সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথ কর্ত্তৃক ৬ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ]　　শ্রাবণ ১৩১৫ ; আগষ্ট ১৯০৮।　　[১ম সংখ্যা।

মহিলার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় মহিলা নানা বিঘ্ন বিপৎ পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন। তজ্জন্য সেই সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা বিধাতাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে নমস্কার করি ; গত বৎসর যে সকল হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও গ্রাহক গ্রাহিকা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মহিলার হিতসাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান করি।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়—বঙ্গদেশের দুঃখ দুর্ভাগ্যের সময় মহিলা রাজভক্তিকে সমর্থন এবং উপকারী রাজপুরুষ ও রাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলার নীতি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন, এবং কোমলপ্রকৃতি বঙ্গ মহিলাদিগকে এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য বলিয়াছেন ; অপিচ ছিদ্রান্বেষণে কাহারও দোষঘোষণা না করিয়া গুণীর গুণগ্রহণ ও মানীকে মানদান এবং উপকারীর উপকার স্বীকারপূর্ব্বক আত্মমহত্বের পরিচয় দান করবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মহিলা ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং অনীতি অধর্ম্মকে ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিবার জন্য স্বদেশীয় ভগিনীদিগকে বলিয়াছেন ; তিনি কোন ভাল বিষয় বর্জ্জনকে পুণ্য বলেন না, বরং পাপ বলিয়া গণ্য করেন। তদ্রূপ বর্জ্জনে জাতীয় উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হয়। যাঁহারা সেরূপ বর্জ্জনের পক্ষপাতী তাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির মিত্র নহেন, শত্রু।

মহিলা গ্রহণের পক্ষপাতিনী, বর্জ্জনের বিরোধিনী। ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির সঙ্গে সদ্ভাব সম্মিলন রক্ষা করিয়া স্বদেশের শিল্প ও পণ্যজাতের যেরূপ উন্নতি হইতে পারে, হিংসা দ্বেষ ও বর্জ্জনের পক্ষপাতী কেহ সেরূপ উন্নতিসাধন কখনও করিতে সক্ষম নহে। যেহেতু পাপের দ্বারা কোন দেশের প্রকৃত অভ্যুদয় হয় নাই, হইবে না, মহিলা ইহাই বলেন। তজ্জন্য বিপ্লবের

পক্ষপাতী লোকেরা, মহিলার প্রতি অত্যন্ত বীতানুরাগ হইয়াছেন। মস্তক প্রস্তরকে আঘাত করিলে প্রস্তরের কিছু হয় না, বরং মস্তকই ক্ষত বিক্ষত হয়। তদ্রূপ ক্ষুদ্র প্রজাশক্তি যদি সুবিশাল রাজশক্তিকে আঘাত করে, সুদৃঢ় রাজশক্তির কিছুই হয় না, দুর্ব্বল প্রজাশক্তিই চূর্ণ হইয়া যায়। ইহা পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ হইয়াছে। এদেশের প্রজাকুল রাজানুগ্রহে প্রাপ্ত উচ্চ অধিকার সকল হইতে সে সকলের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হওয়ায় সেই অধিকারের অযোগ্য বলিয়া ক্রমে বঞ্চিত হইতেছেন, নিজেদের যে কত দোষ ত্রুটি তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল পরচ্ছিদ্রান্বেষণ। স্বদেশী ভলণ্টিয়ার বাঙ্গালী যুবকগণ সময়ে সময়ে যে অসাধারণ যত্ন পরিশ্রমে দেশস্থ নরনারীর সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি কাহার হৃদয়ে না শ্রদ্ধা প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা বঙ্গের গৌরবস্বরূপ হইয়াছেন। অপর স্বদেশী যুবারা যে নানা স্থানে নানা অত্যাচারের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে, কে তাহাদিগকে বাঙ্গালীজাতির কলঙ্ক নরপশু বলিবে না? সম্মিলনবিরোধী বর্জ্জনপন্থী "স্বদেশহিতৈষী" আখ্যাধারী লোকদিগের বহ্বাড়ম্বরে দেশের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, লোকে এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাঁহাদের অনুচিত প্রতিদ্বন্দিতায় রাজপুরুষ ও ইংরাজজাতিসাধারণের ক্রোধ ও বিরাগ বৃদ্ধি হওয়ায় এদেশে বিচ্ছেদ ও অকল্যাণ বৃদ্ধি এবং স্থায়ী হইতেছে। এই বিজ্ঞানপ্রধান যুগে বিজ্ঞানোন্নত সভ্য জাতির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া এই অনুন্নত পরাধীন বাঙ্গালিজাতির নিজে নিজে তদ্বিষয়ে উন্নতি হইবে যাহারা বলে, উহা তাহাদের বাতুলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই প্রকার বর্জ্জনকে যাহারা পাপকার্য্য না বলিয়া পুণ্য কার্য্য, দেশের দুর্ভাগ্যের কারণ না বলিয়া সৌভাগ্যের কারণ বলে, তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত, মহিলার এরূপ বিশ্বাস।

অন্যায় অত্যাচার করিয়া কেহ বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিলে দেশহিতৈষিগণ কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার মনে অনুতাপ আসিতে দেন না, বরং অত্যাচারী বালককে পর্য্যন্ত "বীরপুরুষ" ও "মার্ডার" বলিয়া মাথায় তুলিয়া পুরস্কার দিয়া অন্যায় কার্য্যে তাহাকে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সকলের বিষময় পরিণাম ভাবেন না, বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। নেতাদিগের অবিবেচনা ও একান্ত আতিশয্যের কুফল বহুকাল এদেশের নির্দ্দোষ লোকেরা ভোগ করিবে। রাজবিরোধী বিদ্বেষপরায়ণ নিরীশ্বর দেশ সংস্কারকদিগের দ্বারা এদেশের কল্যাণ না হইয়া অশেষ অকল্যাণ ও বালকবালিকাদের কুশিক্ষা হইতেছে, মহিলার এরূপ বিশ্বাস।

প্রেম, পুণ্য, সত্য, ন্যায় ও সাধুতার জয় চিরকাল হইয়াছে। দ্বেষ, হিংসা, অপ্রেম, ছিদ্রান্বেষণ এবং ছল চতুরতায় অপিচ নিন্দা কটূক্তিতে অধঃপতন হয় মহিলার এইরূপ বিশ্বাস। তিনি এই বিশ্বাসানুসারে অন্তরস্থ আলোকে গত বৎসর নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। যিনি

নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে কর্ত্তব্য কার্য্যসম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ। অপিচ এই বর্ষবৃদ্ধির প্রারম্ভে প্রেমময় পরমেশ্বর এই অশান্তিদগ্ধ বিপন্ন দেশে স্বর্গের প্রেমবারি সিঞ্চন ক'রয়া শান্তি কুশল স্থাপন করুন; তাঁহার কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র পাপক্ষয় ও পুণ্যের জয় হউক, মহিলার এই প্রার্থনা। মহিলা নিজকার্য্যে শুভবুদ্ধি ও শক্তিসামর্থ্য লাভের জন্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

——

সাধ্বী মুক্তকেশী দেবী।

"আজ আম'দের মা নাই। আজ তাঁর শয্যা শূন্য, আজ গৃহ শূন্য। আজ পৃথিবীর কোথাও তাঁর সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। এই পৃথিবীর সকলই ক্ষণস্থায়ী ও অসার। যে দেহ থাকিবে মনে করি, আপনার মনে করি, তাহা থাকে না, সেই জন্যই আ'জ আমরা বলিতেছি আমাদের স্নেহময়ী জননীর শরীর আর নাই। কিন্তু তাঁর সেই প্রশান্ত সরল স্নেহপূর্ণ সুন্দর জীবনই আজ আমাদের সান্ত্বনার স্থল।

"তাঁহার নীরব মহত্ত্বপূর্ণ জীবন আজ আমাদের সম্মুখে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত। তাঁর মুখশ্রীতে বেশ একটী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রসন্নতা লক্ষিত হইত। প্রত্যেক নরনারী যিনি তাঁর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্যও পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাহা স্বীকার করিবেন।

"বিশ্বজনীন প্রেম এবং ক্ষমা তাঁর জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত ছিল। কখনও কাহারও প্রতি রূক্ষ ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। তিনি তাঁর সন্তানসন্ততি কি দাস দাসী প্রভৃতি এমন কি সকলেতেই সমভাবে প্রেম দান করিতেন ও আমাদিগকে সর্ব্বদা সেইরূপ করিতে বলিতেন। কাহারও নিকট হইতে অন্যায় ব্যবহার পাইলেও রাগ করিতেন না বা কর্কশ কথা প্রয়োগ করিতেন না, আবার হয়তো তার প্রতি নিজের কর্ত্তব্যের সময় ঠিক পূর্ব্বেকার সরল স্নেহপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন। বলিতেন 'যাক্, ওরা যা করুক আমাদের কর্ত্তব্য তো আমরা করে যাই, হয়তো আমাদেরও কিছু দোষ ছিল।' দাস দাসীর কষ্ট না হয় সে বিষয় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, এমন কি শাকওয়ালী মেছুনী এবং পর্য্যন্ত তাঁর মিষ্ট কথায় এরূপ মুগ্ধ হইত যে তাঁর কথা এড়াইতে পারিত না। আবার কেহ এরূপ বলিয়াছে 'এ বাড়ীতে ভোরবেলা মা-জীর নিকট আগে জিনিষ বিক্রী করিলে সেদিন বেশী বিক্রয় হয়।' জীবনে কখনও কারও মনে কষ্ট দিতে চাহেন নাই। কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না, আমাদের প্রতিও তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ 'কেহ অন্যায় ক'রলেও কারও মনে কষ্ট দিও না।'

"আমাদের মা সংসারী হইয়াও চিরবৈরাগিণী ছিলেন। তাঁহাতে কখনো কোন পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখি নাই। সংসারের প্রতি তজ্জন্য ঔদাসীন্যও বিন্দুমাত্র

ছিল না। তিনি অপরিচ্ছন্নতা একেবারেই ভালবাসিতেন না। তিনি তাঁর সন্তানদের সর্ব্বদা মোটা ও পরিষ্কার কাপড় পরিতে দিতেন। শুনিয়াছি তাঁর এই ত্যাগের ভাব বাল্যকাল হইতেই তাঁর জীবনে আশ্চর্য্য রূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি ধনীর কন্যা ছিলেন, সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাতে এই সকল গুণ সন্নিবেশিত ছিল।

"১৪।১৫ বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে আসেন, তখন নিজের বস্ত্রালঙ্কার তাঁর সমবয়সী জ্যেষ্ঠা ভগিনী (বড় জা)কে ভাগ করিয়া দিতেন, মনে করিতেন আমি একলা এত কেন পরিব। চোদ্দ পনেরো বৎসরের একটী বালিকার পক্ষে এরূপ ত্যাগের ভাব অল্প মহত্বের পরিচায়ক নয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাটীর হিন্দু আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তখন তিনি হিন্দুনিয়ম বিরুদ্ধ (যাহা তিনি কেবল কুসংস্কার মনে করিতেন) এরূপ অনেক কাজ করিতেন তাহাতে তাঁর আত্মীয় গুরুজন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং তিরস্কার করিতেন, কিন্তু আমাদের মা কখনও তার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দিতে যাইতেন না, হাসিতেন এবং যাহা ভাল বুঝিতেন নীরবে তাহাই করিয়া যাইতেন। সেজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে ও সহায়হীন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই।

"আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না বটে, কিন্তু সন্তানপালনসম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক শিক্ষা জীবনে নিহিত ছিল। শিশুপালন ধাত্রীশিক্ষা প্রভৃতি কিছু পড়িয়াছিলেন। সন্তানদের প্রতি কখনও কঠোর শাসন করেন নাই। কেহ যদি কখন অন্যায় করিয়াছে তাহাতে তাঁর মৃদু ভৎর্সনাই যথেষ্ট ফলপ্রদ হইত। তাঁকে সকলেই ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। তাঁর সুমিষ্ট স্নেহমাখা ডাক এজীবনে কখনই ভুলিবার নয়। দ্বাদশ সন্তানের জননী হইয়াও এত পরিশ্রমী ছিলেন যে, সংসার এবং জগৎ চিরদিন তাঁর সুগৃহিণীপনা ও সুশৃঙ্খলতার পরিচয় দান করিবে।

"সেবা তাঁর অঙ্গের ভূষণ ছিল, সেবা করিতে পারিলে বা পাইলে যেন কত কৃতার্থ ও সুখী হইতেন। অনেক ভাই ভগিনীর বিপদের সময় নিজে গিয়া শুশ্রূষা করিয়া আহার পথ্য দিয়াছেন, এমন কি সময়ে সময়ে ধাত্রীর কার্য্য করিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। অভাবস্থলে সাধ্যমত দানও করিয়াছেন, কিন্তু এই যে সব কাজ গুলি কখনও বাহ্য আড়ম্বরের সহিত করেন নাই, যাঁহাদের করিয়াছেন তাঁহারা আজ তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এসম্বন্ধে তিনি ঈশার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিত বাস্তবিক বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না।

"দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন তিনি জীবনে প্রথম ভীষণ পুত্র শোক পাইলেন তখন তাহা আশ্চর্য্যরূপে বহন করিয়াছিলেন, শোকে কখনও অধীর হইতেন না। প্রথম

শোকে কোন মহিলা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে শোকে অধীর না হইয়া অতুল ধৈর্য্যের সহিত দুর্দ্দমনীয় শোক দমন করিয়া তাঁর সঙ্গে মহাভারতের কুন্তীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন কুন্তী 'শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন আমাকে বিপদেই রেখো তাহলে তোমাকে বেশী করে পাব।' তা এখন সেটী ভাল করে অনুভব করিতেছি সম্পদের মধ্যে থাকিলে এতটা বোঝা যায় না। তার পর ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি শোকের আগুনে দগ্ধ হইয়া বিশ্বাসের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই যে সন্তান চতুষ্টয়ের শোক পাইয়াছিলেন তাঁদের যাইবার পূর্ব্বাভাস আশ্চর্য্যরূপে তিনি পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, এবং তদনুযায়ী মনকে দৃঢ়ীষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন।

"সাংসারিক দুঃখ সুখ শোক আনন্দে কোন রকম অবস্থাতেই তাঁর কর্ত্তব্যের কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। ভীষণ শোকেই হোক আর রোগেই হোক আর যাই হোক না কেন উপাসনার ক্রটী বা ব্যাঘাত কখন হইতে দিতেন না। আমাদেরও বলিতেন, 'মনের সহিত দু একটা কথা যা পার বলিয়া আরাধনা প্রার্থনা করিলেই হবে।' আড়ম্বর কিছুরই ভিতর ছিল না।

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সব করা এইটী তাঁর একটী চমৎকার গুণ ছিল। ধর্ম্মের কাজই হোক বা সংসারের কোন আনন্দের ব্যাপারই হোক বা কোন সভা সমিতিতে যোগ দেওয়াই হোক কিছুতেই তাঁকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিতে দেখা যাইত না। এমন কি মৃত্যুর ৪।৫ দিন পূর্ব্বেও বলিয়াছেন 'তোমরা আলুভাতে ভাত দিয়া লোককে আদর যত্ন করিবে, তথাপি উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিও না।' এ কথাটী বড় মূল্যবান্। আমরা কয় জন বা পারি? স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপ বাবু মহাশয় তাঁর আরাধনা প্রার্থনায় কি যে একটা গভীর আনন্দ পাইতেন তা তিনিই জানেন। ভক্তেরাই ভক্তকে চেনেন। বলিতেন "নরেনের মা এসেছেন, তা তাঁর আরাধনা প্রার্থনাতেই আমি বুঝেছি"। নীরবে এমন গভীর ধর্ম্ম সাধন খুব কমই দেখা যায়। কখনও ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা, প্রসঙ্গ, বা অনেক বড় বড় কথা কাহারও সহিত করেন নাই, কিন্তু ধীর ভাবে দু একটী কথা যা বলিতেন তাহা অতি সুন্দর এবং সারগর্ভ।

"ধর্ম্মের গভীরতা দিন দিন অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইরূপে কয়েক বৎসর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য জীবনে আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখাইয়া দিন দিন পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগে যুক্ত হইতেছিলেন। শেষ অবস্থাতে দারুণ রোগশয্যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিশ্বাসের ফল লাভ করিয়া ইহলোকেই থাকিয়া পরলোকের সুখ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। একদিন বলিলেন 'আমি তো বাড়ীতে নাই, পরলোকে রয়েছি।' প্রায় তিন সপ্তাহ কাল রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, বহুদিন

হইতেই তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, এবং গত দুই বৎসর হইতে তাঁর শরীর বিশেষ ভাবে অসুস্থ হইয়াছিল। ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়াছিল। যতদিন তাঁহার সামর্থ্য ছিল ততদিন কাহারও নিকট হইতে সেবা লন নাই, বরং এই বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ শরীরেও আমাদের প্রতি কত স্নেহ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন; সেই আমাদের প্রিয় মা যাঁর এত সদ্‌গুণরাশি তিনি চিরকাল কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে কতই পরিশ্রম করিয়াছেন, এমন কি দুই শত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া রাত্রি ২টার সময় হইতে এক হাতে নিজে রন্ধন করিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের আহারে বসাইয়াছেন, কখনও নিজের সাহায্যের জন্য কাহাকেও একটী আদেশও করেন নাই। তিনিই আমাদের সেবা লইতে কতই না কুণ্ঠিত হইতেন। রোগশয্যার ভয়ানক গায়ের জ্বালা ও মৃত্যুর তীব্র দংশনে তাঁকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। গাত্রদাহের সময় একদিন বলিলেন 'জর্দ্দনের জলে আমায় নাইয়ে দাও।' অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল যে জর্দ্দনের জলে স্নাত হইলে ঈশার ন্যায় ক্রুশ বহনের সকল ভীষণ যাতনা বহন করিবার শক্তি পাইবেন। বাস্তবিক যে দিন নিজেকে জর্দ্দনের জলে অভিষিক্ত মনে করিলেন সে দিন হইতে অতুল ধৈর্য্যের সহিত এমন যে বিষের জ্বালার ভীষণ যাতনা অবাধে নীরবে বহন করিতে লাগিলেন। অন্য কোন রকম কাতরধ্বনি নাই, দিন ও রাত্রি কত সঙ্গীত, কখনও ব্যাকুল প্রার্থনা, আরাধনা, স্তোত্রপাঠ, এইরূপ নানা ভাবে সেই শান্তিদায়িনী জননীকে ডাকা ছাড়া আর অন্য কথা মুখে নাই। প্রায় দুই মাস হইতেই তিনি পার্থিব সমস্ত ভাব থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, সন্তানদের কথা কেহ কিছু বলিলেও বিশেষ উত্তর দিতেন না বা নিজেও কখনও জিজ্ঞাসা করিতেন না, কেবলই শান্তিধামে যাবার জন্যই ব্যাকুল প্রার্থনা।

"তাঁর এই জীবনসম্বন্ধে সামান্যই বলা হইল। তিনি যে আদর্শ জীবন রাখিয়া গেলেন, আমাদের যাহা মনে আসিল তাড়াতাড়ি লিখিলাম, ক্রমে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন যে কখন কি হইবে, মৃত্যুর সময় হরিনাম করিতে বা শুনিতে পাইব না। সেই জন্য বাড়ীর সব লোককে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া হরিনাম করিতে বলিতেন, গভীর রাত্রে নিজেই স্তোত্রপাঠ করিতেন, নিজের তো তাঁকে নানা উপায়ে ডাকা ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না। তাঁহার প্রস্থানের ৮।১০ দিন পূর্ব্বে একদিন বধূদের ডাকিয়া একজনকে বলিলেন 'ছেলেপুলে নিয়ে সাবধানে সংসার কোরো' আর একজনকে বলিলেন, 'ইহাকে (বাবাকে) দেখো'। আমাদের প্রতি তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ এই 'সকলের ধর্ম্মে মতি হোক ধর্ম্মই একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। কেহ কিছু অন্যায় করিলেও কারও মনে কষ্ট দিও না।'

সমস্ত জীবনের সাধনের ফল এই সময় প্রমাণিত হইয়া গেল। মৃত্যু ব্যাধি সকলই

পরাস্ত হইল। জীবনে তাঁর মহৎ ইচ্ছা জয়যুক্ত করিয়া হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে এবং নিজের মুখের ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে করিতে তাঁর শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুলিত আত্মা অমরধামে প্রবেশ করিল।—শ্রাদ্ধে পঠিত।

কন্যা ও পুত্রবধূ কর্ত্তৃক লিখিত।

মতিবাবুর পারিবারিক অবস্থা।

কার্ত্তিক মাস, প্রভাত সময়। নদীতীর লোকে লোকারণ্য। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনতাস্রোত বহুব্যাপী হইয়া পড়িল। সকলেরই মুখ বিষাদমাখা, সকল চক্ষুই নদীর উপর আকৃষ্ট। দুই দিন পুর্ব্বে ভীষণ ঝটিকা হইয়া গিয়াছে; ঝড়ের অপরিসীম বেগে পূর্ব্বাঞ্চল লণ্ডভণ্ড। আকস্মিক উত্তাল জলতরঙ্গে কত জীব জন্তু, ঘর চালা বৃক্ষাদি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। যেস্থানে লোকের ভিড়, সে স্থানটা একটা প্রকাণ্ড বন্দর; তথায় এক বিস্ময়কর হৃদয় বিদারক দৃশ্য উপস্থিত। তীরের অনতিদূরে ভাসমান শবরাশির মধ্যে মৃত ব্যাঘ্রের উপর একটি বালক শয়ান। বালক মৃত কি জীবিত বুঝিবার উপায় নাই। তীরস্থিত সকলের মুখেই কেবল হাহাকার বিলাপধ্বনি, কিন্তু কাহারো সাহস নাই যে, এই বালকের সম্মুখীন হয়। একটি ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তৎসঙ্গে আরো কয়েক জন সাঁতরাইতে লাগিল। তাঁহারা অতিকষ্টে মৃত ব্যাঘ্র সহিত বালককে পারে তুলিলেন। তৎক্ষণাৎ বালকের সেবা শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন জীবনের আশা নাই। সকলের মুখই ম্লান, স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে লাগিল। অনেকেই হয়তো পুত্রহারা জননী। তাহাদের শোকোচ্ছ্বাস দুর্দ্দমনীয় হইল।

কোথা হইতে একটি বেদিয়া স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বালকের চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ও উদর পরীক্ষা করিয়া বলিল "তোমরা একটু সরিয়া যাওতো, আমি একবার দেখি।" যিনি বালককে জল হইতে তুলিয়াছিলেন তিনি তাহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। সেই বেদিয়া রমণী তাহার থলিয়া হইতে কতকগুলি লতাপাতা বাহির করিয়া তাহার রস বালকের নাকে, কাণে ও মুখের ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দিল—অতি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলিতে বলিতে তাহার বুক পিঠ মর্দ্দন করিতে লাগিল। সহসা বালকের ওষ্ঠ যেন একটু নড়িয়া উঠিল, হস্তপদ ঈষৎ স্পন্দিত হইল। বিচক্ষণ ডাক্তার যাহাকে মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, একটি অসভ্য স্ত্রীলোকের হাতুড়ে চিকিৎসায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল। বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিবামাত্র চারি দিকে আনন্দধ্বনি উঠিতে লাগিল। তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া সেই ভদ্রলোকটি মহানন্দে স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

বালকের আশ্রয়দাতার নাম মতিলাল ঘোষ। সেস্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড কারবার। বয়স পঞ্চাশের উপর হইলেও শক্তি সামর্থ্যে অনেক যুবকই তাঁহার নিকট লজ্জিত

ছিল। মতিবাবুর সংসারে স্ত্রী ও এক কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না। অর্থের কুহকে পড়িয়া সচরাচর লোকের যেরূপ দুর্মতি হইয়া থাকে, জগদম্বার কৃপায় তাঁহার সেরূপ হয় নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য, পরহিতকার্য্যে তিনি অকাতরে সাহায্য দান করিতেন। পূজা পার্ব্বণাদিতে প্রতি বৎসর তাঁহার বিস্তর অর্থ ব্যয় হইত। নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও তাঁহার একটা মস্ত দোষ এই ছিল যে, তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। নিজের ভুল ত্রুটী অন্যে ধরিয়া দিলে তাঁহার অসহ্য হইত। এই দোষের জন্য অনেক সময় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইত।

ঘোষজায়া একটু স্থূলাঙ্গী ছিলেন। স্বামীর অর্থের অভাব নাই, তাঁহার গহণার অভাব কেন হইবে? দুই হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে সমস্ত হাত দুটিতে বিশুদ্ধ খাঁটি সোনার নানা ফ্যাসনের আংটি, জোড়া জোড়া বালা, চূড়ী, ছড়াছড়া তাগা ও অনন্ত। গলায় হীরার চিক্ ও মোটা চেইনহার। কাণে ইহুদী মাকড়ি, ঝাড় ইয়ারিং। নাকে প্রকাণ্ড নথ, দেখিলেই সে কালের সুদর্শন চক্রের কথা মনে পড়ে। অধমাঙ্গের ভূষণের মধ্যে আমরা কেবল ১৬০ ভরি মলের কথাই অবগত আছি। এই গহনার ভারে হাত দুখানি লইয়া তিনি বড়ই বিব্রত ছিলেন। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার একরূপ বিনা বিঘ্নেই সমাধা হইত, কিন্তু বামহস্তের আবশ্যক হইলেই তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন। কোন কোন দিন কাঁদিয়া ফেলতেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাড়ার বিশ্বনিন্দুকী (তাদের নাকে মুখে ছাই পড়ুক) পোড়ামুখীরা নাক্ সিট্‌কাইয়া বলিয়া বেড়াইত "দেখ্‌তে যেন একটা বনো মোষ, তা'তে গয়নার ছিরি দেখ।" কথায় বলে "যত কয় তত নয়।" আমরা কিন্তু শুনিয়াছি একদিন ঘোষজায়ার ফটো তুলিবার বড় সাধ হইল। ফটোগ্রাফার বাবুকে আগেই বলা হইল ছবির রংটা যেন বেশ ফর্‌শা হয়; নতুবা বায়না মিলিবে না। বাবুটি সহাস্যে উত্তর করিলেন, তার জন্য ভাবনা কি? আমি ঠিক মেমদের রং করে দিচ্ছি। তাঁহার গহনার যে কেবল নিন্দাই হইত এমত নয়; অনেক ঈর্ষ্যাপরায়ণা অপ্রিয়বাদিনী মনের দুঃখে নিজ নিজ অল্পবিত্ত হতভাগ্য স্বামীকে অভিসম্পাদ না করিয়া ছাড়িতেন না।

মেয়েটি মাত্র নবম বৎসরের বালিকা। তাহার মুখখানি বড়ই সুন্দর। যে দেখিত সেই বলিত "মরি মরি মেয়েটি যেন চ'খে হাসে।" গায়ের রং দু'ধে আল্‌তা না হইলেও অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ,—তাতেই নাম রাখিয়াছিল শ্যামা।

মতিবাবুর ভদ্রাসন হুগলি জেলায়। কিন্তু কারবার উপলক্ষে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে জীবনের অধিক কাল কাটাইয়া ছিলেন। সেজন্য তাঁহার একটা বিশেষ নাম ছিল, 'রাঢ়ি বাঙ্গাল। শ্যামা একমাত্র সন্তান, তাই তিনি তাহাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার ইষ্টদেবতা আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণটি বৃদ্ধ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি শ্যামার হাত

দেখিতে বসিলেন। হাত দেখা শেষ হইলে তিনি শিষ্যকে গোপনে বলিলেন "দেখ, তোমার মেয়ের অদৃষ্ট ভাল নয়, তাহার কপালে রাজদণ্ড। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় অশুভজনক। ইহার ষোড়শবর্ষ বয়সে এক মহা গোলযোগ আশঙ্কা করিতেছি।—বোধ হয় যেন ইহার গ্রহবিপর্য্যয় ঘটিবে। সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিকিরণ করিবে না। কি যে একটা কাণ্ড ঘটিবে ঠিক্‌ করিতে পারিতেছি না।" কথা শুনিয়া মতিবাবুর আত্মা চমকিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "এখন উপায় ?"

ইষ্টদেবতা—উপায় একমাত্র গ্রহশান্তি। ইহার কল্যাণার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে।

ক্রমে গিন্নীর কাণে এই সংবাদ গেল। তিনি পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

শ্যামার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তর শিখিয়া ফেলিল। তাহার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন শকুন্তলা বৃত্তসংহার শেষ হইয়াছে। মতিবাবু আহ্লাদে তাহাকে ইংরাজী পড়াইতে লাগিলেন। ইংরাজীটা গিন্নীর ভাল লাগিল না। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন "ও সব রেখে দাও, আমি এসব ক্যাচম্যাচ শুনতে পারি না।" কিন্তু বাবু যাহা ঠিক বুঝিয়াছেন তাহার উপর অন্যের বিচার কেবলই অরণ্যে রোদন। শ্যামার ইংরাজী পড়া বেশ চলিতে লাগিল।

মতিবাবু ছেলেটিকে কোলে করিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন। বালক সুস্থ হইয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। শ্যামার মা তাহাকে সস্নেহে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

শ্যামার মা—বাছা, তুমি কেঁদ না। তোমার কিসের ভাবনা ? তোমার বাবার নাম কি ?

বালক—প্রভাসচন্দ্র বসু।

শ্যা-মা—তোমার বাড়ী ?

বালক—কেদারপুর।

শ্যা-মা—তোমার নাম ?

বালক—হারাধন।

শ্যা-মা—বাঃ সুন্দর নামটি তো। আচ্ছা তোমার কি কিছু মনে পড়ে ?

বালক চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, "আমি স্কুল থেকে যখন বাড়ী যাই, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমাদের বাড়ীর নিকটই প্রকাণ্ড নদী। ঘরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে একটা ভয়ানক শব্দ শুনিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে মহাবেগে নদীর জল আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। মা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তার পর বাবা আমাকে কাঁধে করিলেন। জল ক্রমেই বাড়ীতে লাগিল। তুমুল ঝড়ে ঘরের ঝাপ, চাল কোথায় উড়াইয়া নিল। বাবা আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমি স্রোতে ভাসিয়া গেলাম। অন্ধকার রাত্রি, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতেছিল। হাতের নিকট যাহা পাইলাম তাহাই চাপিয়া ধরিলাম। তার পর কি হইল জানি না।" বালক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। শ্যামা ও তাহার মা চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। শ্যামার মা বালকের চক্ষের জল মুছাইয়া শোকার্ত্ত-হৃদয়ে বলিলেন,

"বৎস হারাধন, তুমি আর কাঁদিও না। আমরা তোমার বাপ মার খোঁজ করিব। এখন তুমি আমাদেরই ছেলে। এই বাড়ী ঘর সমস্তই তোমার।"

মতিবাবু হারাধনের পিতামাতার অন্বেষণে স্বয়ং কেদারপুর গেলেন। কিন্তু কোথায় সে স্থান? গ্রামের ভিতর ২।১ খানা পাকা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নাই। শবের পুঁতি গন্ধে সেস্থানে তিষ্ঠান দায় হইল। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন বালকের পিতামাতা কেহই জীবিত নাই। তাহার এক জন মাতুল ভিন্ন গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, তিনি নিজেই ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

ক্রমশঃ।

কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী।

(৩১১ পৃষ্ঠার পর।)

(সেজমেয়ে চূণীর বিবাহ।)

আমার বড় জামাই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গেই সেজমেয়ের বিবাহ হয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহ হয়। পূর্ব্বে এক ধনবানের ছেলের সঙ্গে বিবাহের ঠিক হইয়াছিল। শেষে আমার বড় মেয়ের মৃত্যুর পর সেই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ভাশুর বড় জামাইএর সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহ অতি গরিব ভাবেই হইয়াছিল। এমন কি এক খানি কাপড়পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। আমার এই মেয়ে অতি সুন্দরী। দশ বৎসর বয়সে এই মেয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহ হয়। এই বিবাহ আমি নিজেই দিয়াছিলাম। টাকাকড়ি অবশ্য ভাশুরের হাতে ছিল, তিনিই সব খরচ পত্তর করিয়াছিলেন, কিন্তু পছন্দ করিয়াছিলাম আমি। আমাদের নিজ-গ্রামের যাদবচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে খরচপত্রের কোনও অভাব হয় নাই। এই মেয়েরও দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। সমস্ত মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে অল্প কয়েক বৎসর পরে কেশবের বিবাহ হয়।

সর্ব্ব প্রথমে কেশবের ছেলে বয়স হইতে কাঁচরাপাড়ার শ্রীনাথ মজুমদারের মেয়ের সহিত প্রস্তাব হয়। মেয়েটী বেশ সুন্দরী ছিল, অনেক চুল ছিল। আমি বলিতাম, এতো আমার বৌ হইয়াই আছে। এই মেয়েকে আমি পা মুছাইয়া দিতাম; কেশবের সঙ্গে একপাতে ভাত খাওয়াইয়া দিতাম; তাহার মাকে বেহান বলিতাম। এই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ নিশ্চয়ই হইত, শুধু একটি কারণে আমার ভাশুর অমত করিলেন। কারণটি এই—আমার শ্বশুর যখন ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় একবার ৩৪০০০ (চৌত্রিস হাজার) টাকা চুরি যায়, তাহাতে সেই সময়ে সকলেই এই মেয়ের ঠাকুর দাদাকে সন্দেহ করিয়াছিল। আমার শ্বশুর ইঁহাকে কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। আমার ভাশুরেরও এই বিশ্বাস ছিল যে, টাকা চুরি যাওয়ার পর আমার শ্বশুরের মনের কষ্টে দম্‌ব্যামু হয়। সেই

ব্যামুতে এক এক বার তাঁর আধঘণ্টা পর্য্যন্ত দম্ আট্‌কে থাকিত। শেষে এই ব্যামুতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই কারণে আমার ভাশুর এই মেয়েকে তাঁহার পিতৃ-হন্তার পৌত্রী মনে করিয়া বিবাহে অমত প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু এই মেয়েকে বড়ই ভাল বাসিতাম। শেষে এই মেয়ের সঙ্গে নববিধান প্রচারক শ্রীমান্ উমানাথ গুপ্তের বিবাহ হয়। এই মেয়ের প্রতি সেই পূর্ব্বেকার ভালবাসা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

এই সম্বন্ধের পর হাঁড়েলার এক সুন্দরী কুলীন কন্যার সহিত কেশবের বিবাহের প্রস্তাব হয়। আমার ভাশুর সেই মেয়ে সুন্দরী বলিয়া আপনার সেজছেলের সঙ্গে ঠিক করিলেন।

এই সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া গেলে বালির চন্দ্রমজুমদারের মেয়ে গোলাপ সুন্দরীর সঙ্গে কেশবের সম্বন্ধ ও বিবাহ হয়। এই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হওয়া আমার বেশ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যখন শুনিতে পাইলাম মেয়ে তত সুন্দরী নয়, এবং অতি ছোট তখন আমার একটু অনিচ্ছা হইতে লাগিল। আমারভাশুর মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। তিনি প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু যে ভাবে বলিলেন তাতে আমার বেশ মনে হইল মেয়ে সুন্দরী নয়, তারপর আমি একবার যখন বড়বৌ ও ছোট মেয়েকে লইয়া বাপের বাড়ী যাইতে-ছিলাম, সেই সময় বালির ঘাটে নৌকা লাগাইয়া বৌ ও ছোট মেয়েকে ঝিএর সঙ্গে মেয়ে দেখিতে পাঠাইলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার মন আরও খারাপ হইল। সে যাহা হউক বিবাহ ঠিক হইল। বৌ ঘরে আসিল। বৌএর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে আমার মন আরও খারাপ হইল, এমন কি কাঁদিয়া ফেলিলাম, আমার ভাশুরও অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি নিজে বাতি লইয়া ধরিলেন, এবং আমায় বেশ করিয়া মুখ দেখিতে বলিলেন। মুখ দেখিয়া আমার মনটা ভাল হইল। মনে করিলাম মুখখানি বেশ, পরে ভাল হইবে। বিবাহের সময় বৌ অতি ছোট, রোগা ও কাল ছিলেন, মাথায় চুল আদপেই ছিল না। কেশব পরে ঠাট্টা করিয়া আমার মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা আর কাহারও মেয়ে দেখিতে যাইও না।" কিন্তু বিবাহের পর তিনি একদিনের জন্যও দুঃখ করেন নাই। তিনি বৌকে কখনও বাপের বাড়ীতে রাখিতেন না। বৌ এত রোগা ও ছোট ছিলেন যে, কেশব যদি মন্দ ছেলে হইতেন তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব নিশ্চয় মন্দ হইয়া যাইত। কিন্তু কেশব ছেলেবেলা হইতে বৈরাগ্য ভাবে পূর্ণ ছিলেন। সেইজন্য এই বিবাহেতে তাঁহার কোনও অনিষ্ট না হইয়া বরং ভালই হইল।

বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি লইয়া আসি, সেই পর্য্যন্ত আমারই ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন। ধর্ম্ম ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌএর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।

ভাশুরের মেজ ছেলের অধিবাসের দিন নাচেতে তাঁর মেজ ছেলেকে গদিতে বসান হইয়াছিল। আমার ছেলের বিবাহের দিন আমার ভাশুরের সেজ ছেলের বিয়ের নাচ যে এক সঙ্গে হয় ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলিলাম, আমার ছেলের বিবাহেতে ভিন্ন নাচ করিতে হইবে। কারণ আমার ছেলেকে একদিন নাচেতে আলাদা রূপার তক্তানামায় (চতুর্দ্দোল) বসাই ইহা আমার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি সেই দিন আপনার সেজ ছেলেকেও কেশবের সঙ্গে গদীতে বসাইয়া দিলেন।

সরলাসুন্দরী কাস্তগির।

প্রাচীনকালের আর্য্যনারীদের জীবনের পরীক্ষা।

প্রথম, কুন্তীদেবী।

পুরাকালে হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং বিদুর নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতাবশতঃ রাজসিংহাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডু রাজা হইয়াছিলেন। বিদুর দাসী-গর্ভজাত বলিয়া রাজসিংহাসনে তাঁহার অধিকার ছিল না। পাণ্ডুর কুন্তী এবং মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। প্রতিষ্ঠার সহিত বহুকাল রাজত্ব করিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থায়িরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পাণ্ডু আপন জ্যেষ্ঠ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং অমাত্যবর্গ হস্তে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দিয়া কিছুকালের জন্য যখন বনবাস করিতেছিলেন তখন কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্টির, ভীম এবং অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল এবং সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। এই পঞ্চ পুত্রের জন্মগ্রহণের কিছুকাল পর পাণ্ডুর মৃত্যু এবং তৎসহ মাদ্রীর সহমরণ ঘটে। কুন্তিদেবী বৈধব্যাবস্থায় এই পঞ্চ পুত্রের লালন পালনের গুরুভার প্রাপ্ত হয়েন, এবং রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। আশৈশব কুন্তী দেবী ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং বিশ্বাস ভক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন. এক্ষণে শোক দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভর এবং ভক্তি আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সন্তানদিগের যাহাতে সত্যনিষ্ঠা ভগবানে ভক্তি ও নির্ভর এবং নানাবিধ বিদ্যা ও সদ্‌গুণের বিকাশ এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করে তজ্জন্য কুন্তীদেবী একান্ত যত্নবতী হইলেন। মাতার যত্ন কোন দিনই নিষ্ফল হয় না। যে মাতা যেরূপ ভাবে সন্তান প্রস্তুত করেন সন্তানগণ সেই রূপেই প্রস্তুত হয়। কুন্তীর যত্নে যুধিষ্ঠির ভারতভূমিতে সত্যবাদী এবং ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিচিত হইলেন। অর্জ্জুনের ভগবানে একান্ত নির্ভর এবং ভীমের ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস হইল, নকুল সহদেব ধর্ম্মের শান্ত গাম্ভীর্য্য ভাব লাভ করিলেন। এই জন্যই এই গুণবতী নারী কুন্তী হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় কেবল স্মরণ-মধ্যেই থাকিয়া যায়, সেরূপ নিষ্ঠার সহিত পুত্র প্রস্তুত করিতে এদেশের নারী মধ্যে তেমন যত্ন দেখা যায় না।

কুন্তী অতি বুদ্ধিমতী এবং ধীর প্রকৃতির রমণী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ছিল, কিন্তু পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। পাণ্ডু রাজা ছিলেন, উত্তরাধিকারিসূত্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরই রাজপদের অধিকারী। অপচ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র দেখিলেন যে তাঁহার তনয়দের রাজ্যলাভের ন্যায়ানুসারে কোন সম্ভাবনা নাই, তখন স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনজন্য চিন্তিত হইলেন। দুর্য্যোধনও রাজ্য লালসায় অধীর হইলেন। এমতাবস্থায় কুন্তী দেখিলেন যে, তাঁহার ছেলেরা নিতান্ত সহায়হীন। কেন না শেষ কয়েক বৎসর পাণ্ডুর অরণ্যে অবস্থানকালে রাজ-ক্ষমতা সমস্তই ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রদের হস্তে পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় ভগবান্ ভরসা ভিন্ন পুত্রদের পৈতৃক রাজ্য লাভের অন্য পন্থা নাই। সুতরাং দীনবেশে কুন্তী পুত্রগণসহ সুসময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ জীবিত থাকিতে দুর্য্যোধনের রাজপদ লাভ কঠিন, সুতরাং তাঁহারা যাহাতে নিহত হয় তাহার উপায় কৌশলক্রমে করিতে ধৃতরাষ্ট্রসহ দুর্য্যোধন উদ্যোগী হইলেন। প্রথমতঃ দুর্য্যোধনাদি একশত ভাই অন্যান্য বন্ধুগণ সহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে লইয়া কোন প্রসিদ্ধ রম্য স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতে গেলেন। তথায় আহারের সময় আহার্য্যসহ প্রখর বিষ ভীমকে খাওয়ান হয়। আহারান্তে সকলে বিশ্রামার্থ নিদ্রা গেলেন। দুর্য্যোধন দেখিলেন বিষে ভীমের উপর ক্রিয়া করিয়াছে। অন্যের অগোচরে ভীমকে অচেতন অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দেন। প্রবল স্রোতে ভীমকে কোথায় লইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখিতে না পাইয়া বড় ব্যস্ত হইলেন। তিনি বহু অন্বেষণে কোথাও সন্ধান না পাইয়া বিষণ্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কুন্তী সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া শোকার্ত্ত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না, আত্মসম্বরণ করিলেন। ভীমের অপরিমিত বল ছিল তাঁহার ভয়ে দুর্য্যোধনেরা ভীত ছিল। এক্ষণে তাঁহার অভাবে যুধিষ্ঠিরাদিকে বিনাশ করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ভীম তীব্র বিষের ক্রিয়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া কতিপয় দিবস পর মাতৃ-সন্নিধানে ফিরিয়া আইসেন, এবং দুর্য্যোধনের গুপ্ত হত্যার চেষ্টার বিষয় মাতাকে জ্ঞাপন করেন। তদবধি কুন্তী পুত্রগণসহ অতিশয় সন্তর্পণে দিন কাটাইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন দেখিল তাহার এই প্রথম উপায় ব্যর্থ হইল। অতঃপর পিতার যোগে দ্বিতীয় কৌশল বিস্তৃত করিল। জ্যেষ্ঠতাতের আদেশে দুর্য্যোধন নির্ম্মিত বারণাবতস্থ জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতাসহ যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া নিহত করিবে এই অভিপ্রায়ে তীর্থদর্শন উপলক্ষ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র যে পাঠাইয়াছেন তাহা কুন্তী এবং তাঁহার পুত্রদের বুঝিতে বাকি রহিল না। কুন্তী এই বিপদে অবসন্ন হইলেন না। কেন না বিশ্বাসীরা কোন বিপদে আপদে

অবসন্ন হন না, বরং তাঁহাদের বিশ্বাস নির্ভর অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

ধৃতরাষ্ট্রের এই দুরভিসন্ধি যে তাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহাদের পলায়ন এবং অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিয়া মনের ত্রাসে তাঁহারা নিজেরাই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার তনয়গণ মনে করিলেন, মাতাসহ পাণ্ডুনন্দনেরা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে।

কুন্তী পুত্রগণসহ দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষোপজীবিনী হইলেন; অদ্য এক গৃহ, কল্য অন্য গৃহ আশ্রয় করিয়া ছদ্মবেশে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণগৃহে স্থান গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকালে পূজাবন্দনা সমাপনান্তর যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতা ভিক্ষার্থ নির্গত হইতেন, আর ভীম মাতৃ সন্নিধানে রক্ষকরূপে অবস্থান করিতেন। সেই সময় সেই দেশে এক নরভুকের বড় উপদ্রব ছিল। তাহার সঙ্গে সেই দেশের রাজা প্রজার এই ব্যবস্থা ছিল যে, প্রতিদিন তাহার আহারার্থ উপাদেয় আহার্য্যসহ এক মনুষ্যকে পালা ক্রমে এক এক বাড়ী হইতে দিতে হইবে। ঘটনাক্রমে সেদিনের পালা আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের ছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, এক পুত্র এবং এক কন্যা এই চারি জনের মধ্যে কাহাকে নরভুকের গ্রাসে প্রদত্ত হইবে, এই লইয়া ক্রন্দন হইতেছিল। কুন্তী ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ যে ঘরে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইলে পর ব্রাহ্মণকে আপনার পুত্র ভীমকে তৎপরিবর্ত্তে দিতে প্রস্তাব করিলেন। ভীম মাতৃ আজ্ঞায় জীবন দান দ্বারা অন্য জীবন রক্ষা করা, অথবা যদি ভুজবলে রাক্ষসকে ধ্বংস করিতে পারেন তবে একটি দেশকে উদ্ধার করা হইবে ভাবিয়া ব্রাহ্মণের পালা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কথিত আছে ভীম সেই নরভুক্‌কে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করিয়া সেই দেশের উপদ্রব শান্তি করেন। আপন পুত্রদানে পরের জীবন রক্ষা করায় মহতী পুণ্য নিষ্ঠা কুন্তীর ন্যায় মাতার ছিল বলিয়াই পুত্রগণ এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ পরোপকারী, পরের জন্য এবং দেশের জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পর পাঞ্চাল রাজার কন্যার বিবাহ দর্শনোপলক্ষে মাতা সহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালে প্রস্থান করেন। পঞ্চাল রাজা দ্রুপদের দ্রৌপদী কন্যার স্বয়ম্বরে এইরূপ ঘোষণা হইয়াছিল, যে কেহ লক্ষ্যবিদ্ধ করিবে, তাহাকেই দ্রৌপদী পতিত্বে বরণ করিবেন। ভারতের সমগ্র রাজা তথায় সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই অকৃতকার্য্য হন। শেষ সুবিধা বুঝিয়া অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিলে দ্রৌপদী তাহাকে বরণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঈর্ষান্বিত রাজন্যবর্গ কতকটা গোল উপস্থিত করিলে কৃষ্ণ তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর দ্রৌপদীসহ পঞ্চ ভ্রাতা যেস্থানে মাতাকে রাখিয়া দিবসের ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির

হইয়াছিলেন, তথায় চলিয়া গেলেন। দূর হইতে মাতাকে ডাকিয়া ভীম বলিলেন, "মা আজ তণ্ডুল ভিক্ষা অধিক মিলে নাই, কিন্তু অভিনব এক ভিক্ষা লাভ হইয়াছে।" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা পাঁচজনে বাটিয়া খাও।" কিন্তু যখন দেখিলেন যে এই সামান্য ভিক্ষা নয় একটী রূপসী যুবতী। তখন কুন্তী অতি বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "এখন আমার বাক্য সত্য হইবে কি প্রকারে? একটী মেয়ে পাঁচজনের পত্নী কি করিয়া হইবে?" কুন্তী ব্যস্ত হইলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইবে কি করিয়া। ইহা দ্বারায় এই প্রমাণ হয় যে, তৎকালের রমণীরা বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। অনৃত বাক্য বলিতেন না। মাতার বাক্য সত্য করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা প্রচলিত নিয়ম এবং দেশাচারবিরুদ্ধে পঞ্চভ্রাতা মিলিয়াই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। যদিচ বিষয়টি অত্যন্ত নিয়মবিরুদ্ধ, রুচিবিরুদ্ধ তথাপি এই ঘটনা তদানীন্তন মাতারা সন্তানের নিকট যে, কখনও কোন বৃথা বাক্য কিম্বা অসত্য বাক্য বলিতেন না, এই প্রমাণিত হয়। আজকাল যদি মাতারা এইরূপ খাটি কথা, সত্য কথা, সত্য ব্যবহার সন্তানদের প্রতি করিতে পারিতেন তবে দেশের যুবকদল কত উচ্চ নীতি ও ধর্ম্মবলে বলী হইত। ধর্ম্মবল হইতে শারীরিক বল, স্বাধীনতা, পুরুষকার সমস্তই বিকাশ পায়। কুন্তী এবং তাঁহার পুত্রদের জীবন আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ অকাট্যরূপে পাওয়া যায়। এই বিবাহ দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রৌপদ রাজাকে সহায় পাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র এখন দেখিলেন যে, পাণ্ডবেরা জীবিত আছে, এবং প্রবল সহায় লাভ করিয়াছে তখন সৌহার্দ্দে ডাকিয়া আনিয়া আদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অর্দ্ধ রাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন। এইরূপে বিধাতার করুণায় কুন্তী দুস্তর বিপদ্ উত্তীর্ণ হইলেন; পুত্রদিগকেও পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিলেন। কেবল একমাত্র ঈশ্বর লক্ষ্যই যাহাদের জীবন তাহাদের সংসারের যাহা কিছু আবশ্যক তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব "অগ্রে স্বর্গরাজ্যে আরোহণ কর পশ্চাৎ যাহা কিছু আবশ্যক তাহা প্রদত্ত হইবে।" ঈশার এই মহাবাক্যের প্রমাণ প্রতি ধর্ম্মাত্মার জীবনে দেখা যায়। "সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্যমামেকং শরণং ব্রজ।" কৃষ্ণের ও ঈশার এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখা যায়। হে ভারতের মহিলাশ্রেণী, ঈশা কৃষ্ণের মহাবাক্যগুলি জীবনে পালন করুন এবং দেশকে ঐশীবলে পূর্ণ করুন। পুণ্যক্ষেত্র, স্বাধীন রাজ্যরূপে ভারত পুনরায় পরিণত হইবে।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের উদ্ধারকারিণী।

মহিলাদের মধ্যে যাহারা "টম্ কাকার কুটীর" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা আমেরিকার দাসত্ব প্রথার জঘন্যতা এবং ভীষণতার পরিচয় পাইয়াছেন। আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদিগকে বলে, কলে, কৌশলে অপহরণ করিয়া ইউরোপীয়

লোকেরা দাস করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিত। মনুষ্য বিক্রয় প্রথা উনবিংশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছিল। যেমন গরু বাছুর ক্রয় বিক্রয় হয় তদ্রূপ নিগ্রোদিগকে দাসরূপে ক্রয় বিক্রয় করা হইত। স্ত্রী এক জনের নিকট স্বামী অন্যের নিকট, পুত্র তৃতীয় ব্যক্তি কন্যা চতুর্থ ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হইত। কে কোথায় যাইত তাহার কোন সন্ধান তাহাদের পরস্পর মধ্যে জানা থাকিত না। জন্মের মত স্ত্রী, স্বামী পুত্র কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। কেবল তাহা নহে, স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে নূতন প্রভুর আদেশে পুরুষান্তর গ্রহণে স্ত্রী বাধ্য হইত। নিগ্রোর প্রতি অমানুষিক ব্যবহারনিচয় পাঠ করিলে মনুষ্য মাত্রই সিহরিয়া উঠিবে। আমাদের দেশে যেমন শাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসরূপে বিধাতাই সৃজন করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করা হয়, তেমনি আমেরিকাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেন যে, বিধাতা কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে শ্বেতকায়দের দাসত্বের জন্যই সৃজন করিয়াছেন। কৃষ্ণকায়েরা বিধাতার অভিশপ্ত জাতি। আমেরিকাতে বলপূর্ব্বক দেশান্তরিত এবং দাসত্ব শৃঙ্খলে নিক্ষিপ্ত নিগ্রোগণের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না। পশুদের অবস্থাও ইহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল ছিল। তাহাদের গৃহ, বাড়ী, দেশ, পরিবার বলিতে কিছুই ছিল না। এমন দেশ শূন্য, সহায় শূন্য, বান্ধব শূন্য দুরবস্থায় পতিত নিগ্রোরাও পরিণামে বিধাতার অদ্ভুত কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণ আমেরিকায় যুক্তরাজ্য মধ্যে নিগ্রোদের একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছে, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বিদ্যাচর্চ্চা এবং সভ্যতার অন্যান্য যতরূপ উৎকর্ষ সাধন আছে তাহারা তাহার অংশী হইয়াছে। মিসেস্ বিচার ষ্টো নাম্নী একটী সদাশয়া পরম ধার্ম্মিকা মহিলা এই নিগ্রো জাতির দুর্দ্দশার বিষয় "আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন" নাম দিয়া ইংরাজীভাষার একটী গ্রন্থ অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ ভাবে লিখিয়াছিলেন যে, তৎপাঠে সহৃদয় নরনারীরা আর নিগ্রোদের উদ্ধারসাধনে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। মনুষ্য মাত্রই যে ভ্রাতা বিধাতার এই নির্দ্দেশে নিগ্রোরাও শ্বেতকায়দের ভ্রাতা; বিধাতা প্রতি মনুষ্যকে স্বাধীনতাসহ সৃজন করিয়াছেন। নিগ্রোদিগের নৃশংস দাসত্ব মহাপাপ অনুভব করিয়া অচিরে তাহাদের স্বাধীনতা সম্পাদনজন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। একজন মহিলার ধর্ম্মপ্রাণসম্ভূত লেখনীতে কত বড় একটি মহাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল পাঠিকা তাহা চিন্তা করুন। দেখিবেন, জগতে মহিলারাই দেবভাব বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা অশেষ কল্যাণের প্রসূ। বঙ্গমহিলারা কি স্বীয় স্বীয় মহত্ব, গুরু দায়িত্ব বুঝিবেন? "না জাগিলে ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না" অতএব ভগিনী জাগ। স্বীয় মহাব্রত সাধন কর। তোমরা বিধাতার দয়া প্রকৃতি স্বরূপা।

স্বর্গীয়া সারদাদেবী।

আজ কোথায় নবীন! কোথায় কেশব! কোথায় কৃষ্ণবিহারী! ভক্তিরূপা জননীর শ্রাদ্ধ করিতে তাঁহারা কেহই রহিলেন না। তিন জনেরই এবারকার ব্যক্তিত্ব অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি এখনও মিটে নাই, কিছুদিন পরে মিটিবে, তবে কেশবের স্মৃতি মিটিবার নহে, তাহা কল্পান্ত পর্য্যন্ত কোথাও না কোথাও ফুটিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

আলেকজাণ্ডার, হানিবল, সিজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অমিত পরাক্রম ব্যক্তিগণকেই সাধারণ লোকে মহাবীর বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে, এবং তাঁহাদের গর্ভধারিণী মহিলাদিগকে বীরপ্রসবিণী নাম প্রদান করত ধন্যবাদ দেয়; কিন্তু ধর্ম্মবীর মহাপুরুষদিগের দেহ যাঁহাদের শরীরসম্ভূত সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে বড় একটা বুঝিতে পারে না। ঐ সকল দেবীগণ যে আমাদের কি পরিমাণে পূজনীয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যে সে মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষণজন্মা ধর্ম্মাত্মাগণের জননীদের বিষয়ে আমরা সম্যক্ অবগত নহি; কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের ও পুণ্যশ্লোক কেশবচন্দ্রের প্রসূতিদ্বয়সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতাকে আমাদের মধ্যে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার কোমল দয়ার্দ্রচিত্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার পরদুঃখকাতরতার যে কত কথা আমরা শুনিয়াছি তাহার সংখ্যা করা কঠিন, এক একটী উদাহরণ যেন এক একটী অমূল্য রত্ন; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই যেন পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। মাতৃ-ভক্ত পুত্রও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি এক শ্রেণীর মহোচ্চ জীব ছিলেন; আর কেশব-জননী যেন অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও সেবা-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সারদাদেবীর জীবনটা যেন ক্লেশময় এবং সেই সকল ক্লেশ তিনি যেরূপ অসাধারণ ভাবে বহন করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতের রমণীমাত্রের আদর্শ হইয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বিরাজ করিবে। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যে দিন কেশবের চিতাভস্ম ভাসাইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন, কমল কুটীরের মধ্যাহ্নসূর্য্য অকালে অস্তমিত হইয়া যে দিন তথায় দিবসে আঁধার দেখা দিয়াছিল, আনন্দময়ী কলিকাতা নগরী যে দিন সহসা নিরানন্দে মুহ্যমান হইয়াছিল, সমগ্র ভারত যে দিন মহাপুরুষের শোকে অভিভূত হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকা ভাবিয়া দেখুন তাঁহার গর্ভধারিণীর পক্ষে সেই নিদারুণ দিবস কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, পরন্তু ঐরূপ তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও তিনি ভগবচ্চরণ হইতে বিচলিত হয়েন নাই, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া বিধাতার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস রাখিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এরূপ দশজন জননী যে জাতির মধ্যে এক সময়ে বর্ত্তমান থাকেন সে জাতি হু হু করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের এই দুঃসময়ে এরূপ আর একজন খুজিয়া পাওয়া ভার হইয়াছে। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মাতা সচীদেবীর কথা পুস্তকে পড়িয়াছি, আর তদনুরূপ সারদা দেবীকে সশরীরে দেখিয়া আমরা নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

আমার বিশ্বাস, নববিধান সমাজে যে মহিলা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন তিনিই সারদা দেবীকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তি বিশ্বাস সেবার পথে অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন। "এ ত কথার কথা নয় রে ও ভাই ভাবের কথা নয়, জীবনে দেখা'তে হ'বে যুগান্ত প্রলয়।" শুদ্ধ লম্বা লম্বা বক্তৃতায় পেট ভরে না চোটপাটের লেখায় মন ভিজে না, কিন্তু একটা ত্যাগস্বীকার, ধৈর্য্য, দয়া, প্রেমের জীবন্ত উদাহরণ সম্মুখে দেখিলে পাষাণ গলিয়া দ্রব হইয়া যায়।

এ জীবনে বহু পুরাতনবিধানী, নব বিধানী, নিত্য নূতনবিধানী কত রকমের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা দেখিলাম, ব্রাহ্ম পরিবার দেখিলাম, কিন্তু সরল বিবেকের তিলক, সরল বৈরাগ্যের ছাপা, সরল প্রেমের মালা অতি কম জায়গায় দেখা গেল, এ পোড়া চক্ষে খাঁটি জীব ঘটিল অল্প। মুখে যিনিই যা বলুন, কলমে যিনিই যা লিখুন কাজের বেলায় সবাই দুনিয়াদারীতেই মুগ্ধ; ধর্ম্মের দলও সহরের বাজারের মত দোকানদারীতে ভরা। নামজাদা ধর্ম্মপ্রচারক, অথচ আসল কাজের কথাকে "আশপাশের কথা" বলিতে কুণ্ঠিত নন, টাকাকড়ির কথাকেই "প্রকৃত কথা" বলিতে দ্বিধা করেন না, অথচ বক্তৃতায় সংকীর্ত্তনে খুব মাতেন, এবং লোককে মাতাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ছেলের বিয়ের বেলা বড় মানুষের মেয়ে খোঁজেন, দশটাকা আদায় করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, এরূপ ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মসমাজেও বিরল নহে। আমাদের কোন আত্মীয়া যুবতী, নামলেখান দীক্ষিত নববিধানীর কন্যা স্পষ্টাক্ষরে এক সময় বলিয়াছিলেন, দরিদ্রের কন্যার বিবাহ অসম্ভব, দু' চা'র হাজার টাকা না খরচ করিতে পারিলে কি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়?" হায়! হায়। ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের পরিণাম। "দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ" যাঁহারা গাইয়া গেলেন, তাঁহাদের দলের লোকের মুখে এখন প্রকাশ, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মসমাজও একটা সম্প্রদায় মাত্র, ব্রাহ্ম হইলেই যে সকলকে বিবেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, ধর্ম্মপ্রাণ ভাল হিন্দু ভাল, খৃষ্টান ভাল, মুসলমানের মত অল্প সংখ্যক ভাল ব্রাহ্মও থাকিবে, আবার দুনিয়াদার হিন্দু খৃষ্টানাদির মত অধিকাংশ দুনিয়াদার ব্রাহ্মও থাকিবে। তবে আর পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রয়োজন কি?

উক্তরূপ ক্ষেত্রে সারদা সুন্দরীর মত দেবোপম প্রকৃতি মহিলাকে যে ব্রাহ্মসমা-

জের একটী মূল্যবান্ রত্ন শতরাজার ধন একমাণিক বলিয়া চিরকাল পূজা করা কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মদের কেন শুদ্ধ হিন্দুদের কেন, এরূপ মহাজীব সকল সম্প্রদায়েরই বন্দনীয়।

C. Sen.

কল্যাণীয়া প্রসন্নতারা গুপ্ত।

মহিলার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় বিলাত হইতে তারে এই শোকের সংবাদ পাওয়া গেল যে, আমাদের পরম স্নেহপাত্রী প্রসন্নতারা গুপ্ত (ইণ্ডিয়া কাউন্সেলের মেম্বর কে, জি গুপ্তের পত্নী) গত ৩১শে শ্রাবণ শনিবার প্রাতঃকালে হঠাৎ Heart fail হওয়ায় প্রায় ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমে লণ্ডন নগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী ইণ্ডিয়া কাউন্সেলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়া গত মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলে পর তিনিও তাঁহার সঙ্গিনী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রসন্নতারার সন্তানাদির বিয়োগ শোক কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পাঁচ কন্যা তিন পুত্র বিদ্যমান। সমস্ত কন্যারই বিবাহ হইয়াছে, তাহাদেরও সন্তান হইয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্র চন্দ্র বিবাহিত তিনি কলিকাতা-হাইকোর্টের বারিষ্টরী পদে নিযুক্ত। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্র চন্দ্র আমেরিকা হইতে ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কাশ্মীরের মহারাজের অধীনে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীরে যাত্রা করিবার জন্য উদ্যত আছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র বিলাতে স্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।

ঢাকাজিলার অন্তর্গত ডুবধারা গ্রাম প্রসন্নতারার জন্মস্থান, তিনি বাল্যকালে ডুবধারার অনতিদূরস্থ মাধবদি পল্লীতে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তথাকার বালিকা-বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রেমাস্পদ শ্রীমান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (কে, জি গুপ্ত) তাঁহাকে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন, প্রসন্নতারা তাঁহার তিন বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সিভিলসার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার স্বর্গগত পিতা কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। নূনাধিক ৭বৎসর তাঁহাকে ইংলণ্ডে বাস করিতে হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসর প্রসন্নতারা ভাটপাড়া পল্লীতে শ্বশুরালয়ে অন্তঃপুরস্থা বধূরূপে শ্বশুর শাশুড়ীর আশ্রয়ে স্থিতি করিয়াছিলেন। তখন এই গুপ্তপরিবার হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন, পরে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন।

কিয়ৎকাল হইল স্নেহের প্রসন্নতারা নারী-জাতির সুপাঠ্য ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ "পারিবারিক জীবন" নামক পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। একসময় মহিলাতে সেই পুস্তকের উৎকৃষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। প্রসন্নতারা অতিশয় শ্রমশীলা সুগৃহিণী ছিলেন। গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বিস্তীর্ণ সংসারের কোন বিষয়ে গৃহকর্ত্তাকে ভাবিতে হয় নাই;

বলিয়া দিতে হয় নাই। গৃহকর্ত্রী সুস্থ হইয়া সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন। ভাণ্ডারের চাবি নিজ হস্তে রাখিতেন, সকল দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; তিনি রান্নার খরচের হিসাব কড়াগণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন। চতুর চাকর চাকরাণীও তাঁহার চক্ষে ধুলা দিয়া কিছু চুরী করিতে সুযোগ পাইত না।

দেবী প্রসন্নতারা রীতিপূর্ব্বক উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে আশ্চর্য্য রূপে স্বাভাবিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এরূপ সুরুচি ও সুপ্রণালীমতে পুষ্পোদ্যানাদি প্রস্তুত করিয়া বাসভবনাদি অমর ভবন তুল্য করিতেন যে, যিনি দেখিতেন তিনিই স্থির-নেত্রে পুলকিত অন্তরে তৎপ্রতি তাকাইয়া থাকিতেন। তিনি ড্রয়িং রুমকে এরূপ সুরুচিপূর্ব্বক সাজাইতেন যে, অন্য কোন গৃহিণী সেরূপ সাজাইতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রসন্নতারার সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। বালীগঞ্জস্থ সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকা সম্পূর্ণ তাঁহার planএ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রসন্নতারা আলস্য কি জানিতেন না, বৃথা গল্প করিয়া কখনও সময় নষ্ট করিতেন না। ইদানীং তাহার শরীর সুস্থ ছিল না, তিনি বাতের বেদনা ও বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে সংসারের কাজ কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া শয্যাশায়িনী হইয়া থাকিতেন না।

কে, জি, গুপ্ত উড়িষ্যা ডিভিসনের কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইয়া উড়িষ্যা-প্রদেশের প্রধান নগর কটককে কয়েক বৎসর স্থিতি করিয়াছিলেন। তখন প্রসন্নতারা সেই নগরের মহিলাদিগের মধ্যে জ্ঞানোন্নতি এবং ভগ্নীভাব বিস্তারের জন্য মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মহিলা-সমিতি দ্বারা তত্রত্য নারী-সমাজে বিশেষ কল্যাণ হইতেছিল। সমিতিতে পঠিত অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রসন্নতারা হইতে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মহিলাতে প্রকাশ করা গিয়াছে। সমিতির সভ্যাদিগের মধ্যে কাহারও রোগ শোক আপদ-বিপদ ঘটিলে তিনি যত কেন দীন দরিদ্র হীনাবস্থাপন্না হউন না, প্রসন্নতারার হৃদয়ের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হন নাই। প্রসন্নতারা তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মহামান্য কমিশনারের পত্নীর এরূপ অমায়িক সদয় ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। আমরা সময়ে সময়ে সমিতির কার্য্যকলাপ দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। উড়িয়া, বাঙ্গালী, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সকল শ্রেণীর মহিলাই উক্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। উৎকল-কন্যা শ্রীমতী রেবারায় তাহার সম্পাদিকা রূপে কার্য্য করিয়াছেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইত। প্রসন্নতারা কটক নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পর সমিতি হীনাবস্থাপন্না হইয়া পড়ে। এখন তাহার অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ।

কল্যাণীয়া প্রসন্নতারা স্বদেশ ও পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনদিগকে ছাড়িয়া দীর্ঘকালের জন্য বিলাত যাইয়া মনের অসুখে

ছিলেন, দেশে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এক্ষণ বিধাতার আহ্বানে তাঁহাকে প্রকৃত স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। আমারা তাঁহাকে পৃথিবীতে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। মঙ্গলময়ের কৃপায় উন্নতলোকে তাঁহার আত্মা সমধিক উন্নতি লাভ করুক, তিনি চিরশান্তি ভোগ করুন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত একহৃদয় প্রিয়তম স্বামী ও স্নেহের পুত্র কন্যাগণ তাঁহার সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন করিয়া উপস্থিত দুঃখ ক্লেশ হইতে মুক্ত হউন। সকলের মনে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এবং পরলোকের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর হউক। যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কিছু করিবার নাই। এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু ঘটনাতে বিধাতার এই ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে, "তোমরাও পরলোকের জন্য প্রস্তুত থাক। সাংসারিক আমোদ প্রমোদ ও মোহমায়ায় মুগ্ধ না থাকিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পরলোক সাধন কর। মৃত্যু চক্ষুর পলকে সমুদায় কাড়িয়া লইবে।" প্রার্থনা ও উপাসনা-যোগে অমরলোকে সেই অশরীরী দিব্যাত্মাকে পরম জননীর পদপ্রান্তে এক্ষণ দর্শন করিতে হইবে।

মহিলাদিগের রচনা।

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

প্রকৃতির শোভাস্থলে আসিয়া এ হিমাচলে,
মানসে কতই শত হয় ভাবোদয়;
দেবী তব কৃপা বিনা, কি লিখিবে এই হীনা
আসি কত নব ভাব হয় পুন লয়।
তব বর পুত্র কন্যা জগতে আসিয়া ধন্যা
মথিয়া কবিত্ব সিন্ধু তোষে উপহারে,
কিন্তু দেবী বীণাপানি সে তোমারি কৃপা জানি
ইচ্ছা হয় পূজি তোমা নানা উপচারে।
ধরণী-শোভা ভাণ্ডার প্রকৃতির লীলাগার
বর্ণিতে ক্ষমতা কোথা সকল বর্ণনে?
আসিয়া পার্ব্বত্য দেশ দেখিনু শোভা অশেষ
রসনা অবশ মোর বচন রচনে।
নীল গগনের তলে মরি কি শোভা উজলে
লাল নীল হরিতের কি শোভা বিস্তার,
মেঘের উপরে মেঘ মেঘেতে বিজলী বেগ
ক্ষণ পরে চাহি পুন দেখি অন্য ধার।
অদূরে অচল পারে রবি উঠে ধীরে ধীরে
সুবর্ণ কিরণ ঢালি ধরণীর মাঝে,
রাঙ্গা ছবি স্বর্ণকর মোহ মুগ্ধ চিত্রকর
ভাবে ভুলে ভাবে মন সেই বিশ্বরাজ।
কোন দিকে চাহি ফিরে বহিছে সুধীর ধীরে
সতলজ সূর্য্যাকর ধরি লয়ে বুকে
কি সুন্দর বক্রগতি চলেছে অনন্ত প্রতি
ধুইয়া অচল পদ তরঙ্গেতে সুখে।
যেন বা হীরক রাশি চূর্ণ হয়ে পড়ে আসি
ক্ষুদ্র ঝরণার মাঝ ঝর্ঝর রবে,
শ্রবণে পশিলে পরে সে শব্দে সুধা ঝরে
মোহিত পরাণ হয় তাহার সুরবে।
মম মনে লয় হেন পর্ব্বতের শিশু যেন
আনন্দে খেলিছে সুখে ছুটাছুটি করি,
জলস্রোতে যায় ভেসে উপলের খণ্ড শেষে
ধরিবারে ধায় যেন রজতের বারি।
হেরি শোভা অবিশ্রান্ত মানস হয়েছে ক্লান্ত
সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের এককণাটুক,
বর্ণিবারে ক্ষমতার থাকিত যদি আমার
শুনাইয়া সবাকারে পাইতাম সুখ।

হে অচল উচ্চশির তোমার বিরাট ধীর
মহাকায় হেরি মনে কত ভাব আসে
যখন মেঘের মাঝে ডুবে থাক কিবা সাজে
লুপ্ত ও বিশালকায় শুধু মেঘ ভাসে।
গগনে নীরদরাশি তব সাথে মেশামিশি
নানা বরণের মেঘে হয় কিবা শোভা
হেরিয়া হতেছি ধন্য ধন্য দেব তুমি ধন্য
সাজায়েছ এই বিশ্ব করি মনোলোভা
ভক্তি-রসে হয়ে প্লুত ও চরণে হই নত
বার বার প্রণতি হে করহ গ্রহণ
সৌন্দর্য্য কুৎসিত সব সকলই অভিনব
তোমার সৃষ্টির প্রভু মহা নিদর্শন।

শ্রীমতী সাবিত্রীবালা
কসৌলী।

পুনঃ সংসারে।

(আত্ম সমর্পণ)

সংসার-বন্ধন, ছিঁড়িল যখন,
তখন ভাবিনু হায়।
প্রমুক্ত আকাশে, বিমুক্ত বাতাসে,
খুঁজিয়া বেড়াব তাঁয়॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া, আনিব ধরিয়া,
হৃদয় যাঁহারে চায়।
খুলি হৃদি দ্বার, ডেকে বার বার,
পরাণ সঁপিব পায়॥
ভক্তিডোর দিয়া, তাঁহারে বাঁধিয়া,
রাখিব যতন করে।
নয়নেতে রাখি, প্রাণভরে দেখি,
হৃদয়ে রাখিব পুরে॥
হৃদয়-আসনে, বসায়ে যতনে,
করিব তাঁর সাধনা।
মুখ নিরখিব, জীবন জুড়াব,
যাবে যতেক যাতনা॥
ভক্তি পুষ্পতুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি,
তাঁহার চরণে দিব।
অসার ভাবনা, কিছু রহিবে না,
সকলি তাঁরে সঁপিব॥
বন্ধন ছিঁড়িল, বিমানে উড়িল,
আমার পরাণ পাখী।
সংসার ত্যজিয়া, সকল ফেলিয়া,
কোনই আশা না রাখি॥
ধ্যান যোগে বসি, হেরি রূপরাশি,
সুখেতে হইব ভোর।
কেন পুনঃ ফেরে, ফেলিলে আমারে,
ভাবিয়া না পাই ওর॥
কেন হাতে ধরে, স্নেহের নিগড়ে,
আমারে বাঁধিলে তুমি।
যাহা ইচ্ছা হয়, কর ইচ্ছাময়,
সকলি সহিব আমি॥

কাকিনিয়া। শ্রীমতী মো।

সংবাদ।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদের পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহপ্রচলনে বহু চেষ্টা যত্ন এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। উদার ব্রিটীষরাজ এই শুভানুষ্ঠানের প্রচলনপক্ষে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সংস্কারবিমুখতা এতদিন বড়ই প্রবল হইয়াছিল। সুখের বিষয় হাইকোর্টের জজ মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বীয় বিধবা কন্যার পুনঃপরিণয় দান দ্বারা সৎসাহস প্রদর্শন

করিলে ক্রমে দুই একটি করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলন হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, নারায়ণগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় বাবু অদ্বৈত ধরের বিধবা পৌত্রী বাবু মহেন্দ্র নাথ ধর নামক সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ীর পুত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত কলিকাতা বরাহনগরনিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দে সরকারের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ দে সরকারের শুভ পরিণয় ঢাকা নগরে গত ২০শে জুলাই সোমবার হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মহেশর্দি এবং সোণারগাঁয়ের বহু গণ্যমান্য লোক বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় পত্র দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিজয় বাবুর এই সদনুষ্ঠানে জ্ঞাতি কুটুম্বগণ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিজয় বাবুর সৎসাহস আছে, তাঁহার ন্যায় সদাশয় যুবা পুরুষ এই রূপ অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধবর্ব্বরোচিত ব্যবহারকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন। তাঁহার চরিত্র উচ্চ বলিয়া আমরা মনে করি। বিজয়বাবু বিপত্নীক, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, পূর্ব্বপক্ষের প্রায় দেড় বৎসর বয়স্ক একটি পুত্রসন্তান আছে। ভগবান্ এই নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মিসেস্ রিচার্ড কিং নামে এক জন সমৃদ্ধিশালী কৃষিব্যবসায়িনী রমণী আছেন। তাঁহার অধীনে এবং কৃষিসংসৃষ্ট ভূমি প্রায় ইংলণ্ডের ন্যায় বিস্তৃত হইবে। দুই লক্ষ গো মহিষ প্রভৃতি পশু কৃষি জন্য নিযুক্ত আছে ও মেষ ভেড়া সংখ্যাতীত। গো রক্ষক ৩০০ জন। সুসভ্য দেশে রমণীদের কত উন্নতি। ফলতঃ স্বাধীনভাবে আত্মোন্নতির পথ না ধরিলে কাহারও প্রকৃত উন্নতি হয় না।

বিগত ২৭শে শ্রাবণ দুইটী ইয়ুরোপীয় মহিলার হত্যাপরাধে মজফ্‌ফরপুর নগরে নবযুবক ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ছোটলাট ও বড়লাটসাহেবের নিকটে দয়া ভিক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। শ্রুত হইল ক্ষুদিরাম বা তাহার সহচর ঢাকার মাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করিয়াছিল।

পুনানিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেশরী-নামক স্বীয় পত্রিকায় রাজবিদ্রোহসূচক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখার অপরাধে বম্বে হাই-কোর্টের বিচারপতির বিচারে ৬ বৎসরের জন্য দ্বিপান্তর কারাবাস এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গুরুতর দণ্ড হইয়াছে! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এইরূপ অপরাধে দেড় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিলক একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এখানকার স্বদেশী দলের হাজার হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া রাজোচিত মহাঘটা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি এখানে মহা সমারোহসহকারে শিবাজী উৎসব ও ভবানী-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য অনেক সভা সমিতি হইয়াছিল।

হ্যারিসন রোডের বোমার মোকদ্দমায় ছয় জন আসামীর মধ্যে ৩ জনের প্রতি ৭ বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ হইয়াছে, তিন জন মুক্তিলাভ করিয়াছে। আলিপুরের বোমার মোকদ্দমায় ২৫।৩০ জন আসামী বিচারাধীন আছে, হাজত ভোগ করিতেছে। ইহার পরও বোমার ব্যাপার অনেক হইয়া গিয়াছে, কুষ্টিয়াতে একটি পাদ্রী সাহেবকে গুলি করা হইয়াছে, অপরাধী এক্ষণও ধরা পড়ে নাই। ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট রাজবিদ্রোহিতাসূচক গুরুতর কথা সকলও উপেক্ষা করিয়াছেন এক্ষণ ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও বোমার ব্যাপারে রাজপুরুষগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন, সামান্য অপরাধেও কঠিন শাস্তি বিধান করিতেছেন। কাহারও বিরুদ্ধে প্রমাণ পাইলে আর রক্ষা নাই। অনেকগুলি বক্তা ও পত্রিকাসম্পাদক কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এই জন্য আমরা পূর্ব্ব হইতে মহিলাদিগকে সাবধান করিয়া আসিয়াছি, এই সকল কুৎসিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্রবে যেন তাঁহারা না থাকেন, এ বিষয়ে কাহারও অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্য না করেন। অপর কিছু না হইলেও কোর্টে সাক্ষ্য দান করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

বিগত ৭ই আগষ্ট বর্জ্জনোৎসবের দিন এক্ষণ হইতে সংযম অবলম্বন করা হইবে স্বদেশী নেতৃগণ বক্তৃতায় এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সংযত ও সাবধান হইয়া চলিলে দেশে এত বিপদ্ বিভ্রাট ঘটিত না। যে দিন দেখিব বর্জ্জনোৎসবের পরিবর্ত্তে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আনন্দে গ্রহণোৎসব হইতেছে, সেই দিন ভাবিব বঙ্গদেশের শুভদিন, বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণের দিন সমুপস্থিত।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় "সমস্যা" ও "সদুপায়" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বর্ত্তমান আন্দোলনের দ্বেষ হিংসা বিচ্ছেদ বর্জ্জনাদির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন। রবিবাবু এরূপ বলিয়াছেন যে, অন্যায় ও অধর্ম্ম দ্বারা কোন দেশের কোন জাতির কল্যাণ হয় না। ন্যায়, ধর্ম্ম, সদ্ভাব ও প্রীতি দ্বারাই কল্যাণ হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। তিনি স্বদেশী ভলণ্টিয়ারদিগের পরসেবার প্রশংসা করিয়াছেন। রবিবাবু এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন।

বিগত আষাঢ় মাসে মহিলার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণও অধিকাংশ গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকট হইতে সেই বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। দুঃখের বিষয় যে, আমরা পুনঃ পুনঃ তাগিদপত্র লিখিয়াও তাঁহাদের অনেকের দয়া আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া আমরা আমাদের দেশীয় ভগ্নীগণের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সহৃদয় ভগ্নীগণ আমাদের দুঃখে সহানুভূতি করেন এই আমাদের একান্ত বাসনা।

মিলিন্দ প্রশ্ন।*

গতবারে মিলিন্দ প্রশ্ন পড়েছিলাম, এবারও পড়বার ইচ্ছা আছে। প্রথমে এই শিক্ষা দেয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মে যে শিক্ষা প্রবেশ প্রয়োজন নাই। এবং তার সঙ্গে জ্ঞান প্রেমের সম্বন্ধ, সেইটে বই থেকে দেখতে পাই। প্রত্যেক ধর্ম্ম পরিষ্কার জ্ঞান প্রেম, উচ্চতর আদর্শপূর্ণ, আমরা শিক্ষা পাই। জ্ঞান না থাকিলে ধর্ম্মসাধন হতে পারে না। নিঃস্বার্থ প্রেম বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, কেমন জ্ঞান ও প্রেম প্রয়োজন, তাই দেখাব। রাজা প্রশ্ন করিতেছেন —

রাজা। যাহারা জেনে শুনে পাপ করে তাদের পাপ বেশী কিম্বা যাহারা না জেনে শুনে পাপ করে তাদের পাপ বেশী?

নাগসেন। যিনি না জেনে পাপ করেন, তাঁর পাপ বেশী, যিনি জেনে করেন তাঁর পাপ বেশী নয়।

রাজা। তাই যদি সত্য হয়, না জেনে যদি পাপ করে, রাজার নিকট, তবে দ্বিগুণ হওয়া উচিত। সে কিরূপ বুঝিয়ে দাও।

নাগসেন। যদি গরম লোহা থাকে, কাহারও যদি জেনে ধরতে হয়, যে ধরে তার হাত বেশী পুড়বে, কি যে না জেনে ধরবে তার হাত বেশী পুড়বে?

রাজা। যে না জেনে ধরবে তার হাত বেশী পুড়বে।

নাগসেন। যে জেনে অন্যায় করে, তার পক্ষে সেইরূপ। এই যে শিক্ষা এই কথার অর্থ মনের ভিতর বুঝা সহজ নয়, সক্রেটিসেরও সেইরূপ। সমস্ত ধর্ম্ম পুণ্য, প্রেম, পবিত্রতার নাম জ্ঞান, এবং সমস্ত পাপ অন্যায়ের নাম অজ্ঞান। একজন জ্ঞানী লোক আপনার একজন লোককে ঘৃণা থেকে বিদ্বেষ থেকে, যখন অপকার করবে মনে করে, তখন বুঝে করে, যে অজ্ঞানী সে হয়ত মঙ্গল করবে মনে করে অপকার করে ফেলে। যে জানেনা সে কি করে উপকার করবে মনে করে তার সর্ব্বনাশ করে। অজ্ঞান কত ভয়ানক জিনিষ। কোনটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ, যে বুঝতে পারে, সে ঠিক জেনে করবে। যার ভিতরে অন্ধকার আছে, সেটাকে তাড়িয়ে দেওয়া শক্ত। যেমন আমরা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে ক্রাইষ্টের জীবনীতে দেখেছি, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জুডাসকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু তিনিই ক্রাইষ্টকে শত্রুর হাতে দিয়ে ছিলেন। অনেকে বলেন তিনি টাকার লোভে দিয়েছিলেন। অনেকের আর একটা ধারণা ছিল, ঈশার যেরূপ সম্ভ্রম খুব ছিল, তিনি যদি বিপদে পড়েন, তাঁহাকে বাঁচাতে দেবদূতেরা আসিবেন। তিনি ইহুদীদিগের রাজা হয়ে তোমাদিগকে স্বাধীন করিবেন। তিনি সমস্ত শত্রুদিগের হাত

* ৬ই আগষ্ট ১৯০৮ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

থেকে বাঁচবেন। তিনি ইহুদীদিগের রাজা প্রচার করলেন, কেন তিনি আপনাকে গোপন করে রেখেছেন। শত্রুদিগের হাতে পড়লে স্বর্গ হতে দূতেরা আসবেন। সেইটে ঠিক পরিষ্কার হবে। ঈশাকে ভালবাসেন বলে, জুডাস তাঁহাকে এই অবস্থায় ফেললেন। শেষে যখন দেখলেন যে স্বর্গ হতে দূতেরা এসে উদ্ধার করিলেন না, ঈশা রাজাও হলেন না, তখন জুডাসের ভয়ানক দুঃখ হল। তার ভিতরে অজ্ঞানতা ছিল, তিনি কি ভাবে পরিত্রাণ দিতে এসেছেন, বুঝতে পারেন নি। তিনি পৃথিবীর রাজার মত ঈশাকে মনে করেছিলেন, অজ্ঞানতা থেকে যা করা হয় বেশী দোষ। তাহলে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখ্তে পাচ্চি। সেটা না হলে কিছু হয় না। জ্ঞানের অঙ্গ কি তাহা থেকে নির্দ্ধারণ কি করে হয়। জ্ঞানের পাঁচটী অংশ। বিশ্বাস, অধ্যবসায়, মনঃসংযোগ, চিত্তসমাধান, জ্ঞান। নির্ম্মল জ্ঞান যা পাঁচটী। রাজা প্রশ্ন করিতেছেন।—

রাজা। বিশ্বাসের লক্ষণ কি?

নাগসেন। বিশ্বাসের লক্ষণ দুইটী, স্থিরতা এবং শান্তি। যে নদীর জল ঘোলা হয়ে থাকে, তাকে পরিষ্কার করা হয়, সেইরূপ বাসনা গুলিকে, বিশ্বাস যখন স্পর্শ করে, তখন নীচে পড়ে। দ্বিতীয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থা অধ্যবসায়।

রাজা। অধ্যবসায়ের লক্ষণ কি?

নাগসেন। অধ্যবসায়ের লক্ষণ আশ্রয় দিয়ে রাখা। সমস্ত ভাল গুণকে আশ্রয় দিয়ে রাখা।

রাজা। ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

নাগসেন। যখন পড়ে যাচ্চে কিছু আশ্রয় দিয়ে আটকে রাখে, অধ্যবসায় সেইরূপ ভাল গুণকে আশ্রয় দিয়ে রেখে দেয়। কোন রাজা যুদ্ধে গেলে বড় সৈন্যদল যদি ছোট সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। আর এর মধ্যে যদি আর সৈন্য এসে যোগ দেয়, তারা ছোট হলেও পরাজিত করেন। ভাল গুণ অর্থাৎ ধৈর্য্য, ক্ষমা ইত্যাদি, সংসার এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, অধ্যবসায় আশ্রয় দিয়ে রাখে তাদের যেতে দেয় না। অধ্যবসায়ের এই গুণ যে অন্য সমস্ত গুণকে আশ্রয় দিয়ে দিয়ে রেখে দিচ্চে। যেখানে অধ্যবসায়ের অভাব আছে, একবার পরাজিত হলে আর দাঁড়াতে পারে না। যতবার ভেঙ্গে পড়চে, ততবার প্রথম বিশ্বাস দ্বিতীয় অধ্যবসায় ভাল গুণকে আশ্রয় দিয়ে রাখচে।

তৃতীয় মনঃসংযোগ।

রাজা। মনঃসংযোগের লক্ষণ কি?

নাগসেন। বার বার একটা জিনিষের আলোচনা।

রাজা। পুনঃ পুনঃ আলোচনা কি রকম হল?

নাগসেন। যখন মনঃসংযোগ থাকে, ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় সর্ব্বদা আলোচনা করেন।

রাজা। উদাহরণ দাও।

নাগসেন। মনঃসংযোগ হচ্চে, যেরূপ কোন রাজার কোষাধ্যক্ষ, রাজাকে বার বার বলে রাখ্‌চে, এতগুলি অশ্ব, এতগুলি হস্তী, এতগুলি পদাতিক আছে, ভুলে না যান। সেই বিষয়কে বার বার মনে করিয়ে দেওয়া মনঃসংযোগ।

জ্ঞানের চতুর্থ চিত্ত সমাধান।

রাজা। চিত্তসমাধানের লক্ষণ কি ?

নাগসেন। সকলের নেতা, সকলের উত্তম, সদ্‌গুণ, সকলের প্রধান হচ্চে চিত্ত-সমাধান। পর্ব্বতের মতন। পর্ব্বতের গায়ে আছে। এমন একটী বাড়ী যার দুইদিক নীচু, সমুদায় কড়ি বরগাগুলি মালের উপরে এক জায়গায় জমেছে সেইরূপ সমস্ত গুণ গুলি চিত্তসমাধানে মিলেছে।

রাজা। ... ...

নাগসেন। যুদ্ধের ভিতর সৈন্যদলের মধ্যে, রাজা যেমন দলপতি, নেতা হয়ে থাকেন। তেমনি, তাই জন্য বুদ্ধ বলেছিলেন চিত্তসমাধান অভ্যাস কর। সমস্ত জ্ঞান পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর জ্ঞান।

রাজা। জ্ঞানের লক্ষণ কি ?

নাগসেন। জ্ঞানের একটী লক্ষণ কেটে ফেলা। তর্ক আলোচনা করে কেটে ফেলা। যেমন চাষা ধান গাছের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে, অন্য হস্তে কেটে ফেলে। জ্ঞানের আর একটী লক্ষণ আলোক।

রাজা। আলোক কি করে হল ?

নাগসেন। জ্ঞান সমস্ত অজ্ঞানতাকে দূর করে আলোক প্রকাশ করে। জ্ঞান দ্বারা মহৎ উচ্চ সত্য পরিষ্কার হয়। জগতের যা কিছু অনিত্য, যা কিছু দুঃখ পরিষ্কার করে দেয়।

মানুষের মধ্যে এমন কেহ নাই, যার আত্মা নাই, সেই সমস্ত ... ...

রাজা। সেই সমস্ত এক ফল প্রসব করে ?

নাগসেন। হাঁ, এক ফল প্রসব করে, এই জ্ঞান থেকে নির্ব্বাণ হয়।

রাজার মনে সন্দেহ, সমস্যা এসেছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন। সেইগুলি মীমাংসা দ্বারা ... ...

রাজা। বুদ্ধদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে দেবদত্ত একজন সংঘ ছিলেন। কেন দেবদত্তকে নিয়ে ছিল ?

নাগসেন। এই যে সাতজন, যার ভিতরে দেবদত্ত একজন ছিলেন। বুদ্ধদেব শিষ্য রূপে গ্রহণ করে ছিলেন। সংঘেতে প্রবেশ করার পর বিরোধী হন, উচ্চ অভিলাষ থেকে বিরোধী হন।

রাজা। বুদ্ধদেব তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি ?

নাগসেন। কেননা গৃহস্থাশ্রম থেকে এসে সংঘের ভিতরে ... ...। ভিক্ষু হয়ে ছিলেন, পরে বিরোধ ঘটিয়ে ছিলেন। তাঁরা কর্ম্মফল মানতেন, যে কর্ম্ম করবে তার ফল জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করবে।

রাজা। বুদ্ধ কি জানতেন বিরোধ ঘটাবে ? এক কল্প ধরে... ... +

নাগসেন। হাঁ জানতেন।

রাজা। একথা যদি সত্য হয়, বুদ্ধ সকলকে ভাল বাসতেন, ইহা সত্য নয়। কেননা তিনি জেনে গ্রহণ করলেন। এক কল্প ধরে ভোগ করতেন না। তা যদি না হয় জ্ঞানের অভাব। হয় জ্ঞানের অভাব নয় প্রেমের অভাব। একটা না একটা কিছু আছে।

নাগসেন। বুদ্ধদেবের জ্ঞান ও প্রেম দুই ছিল। বুদ্ধ জেনেছিলেন, দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মে দোষ করেছিলেন। কতকাল ধরে নরকে থাকবে। সংঘে নিয়ে রাখলে কমে যাবে, ভিক্ষু গ্রহণ করলে জেনে অন্যায় করবে, এক কল্প বাস করতে হবে। সেইটে জেনে ভাল বেসে নিয়েছিলেন।

রাজা। যদি একটা আঘাত করবার জন্য ... ...

নাগসেন। যেমন একটা ফোঁড়ার জন্য একজন কত কষ্ট পাইতেছে, চিকিৎসক এসে ছুরি দিয়ে কেটে দিলেন, আরাম হয়ে গেল। যদি একজন রাজা একজনের প্রাণ-দণ্ড দেন, আর একজন বলে প্রাণদণ্ড না দিয়ে অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হয়। দেবদত্তের পক্ষে সেইরূপ ! বেশী পাপ ছিল ... ...

রাজা। প্রেমের লক্ষণ কি ? কষ্ট যন্ত্রণা কম দেখে।

নাগসেন। কষ্ট যন্ত্রণা কর্ম্মফল থেকে হয়। কিন্তু কর্ম্মফল নির্দ্দোষ বলে আছে।

রাজা। যখন বুদ্ধ বুদ্ধ হলেন, যত অন্যায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ?

নাগসেন। সমস্ত ক্ষয় হয়েছিল, ...

রাজা। বিনষ্ট হয়ে গিয়ে ... ... সমস্ত কর্ম্ম থেকে আসে।

নাগসেন। পাপের শাস্তির জন্য যে আসে তা নয়, নিজের শাস্তি থেকে আসে, আবার বাহিরের কারণ আছে। তাঁর পায়ে লেগেছিল, বাহির থেকে এসেছিল, কত হাজার বৎসর ধরে দেবদত্ত যখন শত্রু হয়ে দাঁড়াল। একটা পাথর ছুঁড়েছিল মাথায় পড়ল না পায়ে লেগে আহত হয়। হয় নিজের দোষে নয় অন্যের দোষে কষ্ট পায়। দেবদত্ত শত্রুতা করেছিল, তাই কষ্ট পেয়েছিলেন। বুদ্ধ জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, যেগুলি নিজের পাপ থেকে নয়।

রাজা। আর একটী, ভাল লোক বেশী কষ্ট পায় কি মন্দ লোক বেশী কষ্ট পায়।

নাগসেন। মন্দ লোক ভালতে থাকে, ভাল লোক কষ্ট পায়।

রাজা। যিনি ভাল কাজ করেন, যিনি মন্দ কাজ করেন, দুই এক কি প্রভেদ আছে ?

নাগসেন। ভালমন্দে প্রভেদ আছে। ভালকাজ স্বর্গে নিয়ে যায়। তোমরা বল দেবদত্ত মন্দ ছিল, কিন্তু দেবদত্ত ভাল ছিল। অথচ বৌদ্ধে যে সমস্ত গল্প দেখতে পাই সমান নয়। দেবদত্ত বুদ্ধের উপরে ছিলেন। একটী গল্প আছে দেবদত্ত যখন বেনারসের পুরোহিত, বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল ছিলেন।

রাজা। এ কি করে হল?

নাগসেন। আর একটী গল্প আছে, দেবদত্ত রাজা ছিলেন, বোধিসত্ত্ব হাতী ছিলেন। হাতী রাজাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। আর একটী গল্পে আছে, দেবদত্ত মানুষ ছিলেন, বোধিসত্ত্ব বানর ছিলেন। আর একটী গল্পে দেবদত্ত ব্যাধ ছিলেন, বোধিসত্ত্ব পাখী ছিলেন। আর একটী গল্পে দেবদত্ত বেনারসের রাজা ছিলেন, বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসী ছিলেন। এই সকল থেকে জানতে পারি দেবদত্ত উচুঁ ছিলেন, বোধিসত্ত্ব নীচু ছিলেন। এজন্মে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হলেন, দেবদত্ত শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।

রাজা। তাহলেতো ভাল মন্দের কথা নাই।

নাগসেন। না, সমান নয়। প্রত্যেক জন্মে দেবদত্তের শত্রু ছিল, বোধিসত্ত্বের শত্রুতা ছিল না দেবদত্তের মনে শত্রুতা ছিল, প্রত্যেক জন্মে ফল পেয়েছিল। দেবদত্ত পাপ কাজ করে ছিল, আর যে ধর্ম্ম করে ছিল তারও ফল তো দেবে, তাই রাজা হয়ে ভাল কাজ করে ছিলেন।

এই যে দেবদত্ত, বোধিসত্ত্ব হাজার বৎসর ধরে জন্মে ছিলেন। প্রত্যেক জন্মে সঙ্গী পায়, নানা রকম জিনিষে ... ... মানুষও জন্মে জন্মে যেতে যেতে সঙ্গী পায়। কিন্তু সঙ্গী হয়, থাকে বটে, যেটা ভাল থেকে নির্ব্বাণের পথে চলে যায়। মন্দ যেটা ... ... এই জন্মে দেবদত্ত শত্রুতা করলেন। বোধি দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন।

———

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ বসু লাহিরিয়াসরাই ২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দাস গুপ্ত, ঢাকা ১৲
" অদ্বৈতচরণ বসু লাহিরিয়াসরাই ২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দাস গুপ্ত ঢাকা ২৲
" ললিতমোহন রায় কলিকাতা ২৲
" অদ্বৈতচরণ বসু লাহিরিয়াসরাই ২৲
" হাজারিলাল মোজাফরপুর ।।০
" রাজা সচ্চিদানন্দ দেব বামড়া ২৲
" সিদ্ধেশ্বর সরকার ২৲
শ্রীমতী কিরণশশী দাস কলিকাতা ২৲
" সরলাসুন্দরী দাস কটক ২৲
" সরলাবালা দত্ত সীতারামপুর ২৲
" সতী রায় বানিবন ২৲
" প্রিয়বালা ঘোষ লাহোর ২৲
" নির্ম্মলা বসু কলিকাতা ২৲
" বাসন্তী মজুমদার সম্বলপুর ২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দাস ঢাকা ১৲
" এম্ এ জালিম্মা মিঞা মানকচড় ।৵১৫
" কালিকাদাস দত্ত কোচবেহার ২৲
" ললিতমোহন রায় কলিকাতা ২৲
" কালীমোহন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ ২৲
" নগেন্দ্রনাথ সেন রেঙ্গুন ১৲
" বিহারীলাল ঘোষ শিবপুর ২৲
" প্রসন্নকুমার দত্ত জপালা ২৲
শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী সেন কোচবেহার ২৲
" স্নেহলতা দত্ত কলিকাতা ২৲
" চপলা মজুমদার কলিকাতা ১৲
" সরলাসুন্দরী দাস কটক ২৲
" বিমলাসুন্দরী দাস কলিকাতা ২৲
" তরঙ্গিণী দেবী কলিকাতা ১।০
" সতী রায় বালিবন ২৲
" ঊষা মজুমদার লাহিরিয়াসরাই ২৲
" সরস্বতী সেন কলিকাতা ২৲
" কুমুদিনী দাস কলিকাতা ২৲
" রাণী উমাসুন্দরী ডুবলহাটী ২৲
" বাসন্তী মজুমদার সম্বলপুর ১৲
ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঁকিপুর ২৲
রেভেরেণ্ড বিমলানন্দ নাগ কলিকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত আর এন্ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲
" হাজারীলাল মজাফরপুর ১।।০
" মধুসূদন সেন কলিকাতা ২৲
" বিনয়ভূষণ বসু লক্ষ্ণৌ ২৲
" ডাক্তার চুনীলাল বসু কলিকাতা ২৲
" রাজা সচ্চিদানন্দ দেব বামড়া ২৲
" ক্রোধেশচন্দ্র সেন, টিয়ক ১৲
কোচবিহার নববিধান সমাজ ২৲
শ্রীমতী অশোকলতা দাস ডেরাডুন ২৲
" যাদুমণি রায় অমরাগড়ী ২৲
" অন্নদায়িনী সরকার কলিকাতা ২৲
" সরযূবালা সেন নোয়াখালি ২৲
" বিনোদিনী গুপ্ত কুড়ীগ্রাম ১৲
" নির্ম্মলা বসু কলিকাতা ২৲
" প্রেমময়ী আইচ নোয়াখালী ১৲
" কুমারী আশালতা গুপ্ত চট্টগ্রাম ২৲

১৪শ বৎসর।

এম্ এ জালিম্মা মিঞা মানকচড় ১।/৫
শ্রীযুক্ত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার ২৲
" প্রসন্নকুমার দত্ত জপলা ২৲
শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দাস কলিকাতা ১৲
" সরলাবালা দত্ত শিলং ২৲
" ইচ্ছাময়ী দাস কলিকাতা ২৲
" সুবোধবালা দেবী টাঙ্গু ২৲
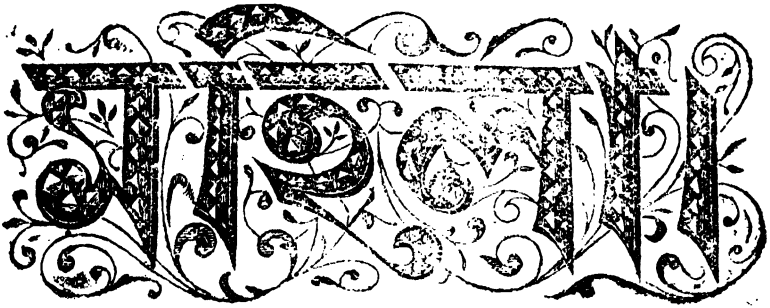
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১৪শ ভাগ] ভাদ্র ১৩১৫ ; সেপ্টেম্বর ১৯০৮। [২য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে কার্য্য বা যে কথায় মন বিকৃত হয়, তৎপ্রতি অন্তরে যে সঙ্কোচ ভাব জন্মে তাহাকে লজ্জা বলে, তাহা হইতে দূরে থাকিবার যত্নকে লজ্জার প্রকাশ বলা যায়। লজ্জাতেই নারী-জীবনের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা রক্ষা পায়। নির্লজ্জা নারী কর্তৃক কোন্ পাপ অকৃত হয়? কিন্তু এদেশের রমণীদিগের বড়ই কৃত্রিম লজ্জা, যে অবস্থায় লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবিক, সেই অবস্থায় তাঁহারা অসঙ্কোচ ও নির্লজ্জতার পরিচয় দান করেন, এবং যে অবস্থায় কোন লজ্জার কারণ নাই সেই অবস্থায় লজ্জার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকরিয়া থাকেন। ইহাতে অনীতি ও অসত্যকে প্রশ্রয় দান হয়।

হিন্দুকুলের বধূগণ স্বীয় শ্বশুর ভাশুরের এমন কি অনেকে দেবরের নিকটে উপস্থিত হইতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিলে অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া সরিয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা কহেন না। এক পরিবারস্থ গুরুজন বা স্নেহভাজন লোকের সম্বন্ধে এরূপ লজ্জা প্রকাশের কোন কারণ নাই, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। এদিকে একমাত্র সূক্ষ্মবস্ত্র এক পেঁচ দিয়া পরিধান করিয়া জনাকীর্ণ গঙ্গার ঘাটে অনেক কুলযুবতীর স্নান ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধানে লজ্জাবোধ হয় না। ফল মূল মাছ তরকারী ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য ফেরিওয়ালা বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কোনের বধূ তাহার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে কথা কহেন দাম দর স্থির করেন। মোসলমান রমণীরা যেরূপ কৃত্রিম লজ্জার বশবর্ত্তিনী, অন্য কোন শ্রেণীর রমণী সেরূপ নহে। অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতায় কাহারও জীবনের অবনতি ভিন্ন উন্নতি কখনও হয় না।

বধূগণ ও কন্যাগণ তোমরা অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও সুনীতির পথে চল, এবং সন্তানদিগকে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। অমূলক কুসংস্কার ও কুরীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত লজ্জা ও বিনয়ের পথে চলিয়া আন্তরিক বীর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় দান কর।

নারী-জীবনের দায়িত্ব।

মানুষ স্বাধীন জীব, তজ্জন্য তাহার জীবনের দায়িত্ব আছে, সে পাপ পুণ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, সে পাপের নিমিত্ত দণ্ড পুণ্যের নিমিত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই দায়িত্ব আছে বলিয়াই তাহার উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তু স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান নাই, ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কোন বিষয়ে দায়িত্ব বোধ নাই, সুতরাং উন্নতি বা অবনতি নাই, স্বাধীনভাবে তাহারা অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা যত্ন করিতে পারে না, তাহাদের অবনতিও হয় না। তাহারা যুগযুগান্তর একভাবে এক অবস্থায় আছে। পাপের জন্য কখনও তাহাদিগকে অনুতাপ করিতে হয় না, পুণ্যজনিত আত্মপ্রসাদও ভোগ হয় না। তাহারা আহার নিদ্রা গতিস্থিতি ইত্যাদি কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী, তাহার অতীত উচ্চ মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি তাহাদের জীবনে কখনও স্ফূর্ত্তি পায় না। গো মহিষ ও কাক চিলাদি জন্তু যুগ যুগান্তর হইতে একই অবস্থায় আছে, তাহাদের কোন উন্নতি ও পরিবর্ত্তন নাই, কালক্রমে তাহাদের চিন্তাশীলতা বাড়িয়াছে বা বুদ্ধির প্রখরতা জন্মিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বাবুই পক্ষী সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এখনও ঠিক সেইরূপই করিতেছে, সেই নির্ম্মাণ কার্য্যে তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। তবে বিশেষ বিশেষ ইতর জন্তুকে মানুষে বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা এক এক বিষয়ে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিয়া থাকে। কুকুর তাহার প্রভুর ইঙ্গিতে এরূপ বুদ্ধি ও সাহসিকতার কার্য্য করে যে, অনেক মানুষে সে প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। শুক পক্ষী মানুষের ন্যায় কথা কহে ও শ্লোক উচ্চারণ করে। তাহা বলিয়া যে তাহাদের জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে ও দায়িত্ব বোধ জন্মিয়াছে ইহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ এরূপ লক্ষিত হয় যে শত সহস্র নারীর জীবনের দায়িত্ব বোধ একেবারে নাই। তাঁহাদের জীবন যেন পশুপক্ষীর জীবনের ন্যায় উন্নতিবিমুখ দায়িত্ববিহীন। তাহারা কতকগুলি শারীরিক নিকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ ও শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন জন্য যেন পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না, পাপ পুণ্যের জন্য তাঁহারা দণ্ডিত ও পুরস্কৃত হইবেন না। ইহাই তাঁহাদের অনেকের মানসিক ধারণা; জ্ঞানোন্নতি ও আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগের কোন সাধন ভজন ও প্রয়াস নাই, স্বামীর প্রতি ও পুত্র কন্যাদের প্রতি জীবনের কোন দায়িত্ব নাই, কোন প্রকার সংসারে কয়েকটা দিন কাটিয়া যাইতে পারিলেই হইল, এই তাঁহাদের ধারণা। কোন প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও সংধর্ম সংগ্রাম না থাকিলে মানুষ পশুর মত নীচ হইয়া যায়। সংসার-মোহে মুগ্ধ অনেক নারী দেবপ্রকৃতি স্বামীকে পশু-প্রকৃতি

করিয়া তোলেন। তাঁহারা শারীরিক সুখ ভোগ বেশভূষা ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীকে নিয়ত ব্যস্ত রাখেন, তাঁহার ক্রীড়ার পুতুল হইয়া তাঁহাকে কেবল শরীর ও সংসার-সেবায় আকর্ষণ করেন, উচ্চতর পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া নিকৃষ্ট পাশব সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে চিরজীবন বদ্ধ থাকেন। তাঁহারা স্বীয় জীবনের নীচ দৃষ্টান্তে পুত্র কন্যাদের জীবনও নীচ করিয়া তোলেন। বলি মাতৃগণ, তোমরা দেবকুমারী, স্বর্গ হইতে প্রেরিত, তোমরা সামান্য জীব নও, দেবত্ব তোমাদের জীবনে লুক্কায়িত, তাহাকে প্রস্ফুটিত করিবে, যত্ন প্রয়াস ও সাধন ভজনে তোমরা দেবী জীবন লাভ করিবে, পতি পুত্র কন্যাদিগকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে, তজ্জন্য পরম জননীর নিকট তোমরা দায়ী। তোমরা পৃথিবীর অনিত্য ক্ষুদ্রবিষয়ে মনকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না। নিজ নিজ জীবনের কি উদ্দেশ্যে, কি বিশেষ কাজ, কি জন্য তোমরা সংসারে প্রেরিত হইয়াছ, ঈশ্বর তোমাদের জীবন দ্বারা নিজের কি অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে চাহেন, কি কি কাজের জন্য তোমরা এক এক জন দায়ী, ঈশ্বরপ্রদত্ত নিজের নিজের শক্তি প্রকৃতি ও রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া লও এবং কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাক। অলস হইয়াবসিয়া থাকিও না,স্বর্গীয় গুণ সকলকে চাপা দিয়া নষ্ট করিও না। ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ও জগতের সেবার জন্য তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে মনে করিয়া তজ্জন্য জীবন সমর্পণপূর্ব্বক ধন্য হও। জীবনের দায়িত্ব বোধ না থাকিলে কোন উন্নতি হয় না। দায়িত্ববিহীন নারী-জীবন দুঃখের জীবন। তোমাদের উপদেশ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাদের কন্যাগণ সুগৃহিণী, সুপত্নী ও সুমাতা হইবার উপযুক্ত হইতেছেন কি না, পুত্রগণ ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মবীর হইয়া জগতে অমর কীর্ত্তি লাভ করিতেছে কি না একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহারা যেন ঘোরতর সংসারী বিলাসী ও ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হইয়া জীবনকে ভারবহ করিয়া না তোলে। ভুবন-বিখ্যাত থিয়োডার পার্কার, ওয়াসিংটন, সার উইলাম জোন্‌স এবং কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনের মূলে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রাণা জননীর প্রভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালের আর্য্যনারীদের জীবনের পরীক্ষা।

২য়, দ্রৌপদী।

মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, মাতৃবাক্য সত্য করিবার জন্য পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবদের রাজধানী হইল, দ্রৌপদী পাণ্ডবমহিষীরূপে অবস্থিতি করিয়া নিত্য সেবাব্রতে রত হইলেন। কিছু কাল পরে যুধিষ্ঠির যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রপাত করিলেন। কথিত আছে সেই সময়ের পৃথিবীর সমস্ত রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ মণ্ডপ এবং ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাটী এরূপ উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হইয়াছিল যে,কেহ কখনও

সেরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করে নাই। রাজা দুর্য্যোধনও এই সমারোহে উপস্থিত ছিলেন। এত সম্পদ্ দর্শনে তাঁহার প্রবল ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইল। তিনি কিছুতেই সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, কিরূপে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য হরণ এবং আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিবেন দিবা রাত্রি এই চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অবশেষে আপন মাতুল ক্রূরমতি শকুনীসহ পরামর্শ করিয়া কপট পাশাখেলার ছলে পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব হরণের কৌশল বিস্তার করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলাতে আহ্বান করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বান মান্য করিতে হইবে বলিয়া যুধিষ্ঠির এই নিমন্ত্রণ স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও গ্রহণ করিলেন। অক্ষক্রীড়া অনর্থের মূল, কারণ উহাতে পণ রাখিয়া খেলার নিয়ম। বর্ত্তমান সময়ে জুয়াখেলা যেমন, সেই রূপ অক্ষক্রীড়া অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, সেকালে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে আহ্বান এবং অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান দুইই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেন। যুধিষ্ঠিরকে এই ভ্রমধর্ম্মতের বশীভূত হইয়া অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ধন ঐশ্বর্য্য, গৃহ সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে হারাইতে হইল, অবশেষে তিনি নিজেদের দেহ এমন কি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া পরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধন এইরূপে পাণ্ডবদিগকে এবং তাঁহাদের মহিষী দ্রৌপদীকে আপন অধিকারমধ্যে পাইলেন। পাণ্ডবদিগকে দাস-শ্রেণীতে বসাইলেন, আর দ্রৌপদীকে কুরুসভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক অপমান করিবার অভিসন্ধি করিলেন। প্রতিকামী নামক অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র দ্রৌপদীকে যাইয়া বল যে তিনি আমাদের দাসী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে আমাদের এই স্থানে আনয়ন কর। দ্রৌপদী কুন্তীসহ গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন, এত দূর অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে কিছুই জানিতেন না। এই বিষ পরীক্ষার জন্য তিনি কিছুই প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ প্রতিকামীপ্রমুখাৎ সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং আপনাকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রাজার কন্যা এবং রাজমহিষী আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কখনও হইতে পারে না। প্রতিকামী, তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর এ বিষয়টি কিরূপ। প্রতিকামীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, তুমি পুনরায় যাও, দাসীর আবার মতামত কি? তুমি তাঁহাকে যেরূপে হউক এখনি লইয়া আইস। কিন্তু প্রতিকামী এবারও কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন দুর্যোধন স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে এই কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। দুঃশাসন অতিশয় দুরাশয় নির্ম্মম লোক ছিল। সে তখনি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেল, এবং কোন প্রকারের সৌজন্য-নিয়ম রক্ষা না করিয়া একেবারে দ্রৌপদী যে গৃহে ছিলেন তাহাতে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইলেন। কুন্তী গৃহ দ্বারে আসিয়া বাধা প্রদান করিলেন, কিন্তু সেই দুষ্টাশয় খুল্লতাতপত্নী কুন্তীদেবীকে বে

ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একবারে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া চলিল। একজন কুলনারীর পক্ষে কত বড় অপমান, লাঞ্ছনা, তাহার উপর সেই নারী রাজমহিষ, অল্পদিন পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে সমগ্র রাজাদের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, প্রকৃত ধর্ম্ম যাহাদের প্রাণ তাহাদের জীবনে এইরূপ বিষম অবস্থা অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে।

দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক লইয়া যাইয়া একেবারে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে উপস্থিত করিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ দ্রৌপদীর গুরুজন এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত, উপস্থিত পণে পরাজিত হওয়ার বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্দ্ধারণে অক্ষম হইলেন। যাজ্ঞসেনী দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরুজনদের আশ্রয় এবং রক্ষণ এই উপস্থিত বিপদ সময়ে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে দুঃখ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কিম্বা সহায়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। এদিকে দুঃশাসন দুর্য্যোধনের আদেশ ক্রমে বস্ত্রহরণ করিবার জন্য বারবার বস্ত্রধরিয়া টানিতে লাগিল। কি বিষম অবস্থা! তখন দ্রৌপদী দেখিলেন যে, পৃথিবীতে তাহার কেহই নাই। পঞ্চস্বামী উপস্থিত থাকিয়াও নাই, ধর্ম্মাত্মারাও যেন নাই। তিনি একান্ত প্রাণে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ব্যাকুল প্রার্থনায় যখন অশ্রুজলসহ ঠাকুরকে বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ ব'লে প্রাণত্যাগ করিব যদি দেখা না দেও।" তখন শ্রীভগবানের অপার করুণায় এবং অলৌকিক কৌশলে তিনি এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। এদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিবেকদংশন অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি এই গর্হিত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতীকার-জন্য ব্যস্ত হইয়া দ্রৌপদীকে ডাকাইয়া নিজের নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে বর দান করিলেন। সেই বরে পাণ্ডবেরা পণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। দ্রৌপদীর প্রার্থনাবলেই পাণ্ডবেরা এই স্বকৃত দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। যত ক্ষণ দ্রৌপদী লোকবলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন ততক্ষণ কেবল লাঞ্ছনার বৃদ্ধিই হইতেছিল। যখন দেখিলেন আর ঈশ্বর ভিন্ন উপায় নাই, তখনই ব্যাকুল প্রার্থনা আসিল। মনুষ্য যেখানে ঠেকে সেখানে যদি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া আকুল প্রার্থনা করিতে পারে তবে বিঘ্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। মনুষ্যের আত্মবল কিছুই নাই, দৈব বলই বল। কাহার কখন কি অবস্থা হয় তাহারও নিশ্চয়তা নাই। অতএব সদাই ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখী থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি মরিব তবু ধর্ম্ম ছাড়িব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করে, তাহাকেই ভগবান্ রক্ষা করেন। দ্রৌপদীর জীবন এই একটি পরীক্ষাতে যে শেষ হইয়াছিল তাহা নয়। অতঃপর আরও দুঃখকর অবস্থা তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু এবার স্বামী-

সহ দুঃখভাগিনী হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার বিশেষ লাঞ্ছনা এবং স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করার সম্বন্ধে দুস্তর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন যখন দেখিলেন যে, পিতার বিবেক জাগ্রত হওয়াতে তাহার মনস্কামনা যাহা সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা-ব্যর্থ হইল, তখন পিতাকে যাইয়া অনেক অনুযোগ করিল। অবশেষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাত বাস এই পণে অক্ষক্রীড়ায় পুনরায় প্রবৃত্ত করিতে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাতের আজ্ঞা অমান্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না ভয়ে পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পণে পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর দ্রৌপদী আপন পঞ্চ পুত্রকে স্বীয় গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, এবং অভিমন্য সহ সুভদ্রা দ্বারকায় কৃষ্ণাশ্রয়ে বাসজন্য চলিয়া গেলেন। জননী কুন্তী বিদুরাশ্রয়ে রহিলেন। এইরূপ ব্যবস্থার পর পঞ্চভ্রাতা এবং দ্রৌপদী বনে প্রস্থান করিলেন। পণ ছিল যে ত্রয়োদশবৎসর পর ফিরিয়া আসিলে পাণ্ডবেরা আপন রাজ্য পাইবেন। এই কৌশলে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য নিজের করিয়া লইলেন। বনবাস-কালে দুর্য্যোধন দ্রৌপদী-হরণের প্রায়স করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের ভগিনী-পতি জয়দ্রথ সুযোগ ক্রমে দ্রৌপদীকে রথে চড়াইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। দ্রৌপদীর ক্রন্দনে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর বিপদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। যখন সঙ্কট উপস্থিত হইত তখন দ্রৌপদী প্রার্থনা করিতেন, এবং সেই পাপের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিতেন। অবশেষে বিরাট গৃহে দাসী বেশে যখন আত্ম-গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিষম পরীক্ষায় পড়িলেন। সেই সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতবাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বিরাটের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার করিতে মহাকৌশল করিয়াছিল। দ্রৌপদী স্বীয় ধর্ম্মপরায়ণতায় বিধাতার বিশেষ কৃপায় অজ্ঞাত বাস রক্ষণ করিয়াই উদ্ধার পাইলেন। পৃথিবীতে নরনারী সকলেরই নানা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, নানারূপ কষ্ট ঘটে, কিন্তু সকলেই যদি একান্ত ভগবৎপরায়ণা সাধ্বী দ্রৌপদীর ন্যায় প্রার্থনা সম্বল এবং প্রাণদিব তবু অধর্ম্মের অধীন হব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে নিশ্চয়ই সংসারক্ষেত্রের শত বিপদ দুঃখ বহন করিতে সক্ষম হইবেন, এবং চিত্তে শান্তিসুখ অক্ষুন্ন থাকিবে। সংসারও দুঃখের না হইয়া সুখের হইবে।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

উদ্বন্ধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের দেশে বৎসর বৎসর অনেক লোক, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যদি সময়ে এরূপ ঘটনা দৃষ্টিপথে পতিত হয় আশু চেষ্টাদ্বারা প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে। কোন

ব্যক্তিকে উদ্বন্ধনাবস্থায় দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহটি কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠাইয়া ধরিয়া উদ্বন্ধন-রজ্জু বা বস্ত্র উন্মোচিত করিবে। যদি তাহা অসাধ্য হয় তবে কাটিয়া দিবে, তৎপর মস্তকের দিক কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া তাহাকে শয়ন করাইবে এবং মস্তকে মুখে ও বক্ষে সজোরে প্রচুর পরিমাণে শীতল জলের ছিটা দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে smelling salt আঘ্রাণ করাইবে। ইহাতে যদি সে সজ্ঞান না হয় বা তাহার নিশ্বাস না পড়ে তবে পূর্ব্বোল্লিখিত মতে কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে চেষ্টা করিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই পীড়িত ব্যক্তি ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিবে।

গলার অভ্যন্তরে কোন দ্রব্য আটকাইয়া নিশ্বাস বন্ধ হওয়া।

কখন কখন তাড়াতাড়ি আহার করিতে গিয়া গলার মধ্যে কোন দ্রব্য আটকাইয়া নিশ্বাস বন্ধ হইতে দেখা যায়। একদা বিহার প্রদেশের একটী কৃষক তাহার ক্ষেত্রের নিকটে বৃক্ষতলে বসিয়া ছাতু আহার করিতেছিল এবং তাহার সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটী লোক কিঞ্চিদ্দূরে কার্য্য করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহারা শুনিতে পাইল যে কৃষক অবিরত কাসিতেছে এবং এবং একপ্রকার অস্বাভাবিক শব্দ করিতেছে তাহারা ছুটিয়া নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতে সে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে এব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিবার জন্য তাহার মৃতদেহ লেখকের নিকটে প্রেরিত হইল। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গেল যে হতভাগ্যের কণ্ঠনালী মধ্যে একটী ছাতুর ডেলা আটকাইয়া রহিয়াছে, উহা এমনি ভাবে সংস্থিত ছিল যে তাহার শ্বাস প্রণালী মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিবার কিছুমাত্র পথ ছিল না। এব্যক্তির শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে বালক বালিকাদের কণ্ঠে পয়সা সিকি দুয়ানি ইত্যাদি আটকাইয়া মৃত্যু হইতে দেখা যায়। মৎস্যের কাঁটা, মাংসের অস্থি, ফলের বীচি ইত্যাদিও গলায় আটকাইয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল দুই বৎসরের বালক কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায় লেখকের নিকট আনীত হয়, সে প্রাতঃকালে তাহার মাতার নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল, এবং মাতা কৈ-মৎস্য কুটীতেছিল, বালকটি মাতার অজ্ঞাতে একটী ক্ষুদ্র কৈ-মৎস্য তুলিয়া মুখে দেয়, এবং মৎস্যটী হস্তচ্যুত হইয়া তাহার গলনালী মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তথায় আটকাইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে মৎস্যের মস্তক এবং উহার শরীরের কিয়দংশ গলনালীর মধ্যে এবং অপরাংশ বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। কৈ-মৎস্যের পৃষ্ঠ বহির্ম্মুখীন ও কাঁটাযুক্ত ডানাথাকা প্রযুক্ত গলনালীকে ক্ষত বিক্ষত না করিয়া উহা বাহিরের দিকে টানিয়া আনা অসম্ভব ছিল, এবং সমস্ত মৎস্যটী নিম্নদিকে ঠেলিয়া দেওয়াও কঠিন বোধ হইল। এই অবস্থায় অতি সাবধানে, অস্ত্রের দ্বারা মৎস্যটির

কিয়দংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নির্গত করান হইয়াছিল, এবং যেটুকু এইরূপে নির্গত হইল না তাহা উদরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বালকটীর প্রাণরক্ষা হয়। কয়েকদিন গলায় একটু বেদনা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট তাহার হয় নাই।

গলার মধ্যে কোন দ্রব্য আটকাইয়া গেলে আটকাইবার স্থানানুসারে দুই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালী, জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ হইতে দু টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভক্ত হয় উহার একটি ফুসফুস মধ্যে এবং অপরটী পাকাশয় মধ্যে প্রবেশ করে। একটী দ্বারা ফুসফুস মধ্যে এবং অপরটী পাকাশয় মধে প্রবেশ করে। একটী দ্বারা ফুসফুস বায়ু নীত হয় এবং অপরটী দ্বারা পাকাশয় মধ্যে আহার্য্য নীত হয়। আহারের প্রণালী-মধ্যে কোন দ্রব্য আটকাইলে যদিও অবস্থা কষ্টকর হইয়া থাকে প্রায়ই সাংঘাতিক হয়না, কিন্তু বায়ু প্রণালী অবরুদ্ধ হইলে অবস্থা অতিশয় গুরুতর হইয়া থাকে, এবং শীঘ্র উপায় অবলম্বন না করিলে সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। কোন প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

১। শ্বাসপ্রণালীতে অবরোধ উপস্থিত হইলে নিশ্বাস গ্রহণে অতিশয় কষ্ট হয়। অবরোধ গ্রস্ত ব্যক্তি অতিশয় অস্থির হয় এবং ছটফট করিতে থাকে, তাহার মুখ বিবর্ণ হয় এবং নিশ্বাস গ্রহণের চেষ্টাতে বক্ষের ও পঞ্জরের অস্থি সমুদায় অস্বাভাবিক ভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকে। কপালে এবং গলদেশের শিরাগুলি স্ফীত হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

২। আহার প্রণালীতে অবরোধ উপস্থিত হইলে এ সমুদায় কিছুই হয় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে, কেবল গলার মধ্যে কষ্ট বোধ হয়। প্রতীকার;—ইহা বলা বাহুল্য যে শ্বাস প্রণালীতে অবরোধ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। গৃহে ইহার কোনও চিকিৎসা হইতে পারে না. চিকিৎসককে গৃহে ডাকিয়া আনিলেও কোন ফল হইবে না, কেননা সময়ে সময়ে ইহাতে কঠিন এবং ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং তজ্জন্য শিক্ষিত সাহায্যকারীর আবশ্যক হয়। এরূপ সাহায্যকারী কোনও গৃহে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

আহার প্রণালীর অবরোধ উপস্থিত হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

১। অঙ্গুলি বা যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অবরোধকারী দ্রব্যটী বহির্দ্দেশে নিষ্কাশিত করা।

২। উহাকে নিম্নদিকে ঠেলিয়া উদরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া।

প্রথমে পীড়িতের মুখ খুলিয়া তাহার দুই চোয়ালের মধ্যে একটী বোতলের ছিপি, ভাঁজকরা কাপড় বা এইরূপ কোন দ্রব্য রাখিয়া দিবে, যাহাতে সে মুখ বন্ধ করিতে না পারে। তৎপরে দক্ষিণহস্তের দুই অঙ্গুলি

গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গলায় আটকান দ্রব্যটী টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিবে ও পীড়িতের পৃষ্ঠে উভয় স্কন্ধাস্থির মধ্যস্থলে বারম্বার আঘাত করিবে। যদ্যপি দ্রব্যটী মস্থণভাবের হয় তবে এরূপ না করিয়া কিছু জল খাইতে দিলে তাহা জলের সঙ্গে উদরে প্রবেশ করিবে, এবং পরে মলের সহিত নির্গত হইয়া যাইবে। মৎস্যের কাঁটা ইত্যাদি যদ্যপি বৃহৎ না হয়, এবং আকর্ষণ করিয়া নির্গত করা না যায় তবে ভাতের ডেলা আলুর ডেলা অথবা এরূপ কোনও দ্রব্য চর্ব্বণ না করিয়া গিলিয়া ফেলিলে তৎসঙ্গে নীচে নামিয়া যায়।

কখন কখন বমনকারক দ্রব্যাদি (যথা—লবণ মিশ্রিত গরম জল বিলাতী রাই (Mustard মিশ্রিত গরম জল) সেবন করাইলে আটকান দ্রব্য বাহির হইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন আটকান দ্রব্য উদরের দিকে নামাইয়া দিয়া তাহা নির্গত করিবার জন্য Castor oil ইত্যাদি কোনও বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু ইহা প্রায়ই আবশ্যক হয় না. এবং মৎস্যের কাঁটা বা মাংসের হাড় বা তদনুরূপ কোনও পদার্থ উদরে থাকিলে বিরেচক না দেওয়াই ভাল মল কঠিন থাকিলে এরূপ দ্রব্য তাহাতে জড়িত ও আবৃত হইয়া নির্গত হয়, তাহাতে পেটের নাড়ীর কোনও স্থানে ক্ষত হইবার ভয় থাকে না।

উপরিলিখিত উপায় দ্বারা প্রতীকার না হইলে আবদ্ধ বস্তু নিষ্কাশিত করিবার জন্য যন্ত্রাদির আবশ্যক হইতে পারে, সুতরাং ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত।

দূষিত বা বিষাক্ত বায়ু বা গ্যাস্ (gas) দ্বারা শ্বাস রোধ হওয়া।

মহিলার পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে শুনিয়া থাকিবেন কলিকাতার ভূগর্ভনিহিত ড্রেণ সমুদয় পরিষ্কার করিবার জন্য তন্মধ্যে লোক অবতরণ করিয়া সময়ে সময়ে প্রাণ হারাইয়া থাকে। এসম্বন্ধে মহাত্যাগী যুবক ৺নফরচন্দ্র কুণ্ডের আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটী অতুল্য ঘটনারূপে নিশ্চয়ই পাঠিকাগণের স্মরণ আছে। আবদ্ধ গৃহকক্ষে কয়লার অগ্নি রাখিয়া রাত্রিতে শয়ন করা হেতুও লোকের মৃত্যু হয়। শুষ্ক বা অর্দ্ধশুষ্ক পুরাতন ও গভীর কূয়া মধ্যে অবতরণ করিয়াও লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। গৃহদাহের সময়ে কখন কখন দেখা যায় যে, কিছুমাত্র দগ্ধ না হইয়াও গৃহে অবরুদ্ধ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অপরিস্কৃত ও আবদ্ধ ড্রেণেতে Sewer gas নামে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু উৎপন্ন হয়, এবং অগ্নির ধূমেতে কার্ব্বণিক এসিড নামক বিষাক্ত বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ সমুদায় বিষাক্ত বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে প্রথমে মূর্চ্ছা পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

প্রতীকার—উপর্যুক্ত দূষিত বায়ু সেবনে মূর্চ্ছা হইলে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে পরিষ্কার

ও উন্মুক্ত বায়ুতে লইয়া আসিবে, এবং আঁটা বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া বা শ্লথ করিয়া দিয়া তাহার মুখে ও বক্ষে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল প্রক্ষেপ করিবে ও smelling solt আঘ্রাণ করাইবে। ইহাতে কোন ফল না হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইবে।

আমাদের দেশে গৃহনির্ম্মাণের দোষে এবং গৃহদ্রব্যাদি রাখিবার যথাবিহিত শৃঙ্খলার অভাবে অনেক গৃহেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিষাক্ত বায়ু সর্ব্বদা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে গৃহস্থ সকলের বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। পুরুষেরা সর্ব্বদা বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে যাতায়াত করেন বলিয়া তাঁহাদের তত ক্ষতি হয় না। এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি মহিলার পাঠিকাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

১। প্রথমতঃ গৃহে প্রত্যেক কক্ষে যথেষ্টরূপে আলোক ও সূর্য্যের উত্তাপ ও সঞ্চরণশীল বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিলে উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষিত ও বিষাক্ত হয়।

২। গৃহের মেজে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে ধূলি সঞ্চিত হইলেও বায়ু বিষাক্ত হয়।

৩। সচরাচর আমাদের পাক গৃহের নির্ম্মাণপ্রণালী অতিশয় দূষণীয়। উহাতে ধূম নির্গমণের জন্য প্রায় কোন নির্দ্দিষ্ট পথ থাকে না। ধূমে কার্ব্বণিক এসিড নামক বিষাক্ত পদার্থ থাকে, ইহার অল্প মাত্রা সেবন করিলে মাথা ধরা, কপালের উভয় পার্শ্বে দপ্ দপ্ করা, হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ, চক্ষে জল বহা ইত্যাদি কষ্ট হইয়া থাকে, এজন্যই আমাদের গৃহিণীদিগের মধ্যে অনেকেই যাঁহাদের শরীর সুস্থ এবং সবল নহে, রন্ধনশালা হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় সমস্ত দিন উপরিলিখিত কষ্টগুলি অনুভব করেন, এবং যাঁহারা সবল ও সুস্থ তাঁহারা ক্রমে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইতে থাকেন। ইহা সত্য যে সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন না; অবস্থা, স্বাভাবিক শারীরিক সামর্থ্য ও শক্তির উপর নির্ভর করে।

উপরি লিখিত কারণবশতঃ সকল গৃহিণীরই উচিত যে বাস করিবার জন্য যখন গৃহ-নির্ব্বাচণ বা গৃহ-নির্ম্মাণ করেন তখন গৃহের দ্বার জানালা যথেষ্ট ও যথাযোগ্য আছে কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। গৃহের কোনও স্থলেই অন্ধকার হওয়া উচিত নহে। পাইখানা ও স্নানের ঘরেও বিশেষরূপে আলোক প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালনের বন্দোবস্ত থাকার আবশ্যক। শেষোক্ত স্থানদ্বয়ে দূষিত জল নির্গমনের জন্য যথেষ্ট পয়ঃ-প্রণালী থাকা আবশ্যক, এবং উহা প্রতিদিনই পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক রান্নাঘরে ধূম নির্গমনের উত্তম বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। ইংরাজী ধরণে চিমণি থাকিলে বড় ভাল হয়।

I r: N. C. Dutta.

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আচার্য্যমাতা সাধ্বী সারদা দেবী ৭১৮ বৎসর হইল তাঁহার নাত জামাতা পূর্ণিয়ার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমান্ যোগেন্দ্র

লাল কাওগিরির অনুরোধমতে স্বীয় জীবনকাহিনী আনুপূর্ব্বিক ক্রমশ: কিছু কিছু করিয়া এক এক দিন বলিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রলাল তাঁহার কথাগুলি একটী খাতায় অবিকল লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সারদা দেবী স্বর্গগত হইলে পর তাঁহার প্রিয়তমা পৌত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী (যোগেন্দ্রলালের পত্নী।) উক্ত খাতা হইতে সেই জীবনকাহিনী কিছু কিছু নকল করিয়া মহিলাতে প্রকাশের জন্য ক্রমশঃ আমাদের নিকটে পাঠাইতেছেন। তাহা অবিকল প্রকাশিত হইতেছে। বিগত শ্রাবণ মাসে আচার্য্যের বিবাহ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য্যমাতা একটী পাত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয় সেই সম্বন্ধ কোন কারণে ভঙ্গ করিয়া আচার্য্যমাতার অমতে ও অজ্ঞাতসারে বালী গ্রামে চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করেন। তখন সেই পাত্রীর বয়ঃক্রম ৭বৎসর ছিল, তিনি রুগ্না ছিলেন। তাঁহার মাথায় চুল একেবারে ছিল না, বর্ণ মলিন ছিল। আচার্য্যমাতা লোকমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হন, পরে বধূকে স্বয়ং দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, তবে ভাল করিয়া মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে তত ক্ষোভ থাকে নাই। এ বিষয় তিনি নিজে যাহা বলিয়াছিলেন পরে পুত্রবধূর সৌন্দর্য্য বিষয়ে, যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

—"যে ভাবে বলিলেন তাতে আমার মনে হইল মেয়ে সুন্দরী নয়, তারপর আমি একবার যখন বড় বৌ ও ছোট মেয়েকে লইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছিলাম, সেই সময় বালির ঘাটে নৌকা লাগাইয়া বৌ ও ছোট মেয়েকে ঝিএর সঙ্গে মেয়ে দেখিতে পাঠাইলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে আমার মন আরও খারাপ হইল। সে যাহা হউক বিবাহ ঠিক হইল। বৌ ঘরে আসিল। বৌএর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে আমার মন আরও খারাপ হইল এমন কি কাঁদিয়া ফেলিলাম, আমার ভাশুরও অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি নিজে বাতি লইয়া ধরিলেন, এবং আমায় বেশ করিয়া মুখ দেখিতে বলিলেন। মুখ দেখিয়া আমার মনটা ভাল হইল। মনে করিলাম মুখখানি বেশ, পরে ভাল হইবে। বিবাহের সময় বৌ অতি ছোট, রোগা ও কাল ছিলেন, মাথায় চুল আদপেই ছিল না। * * *

"বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি লইয়া আসি, সেই পর্য্যন্ত আমারই ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন। ধর্ম্ম ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌএর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।"

আচার্য্যপত্নী তখন ৭ বৎসরের বালিকা, রুগ্না ছিলেন। এরূপ অবস্থাপন্না একটী বালিকার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য বিষয়ে কোন আলোচনাই হইতে পারে না,

রোগে শারীরিক সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া নিন্দাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে। পরে আচার্য্যমাতা বলিয়াছেন, "আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন, ধর্ম্ম ভাবের সঙ্গে বউয়ের শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।" আচার্য্য মাতা নিজের জীবনসম্বন্ধীয় সকল কথা সরলভাবে যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের একটী কন্যা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদসূচক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন,* তিনি বলেন, এরূপ লিখাদ্বারা সাধারণের নিকট আচার্য্য-পত্নীর নিন্দা করা হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি পরমাসুন্দরী ছিলেন। আমরাও বলি তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন। আচার্য্যমাতাও নিজে তাহা বলিয়াছেন। কন্যা বলেন, "কোন একটা Public কাগজে কোন কুৎসা বা নিন্দা সঙ্গত মনে হয় না, বিশেষতঃ তাঁহাদের যাঁহাদের জীবন জগতে আদর্শ স্থানীয়।"

তদ্রূপ বলাতে আচার্য্যমাতা স্বীয় পুত্র বধূর কুৎসা ও নিন্দা করিয়াছেন কি না তাঁহার কথাগুলি পূর্ব্বাপর পাঠ করিয়া পাঠিকারা বিচার করিবেন। তিনি পুত্র বধূর জীবন ও চরিত্র বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। ৭।৮ বৎসরের বালিকার জীবন গঠন হয় না, সে বিষয়ে কোন কথাই হইতে পারে না। তদবস্থাপন্না একটী বালিকার শারীরিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে বাদানু-বাদ করাও অপ্রয়োজন। লেখিকা বলেন, আচার্য্যমাতার কথাগুলি অবিকল প্রকাশ না করিয়া আমরা নিজের ভাবানুসারে তাঁহার জীবনী কেন লিখিতেছি না? আমরা বলি সেরূপ লিখিতে আমরা অসমর্থ। আমারা জীবনী প্রকাশের প্রথমেই ব্যক্ত করিয়াছি, ইহা কেশব-জননীর নিজ-মুখের কথা। এমন অবস্থায় তাঁহার কথায় বা ভাবের পরিবর্ত্তন করিলে আমাদের বড় দায়িত্ব, তাহাতে যে মিথ্যাচরণ হয়। বিশেষতঃ তাঁহার সরল হৃদয়ের কথাগুলি অবিকল প্রকাশ করাতে যেরূপ স্বাভাবিক ও মিষ্ট লোকের আদরণীয় হইতেছে, তাহা আমাদের নিজের কথায় লিখিলে হইবে না, জিনিষ অন্যরূপ হইবে। অপিচ উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইলে যিনি উহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, এবং যিনি মহিলাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন, আপত্তি নাই।

লেখিকা জানিবেন আচার্য্যমাতার জীবনের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন মন্দভাব কখনও পোষণ করেন নাই, কখনও কাহারও নিন্দা ও কুৎসা করেন নাই। জগতে তাঁহার শত্রু ছিল না, সকলের প্রতি তাঁহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও চিরপ্রসন্ন ছিল, তাঁহার তদ্রূপ বলাতে তাঁহার নিজের পুত্র-বধূর কোন প্রকার নিন্দা ও কুৎসা হয় নাই, ইহা আমরা সাহস করিয়া

* এক্ষণে তাঁহার পরিচয়দানে আমরা অপ্রস্তুত।

বলিতে পারি। লেখিকা মনে কোনরূপ ক্ষোভ রাখিবেন না। তিনি জানিবেন আচার্য্যপত্নী যেমন তাঁহার ভক্তির পাত্রী আমাদেরও তদ্রূপ ভক্তির পাত্রী।

স্বর্গগতা সাধ্বী মুক্তকেশী। *

১৭৬৭শকে ২৫শে অগ্রহায়ণ জেলা হুগলির অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট বাগাটী গ্রামে কোন সম্পন্ন পরিবারে মাতৃদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোপীনাথ মিত্র কলিকাতায় মুচ্ছুদি Banion ছিলেন। প্রথম সন্তান বলিয়া তিনি পিতা মাতার বড় আদরের কন্যা ছিলেন। যখন তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স তখন হঠাৎ বিসূচিকা (কলেরা) রোগে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃহীনা সন্তান বলিয়া পিতা পিতামহী ও বিধবা নিঃসন্তান পিসীর বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। তাঁর দুইটী সহোদর ভিন্ন গৃহে আর সন্তানাদি ছিল না. সুতরাং কন্যা তখনকার কালেও পুত্রের ন্যায় আদরে লালিতা পালিতা হইয়াছিলেন। চিরজীবন নিরামিষভোজিনী মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি বাল্যকালে মৎস্য ভিন্ন একদিনও তাঁহার আহার হইত না। এইরূপ আদরের কন্যা একাদশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরগৃহে গেলেন। শ্বশুরালয় প্রকাণ্ড সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া স্ত্রীপুরুষ বহুলোক ছিলেন। তাহা অপেক্ষা বড় পরিবার হইতেই পারে না। আবার আমার মাতৃদেবীর নিজের শ্বশুর বা শাশুড়ী কেহই ছিলেন না; তাঁর শ্বশুর, আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের শৈশবকালেই পরলোকগত হন, এবং শাশুড়ীঠাকুরাণীও, বধূর শ্বশুরগৃহে সংসার করিতে আসিবার পূর্ব্বেই-স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং নূতন বধুকে তেমন করিয়া আদর যত্ন করিবার লোক বিশেষ কেহই ছিলেন না, বরং ছোট বধূ বলিয়া (তখনকার সময়ে পল্লীগ্রামে যেরূপ নিয়ম ছিল) তাঁহাকে অনেক কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। যিনি পিতৃগৃহে একেবারেই কাজকর্ম্ম করেন নাই, একেবারে কতকগুল কাজের ভার তাঁহার উপর পড়ায় যদিও একটু কষ্ট হইত তথাপি সুন্দররূপেই তাহা সম্পন্ন করিতেন। পল্লীগ্রামের ব্যবস্থানুসারে যতই কেন অল্পবয়স্কা বধূ হউন না, বাড়ীর সকলের আহারাদির পর অপরাহ্ণ সময়ে বধূগণের আহার করিতে হইত। এই সকল নানা কারণে প্রথম প্রথম তিনি কষ্ট বোধ করিতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন প্রকার কষ্টের কথা, পাছে শ্বশুর বাড়ীর নিন্দা করা হয়, এবং তাঁর পিতা

* গত আষাঢ় মাসে দেবী মুক্তকেশীর অন্তিম কালের বিবরণ, শ্রাবণ মাসে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এখন হইতে জীবনের কিছু বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে চলিল। ইহা তাঁহার তৃতীয়া কন্যা প্রিয়বালা কর্ত্তৃক লিখিত। ইহার প্রথমাংশের ৪।৫ ছত্রের কিয়দংশ মসীলিপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে অবোধ্য হইয়াছে। কোনরূপে দুই চারি কথার যোগ করিয়া অর্থসংগতি করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পিতামহী প্রভৃতি দুঃখিত হন সেজন্য কাহাকেও বলিতেন না।

তাঁর পিতা আদরের কন্যাকে, পাছে কোন কষ্ট হয় ভাবিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক উপহারাদি পাঠাইতেন, তিনি সেই সকল অর্থ ও বস্ত্র হইতে তাঁর বড় জা-কে না দিয়া নিজে লইতেন না। কখনও কোথায়ও যাইতে হইলে দুইখানি বস্ত্র বাহির করিয়া একখানি দিদীকে দিতেন ও একখানি নিজে পরিধান করিতেন।

কেহ যদি তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিত, নিজের পছন্দ মত জিনিষ হইলেও, তাহা তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত তাহাকে দান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি দানে বড় সুখ অনুভব করিতেন, এইরূপে তাঁর সদ্‌গুণ সকল বাল্যকালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

যখন তিনি অল্পবয়স্কা বালিকা ছিলেন, শ্বশুরালয় গিয়া অসুখ বিসুখ হইলে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিজের কর্ত্তব্যপালনে কখনও ত্রুটি করিতেন না। সে সময় পল্লীগ্রামে অনেকগুলি নারী একত্রিত হইলেই, কুৎসিত আমোদ কুৎসিত ভাষা এবং কুৎসিত বিষয়ের চর্চ্চা ইত্যাদি হইত, আমার জননী দেবী সযত্নে সেই সকল প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতেন, কখন তাঁহারা ডাকিলেও ওরূপ সংসর্গে মিশিতেন না, এবং বলিতেন "তোমাদের কি আর ভাল কথা নাই, তোমরা এসকল কুৎসিত বিষয়ে আলোচনা কর কেন?"

তিনি স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া ছিলেন। কিন্তু অন্যায় দেখিলে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতাঠাকুর মহাশয় প্রথম ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হন। তখন মাতাঠাকুরাণীর উপর খুব অত্যাচার ও নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। শুনিয়াছি প্রথম সন্তান প্রসবকালে তিনি যখন সূতিকাগারে ছিলেন তখন তাঁহার উপর গৃহ-কর্ত্তার আদেশ হইল যে বধূর আহার বন্ধ করা হউক, এবং কোন প্রকার সাহায্য কেহ করিতে পাইবে না। সেই অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও মাতৃদেবী বিচলিত হয়েন নাই; তিনি কোন লোকের দ্বারা আহার্য্য সামগ্রী আনাইয়া সূতিকাগারমধ্যে নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন, তথাপি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। গৃহে স্ত্রীলোকেরা "ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে" বলিয়া মাতাঠাকুরাণীকে অনেক তিরস্কার লাঞ্ছনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সকলই অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন।

যখন তাঁর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন তাঁর পিতৃগৃহে একটী বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্ম হয়, তিনি সেই ভাইটীকে পুত্র নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন, এবং আজীবন তাঁকে ও পরে তাঁর পুত্রকে নিজপুত্রের ন্যায় যত্ন আদর করিয়া আসিয়াছেন। অনেক বয়সে শেষবার যখন জন্মস্থান দেখিবার জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তখন তাঁর সহোদরা ভগ্নী ও তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভাইয়ের বিষয়ে কিছু অভিযোগ করিতেছিলেন মাতৃদেবী তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন,

"হরির কথা আমাকে কিছু বলিও না, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, তোমার তার বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়। কারণ সেই আমাদের একমাত্র ভাই ও পিতৃবংশের রক্ষক, আমি তার কোন দোষ দেখি না।"

তাঁর গুরুজনে ভক্তি ও কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ মমতা চিরদিন সমান ভাবেই দেখিলাম, নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন এবং সমাজভুক্ত নরনারী সকলকেই যথাযোগ্য ভক্তি স্নেহ করিতেন, কাহারও নিকট হইতে কদাচ মন্দ ব্যবহার পাইলেও তাঁর ভক্তি বা স্নেহের অভাব দেখা নাই, সেজন্য তাঁহাকে কি আত্মীয় স্বজন কি সমাজস্থ নরনারী সকলেই ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

যে সময়ে পিতাঠাকুর মহাশয় প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন, সে সময়ও তাঁকে বিষম পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি অটল ভাবে আনন্দের সহিত পিতৃদেবের কর্ম্ম পরিত্যাগে অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবং তখন হইতেই বৈরাগ্য ব্রত গ্রহন করেন ও বস্ত্র অলঙ্কারের বাসনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইলেও কাহাকেও জানাইতেন না। তিনি স্বভাবতঃ ভোগবিলাসপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর জীবন বৈরাগ্যপ্রধান ছিল, কখন কোনও অভাব বোধ করিতেন না।

দেশ বিদেশে যাইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিধাতার বিচিত্র লীলা দেখিবার ও সম্ভোগ করিবার জন্য তাঁর প্রাণ উৎসাহিত হইত। তিনি যত স্থান দেখিয়াছেন তার মধ্যে হরিদ্বার তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান ছিল, তিনি হরিদ্বারের কথা উৎসাহের সহিত বলিতেন, এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার যাইতে চাহিতেন। হরিদ্বারে যখন গিয়াছিলেন, তখন চণ্ডীর পাহাড়ে উঠিবার জন্য কিয়দ্দূর একটী অপ্রশস্ত কাষ্ঠ ফলকের উপর দিয়া যাইতে হইত, নীচে গঙ্গানদী প্রবাহিত, নীচে পড়িয়া গেলে কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, এমন অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে কেহই সাহস করিতেছেন না দেখিয়া মাতা ঠাকুরাণীই প্রথমে সাহসপূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, দেখিয়া অন্যান্য মেয়েরা সাহস করিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যেই সাহস ছিল।

তিনি ধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্ম বাহিরে নয়, অন্তরে, অন্তর শুদ্ধ রাখ, বাহিরে দেখাইয়া কি হইবে। ভগবান বাহিরের ধর্ম্মে ভোলেন না অন্তর দেখেন।"

তিনি একটী ধার্ম্মিকা নারী ছিলেন কিন্তু নিজেকে নিতান্ত দীন পাপী বলিয়া মনে করিতেন। অহঙ্কার তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্রও ছিল না।

মাতৃদেবী বিবিধ গুণের ভূষণ পরিশ্রমী ও সুগৃহিণী ছিলেন। গৃহকার্য্যে এম সুদক্ষা নারী কমই দেখিতে পাওয়া যায় তিনি রন্ধন, বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত ও শি কর্ম্মে সুপটু ছিলেন। তাঁর সংসারের সু শৃঙ্খলা ও সু ব্যবস্থা উল্লেখ যোগ্য। এত অ

আয়ের মধ্যে এমন সুচারুরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। তাঁর দৈনিক কার্য্য প্রণালী এইরূপ ছিল :—

অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উপাসনা করিতেন। যখন পিতা গৃহে থাকিতেন তখন তাঁকে আরাধনা ভাগ করিয়া করিতে হইত, (নচেৎ তিনি নিজেই পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন।) উপাসনার পর রন্ধনাদি করিয়া ৯॥ টার মধ্যে সন্তানদিগকে আহার করাইয়া স্কুলে পাঠাইতেন, তাহার মধ্যে যদি কেহ উপাসনায় যোগ দিবার জন্য আসিতেন তাঁহার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে মিষ্টান্ন খাদ্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। কেহ টের পাইত না যে কখন প্রস্তুত হইল নীরবে সকল কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্মে কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। স্বামী ও পুত্র কন্যাদের আহার করাইয়া অবশেষে নিজে স্নান আহার করিতেন। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিবার পর ছোট ছেলে মেয়েদের কাপড় চোপড় সেলাই ও গৃহের অন্যান্য শিল্প কর্ম্ম করিতেন। তারই মধ্যে, কখন কখন পরেও কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ হইত। বৈকালে পুনরায় রন্ধনাদি করিয়া বালক বালিকাদিগকে আহার করাইতেন। পরিশেষে সন্ধ্যার সময় পুত্র কন্যাদের লইয়া একটী গান ও প্রার্থনা হইত। প্রার্থনার পর ছেলে মেয়েরা পড়িতে বসিতেন, তাঁকে পরেও উপাসনা-গৃহে ধ্যানে রত থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি অনেক সময়ে ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া সন্ধ্যার পর রামায়ণ, মহাভারতের নীতিপূর্ণ গল্প সকল শুনাইতেন। সন্তানেরা কিরূপে সৎপথে থাকিবে ও ভগবানকে চিনিবে সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল, কন্যারা বড় হইলে কিরূপে চিত্ত সংযম করিয়া ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়, তিনি নিজে কিরূপে করিতেন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন।

একবার কেহ বলিয়াছিলেন, "তিনি সর্ব্বদা সংসারের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে সংসার করি, ইহাও তাঁরই কাজ; তিনি আমায় এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন যে, আমায় সর্ব্বদা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যিনি এ ভার দিয়াছেন; যত দিন তিনি আমাকে এ কাজে রাখিবেন, তাঁরই কাজ করিতেছি ভাবিয়া করিয়া যাইব।"

তিনি সকল কর্ম্ম সময়ে করিতেন, অসময়ে ভালরূপে করার চেয়ে সময়ে অল্প পরিমাণে করাও ভাল এই তাঁর মত ছিল। তিনি সর্ব্বদা পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজনকে উপহারাদি প্রেরণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, কেবল নিজের আত্মীয় স্বজনকে দিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, তাঁর ভালবাসা বহু বিস্তৃত ছিল। সম বিশ্বাসী ও বিশেষতঃ প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দের সেবা করিবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হইত। কিন্তু তিনি অর্থাভাবে সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করিতে পারিতেন না। ভাগলপুরে যখন ছিলেন ব্রাহ্মপরিবার গঠন-কার্য্যে পিতৃদেবকে বিশেষরূপে সহায়তা

করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তেই কিছুকাল তিনি প্রতি বৎসরে গ্রীষ্মকালে একটী ব্রত করিতেন, প্রত্যহ এক একটী বাড়ীতে পাখা, সোরাই এবং সর্ব্বৎ, বরফ ও ফল ইত্যাদি যত্নপূর্ব্বক পাঠাইতেন। অনেক সময়ে গৃহে কেহ আসিলেও তাঁকে ঐরূপ দেওয়া হইত। সময়ে সময়ে স্থানীয় হাঁসপাতালে রোগীদের জন্য খাদ্যাদি প্রেরণ করিতেন। কেহ তাঁর গৃহে অতিথি হইলে, অতি আনন্দের সহিত যত্ন পূর্ব্বক তাঁর পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁর অন্তর সেবা-প্রিয় ছিল, কাহারও সেবা করিতে পাইলে কৃতার্থ হইতেন। বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রম তাঁর একটী বিশেষ সেবার স্থান ছিল। ক্রমশঃ

স্বদেশের দুর্গতির জন্য মহিলাদের প্রার্থনা হয় কি?

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষভাগে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া একযোগে স্বীয় প্রথম পৌত্র ও প্রথমা দৌহিত্রীর নামকরণ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে কমলকুটীরে সম্পাদন করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়। সেই শুভানুষ্ঠানোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বাবু নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি বাহিরের অনেক সম্ভ্রান্ত বন্ধু কমলকুটীরে আসিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর আচার্য্য উপরের একটি ঘরে চিন্তাশীল অন্তরে বিষণ্ণ ভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়াছিলেন। তখন নলিনবিহারী বাবু ও অন্য কোন বন্ধু তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া চিন্তা ও বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, এদেশের যুবক যুবতী ও বালক বালিকাগণ ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি জন্মিতেছিল, তাহারা ধর্ম্মভয়, বিনয় ও বাধ্যতার অধীন হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণ হইতে উহা পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে পড়িতেছে। সেই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত চলে, ক্রমে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বক্তা, বালক ও যুবকদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সামান্য অগ্নিকণা যেমন বায়ুর সাহায্যে ভীষণাকার ধারণ করিয়া একটি প্রকাণ্ড নগরকে ভস্মীভূত করিতে পারে, তদ্রূপ ২৫ বৎসর পূর্ব্বকার সামান্য আন্দোলন এক্ষণ দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালী জাতি শাসনকর্ত্তাদিগের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আর বাঙ্গালীদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, কাহারও কথায় বা লেখায় রাজবিদ্রোহিতার গন্ধ পাইলেই তাহার উপর কঠিন দণ্ড বিধান করিতেছেন। বহু পত্রিকা সম্পাদক, প্রিণ্টার ও বক্তা রাজদ্রোহিতাপরাধে কারাগারে প্রেরিত এবং দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, অনেকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপরও আঘাত পড়িয়াছে। এক্ষণ যদি আচার্য্য দেহে বিদ্যমান থাকিতেন স্বচক্ষে দেখিতেন উন্নতি ও কল্যাণ পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে পড়িয়াছে কি দুই শত বৎসরেরও অধিক দূরে পড়িয়াছে।

আচার্য্যের মূল ধর্ম্মমত রাজভক্তি। তিনি রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিণ্টনের ভারত সাম্রাজ্য শাসন কালে দিল্লির দরবারের অব্যবহিত পরে টাউনহলের বক্তৃতায় রাজভক্তি বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। কিরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক তাঁহার গভীর রাজভক্তি, পরমোপকারী ইংরাজ জাতির প্রতি স্থির কৃতজ্ঞতা ছিল, ইহা দ্বারা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"বহু শতাব্দি হইতে হিন্দুজাতি রাজার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর নিকট রাজভক্তির অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে রাজাকে ভালবাসা ও শাসনবিভাগের কর্ত্তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা। হিন্দু সন্তান নিজের রাজাকে প্রগাঢ় আনুগত্যের সহিত ভাল বাসেন। হিন্দুর নিকটে রাজাকে বিশ্বাস করিবার অর্থ রাজভক্তি বা রাজাকে ভালবাসা। হিন্দু গৃহস্থ পিতাকে গৃহকর্ত্তৃরূপে ভক্তি করেন, এবং ভালবাসার সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন, সেই প্রকার রাজাকে রাজ্যের পিতৃরূপে ভাল বাসেন ও আনন্দের সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। রাজা যে প্রজাসাধারণের পিতৃস্বরূপ, ইহা প্রধানতঃ হিন্দুভাব। হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এবং দেশীয় প্রজা সকলের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি তাহার জলন্ত প্রমাণ। হিন্দু মতই যথার্থ মত। ইহা স্বভাবের অত্যন্ত উপযোগী। ভ্রান্তমতবাদীরা ইহা অস্বীকার করুক, হৃদয়বিহীন কল্পনার সেবকগণ ইহার বিরুদ্ধে বলুক তাহাতে কি? আমি তেজের সহিত বলিতেছি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রাজাকে সাধারণের পিতৃরূপে দর্শন করে। তিনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ না হইতে পারেন, তাঁহার শাসনপ্রণালী দোষ-শূন্য না হইতে পারে, তথাপি সাধারণ লোক তাঁহাকে ভক্তি করে। যেমন সন্তান তাহার পিতার দোষ দুর্ব্বলতা বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। রাজ্যের আইন-সঙ্গত অভিভাবকের উপর যে প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার কোন কারণই যথেষ্ট নহে। শান্ত স্বাভাবিক অন্তঃকরণ কখনও রাজনৈতিক কল্পনায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ব্যক্তি-বিহীন ভাব ত্যাগ করে, ইহা একটি ব্যক্তি চায়, সেই ব্যক্তি রাজা কিংবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি, যাঁহা হইতে নিয়ম ও রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে আমার রাজবিশ্বস্ততার যথার্থ অর্থ কেবল আইন ও পার্লেমেণ্টকে মান্য করা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ব্যক্তিগত অনুরাগ। কেবল সাংসারিক ভাবে রাজভক্তিতে মন এত সরস হয় না। কিন্তু ইহা গভীর ধর্ম্মভাবের ফল। রাজভক্তির অর্থ, বিধাতাকে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসই রাজভক্তির মধ্যে এত পবিত্রতা ও গভীরতা আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রত্যেক লোকের অন্তরে ও সমাজের মধ্যে এই পবিত্র বৃত্তি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান? সমস্ত জাতির উন্নতির মধ্যে কি ভগবানের বিশেষ বিধান দেখিতে পাও না?

নিশ্চয়ই ভারতে ইংরাজ-শাসনকাল ইতিহাসের একটি সামান্য অধ্যায় নয়। কিন্তু ইহা একটি ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস। আমাদের এই সুবিস্তীর্ণ দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও ইংরাজের পিতার ন্যায় শাসনে সম্পন্ন হইতেছে। যে পুস্তকে এ কথা লিখিত হয় সত্যই ইহা একটি পবিত্র পুস্তক। ইহাতে আমরা পরিস্কার দেখিতেছি যে, ভগবান্‌ই ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন।

* * * *

"হে শিক্ষিত দেশীয়গণ, তোমরা তোমাদের স্বর্গের নিয়োজিত রাজাকে ভক্তি করিতে বাধ্য। তুমি যদি ভক্তি না কর তাহার অর্থ ভয়ানক অকৃতজ্ঞ হওয়া ও ভগবানে অবিশ্বাস করা। যখন তোমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে অন্তঃসারশূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন ইংরাজশাসন ঈশ্বরের দূত হইয়া তোমাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছিল, এবং সেই অবস্থা হইতে তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে। সেই ইংরাজ-শাসনকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই কাজ মানুষের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। ইংরাজ জাতি দ্বারা তিনিই ইহা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মনোনীত যন্ত্র জানিয়া তোমরা রাজাকে ও সমস্ত শাসন কর্ত্তাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মান্য কর। আমরা যতই অধিক রাজভক্ত হইব তত আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সাহায্যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ইহাও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া বহুদিন পাশ্চত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির আগমনে বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন দেখিতে পাই। অর্থাৎ এই দুই জাতি আর্য্য জাতির দুইটি ভিন্ন পরিবার হইতে অদ্ভুত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বিধানে, স্বর্গের সুনিয়মে কতক গুলি মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই ভারতে সেই দুই জাতির মিলন হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারত রাজনৈতিক ও সমাজিক নীতিবিষয়ে পরস্পর আদান প্রদান করিয়া যথার্থ উন্নতি অক্ষুন্ন গৌরব লাভ করে ভগবানের ইচ্ছা। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, রাজকীয় সভাতে সাম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়াকে ও তাঁহার প্রতিনিধিকে এ দেশের রাজা মহারাজগণ মিলিতভাবে সম্মান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তখন আরও অধিক আনন্দিত হইব, যখন দেখিব ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ এবং ইংরাজজাতি একটি বৃহৎ মিলিত দলে সকল রাজার রাজা, সকল প্রভুর প্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে মিলিত হইবে। ইংলণ্ড তাহার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদিগকে সেই পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহায্য করুক। ভারতে ইহাই তাহার (স্বর্গের প্রেরিত) কার্য্য। সে যেন এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। ইংলণ্ড তাহার পরিশ্রম ও শিল্প এবং তাহার কার্য্যকর বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক দর্শন আমাদিগকে প্রদান করুক যাহা এ

দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে দেশ কুসংস্কার দ্বারা ভয়ানক রূপে আচ্ছন্ন।” ইত্যাদি।

কেশবচন্দ্রের জীবন ভক্তি-প্রধান ও বিশ্বাস-প্রধান ছিল। তিনি দিব্যালোকে সমস্ত দেখিতেন, রাজার মধ্যে দেবত্ব দর্শন করিতেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ভারতের কল্যাণের জন্য বিধাতার বিশেষ বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র প্রত্যাদেশ দ্বারা চালিত হইতেন। উপাসনা প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র বল ও সম্বল ছিল। বঙ্গীয় যুবকদিগের বর্ত্তমান নেতৃগণ পার্থিব জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হন, নিজেদের বুদ্ধির আলোকে চলেন। উভয়ের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্তের ন্যায় প্রভেদ। রাজাকে ভক্তি করা ও মান্য করা ভারতের স্বদেশী ভাব। কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে পূর্ণ স্বদেশী ছিলেন। রাজাকে ও রাজপ্রতিনিধিকে অমান্য করা, রাজপুরুষদিগকে অগ্রাহ্য করা, সম্মানিত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপমানিত করা, এ সকল স্বদেশী ভাব নয়, ভারতীয় আর্য্য জাতির ভাব নয়। বিকৃত বিলাতী ভাব। বিলাতের উদ্ধত লোকেরাই এই ভাব পোষণ করে, এই ভাবে চালিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান নেতারা ও সহকারী উপনেতৃগণ ভয়ঙ্কর বিলাতী ভাবকে স্বদেশী নামে বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার করিতেছেন। তাহার কুফল ফলিতেছে ও শত সহস্র যুবা ও বালক নীতি ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতে মহা দুঃখ ও অশান্তি আনয়ন করিয়াছে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রোল উঠিয়াছে।

কেশবচন্দ্র গুণগ্রাহী ছিলেন, ছিদ্রান্বেষী ছিলেন না। তিনি সম্মিলনপ্রার্থী—বর্জ্জনবিরোধী ছিলেন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মমন্দিরে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতভূমির বিবাহ—অচ্ছেদ্য যোগ। বর্ত্তমান নেতৃগণ বিবাহভঙ্গ—ডাইভোর্সের বিধি দিতেছেন। ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যাদির সম্পর্ক যাহাতে না থাকে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। যে দিন বর্জ্জনবিধির সূত্রপাত হইয়াছে সেই দিন পুণ্য দিন ও আনন্দের দিন বলিয়া প্রতি বৎসর স্বদেশী দলের দ্বারা মহাঘটা সহকারে উৎসব হইতেছে। তাহার নাম বর্জ্জনোৎসব। রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গবিভাগ হইয়াছে, তজ্জন্যই এত আন্দোলন ও বিবাদ কলহ। কেহ তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না, ইংরাজ জাতির ব্যবসায় বাণিজ্য যাহাতে এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন হইতেছে। ইহা ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ও শত্রুতার কারণ হইয়াছে, ভবিষ্যতে যে শীঘ্র সম্মিলন হইবে সেই পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে বঙ্গবিভাগের বিপক্ষ ছিলেন, এক্ষণ তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বঙ্গবিভাগ উচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বথা সমর্থন করিতেছেন। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত “সদুপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বঙ্গবিভাগের ঔচিত্য যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, যোগ ভক্তি পুণ্য প্রেমের উন্নতির উপর, শাক্য গৌরাঙ্গাদি ভারতের শিরোরত্ন দেবাত্মাদিগের অনুসরণে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনের উপর এদেশের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। বর্ত্তমান নেতৃগণ বলেন, এদেশে বিলাতী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইলে, এদেশে বিলাতের বণিক্‌দিগের ব্যবসায় বাণিজ্য উঠিয়া গেলে, দেশীয় কাপড় ও দেশীয় লবণাদির বিক্রয়ের বাহুল্য হইলে * এদেশের উদ্ধার উন্নতি ও সৌভাগ্য হইবে। কি স্থূল ও বাহ্যিক বস্তুর উপর জাতীয় উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত! কি বহির্ম্মুখীন দৃষ্টি! বলা বাহুল্য যে, এই বহির্ম্মুখীন স্বদেশী দলের উপাস্যও স্থূল জড়পদার্থ—ভূমিখণ্ড। অধ্যাত্মরাজ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। উচ্চ ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ না রাখিয়া কেবল দেশীয় লোকের বাণিজ্যের উন্নতি ও ইংরাজদিগের ক্ষতি করিতে পারিলেই দেশের উদ্ধার ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইবে, কি আশ্চর্য্য কথা! ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান স্বদেশী ব্যাপার ধর্ম্মমূলক নহে। যাহা ধর্ম্মমূলক নহে, হিংসা বিদ্বেষমূলক তাহা দ্বারা কি কোন প্রকার কল্যাণের প্রত্যাশা করা যায়? কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র বিলাতে যাইয়া সে দেশের লোকের কত আদর ও সম্মান ভ্রাতৃভাব লাভ করিয়াছিলেন, আর বাঙ্গালী স্বদেশ হইতে সে দেশের উপকারী লোকদিগকেও তাড়াইয়া দিতে চাহেন, কি অভদ্রতা ও অশিষ্টতা! আমরা স্বীকার করি যে, বিশেষ বিশেষ নেতা মহাবক্তা, দৃঢ়ব্রত, স্বদেশপ্রিয়, কর্ম্মিষ্ঠ লোক, তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু তাঁহারা নিজে ভ্রমান্ধকারে পড়িয়া অন্য শত সহস্র লোককে—সরলহৃদয় যুবক যুবতী ও বালকবালিকাদিগকে সেই অন্ধকারের পথে লইয়া চলিয়াছেন। সাধারণ লোকদিগের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মসমাজের উপরও তাঁহাদের বিশেষ প্রভাব বিস্তার হইয়াছে। সাধারণ সমাজ ও নববিধান সমাজের প্রায় ১৫ আনা লোক তাঁহাদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। নববিধান সমাজের লেখাপড়া শিখিয়াছে এমন দুই একজন যুবার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, তাঁহারা নববিধান ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের কোন ধার ধারেন না। অন্তরে রাজভক্ত কেশবচন্দ্রের বিরোধী। আমরা তাঁহাদের ভাবগতি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। কেশবচন্দ্র টাউনহলে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "বিচারকের—মাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্ব স্বীকার করিব, আইনকে গ্রহণ করিব। স্বদেশের বর্ত্তমান নেতারা লাট সাহেবের প্রভুত্বও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের প্রভাবাধীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বালক লাঠী হাতে করিয়া রাজ নিয়োজিত শান্তিরক্ষক পুলিশকে মারিতে গিয়াছে জানি। ব্রাহ্মসমাজের একটি যুবা

* এদেশে উৎপন্ন সমস্ত লবণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া বাণিজ্য। লবণের টাকা রাজকোষভুক্ত হয়। বিলাতী লবণ না খাইয়া দেশীয় লবণ খাইলে স্বদেশীদিগের কোন লাভ হয় না।

গুরুতর রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে এবং ইংরাজ-বধের উদ্দেশ্যে বোমা প্রস্তুতির উদ্যোগ করা বশতঃ ৭ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার উপর আরও একটি অভিযোগ রহিয়াছে তাহার বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই। রাজবিদ্রোহিতা অভিযোগে অভিযুক্ত ২৯।৩০ জন বাঙ্গালী যুবা এক্ষণও হাইকোর্টের বিচারাধীন আছে। দুঃখের বিষয় পরিণতবয়স্ক অনেক খ্যাতনামা ব্রাহ্মও উক্ত নেতাদের সার্কুলার শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম বিধি সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়াছেন। তাই আমরা বলি স্বদেশের দুঃখ দুর্গতি মোচনের জন্য মহিলাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা হয় কি? চারি দিকের ব্যাপার যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে, এক্ষণ অশ্রুপাতের সময়, স্বদেশের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করার সময়। এই স্বদেশোদ্ধারের মহা ব্যাপারের শেষ যে কিরূপ ও কতদূর, কে জানে? এক্ষণ দেশোদ্ধারকারী নেতারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া বিরাট সভা করিয়া বর্জ্জন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদের বিরাট উদ্যোগে পল্লীনিবাসী ছেলে বুড় সকলেই মত্ত হইয়া উঠিতেছেন।

দেশোদ্ধারকারিগণ স্বদেশের উদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লাগিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্য জাতির চিরন্তন অমূল্য সম্পত্তি আধ্যাত্মিকতা, সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া লোকের মনে বিশেষতঃ বালক বালিকাদের অন্তরে বাহ্যিক ভাব প্রবল করিয়া তুলিতেছেন, চিন্ময় পরমেশ্বরের উপাসনার পরিবর্ত্তে জড়োপাসনা, বিনয় শিষ্টতার পরিবর্ত্তে, অবিনয় অশিষ্টতা, গুরুজনভক্তি ও রাজভক্তির পরিবর্ত্তে, গুরুজনের অবাধ্যতা ও রাজবিদ্রোহিতা, সদ্ভাব সম্মিলনের পরিবর্ত্তে হিংসা দ্বেষ অসদ্ভাব ও অসম্মিলন, কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাদের দেশোদ্ধারের এই উপায়। এরূপ সম্পূর্ণ বহির্মুখীন ভাব এদেশের লোকের কখনও ছিল না। যদি আত্মা বিনষ্ট হয় তবে কতকগুলি স্বদেশী কাপড় বা অন্য কয়েক প্রকার দেশী খাওয়া পরার জিনিষের উন্নতি দেখিয়া কি হইবে? বাইবেল শাস্ত্র বলেন, "যদি আত্মা বিনষ্ট হয় তবে সমস্ত পৃথিবী লইয়া কি উপকার, পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে যাহা আত্মার বিনিময়ে প্রদান করা যায়।" স্বরাজ হইয়া রাজ্যশাসন করিয়া এদেশকে উদ্ধার করিব অনেকের এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। ইংরাজ শাসনের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের শাসন হইলে প্রজাদের তো দুঃখের সীমা থাকিবে না। ঈশ্বর করুন আমাদের ন্যায় প্রজাদের ভাগ্যে তাহা যেন না ঘটে।

মাসিক পত্রিকা গৃহলক্ষ্মী।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শান্তিময়ী সেন কর্ত্তৃক গৃহলক্ষ্মী সম্পাদিত হইতেছে। আমরা গৃহলক্ষ্মীর প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। গত আষাঢ় মাসে ১০ম সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। এই পত্রিকা স্মল পাইকা অক্ষরে ডিমাই ৮ পেজী কাগজে দুই ফরমায় পূর্ণ। ইহা

৩নং ফরিয়া পুকুর লেনস্থ ইলিসিয়ম যন্ত্রে মুদ্রিত। আষাঢ় মাসের গৃহলক্ষ্মীতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আছে; কামনা, শিক্ষা, ভ্রমণকাহিনী, সুখী, সুখের মরণ, বীরবলকাহিনী, এঁচড়ের নিরামিষ চপ, আসি যায়, সমালোচনা।

শান্তিময়ী একজন সুলেখিকা, কিছুকাল পূর্ব্বে মহিলাতে তাঁহার রচিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে দায়িত্বের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাহাতে কৃতকার্য্য হউন। এক্ষণ যেমন অনেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদিকা কতকগুলি অসার উপন্যাস গল্প দ্বারা দায়িত্ববিহীন ভাবে পত্রিকা পূর্ণ করিয়া থাকেন, আমরা ভরসা করি শান্তিময়ী দ্বারা সেরূপ হইবে না। তিনি নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া চিন্তাশীল অন্তরে গৃহলক্ষ্মীর সমুদায় লেখার যোজনা করিবেন। গৃহলক্ষ্মী প্রতি গৃহে প্রতিপরিবারে সমাদৃত হউক।

সংবাদ।

স্বর্গগতা প্রসন্নতারা প্রাতঃকালে লণ্ডন নগর হইতে কয়েক দিনের জন্য স্বামী কে, জি গুপ্তসহ অন্যত্র বেড়াইতে যাইবেন স্থির করিয়া পূর্ব্ব রাত্রিতে সঙ্গে লইয়া যাইবার জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইতে ছিলেন। এমন সময় শরীর অস্থির হইয়া পড়ে, তিনি শয্যা আশ্রয় করেন। তখন রাত্রি ১১ বা ১১॥টা। কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্র গৃহে ছিল। তাহাকে ডাক্তারের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডাক্তার আসিয়া দেখেন জীবন শেষ। মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্ব্বে তিনি ১০।১২ প্রকারের বাঙ্গলা দেশের ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া কয়েক জন বন্ধুকে ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রসন্নতারা ১৫ই আগষ্ট ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন আমরা কে, জি, গুপ্ত হইতে তাঁহার ১৪ই তারিখের পত্রে জানিতে পাই, তাঁহারা সকলে ভাল আছেন। মৃত্যুসংবাদ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে টেলিগ্রাফযোগে পঁহুছে। তাহার পর ২।৩ সপ্তাহ ক্রমে "আমরা ভাল আছি" বলিয়া প্রসন্নতারার স্বহস্তে লিখিত পত্র পাওয়া গিয়াছে। মানবজীবন এক বিচিত্র প্রহেলিকা। প্রসন্নতারার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে বহু বাঙ্গালী ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ যোগদান করিয়াছিলেন। শব কফিণে পুরিয়া শবদাহক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শবসহ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টার কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ শশধর হালদার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃতদেহ যন্ত্রবিশেষে স্থাপন পূর্ব্বক বৈদ্যুতিক উত্তাপে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শব দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে উক্ত শ্মশানক্ষেত্রে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। এই পারলৌকি ক্রিয়ার বিবরণ বিলাতের বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গম্ভীর ভাবে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর আমেরিকাতে বাস করিয়া আমাদের একজন আত্মীয় যুবা সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তথায় কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে স্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হওয়া

গেল যে আমেরিকায় ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারাও স্বহস্তে প্রায় সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করেন, রন্ধনাদি করিয়া থাকেন। চাকর চাকরাণীর উপর বড় একটা নির্ভর করেন না। সাধারণতঃ বিলাতের বিবীদিগের প্রকৃতি উহার বিপরীত। তাঁহারা কিছু অধিক সৌখিন। এখানে অনেক নব্য শ্রেণীর মেয়েরও সেইরূপ শিক্ষা হয়। কোন্ পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন ? কয়টী কন্যা সুগৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষিত হইতেছেন ? তাঁহাদের সৌখিন শিক্ষাই অধিক হয়। সৌখিন শিক্ষা দান করিয়া কন্যার সৌখিন জীবনগঠনের জন্য অনেক পিতামাতা বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। সেই কন্যার জীবন জগতের কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না, তাঁহার উচ্চ চিন্তা আত্মদৃষ্টি হয় না, তাঁহার সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ ধরা যাইতেছে না। মেয়েরা সুগৃহিণী, সুমাতা ও সুপত্নী হইবার জন্য শিক্ষা পাইলে তাঁহাদের জীবন অনেক কার্য্যকর হয়।

চরমপন্থী স্বদেশী দলের নেতা ও প্রধান বক্তা বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি কিছু কাল ফ্রান্সে জীবন যাপন করিবেন। অনেকে বলেন এখন এখানে বেগতিক দেখিয়া তিনি হঠাৎ সরিয়া পড়িয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ৬ মাস কারাগারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। আবার কখন কি বিপদ্ ঘটে কে বলিতে পারে ?

মান্দ্রাজের চিদাম্বর পিল্লেনামক এক জন স্বদেশী বক্তা, "তোমরা ইংরাজদের দোকান হইতে কিছু খরিদ করিও না তাহা হইলেই তাহারা আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।" বক্তৃতায় এই ভাবে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। গুরুতর দণ্ড ! অন্যতর বক্তা, "তোমরা থু থু ফেলিলে ইংরাজ ভসিয়া যাইবে" ইত্যাদি কি কি বলিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি ৭বৎসরের জন্য কারাবাসের হুকুম হইয়াছে, আর একজনের বক্তৃতায় রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ পাওয়াতে তিনি ৫ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। বম্বের বালগঙ্গাধর তিলক যে ৭ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বিলাতে আপিল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। রাজবিদ্রোহিতা প্রকাশজন্য গভর্ণমেণ্ট এদেশের অনেকগুলি সংবাদ পত্র এবং তৎ সংক্রান্ত মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সীমা তক্রম ও একান্ত আতিশয্যের এই ফল।

বোমা মকদ্দমার যুবক আসামী কানাইলাল দত্ত পিস্তলের গুলিতে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের সাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীকে বধ করিয়াছে। তজ্জন্য কানাইলালের প্রতি ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

—

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

ইচ্ছাশক্তি।

দ্বাদশ ভাগ, ২৭৭পৃষ্ঠার পর।

শিশু যত চলিয়া বেড়াইবে যত জিনিষ পত্র স্পর্শ করিবে এমন কি যত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিবে ততই ভাল,ততই তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, এবং পরে বস্তু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভের পক্ষে সহজ হইবে। যদি একজন শিশুকে কেবল এক জায়গায় বসাইয়া রাখিয়া দেখিতে দেওয়া হয় তবে সে কোন বিষয়েই একটা জ্ঞান পাইতে পারে না কেবল কতগুলি ছবির মত ছায়া ছায়া জিনিষের ভাব তার মনে থাকে। যথার্থ জিনিষের জ্ঞান বেশীর ভাগ স্পর্শ শক্তি দ্বারাই লাভ করা হয়।

তৃতীয় বুদ্ধি, কেবল যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কতগুলি জিনিষ স্পর্শ করিলাম দর্শন করিলাম এবং স্মৃতি দ্বারা সে গুলির ভাব পার্থক্য জ্ঞান করিয়া রাখিলাম তাহা হইলেও হইল না, বস্তু বিষয় পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এ দুটী জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আবার বুদ্ধি চাই। স্মৃতি দ্বারা যে একটা মোটামুটী জ্ঞান পাওয়া গেল, সেইটা আবার বুদ্ধি প্রয়োগে পরিস্কার রূপে অনুভব হয়। বুদ্ধি শক্তি যত প্রয়োগ করা হয় ততই একটী জিনিষের বিষয়ে ভাল রূপে বুঝিতে পারা যায়।

বুদ্ধি দ্বারাই কোন জিনিষের জ্ঞান স্পষ্টরূপে একটীর পর একটী করিয়া জানা যায়।

ছোটদের স্বাভাবিক একটা জানবার পিপাসা আছে। কিছু দেখিলেই এটা কি ওটা কি এরূপ জিজ্ঞাসা করে; শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পিপাসাও বাড়িতে থাকে, এবং ঐ অভ্যাস দ্বারাই পরে সে সকল বিষয় আরও করিতে চায়। যে শিশুর ঐ রূপ জ্ঞান পিপাসা যত বেশী সেই ভাল। স্বাভাবিক যদি কোন ছেলের ঐ রূপ জ্ঞানের পিপাসা না থাকে তবে তাহার সম্মুখে এমন সব জিনিষ রাখা উচিত যাহা দ্বারা তাহাদের জানিবার ইচ্ছা খুলিয়া যায়। এই রূপে যদি ছোট বেলায় সমস্ত জিনিষের বিষয় তাহারা এক একটা জ্ঞান লাভ না করান হয় তবে বড় হইলে তাহারা যে অজ্ঞ থাকে সেটা তাহাদের দোষ নয় অভিভাবকদিগেরই দোষ।

বস্তু জ্ঞান বিষয়ে বলিতে গিয়া প্রথম বলা হইল বস্তু কয় প্রকার। দ্বিতীয় কিরূপে বস্তুর পার্থক্য চিনিতে পারা যায়। তৃতীয় এই সকল বস্তুর বিষয় কিরূপে জানা যায়। তিনটী সমান শক্তি যেমন ইন্দ্রিয়শক্তি স্মৃতি ও বুদ্ধি এবং যদি কোনটার অভাব হয় তবে বস্তু সম্বন্ধে ঠিক্ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। কোন বিষয়েই ভাল জানিতে পারে না। তিনটী শক্তি সমান ভাবে প্রয়োগ না করিলে যে একটা বস্তুর বিষয় ঠিক জ্ঞান পাওয়া যায় না এবিষয় একটী গল্প আছে। "একটীস্কুলে তিন রকমের ছেলে পড়িত, একজন ইংরেজ একজন ফরাসি ও একজন জার্ম্মাণ, একদিন এই তিনজনকে ১টা উটের বিষয় রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়া ছিল। তাহারা কেহ কখনই উট দেখে নাই সুতরাং যে ইংরেজ বালক সে জুওলজিকেল গার্ডেনে গিয়া একটা উট দেখিয়া আসিয়া তার যে ভাব মনে হইল তাই লিখিল। আর ফরাসি বালক অতকষ্ট করে আর উট দেখিতে গেল না।" সে লাইব্রেরীতে গিয়া অনেক বই পড়িয়া তার ভিতর উটের বিষয় যে যা লিখিয়াছিল সেইগুলি লিখিয়া রাখিল। আর তৃতীয় জার্ম্মাণ বালক সে উটও দেখিতে গেল না এবং বইও পড়িল না,তার নিজের মনে যা আসিল তাই লিখিয়া

লইয়া গেল”। এদের ভিতর কার কিরূপ রচনা হইয়াছিল সে বিষয় বিচার করিতে চাই না, তবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে কাহার রচনাতেই উটের বিষয় স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় নাই।

ইন্দ্রিয় অনুভব স্মৃতি ও বুদ্ধি এই তিনটা সমান ভাবে চালিত না হইলে কোনই জ্ঞান হয় না। প্রথম সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সেই বস্তুকে অনুভব করিতে হইবে, তার পর তার বিষয় নিজের স্মৃতি ও অন্যান্যের স্মৃতি লইতে হইবে, অবশেষে নিজের বুদ্ধি দ্বারা সেগুলি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। একটা বস্তুর জ্ঞান বলিলে কি বুঝায় বাস্তবিক আমরা বস্তু সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ করি, এটা একটু গভীর বুঝিবার বিষয়। বাস্তবিক বস্তুটা কি? কোন জিনিষের যে রং দেখ বাস্তবিক কোন জিনিষের রং নাই, সূর্য্যের আলো জিনিষের উপর পড়িয়া আন্দোলিত হইয়া চোকের ভিতর স্নায়ুতে আঘাত করে, সেই স্নায়ুর আঘাত অনুসারেই লাল নীল সবুজ প্রভৃতি রং দেখা যায়। এমন লোক আছেন যাহাদের চক্ষুর লাল রং ধরবার ক্ষমতা নাই, তাহারা আর লাল দেখিতে পায় না সেস্থানে নীল কিংবা সবুজ দেখে। সুতরাং রং কোন বস্তুতে নাই চক্ষুর ভিতরের আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারাই আমরা রং দেখি। যদি চোক না থাকিত, তাহা হইলে কি রং থাকিত? রং এর স্থায়িত্বও চক্ষুর সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। চোকই রং দেখে সুতরাং তাহা যদি না থাকে তবে আর রং থাকিবে কি প্রকারে? যদি মানুষের জ্ঞান না থাকে, অর্থাৎ রং বুঝিবার জন্য যদি কিছু না থাকে তাহা হইলে রংও থাকে না।

সেই রূপ একটা জিনিষ ভারি, তাহা তুলিতে একজনের খুব পরিশ্রম হয় কিন্তু আর একজন অনায়াসেই তুলিতে পারে কোন জিনিষ কত ভারি, তাহাও শরীরের মাংসপেশীর বল অনুসারে নিরূপিত হয়। তবে ভারীত্ব ও লঘুত্ব সবই মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যদি ভারি অথবা ইহা বিচার করিবার অর্থাৎ ইহা জানিবার লোক না থাকে তাহা হইলে উহাও থাকিতে পারে না। সুতরাং বস্তুর সমস্ত গুণই মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মানুষের ইন্দ্রিয়াদি যে নিয়মে গঠিত সেই নিয়ম অনুসারে বস্তুর বিষয় যে প্রকার জানা যায় তাহাকেই বস্তুর গুণ বলা হয়। তবে বাস্তবিক জিনিষটা কি? মূলতঃ বস্তুগুলি কি? যেমন দার্শনিক একটুকরা খড়ি লইয়া বলিলেন এটা সাদা, শক্ত জিনিষ, কিন্তু সেই এটা জিনিষটা কি? কোনটা এ বিষয় যত দেখা যায় ততই রহস্যময়। বাস্তবিকই ইহা একটা রহস্যময় ব্যাপার। এটার মানে শক্তি। সমস্ত বস্তুর মূলে কেবল শক্তি। এই সমস্ত জগতের মধ্যে যে শক্তি ইহা কেবল তাঁহারই শক্তি। বাস্তবিক এই জড়শক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া। এই শক্তি চৈতন্যময় না অচেতন এই শক্তির কার্য্য ও নিয়ম দেখিলে কিছুতেই ইহাকে অচেতন শক্তি বলা যায় না। যিনি এই সমস্ত শক্তির আদিশক্তি যিনি জগতের মধ্যে এই সব শক্তি সমষ্টিকে দিবা রাত্র নিয়মিত ভাবে চালাইতেছেন, তিনি কি আশ্চার্য্য জ্ঞানময়। ও এই যে শক্তি যাহা জগতে আছে বস্তু বিজ্ঞান বলে সেটা জ্ঞানময় শক্তি।

যেটাকে বলি বাস্তবিক তাহা একটা শক্তি যাহা ফুরাইয়া যায় না এবং যাহার ভিতর একটা আশ্চয্য জ্ঞানময় শক্তি নিহিত থাকিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। আর এই জানা অর্থাৎ বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য তাহাও ঐ শক্তি হইতেই উঠিতেছে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] আশ্বিন ১৩১৫ ; অক্টোবর ১৯০৮। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রী-নীতিসার।

প্রায় প্রত্যেক পরিবারে শাশুড়ী বধূর মধ্যে কোন না কোনরূপ অসম্মিলন ও বিবাদ কলহ দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর শাশুড়ী আছেন যে, বধূর উপর একান্ত আধিপত্য করিয়া থাকেন, তিনি পুত্রের বিবাহান্তে বধূকে গৃহে আনয়ন করিয়া মনে করেন সেবা পরিচর্যা করিবার জন্য চির জীবনের নিমিত্ত একটী দাসী খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। সেবার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হইলেই বালিকা বধূর প্রতি ও তিনি কঠোর শাসন করেন, কটূকাটব্য করিয়া থাকেন, লোকের নিকটে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়ান, বধূ তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণে মর্ম্মাহত হন। মুখ ফুটিয়া তাঁহার একটী কথা কহিবার সাধ্য নাই ; তিনি সর্ব্বদা মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকেন। শাশুড়ীর প্রতি তাঁহার আর শ্রদ্ধা ভক্তি কিরূপে হইবে? স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি জননীর অপ্রেম ও অস্নেহ দেখিয়া পুত্রও বিরক্ত হইয়া উঠেন, তাহাতে অনেক সময় মাকে দুই কথা শুনাইয়া দেন। এইরূপ অশান্তিময় পরিবারে সুখশান্তি কোথায়!

আর এক শ্রেণীর শাশুড়ী ও বধূ আছেন, তাঁহারা ঠিক বিপরীত। বধূ শ্বশ্রূমাতার উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। নিরীহ স্বামীর অনুচিত আদর পাইয়া বধূ অতিশয় প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছেন। বধূর ভয়ে শাশুড়ী তটস্থ। তিনি বধূর সেবায় নিয়ত নিযুক্ত ; রন্ধন পরিবেশন করিয়া তাহাকে সযত্নে ভোজন করাইয়া থাকেন। তিনি বধূর প্রসন্নতার ভিখারিণী। তাঁহার প্রতি বধূর শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই নাই। এইরূপ অস্বাভাবিক বিসদৃশ দৃশ্য অনেক পরিবারে দেখা যায়।

বধূ শাশুড়ীকে পরম গুরু জানিয়া মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেন, সযত্নে তাঁহার সেবা করিবেন, এবং চিরকাল তাঁহার বাধ্য থাকিবেন।" শাশুড়ী বধূকে নিজ কন্যার ন্যায় আদর স্নেহ করিবেন, তাঁহার দুঃখ ক্লেশে সহানুভূতি করিবেন, তাহাকে মিষ্ট কথা বলিবেন। ইহাই স্বাভাবিক।

মাতৃশিক্ষা।

সাধারণতঃ মাতৃশিক্ষার অর্থ ধাতৃশিক্ষার এক অংশ বুঝায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ কোন বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই। মাতার কিরূপ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন, অথবা কোন্ কোন্ বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিলে সুমাতা হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয়ের কিছু আলোচনা করাই এখনকার উদ্দেশ্য। একটা প্রসঙ্গচ্ছলে সক্রেটীস বলিয়া ছিলেন যে, যদি এরূপ দুইটি যুবককে শিক্ষা দান করিতে ভার প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহার একটি ভবিষ্যতে স্বচ্ছল সুগৃহস্থ নগরবাসী ভদ্রলোক হইবে ও অপর দেশশাসনের ভার প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত যুবককে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় যুবককে সকল প্রকার সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শারীরিক কষ্ট, উপবাস, দারিদ্র্য ইত্যাদি সহ্য করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বাস্তবিক ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যত উচ্চস্থানে স্থাপিত তাহাকে তত কঠিন বিষয় সকল আয়ত্ত করিতে হয়। পরিবারের মধ্যে মাতার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। এজন্য মাতৃশিক্ষাও অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য। যদি মাতার শিক্ষা উপযুক্তরূপ না হয়, ভবিষ্যতে যাঁহাকে মাতা হইতে হইবে তাহাকে জ্যোতিশশাস্ত্রের বা যুদ্ধ বিদ্যার পণ্ডিতা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা সংসারের ঘোর অনিষ্ট হইবে। এবিষয়ে অত্যন্ত ভুল সংস্কার আছে। তাঁহারা মনে করেন সৃষ্টির নিয়মে নারী যেমন সময়ে মাতা হন, তেমনই স্বভাবেই তাঁহাকে সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দেন। ফলে এবিষয়ে মিথ্যা সংস্কার অনেকের মনে এত বদ্ধমূল যে, তাঁহারা মনে করেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা নারীকে যে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহাকে সে বিষয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তিনি দিবেন, আর নারী-স্বভাবের ভিতরে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সকল গুণ রাখেন নাই, বা অত্যন্ত অল্প দিয়াছেন সেইগুলি প্রদান করা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করা পৃথিবীর শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বাস্তবিক মনুষ্য-সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও রীতি তাহা নয়। কাঠগোলাপত সুগন্ধ ও সুন্দর পুষ্প, স্বভাব আমাদিগকে ইহা দিয়াছেন। এখন ইহার উন্নতি-সাধন করিতে ইহার অভাবের দিকে দৃষ্টি পড়ে। গোলাপ এমন সুন্দর ফুল, অথচ বড় ছোট. ইহার পাঁপড়ি বড় অল্প, গন্ধও তত উত্তম নয়. ইহার উন্নতি সাধন করিতে ইহার গন্ধ আকৃতি বর্ণ ইত্যাদির উন্নতির চেষ্টাই করা হইয়াছে, এবং সেই দিকেই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করা হইয়াছে. কিন্তু গোলাপ ফুলে, শরীর রক্ষার উপযোগী অংশ নাই। গোলাপ গোধূমের ও তণ্ডুলের কার্য্য করিবে সেরূপ উদ্দেশ্যে কেহ গোলাপের উৎকর্ষ সাধন করিতে চেষ্টা করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদান কার্য্যটি কেবল স্বভাবকে সাহায্য করা। এখানে ভগবান মানুষের

সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করেন। শিক্ষা কার্য্য যাহা যাহার পক্ষে উপযোগী সে তাহা অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া গ্রহণ করে। এরূপ স্বভাবের ইঙ্গিত অনুসারে শিক্ষা দান করা হইলে যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে তাহার ভিতরের লুক্কায়িত শক্তি সকল প্রকাশিত হয় ও সমস্ত শরীর মন আত্মার শক্তি বৃত্তি প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। শিক্ষ বিষয়ে একথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে রূপ শিক্ষাতে সমস্ত প্রকৃতি প্রসন্ন হয় না, স্বভাবের পূর্ণতা সাধন হয় না সেরূপ শিক্ষা সুশিক্ষা নহে। নারী-শিক্ষাসম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে দুইটি ভ্রান্ত মত প্রবল আছে, তাহার একটি এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা যেন মনে করেন যে নারীকে শিক্ষাদিয়া পুরুষ প্রস্তুত করাই লক্ষ্য, নারী যদি পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উচ্চস্থান লাভ করে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হয়, আফিসের কার্য্য করিতে পারে, পুরুষের মত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে যদি রাজকীয় বিষয়ে আন্দোলন করিতে পারে ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারে তবেই তাহার যাহা উন্নতি হইবার তাহা হইল। এদিকে যদি তাহার নারী-স্বভাবসুলভ কোমলতা, ধৈর্য্য সেবা-পরায়ণতা, ধৈর্য্য, শ্রী, লজ্জা, বিনয়, প্রেম এসকল চলিয়া যায়, যদি তাহার সন্তান না হয়, বা সন্তান হইয়া যদি স্তন্য না পায়, যদি সন্তান মাতার কার্য্যের ব্যস্ততা ও মনের কঠোরতার জন্য দাস দাসীকেই আপনার করিয়া লয় সেদিক তাঁহারা দেখিতে প্রস্তুত নহেন, অথবা মনে করেন সময়ে এসকল দোষ চলিয়া যাইবে। অপর শ্রেণীর লোক মাতৃজাতির শিক্ষার অভাবই অনুভব করেন না। তাঁহারা হয়ত মনে করেন স্বভাবের কার্য্য স্বভাব নির্ব্বাহ করিবে সে বিষয়ে মানুষের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় যে, মনুষ্য সকল বিষয়েই শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা নিপুণতালাভ করে। যেমন শকট চালাইতে বা নৌকা চালাইতে শিক্ষা করিতে হয়, তেমনই সন্তান লালনপালন করিতে ও শিশু-চরিত্র গঠন করিতে মনুষ্যকে শিক্ষা করিতে হয়। আজ কাল সকল বিষয়েরই আলোচনা হইতেছে ও সকল বিষয়েই সত্য বা নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিজ্ঞান হইতেছে। যদিও রেলগাড়ী বা পুল নির্ম্মাণের বিদ্যার মত শিশু পালন ও শিশুশিক্ষার নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে মানুষের জ্ঞানের আয়ত্ত হয় নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এবিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক সত্য শিক্ষা করা হইয়াছে ও যে মাতা সে সকল শিক্ষা করেন নাই তাঁহার হস্তে শিশুর শরীর ও নিরাপদ নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। নারীর শিক্ষার প্রয়োজন, এবিষয় কাহারও ভিন্নমত হওয়া উচিত নয়। তবে শিক্ষাবিষয়ে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে শিক্ষার বিষয় স্থির করিতে হয়। নারী-জন সমাজের একঅঙ্গ, একব্যক্তি, অহার

সংসারের উপযোগী জ্ঞান লাভকরা প্রয়োজন। যদি এরূপ অবস্থায় পতিত হয় আপনার পরিশ্রমে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তবে তাহার উপযোগী শিক্ষাও করিতে হইবে। সমাজের বা দেশের অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন পার্ব্বত্য দেশে বাস করিতে হইলে তাহার উপযোগী বা জনপূর্ণ দেশে বাস করিলে তাহার উপযোগী কিছু শিক্ষা হওয়া চাই। আমরা যে মাতৃশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত সে বিষয় কি কি শিক্ষা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে এই বলিতে হয় যে যেমন একটা বয়স আছে যতদিন পর্য্যন্ত (সাধারণ ৮। ৯ মাস পর্য্যন্ত) শিশুর পক্ষে মাতার স্তনই সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট আহার, তেমনই মাতার স্বভাব ও শিক্ষা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে, অনুমান পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মাতাই তাহার জ্ঞান, নীতি, ব্যায়াম স্বাস্থ্য-রক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন। যদি জিজ্ঞাসা কর মাতাকে তবে কি কি বিষয় শিক্ষা দিব! ইহার একমাত্র উত্তর এই শিশুর নিকট যাহা পাইতে চাও। যদি মাতাকে প্রেম, সুকোমল ব্যবহার, অক্রোধ, সকল জীবে দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, অধ্যবসায়, শিক্ষণীয়তা, নিপুণতা, ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস, প্রার্থনা-শীতলতা, নির্ভর, প্রসন্নতা, পরিচ্ছন্নতা, বাধ্যতা ইত্যাদি শিক্ষাদেও দেখিবে যে সে মাতার সন্তান এসকলগুণ মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিবে। যে বীজক্ষেত্রে বপন কর নাই সে বৃক্ষও তাহার ফল তুমি যেমন সেই ক্ষেত্র হইতে আশা কর না তেমনই মাতাকে যে বিষয় শিক্ষা দেও নাই সন্তানে তাহা পাইতে আশা করিতে পারে না। যদি সুসন্তান চাও তবে সুমাতা প্রস্তুত কর, মাতৃশিক্ষা, কিরূপ হওয়া উচিত এবিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া তারপর ভবিষ্যতে যাহারা মাতা হইবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।

কেশব জননী সাধ্বী সারদা দেবী।

(১২শ পৃষ্ঠার পর হইতে)

১৭ই নবেম্বর ১৮৯৩।

তীর্থ ভ্রমণ—কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্যাচল।

কাশী যাইব বড় আহ্লাদ হইল, আমার ভাশুর প্রায় সমস্ত খরচ দিলেন। আমার সঙ্গে দরোয়ান চাকর ও চাকরাণী গিয়াছিল। তিনি সঙ্গে আরও দুই একজনকে দিলেন। এখান থেকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে গেলাম, তার পর ডাকগাড়ীতে কাশী ও প্রয়াগ ভ্রমণ করিলাম; প্রয়াগ হইতে নৌকা করিয়া বিন্ধ্যাচলে গেলাম। সেই সময় রাণীগঞ্জের ওদিকে আর রেল গাড়ী ছিল না। মাস কএক পর বাড়ীতে ফিরিলাম। কয়েক বৎসর পর আমার বড় জা বৃন্দাবন যাইবেন ঠিক করিলেন। আমারও সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা হইল, আমার ভাশুরও মত দিলেন। কিন্তু আমার জায় মত হইল না, সুতরাং সেই

সঙ্গে আমার যাওয়া হইল না। ফিরে বৎসর আমি পুনরায় যাইতে চাহিলাম। পূজার ছুটী হল, নবীন আমায় সঙ্গে লইয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। ভাশুরের নিকট খরচ চাহিলাম, তিনি যাহা দিলেন অতি সামান্য। নবীন ফিরাইয়া দিলেন। নবীনের এই কার্য্যে আমার মত ছিল না। কারণ তাহাতে ভাশুরের অপমান হইবার সম্ভাবনা ছিল। নবীন নিজে খরচ করিয়া আমায় লইয়া গেলেন। সেই বার আগ্রা অবধি রেল হইয়াছিল। প্রথম কাশীতে গেলাম। সেইখানে ১৫ দিন ছিলাম। অষ্টমীর দিন পূজার ফল ছাড়াইবার সময় হঠাৎ আমার ডান পা ধরিয়া গেল, আমার চলৎশক্তি রহিত হইল। আমাকে ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। আমার পায়েতে ৯টা জোঁক লাগান হইল। তারপরদিন পা একটু হালকি হইল। অষুধ ইত্যাদি খাওয়ার পর একটু ভাল হইলেই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কাশী হইতে আগ্রা গেলাম। কাশী হইতে নবীন পাল্কী করিয়া আগে চলিয়া গেলেন, তারপর আমি উটের গাড়ী করিয়া আগ্রা হইতে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। দুর্ঘটনা—উটের গাড়ী তিনতলা এবং ভয়ানক দোলে, সমস্ত রাত্রি চলার পর ভোরের সময় সমস্ত গাড়ী উল্টে পড়িয়া গেল। গাড়ীতে প্রায় আমরা ১০। ১২ জন ছিলাম, এবং অনেক জিনীষ ছিল যদিও আমরা রক্ষা পাইলাম, কিন্তু আমাদের পুরুতের মার জিভ্ বাহির হইয়া গিয়াছিল। তিনিও শেষে কোন রকমে রক্ষা পাইলেন। গাড়ী উল্টে যাওয়া যেমন ভয়ানক, গাড়ীর উঠা তদপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার। সেই বড় গাড়ী খানি খালি অবস্থায় তুলিতে গেলে প্রায় ১৫। ২০ জন লোকের দরকার হইত, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অতবড় গাড়ী খানি আর আমরা ১০। ১২ জন লোক এবং জিনিষ পত্র সহ হঠাৎ কে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু আমরা কেহ জানিতে কিম্বা দেখিতে পাইলাম না। সেই সময় রাস্তায় কোনও লোক ছিল না। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল সে বলিতে পারে না। সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, যাঁহাকে দেখিতে যাইব তিনিই তুলিয়া দিলেন। তার পরদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। বৃন্দাবন ও মথুরায় তিনমাস ছিলাম। এই তিন মাসের ভিতর মথুরা গোকুল শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া আমি মচ্ছোব দিলাম (মহোৎসব)। সেইবার আমি চতুর্মাসিক (চারিমাস অন্নত্যাগ) করিয়াছিলাম। রাধাকুণ্ডে যাইয়া সেই ব্রত উদযাপন করিয়া এক ভাতের মহোৎসব দিয়াছিলাম। এই ভাতের মহোৎসব এক চমৎকার ব্যাপার। কি যে আমোদ বলিতে পারি না। প্রত্যেক দেবালয়ে সিধে দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি বৈষ্টবেরা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিল। বৃন্দাবনে মহোৎসবের পর নবীন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কারণ ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছিল। রাধাকুণ্ডের মহোৎসবের পর যখন পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া

আসিয়া বাড়ী রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, তখন আমার বন দেখিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। শুধু একজন কুটুম্বের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বন দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। ব্রজবাসীরা আমায় ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল, নদী হাটিয়া পার হইবার সময় "মর্‌বে ভেসে যা'বে পড়িয়া পা ভাঙ্গিবে।" তবু আমি ভয় পাইলাম না। আমি বলিলাম, একবার বৈত দুইবার মৃত্যু হইবে না, আমি নিশ্চয়ই যাইব। তাহারা বলিল "তুমি মরিলে আমরা ব বুকে (নবীনকে) যাইয়া কি বলিব?" আমি বলিলাম "বলিও যে তোমার মার মৃত্যু হইয়াছে।" আমার এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ব্রজবাসীরা স্বীকৃত হইলে অনেক যাত্রী গেল না। শুধু আমরা ৭।৮ জন গেলাম। বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া তিন দিনের পর আমরা কাম্যবনে পৌছিলাম বনটী প্রায় ৯ ক্রোশ, দুই দিন উপবাসের পর এই ৯ ক্রোশ সেই দিনই আমি হাঁটিয়া পরিভ্রমণ করিলাম। কাম্যবন একটী গ্রাম, এই গ্রামটী একটী নদীর পারে স্থাপিত। আমরা যখন নদীর অপর পারে পৌছি তখন রাত্রি ৭।৮টা হইবে। সেখানে অত্যন্ত ডাকাতের ভয়। সেই জন্য অতি সাবধানে সেই অন্ধকার রাত্রে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া সরু পথে আমরা সেই নদীর পারে পৌছিলাম। অন্যান্য সকলে গাড়ী-শুদ্ধ নদী পার হইল। আমি ও চারিজনে হাঁটিয়া পার হইব স্থির করিলাম। ব্রজবাসী আগে আগে মশাল জ্বালাইয়া ও লাঠী ধরিয়া চলিল। তাহার পর আমরা চারিজনে প্রত্যেকের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া এই অন্ধকারময় রাত্রিতে বরফের মত ঠাণ্ডা নদীর বিপৎ পূর্ণ জলে আস্তে আস্তে নামিয়া পার হইলাম; পার হইয়া এক ব্রজবাসীর বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পরদিন ভোর ৪টায় বিমলাকুণ্ডের বরফের ন্যায় জলে ডুব দিয়া সেই ভিজা কাপড়েই বন পরিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই বনের ভিতর রাস্তায় আমরা স্থানে স্থানে যশোদাকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড ইত্যাদি অনেক কুণ্ড দেখিতে লাগিলাম। একটী একটী কুণ্ড পাইতাম তখনই আমি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া তাহাতে পড়িতাম, এবং ডুব দিয়া ভিজা কাপড়ে উঠিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিতাম। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই গ্রামের যত তীর্থ সব দেখিলাম। সন্ধ্যার সময় সেই গ্রাম ছাড়িয়া একটী স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। সেই দিন শুধু দৈ আর ছোলা ভাজা খাইয়া রহিলাম। তার পর দিন কোকিলবনে গেলাম। সেই বনের বড়ই শোভা, সমস্তই তমাল বন। আমার মার মুখে শুনিয়াছিলাম, তমাল বৃক্ষের ছালে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা আছে, আমার তাহা দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল। আমি একটী গাছের ছাল খুলিলাম। ছালের নীচে আমার মনে হইল কালির ভুষোতে দেব নাগরির মত লেখা রহিয়াছে। আমি ততটা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু যেন র এবং ধ এই দুইটী অক্ষর দেখিতে পাইলাম। সেই খানে এক সাধুর নিকট হইতে দুই কোষ

দোই খাইলাম, এবং তাঁহারই নিকট হইতে দুইটা মূলা চাহিয়া লইয়া খাইতে খাইতে চলিলাম। এইরূপ চলিতে চলিতে কোথাও একটী তেঁতুল গাছের তলা হইতে দুইটী তেঁতুল লইয়া তাহাই খাইতে খাইতে আবার চলিতে লাগিলাম, সেই দিন এই রূপেই কাটিল। এইরূপ উপোসের পর উপোস চলিতে লাগিল, কোনও ক্লান্তি কিম্বা খিদে বোধ ছিল না, দেখিবার আমোদে মত্ত ছিলাম। আমি এইরূপে দধিসাগর পবনসরোবর সান্তনকুণ্ড মান সরোবর কুসুম বন ইত্যাদি অনেক বন এবং কুণ্ড দর্শন করিলাম। ভাদ্র মাসে অনেক সময় যাত্রীরা ঠোঙ্গা পাইত। (বড় বড় পানের মত গাছের পাতা ঠোঙ্গার মত হয়ে টুপ্ টুপ্ করে পড়ে।) শুধু ভাদ্র মাসে ঐ সব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি যখন যাই তখন অগ্রাহয়ণ মাস, সেইজন্য আমার ঠোঙ্গা দেখিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেই দুঃখে আমি যখন ললিতাকুণ্ডের ধার দিয়া যাইতেছিলাম আমাদের ব্রজবাসীকে বলিলাম "আমার কপালে ঠোঙ্গা দেখা হইল না" এই কথা বলিতে না বলিতে হঠাৎ আমার সম্মুখে একটী ঠোঙ্গা টুপ্ করিয়া পড়িল। মহাবনের ভিতর আমি এইরূপ আর একটী পাইয়াছিলাম। সব শুদ্ধ দু'টী পাইয়া আমার যে কি আহ্লাদ হইল তাহা আর বলিতে পারি না। ক্রমশঃ—

সরলাসুন্দরী কাস্তগির।

দার্জ্জিলিঙ্গযাত্রিকের পত্র।

বত্রিশ বৎসর পরে সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গ গিয়াছিলাম। বত্রিশ বৎসর পরে ছোট ছোট পল্লীগ্রামও একটা নূতন আকার ধারণ করে, আর এতদিন পরে যে একটা পার্ব্বত্য ভূমি নূতন আকার ধারণ করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। যে দুর্গম পথ দিয়া তখন দার্জ্জিলিঙ্গ আসিতে হইত বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ্ লাইনের সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ষ্টীমার যোগে কারাগোলা পর্য্যন্ত আসিতে হইত। তাহার পর কারাগোলা হইতে গোযান অথবা অশ্বশকটে শিলিগুড়ি আসিতে হইত। দিন রাত্রি চলিয়া গোযানে শিলিগুড়ি আসিতে ১০।১১ দিন আর অশ্বশকটে ৪।৫ দিন লাগিত। Carrying Company নামক কোন বিশেষ কোম্পানি দার্জ্জিলিঙ্গ যাত্রীর জন্য এইরূপ যান পরিচালনের ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন। কারাগোলা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত পথে শকট বাহী গো ও অশ্ব মধ্যে মধ্যে বদলাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ আড্ডা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময়ে যাঁহারা এ পথে চলিয়াছেন পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। অনেক পথিককে অনেক সময়ে ব্যাঘ্র ও দস্যুর করাল গ্রাসে পড়িতে হইয়াছে। আমাদিগকেও সমগ্র পথ সেইরূপ ভয় লইয়া চলিতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই আমার সঙ্গে এক যবকবন্ধু সহযাত্রী হইয়া

চলিয়া ছিলেন। বন্ধু আমা অপেক্ষা অনেকটা সাহসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাহসেই আমার সাহস। উপরোক্ত পথে মহানন্দা নদীর দিংড়াঘাটা নামক স্থানে দস্যুর হাত হইতে এড়ান ও তেঁতুলিয়া নামক স্থানে বাঘের মুখ হইতে এড়ান বাস্তবিকই দার্জিলিঙ্গ যাত্রীর পক্ষে একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিঙ্গ পর্য্যন্ত ভীষণ অরণ্যানী ও গিরিসঙ্কট পূর্ণ পথের সে ভীষণ দৃশ্য এখনও স্মরণ পথে আসিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে থাকে। পদ-ব্রজে ও অশ্বারোহণে শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিঙ্গ যাইতে তিন দিন কাটিয়া গেল। যে শুকনায় এখন দার্জিলিঙ্গ রেলপথের দ্বিতীয় ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত। সেই শুকনার জঙ্গলের মধ্যে বন বিভাগের কোন কর্ম্মচারীর ক্ষুদ্র কাষ্ঠ প্রকোষ্টে এক রাত্রি কাটিয়া গেল। তার পর সেথাম হইতে অশ্বপৃষ্ঠে কর্শিয়ং যাইতে আরও একদিন লাগিল। আমরা যে সময় গিয়াছিলাম সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কর্শিয়ং গিরি-শ্রেণীতে উপস্থিত। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা ভীষণ তমসাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা দর্শন ও দুঃসহনীয় শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন সেখানে কেবল দুই জন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। একজন পোষ্টমাষ্টার ও আর একজন বিপণিরক্ষক। এই বিপণিতে সাহেবদের উপযোগী দ্রব্যাদিই বিক্রীত হইত। আমরা অজ্ঞাত কুলশীল হইলেও এই বিপণিরক্ষক আমাদিগকে সে রাত্রিতে খুব সমাদরে স্থান প্রদান করিলেন। সেই গিরি শ্রেণী পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য আলয়ে আমাদের প্রতি তাঁহার সে আতিথ্য সৎকার বড়ই সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল। রাত্রিতে আমরা যে প্রকোষ্ঠে ভোজন করিতে বসিয়াছিলাম সেই প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের বাহির হইতে একটা পোষিত কুকুর এক ভীষণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধৃত ও পাহাড়ের কোন নিভৃত অদৃশ্য স্থানে নীরবে ভক্ষিত হইল। তার পর দিন ভীষন কুজ্ঝটিকা ও বারি কণা পূর্ণ ঘন মেঘ ভেদ করিয়া অপরাহ্ণে আমরা দার্জিলিঙ্গ উপস্থিত হইলাম। ছয় মাস কাল আমরা দার্জিলিঙ্গে সুশীতল তুষার কুজ্ঝটিকা, স্তরীভূত মেঘ ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে প্রকৃতির নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কাটাইয়া দিলাম। তখন সে পাহাড়ে ৮।১০ জন মাত্র বাঙ্গালী আর সব প্রায়ই পাহাড়ী ও ইংরেজ। তখন সে পাহাড়ী জাতির মধ্যে রেল পথ ও বাষ্পীয় শকটের কোন জ্ঞানই ছিল না। তখন বাঙ্গালীর আলু ও অরহর দাইল চাউল ও আটা ভিন্ন আর কোন আহার্য্য মিলিত না। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মুখ খুব কমই দেখিতে পাইত। তখন বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর আতিথ্য বাঙ্গালীর এক প্রাণতা একাত্মতা ও এক হৃদয়তা বড়ই সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। এখনকার দার্জিলিঙ্গের সঙ্গে আর তখনকার দার্জিলিঙ্গের মিল হয় না। এক দিকে খুব উন্নতি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তখন বাঘ ভাল্লুক ও দস্যুর মুখের গ্রাস হইয়া দার্জিলিঙ্গের পথে ও পাহাড়ে

যাইতে হইয়াছিল, আর এখন শিয়ালদহে রেলগাড়িতে উঠিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে হিমালয়ের উচ্চ মঞ্চে যাওয়া সম্ভব হইতেছে। এ ব্যাপারে, বৃটিশ ভারতে ভগবানের হস্ত কেনা স্বীকার করিবে? তরঙ্গায়িত ঘূর্ণায়মান গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া ক্রমোন্নত তুষারাবৃত অভ্রভেদী ধবল গিরির সম্মুখে যে জাতি দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটকে উপস্থিত করিয়াছে সে জাতিকে কোন্ হৃদয় ধন্যবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? যে পাহাড়ে আলু ও অরহর দাইল খাইয়া বাঙ্গালী পাহাড়ী ও অন্যান্য ভারতীয় প্রবাসী ও অধিবাসীগণ দিন কাটাইত আজ সে পাহাড়ে অসময়েও কপি মটর, পটল বেগুণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও উৎকৃষ্ট মৎস্য পর্য্যন্তও অনায়াসে পাওয়া সম্ভব হইতেছে। এখন সে দার্জিলিঙ্গে কত ভাল ভাল লোক। এখন ইহাঁদের বহু যত্ন সম্ভূত, সুন্দর সুরক্ষিত স্বাস্থ্য-নিবাসে কত ভাল ভাল লোকের সমাগম হইতেছে। তখন বন বিভাগের ২। ৪ জন কর্ম্মচারী ও ২। ৪ জন বিপনি রক্ষক ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার বড় সম্ভাবনা ছিল না। সাহেবদের সম্বন্ধেও অনেকটা এইরূপ ছিল। বন বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী একজন ইংরাজ যিনি Conservator of forests বলিয়া আখ্যাত হইতেন তিনিই এক প্রকার সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পাহাড়ী লোকেরা তাঁহাকে জঙ্গলী লাট্ বলিত। তখন পাহাড়ীদের বড়ই সরল প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইত। এখন নানা জাতির সংঘর্ষণে তাহাদের সে সরল ও সুমধুর প্রকৃতি ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। ইংরাজ ও বাঙ্গালীর বিলাসিতা ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সে দিন বাজারের পথে দেখিলাম যে বাঙ্গালী ও পাহাড়ীর মধ্যে মল্ল যুদ্ধ চলিতেছে। এক সময়ে বাঙ্গালা যে চক্ষে সাহেবকে দেখিত পাহাড়ীও সেই চক্ষে বাঙ্গালীকে দেখিত। বাঙ্গালী ও পাহাড়ীর দ্বন্দ্ব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে জাতি স্বজাতির সঙ্গে এক পথে চলিতে শিখে নাই সে জাতি আবার "স্বরাজের" জন্য ব্যস্ত। নিম্ন ভূমি হইতে সমাগত বহু লোকের ঘন সন্নিবেশে সে কালের সে প্রাকৃতিক শোভার কথঞ্চিত হানি করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে পরিষ্কৃত দিনে তখনও যে উন্নত তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গে কাঞ্চন জঙ্ঘার অতুলনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম এখনও এক দিন অরুণোদয়ের অব্যবহিত পরে সেই প্রাণ-মন-হারী বিশ্ব বিধাতার অপার মহিমা প্রকাশক প্রাতঃরশ্মি প্রতিবিম্বিত তুষারাচ্ছন্ন গিরি শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। তখন যে প্রস্রবণের অসংখ্য অজস্র ধারা পাহাড়ের উচ্চতম প্রদেশ হইতে প্রস্তরাহত হইয়া সুমধুর শব্দ করিতে করিতে অলক্ষিত নিভৃত উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া প্রবাহিত হইতেছিল এখনও সেইরূপ ছুটিতেছে। এবার পাহাড়ে একটা যে সুন্দর ছবি দেখিয়া আসিলাম তাহা তখন দেখি নাই। প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতা-পূর্ণ প্রার্থনা ও অশ্রুপাত ভেদ করিয়া এ ছবি

প্রতিফলিত হইয়াছে। যোগী ঋষি, তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধ হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। এক দল নবীন বিশ্বাসী ভাই ভগ্নী সেখানে জুটিয়াছেন। এক দল নবীন তপস্বী তপস্বিনীর অভ্যুদয় হিমালয় ঘোষণা করিতেছেন। পাঠক ও পাঠিকাগণ! এ কোন্ দল তাহা কি তোমরা জান? যে নূতন ইস্রায়েল বংশের জন্য আমাদের নবীন যোগী নিভৃত হিমালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই হিমালয়ে সে দলের উত্থান। এই নূতন দলে এবার ভাদ্রোৎসব হইল। হিমালয়ে এ উৎসবে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ কুচবিহার মহারাণী মহাশয়া ভগবানের ইঙ্গিত দেখিয়া স্থানীয় ভাই ভগ্নী ও বিদেশ গত কয়েকটী ভাই ভগ্নীকে লইয়া বিধানপতির নামে প্রাণের গভীর আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ময়ুরভঞ্জ মহারাজ, শ্রদ্ধাস্পদা ময়ুরভঞ্জ মহারাণী, ভাই নির্ম্মলচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি শতাধিক ভাই ভগ্নী উপস্থিত। Rose Bank নামক স্থানে মহারাজা বর্দ্ধমানাধিপতির প্রশস্ত আলয়ে উৎসব হইল। এইখানে শ্রীআচার্য্যদেব এক সময়ে যোগসাধন করিয়াছেন, আর আচার্য্যের সেই যোগসিদ্ধ প্রার্থনাপূত স্থানে "ভাদ্রোৎসব" হইল। উৎসবের আনুষঙ্গিক মহারাজ ময়ুরভঞ্জ বাহাদুরের Sligo Hall আবাসে, ভাই নির্ম্মলচন্দ্রের Rotheiway আবাসের নূতন উপাসনা কুটীরে ও Mackenzie Roadএ সমাজ গৃহে ভাই ভগ্নীদিগের সম্মিলিত উপাসনা ক্ষেত্রেও এই নূতন ছবি দেখিতে পাইলাম। দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ের অনেক প্রকার নূতন নূতন ছবি বাজারে বিক্রীত হইতে দেখিলাম আর এখন এই এক নূতন ছবি তুলিবার সময় আসিয়াছে। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ কুচবিহার মহারাণী কর্ত্তৃক উৎসবের উপাসনায় আহূত হইয়া বিধানপতি বাস্তবিকই এক নূতন ছবি দেখাইলেন। ধন্য তাঁর লীলা। ধন্য সেই প্রাচীন হিমালয়! ধন্য নববিধান বিশ্বাসী ভাই ভগ্নীগণ!

পাঠক ও পাঠিকা ভাই ভগ্নীগণ! দার্জ্জিলিঙ্গে আর একটা যে সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম তাহার বিষয় একটু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ দৃশ্য যে কি তাহা তোমরা কি জান? পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আমাদের যে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী মিস্ পিগটের কথা আছে ইঁহাকেই সেখানে দেখিলাম। ভগিনী মিস্ পিগট্ যে এখনও জীবিত ও দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন তাহা জানিতাম না। আমাদিগের শ্রদ্ধেয়া মহারাণী কুচবিহারাধিশ্বরী তাঁহার কথা বলাতে ও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে পাহাড় হইতে নীচে নামিবার পূর্ব্ব দিন শ্রদ্ধাস্পদা মিস পিগটের সঙ্গে দেখা করিলাম। Birch Hill এর নিম্নে Rooks nest নামক পর্ব্বত প্রকোষ্ঠে প্রাচীনা ভগ্নী মিস্ পিগট বাস করিতেছেন। Rooks nest এ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে বৃদ্ধা মিস্ পিগট্ একাকিনী তপস্বিনীর ন্যায় সেই নিভৃত হিমালয়ের নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে

অনেক পারিবারিক আলাপ পরিচয়ের পর ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রী আচার্য্যদেব সম্বন্ধেও অনেক কথা বার্ত্তা হইল। শ্রদ্ধেয়া মহারাণী মহাশয়ার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শ্রী আচার্য্যদেবের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি Notes দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। ভগ্নী মিস্ পিগট্ তাহা খুব আহ্লাদের সহিত দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার যে তপস্বিনী মূর্ত্তি বড়ই ভাল লাগিল। তাঁহার দিকে যতবার তাকাইলাম তাঁহাকে সেই কুচবিহার বিবাহের Praying ও Kneeling Miss Pigot বলিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার মুখে সেই ক্রুশবাহী আচার্য্যদেবের উজ্জ্বল স্মৃতি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। তাই বলিতেছি দার্জ্জিলিঙ্গে আর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আসিলাম। ধন্য তিনি যিনি এ সেবককে এবার এসব সুন্দর দৃশ্য দেখাইলেন।

কুচবিহার } স্নেহের সেবক
১১।৯।০৮। } শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার

স্বর্গগতা সাধ্বী মুক্তকেশী দেবী

(৪৭ পৃষ্ঠার পর।)

অনেক সময় দেখিয়াছি, ছাত্রনিবাসের ছেলেদের খাবার কষ্ট হইতেছে শুনিলে, নিজে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। পরিচিত রোগীদের পথ্যাদি পাঠানোও তাঁর একটী বিশেষ আনন্দের কার্য্য ছিল।

তিনি পরদুঃখ কাতরতা দয়ার্দ্র হৃদয় নারী ছিলেন, পরের দুঃখ শুনিলে অর্থ ও সামর্থ দিয়া তাহার কষ্ট দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যদি অর্থ সামর্থ্যে না কুলাইত, অন্ততঃ! দুটী মিষ্ট কথা বলিয়াও সান্ত্বনা করিতেন। তিনি কখন ধনীর দ্বারে যাইতে চাহিতেন না কিন্তু দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। গরিব দুঃখী গৃহে আসিলে কখনও ফিরিত না, ভিক্ষা দিবার সুন্দর প্রণালী ছিল। একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "দেখ্ আমি যখন চলিয়া যাইব, তোরা খুব ভাল করিয়া গরিব দুঃখীদের খাওয়াস্, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব, গরীব দুঃখীদের খাওয়াইতে আমি বড় ভাল বাসি।" তাঁর অন্তরখানি স্নেহ মমতায় পূর্ণ ছিল, কেহ দোষ করিলেও কঠিন কথা বলিয়া তিরস্কার করিতে পারিতেন না।

নিজের সামর্থ্য থাকিতে কন্যা ও বধূদিগকে কোন পরিশ্রম জনক কার্য্য করিতে দিবেন না, এ বিষয়ে কেহ বলিলে, বলিতেন "আমার কাছে যে কয়দিন আছে আরামে থাকুক, এর পর নিজ নিজ সংসারে ত করিবেই"। নিজের সামর্থ্য থাকিতে কাহারও সাহায্য লইতেন না এবং বলিতেন আমি যেন কাহারও সাহায্য না লইয়াই চলিয়া যাইতে পারি। রোগের সময় তাঁর সে ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ হয় নাই। সে জন্য তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন "আমি তোমাদের কত কষ্টই দিয়াছি, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা যিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সেবায় শরীর মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন তার জন্য আমায় বলিয়াছেন "পালু" আমার জন্য

খেটে খেটে রোগা হইয়া গেল, আমি কত দিন তাকে এমন কষ্ট দিব জানি না।

দাস দাসীর উপরও তাঁর সদয় ব্যবহার ছিল, কাহাকেও কটু কথা বলেন নাই বরং যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেই দেখিয়াছি। বাঁকিপুরে থাকিতে তিনি ব্রাহ্মিকা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে রীতিমত উপাসনা করিতেন তিনি সুন্দর ভাব পূর্ণ উপাসনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাও বাহিরের বড় বড় কথা সাজাইয়া উপাসনা ভাল বাসিতেন না, অন্তর হইতে যে ভাল তরঙ্গ উঠে তাহাই সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। তিনি অল্প ভাষী ছিলেন, তাঁর উপাসনাও ভাবপূর্ণ, অল্প কথায় শেষ হইত। হাজারিবাগ উৎসবে একবার বহু সংখ্যক নারীদের লইয়া উপাসনা করিয়া সাধারণের নারীগণকে বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন উপাসনা গৃহে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকিতেন। দেরীতে উপাসনায় আসা পছন্দ করিতেন না। তাঁর শরীরে ক্রোধ ছিল না, ক্রোধের কারণ হইলে, রাগের পরিবর্ত্তে তাঁর দুঃখই হইত।

তাঁহার জীবনে অনেক পরীক্ষা আসিয়া ছিল, সকল পরীক্ষায় প্রকৃত বিশ্বাসির ন্যায় ধীর ভাবে বহন করিয়াছিলেন। চারিটী সুন্দর সুন্দর সন্তান সন্ততি অল্প কালের মধ্যেই যখন চলিয়া গেলেন ঈশ্বর কৃপায় তখনও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই।

যখন মেজ দাদা (ভুপেন্দ্র নাথ মজুমদার) চলিয়া গেলেন তখন হইতেই তাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু এক দিনের জন্যও নিজ কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। তিনি সন্তানদিগের সহিত যোগীযুক্ত ছিলেন তাই মেজদাদা ও দিদি (শ্রীমতী সরলা দেবী) চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে মেজদার প্রাণ বিয়োগ হয় সেই মুহূর্ত্তে তিনি টের পাইয়াছেন এবং তাঁর "মা" "মা" ডাক্ শুনিয়াছিলেন। মেজদাদা মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন, তিনি বলিতেন "আমাদের সৌভাগ্য যে এমন মা পাইয়াছিলাম, তাই পিতার কর্ম্ম ত্যাগেও দুঃখ জানিতে পাই নাই, এমন গুণের মা যদি না পাইতাম তাহলে কি দুর্দ্দশাই হইত"।

যখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র (প্রেমেন্দ্র নাথ) হঠাৎ চলিয়া গেলেন মাতৃ দেবীর ভগ্ন শরীর চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তখন একটী কন্যা পীড়িত থাকায়, সে শোকাহত শরীর লইয়া কেবল বিশ্বাসের বলে পীড়িত কন্যার সেবা করিতে এক দিনের জন্য অবহেলা করেন নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে সেই ভগ্ন শরীরে দিনরাত্রি তার আহার্য্য প্রস্তুত ও তাহার সেবা শুশ্রূষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আহা! এত সেবা শুশ্রূষা করিয়াও কন্যাটীকে বাঁচাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁর অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইল।

তিনি সময় সময় বলিতেন "ভূপেন আমায় ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে, পিমু আমায় চূর্ণ করিয়াছে, ভাগ্যিস্ এমন ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম, তাইত এত শোক দুঃখের বোঝা বহিতে পারিতেছি, এমন ধর্ম্ম যদি না পাইতাম তাহ'লে পাগল হইয়া যাইতাম"।

সম্পদের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রকৃত বৈরাগিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁর জীবনে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁর অন্তরে যাহা ছিল, বাহিরে প্রকাশ পাইত না কারণ তিনি নিজেকে সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন; সেজন্য বাহিরের লোকে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন নাই। প্রকৃতই তিনি একটী "দেবী" ছিলেন, সাধ্বী ছিলেন।

তিনি শেষ জীবনে কয়দিন রোগের যাতনায় বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন, সে কষ্টও অবাধে ভগবানের দিকে চাহিয়া সহ্য করিয়াছেন। এমন অসহ্য যন্ত্রণা তার ভিতরেও উপাসনায় যোগ দেওয়া এক দিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। যন্ত্রণায় আহত তার মধ্যে আরাধনা প্রার্থনা, নামপাঠ রীতিমত চলিয়াছে একটু ভুল পর্য্যন্ত হয় নাই, আশ্চর্য্য!

রোগশয্যায় দুই মাস কাল পড়িয়া ছিলেন, সে সময় সংসারের প্রায় কোন কথাই কহিলেন না কেবল হরিনমে করিয়াছেন। যখন যে গানের যে পদটী মনে আসিত আবৃত্তি করিতেন। "অনন্তের টানে অনন্তের পানে ধায় প্রাণ, নদী বাধা নাহি মানে বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে তাঁহারেই প্রাণ চায়।" এবং যদি বিষয়েতে সুখ হোত, তবে লালাজী (লালাবাবু) ফকির হত না। এই দুটী গান সর্ব্বদাই বলিতেন। একদিন বড়ই কষ্ট হচ্ছিল, বাবা বলিলেন "তুমি অমন করছ কেন? এই যে তোমার চারিদিকে ছেলে মেয়ে বউ সকলে ব'সে তোমার সেবা কর'ছেন" উত্তরে বলিলেন "ওসব ভোজের বাজী"। হরিনাম মা নাম ছাড়া মুখে অন্য কথা ছিল না। মৃত্যুর ৫।৬ দিন পূর্ব্বে এক দিন নিজে "হরিবোল হরি চল যাই বাড়ী" এই গানটী বলিতে ছিলেন দেখে অনেকে মিলে (সে দিন বিদেশের ৪।৫টী মেয়েও দেখিতে এসেছিলেন) ঐ গানটী গাওয়া হলে তিনি সেই সময় বসিয়া বেশ জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগ্‌লেন যখন "বাড়ী পানে মন ছুটেছে এখন মা, মা ব'লে ঘরে চল" এই পদটী গাওয়া হ'চ্ছিল তখন হঠাৎ মুখে এমন স্বর্গের সুন্দর হাসি দেখা গেল যেন কতই আনন্দ হইয়াছে।

উপাসনার দেরী হইয়া গেলে দুঃখিত হইতেন "ঠাণ্ডার সময় উপাসনা হইলে উপাসনা ভাল হয় গরমে কি আমি পারি? এইরূপ প্রায়ই বলিতেন।

শান্তি নিকেতনে যাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই বাবাকে বলিতেন "ওগো আমায় শান্তি নিকেতান নিয়ে চল"।

কিছু খাবে? জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "দূর তোদের এখানকার জিনিষ আমি আর খেতে চাই না, পৃথিবীর জিনিষে আর রুচি নাই"। খাওয়া দাওয়া তাঁর মোটেই ছিল না, কিছুই খাইতে চাহিতেন না, দুধটা নিতান্ত জোর করে খাওয়াতে হ'ত। একদিন অতি সামান্য দুটী ভাতের সহিত দুধ ও আম মাখিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হ'ল, সেদিন খাইলেন দেখিয়া পরদিন জিজ্ঞাসা করা হইল "আর দিয়া

দুটি ভাত খাইবে”? উত্তরে বল্লেন, “তোরা কি জানিস্ না যে ভূপেন গিয়া পর্য্যন্ত আমি আম খাই না”। মেজদাদা গিয়া পর্য্যন্ত, তিনি যে যে সামগ্রী ভাল বাসিতেন, সেই সকল জিনিষ মা খাইতেন না তার মধ্যে ভাল আম কখন খান নাই। ফুলকাপি এঁচোড়ও খাইতেন না।

একদিন অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া আসিল সে দিন আর বাঁচিবেন বলিয়া বোধ হইল না, সে সময় বাবা বলিলেন ‘ছেলে মেয়ে বউ জামাই সকলকে কিছু বলিবেনা?” উত্তরে বলিলেন, “ধর্ম্মই চির-সঙ্গী সকলের ধর্ম্মে মতি হোক্ দোষ করিলেও কাহারও মনে কষ্ট দিও না”। সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই দিন হইতে তাঁর অবস্থা আরো দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে কেবলই হরিনাম করিয়াছেন এবং স্বর্গগত সাধুভক্ত ও পুত্র কন্যাদিগকে দেখিয়াছেন ও কথা বলিয়াছেন। আশ্চর্য্য ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা!

মৃত্যুশয্যায় যখন মাথার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল, ক্রমাগতই বরফ ও জল দেওয়া হইত, বলিতেন “কোন্ জল দিচ্ছ, জর্ডনের জল তো? আমার মাথায় জর্ডনের জল দাও” কখনও বলিতেন “সেই জল দাও যে জলে দেব শিশু যিশুর পরিত্রাণ হ,য়েছিল, আমার হয়ে সেই জর্ডনের জল আমার মাথায় দাও”। আহা, তিনি বাস্তবিক সেই দেব শিশু যিশুর মত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, যেন বিধাতা সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইবার জন্যই তাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজীবন রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ, পরীক্ষা সকলি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিয়া বিজয় নিশান উড়াইয়া চলিয়া গেলেন। একদিন আমাকে বলিলেন “দেখ্‌লিনে? তুই দেখ্‌তে পেলিনে, পিমু এসেছিলেন হেঁসে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, আমি বল্লাম বাবা আমায় ফেলে চ’লে গেলে হেঁসে বল্লেন মা তুমিও যাবে।” একদিন অষুধ দিতে গেলে বলিলেন, “আমায় তোমরা আর অষুধ দিও না আমি ত এখানে নেই, আমি যে অনন্তে! পিমু বলেছিলেন সকলকে অনন্তে যেতে হবে তাই তাঁরাও গিয়াছেন, আমিও যাচ্ছি।” এইরূপে তিনি সর্ব্বদা ভগবান‌ও পরলোক লইয়াই থাকিতেন, ইহলোকের কোন কথা বলিতেন না। বরাবর বেশ জ্ঞান আছে দেখিয়াছি। কনিষ্ঠা সহোদরা যোগপ্রভার নিকট হইতে যে পত্র পাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“তোমরা সেই যে দিন চ’লে গেলে তারপর কদিনই এক রকম অচেতন হ’য়েই ছিলেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, ডাকলে উত্তর দিচ্ছেলেন কিন্তু কথার উত্তর দিতে পাচ্ছিলেন না, কখনো একটু বল্‌তে আরম্ভ ক’রে বাক্যটা ভুলে যাচ্ছিলেন কখনও কথা এত জড়িয়ে যাচ্ছিল যে বোঝা যায় না। এ তিন দিন একটু দুধ, জল কি ঔষধ কিছুই মুখে নেন নি, একটু পাশও ফেরেন নি, ঘা হ’য়ে যাবার ভয়ে আমরা রোজ একবার পাশ ফিরাইয়া দিয়াছি, এই কয়দিনের যা যন্ত্রণা হ’য়েছিল, তা বোধ হয় এ কয়মাসের সঙ্গে তুলনা হয় না। সে

যাতনা প্রকাশ করিবারও বুঝি ভাব ছিল না, কেবল অজ্ঞানের মত পড়ে থাকতেন, অনেক জিজ্ঞাসা করিলে কখনো ব'লেছেন "কিছু না", কখনো ব'লেছেণ "উঃ অসহ্য", কি যে আশ্চর্য্য তখনকার ভাব তা না দেখলে বোঝা যায় না। তারপর তিন দিনের পর রবিবারে 'দুধ খাবে' জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন "হাঁ", প্রায় আধপো দুধ খেলেন একবার পায়খানা হ'ল, তারপর চোক বন্ধ ক'রে যে শুলেন, আর জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যায়নি। সেইদিন উপাসনায় নিয়মিত আরাধনা প্রার্থনা করেননি। কিন্তু স্তোত্র পাঠের সময় একটু একটু বলেছেন। আশ্চর্য্য!

সোমবার সকালে শ্বাসের লক্ষণ দেখা গেল। ১॥টা থেকে খুবই কষ্ট হ'তে লাগিল, তখন বেশ জ্ঞান হোল, চোক চাইলেন। সে রকম আমরা কখনো দেখিনি, সে ভয়ানক কষ্টকর। সন্ধ্যা ৬৷১৫ মিনিটে শেষ নিশ্বাস পড়িল, এতক্ষণ যে শরীর তোলপাড় হ'চ্ছিল সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। সে সময় মুখের চেহারা বড়ই সুন্দর হ'য়েছিল, ফুলো হঠাৎ সমস্ত কমে গেল, খুব রোগা হ'য়ে গেলেন। যখন সুন্দর ক'রে সাজিয়ে বাহিরে আনা হোলো, সে যে কি সুন্দর দৃশ্য, মুখের এমন পবিত্র ভাব, সে দৃশ্য যেন অপার্থিব ব'লে বোধ হ'চ্ছিল—আহা! তুমি কেবল কষ্টের মুখই দেখলে, এ স্বর্গের দৃশ্য দেখ্‌তে পেলে না। তোমায় বার বার মনে হ'চ্ছিল।"

আমাদের মা বড় আরাম পেয়েছেন, তাঁর শেষকালের মুখের ভাব দেখে আমরা কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি এত আরাম পেলেন, আমরা দুঃখ করিব কি জন্য তাঁর শরীরের অবস্থা এমন হ'য়েছিল যে যখন ডাক্তার বাবু বলিলেন আরো ২।৪ দিন থাকিতে পারেন, তখন আমাদের আতঙ্ক হ'ল যে তবে কেমন ক'রে তিনি সহ্য করিবেন এ কষ্ট আর আমরা কেমন ক'রে দেখ্‌বো।

তবে আর আমরা দুঃখ ক'র্‌বো কি? আমাদের চেয়ে যারা তাঁকে দেখেনি তারা দুঃখিত হ'তে পারে।

এখন আমরা যদি তাঁর অমর চরিত্রের অংশ পাই, তহেলেই ধন্য হব এখন আর তাঁকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হবে না, এখন তিনি সুখী মাতৃদেবী এই পৃথিবীতে থাকিতে একবার একটী সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া আমায় বলিয়াছিলেন এখন সেই স্বপ্নটী মনে পড়িতেছে। স্বপ্নটী এই;—"একটি সুন্দর সুশোভিত উচ্চ স্থানে যোগীভক্ত, সাধু সাধ্বীতে পরিপূর্ণ। মা সেই স্থানে যাইবেন বলিয়া দৌড়িতেছেন পথ সুদীর্ঘ এবং জঙ্গল ও কাঁটা বনে পরিপূর্ণ, তাঁর পশ্চাতে এক বিকটাকার মনুষ্য, তাঁকে ধরিবার জন্য সেও দৌড়িতেছে, মা প্রাণপণে দৌড়িতেছেন, কাঁটা খোঁচা লাগিয়া তাঁর দেহ ছড়িয়া যাইতেছে সে দিকে দৃষ্টি নাই, ক্রমাগত দৌড়চ্ছেন, পথ তবু ফুরাচ্ছে না অবশেষে সেই স্থানে পৌঁছিলেন, একজন একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন "এই তোমার স্থান" তিনি সেই স্থানে বসিয়া দেখিলেন সেই বিকটাকার লোকটা উঁকি মারিতেছে কিন্তু তাঁর কাছে আসিতে পারিতেছে না।"

আজ তিনি তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট আনন্দধামে প্রাণের পুত্র কন্যাদের লইয়া মাতৃকোলে উপবিষ্ট, বিশ্বাস চক্ষুতে দেখিয়া আমরা তাঁর দুঃখী সন্তান সন্ততি শোক সম্বরণ করি।

তিনি যে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁর সহিত আত্মার যোগে যুক্ত হইয়া নিজ নিজ জীবনকে সেই আদর্শে গঠন করিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতে পারি বিধাতার নিকট এমন শক্তি বল ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সমুদ্রপথে পুরী।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

প্রায় ১৮ বৎসর গত হইয়াছে। তখন উড়িষ্যা গমনাগমনের সুগম রেল লাইন খোলা হয় নাই। পুরুষোত্তম যাত্রীদিগকে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে সারাদিন ও রাত্রির ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত যাপন করিতে হইত। সে যে কষ্ট ও নির্য্যাতন, ভুক্তভোগী যাঁহারা তাঁহারাই কেবল জানেন। জাহাজের ডেক অর্থাৎ নিম্নতলটি জগন্নাথ ধ্যান নিরত সরলপ্রাণ অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের আশ্রয় নিকেতন হইত। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যতা ও স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কখন কখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইত যে অনেকেই সেই সুদীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকিয়া কাটাইতেন। সৌভাগ্যক্রমে যদি ঝড় তুফানের আবির্ভাব না হইত, তবেই মঙ্গলমত তাঁহারা তৎপর দিন চাঁদবালী বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রস্থ পান্থশালায় কথঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতেন। এখন আর সেই হাড়ভাঙ্গা বিপদসঙ্কুল রাস্তায় উড়িষ্যায় যাইবার কাহারো ইচ্ছা হয় না। এখন সরকার বাহাদুরের কৃপায় রেলে চড়িয়া যথা ইচ্ছা শুইয়া বসিয়া, মহাআরাম, স্বল্প ব্যয়ে, প্রতিদিন শত শত হাজার হাজার যাত্রী মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া মহানন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

সেই অতীত কালের ঘটনা মনে হইলে আমাকে এখনো যেন কেমন করিয়া একটা আতঙ্কের ভাব আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। সরকারী আদেশে আমি পুরী যাত্রা করিলাম। মাঘমাস রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে. আমার বন্ধুজন আমাকে সঙ্গে করিয়া সিগল ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া বিদায় হইলেন। আমি নবীন বয়সে নবীন উৎসাহে মাতিয়াছি, গন্তব্য স্থান কেমন কত দূরে, তাহার ভাবনা একটুও উদয় হয় নাই। প্রাণ ভরিয়া সমুদ্র দর্শন করিব, সমুদ্রের উড্ডীয়মান মৎস্য চাক্ষুষ করিব এই আনন্দেই বিভোর ছিলাম। সেই অপরিণাম দর্শিতার ফল আমাকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইল। অতি প্রত্যূষে জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া তূর্য্য নিনাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া তাহার গমনবার্ত্তা ঘোষিত করেন, এবং সেই সঙ্গে গঙ্গাবক্ষঃ বিষম আলোড়িত করিয়া মৃদু মন্থর ও পরে দ্রুত গতিতে, সাগরাভিমুখে যাত্রা করিল, প্রকৃতির আদর্শ চিত্রপট গঙ্গাসেকতের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী নানা সুরম্য অট্টালিকা কত নগর উপনগর কোথা হইতে যেন আসিতে

কোথায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল। গঙ্গাবক্ষঃ ক্রমেই বিশাল, জল নীলাভ ও ফেনিল দেখাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা বঙ্গোপসাগরে যাইয়া পড়িলাম। সম্মুখে অসীম জলরাশি বামেও কুল কিনারা দৃষ্ট হইতেছে না, কেবল দক্ষিণে সূত্রাকারে একটি কাল রেখা। জানিতে পারিলাম ইহাই ছোট নাগপুরের প্রান্ত সীমা। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে সে সময় স্নানযাত্রা উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী পুরীধামে যাইতে ছিলেন। জাহাজের নিম্নতল যে ভাবে মানুষ বোঝাই হইয়াছিল বোধ হয় পশুশালায়ও সেই ভাবে পশুগণ রক্ষিত হয় না। আমিও অপর দুইটি বাঙ্গালী বাবু আপারডেক অর্থাৎ উচ্চতলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। তন্মধ্যে একজন চাঁদবালী অপরটি কটক যাইতেছিলেন। আমি এই প্রথম পুরী যাইতেছি শুনিয়া শেষোক্ত বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কটকে যাইয়া কোথায় বিশ্রাম করিবেন? কোন আত্মীয় তথায় আছেন কি?" আমি বলিলাম যে তথায় আমার পরিচিত কেহই নাই। আমি গাড়ী করিয়া বরাবর পুরী চলিয়া যাইব। বাবুটি ঈষদ্ হাস্যে বলিয়া উঠিলেন "আপনি কখনো দুরদেশে যান নাই, বোধ হয় সংসারে আপনার কেহই নাই, নতুবা আপনি একাকী এ বয়সে পুরী যাইতেন না। এখন শুনুন—আমরা পরশুদিন অপরাহ্ণ কটক পৌছিব। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল। গো শকটে এই সুদীর্ঘ পথ পার হইতে আপনাকে প্রায় ৩ দিন লাগিবে। কটক জাহাজ ঘাটেই গো শকট মিলিবে না; আপনাকে সহরের ভিতর তল্লাস করিয়া লইতে হইবে। যদি দৈব ঘটনায় কেনেল ষ্টিমার সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পর কটক পৌছে, আপনি জিনিস পত্র লইয়া তখন কোথায় যাইবেন?" আমি ত শুনিয়াই 'থ' খাইয়া গেলাম। তাইতো এখন উপায় কি? তখন স্পষ্টই অনুভূতি হইল অসীম সাগরের তরঙ্গ আমার ভাবনা সাগরের তরঙ্গের তুলনায় নিতান্ত সামান্য, কিছুই নয়। আমি যেন বাস্তবিকই তাহাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

এমন সময় নিম্নতলে তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল। আমরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ ও প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দেখিলাম একটি চট্টগ্রাম বাসিনী বৃদ্ধার ভ্রাতা ও পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হইয়া যাতনায় এ পাশ ওপাশ করিতেছে। অভাগিনী যাহাদের সঙ্গে প্রফুল্ল মনে প্রাণে শত আশা বাঁধিয়া জগন্নাথ দর্শনে আসিতেছিল সেই সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের ন্যায় কেবলই তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। তাহার তৎকালিন অবস্থা অবর্ণনীয়। হতভাগিনী কখনো ভ্রাতার কখনো পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া পাগলিনীর প্রায় কেবলই উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিতেছে—কিন্তু হায়! সেই চীৎকার সেই মর্ম্মভেদী বিলাপ ধ্বনি সহযাত্রী কাহারো প্রাণকে অভিভূত করিল না। কেহই অভাগিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে অথবা রোগী দুটির সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইল না!

মুক্তি ফৌজের নেতা জেনারল বুথের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ।

বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে মুক্তি ফৌজ নামক একদল ধর্ম্মপ্রচারক পৃথিবীতে খাটিধর্ম্ম প্রচার জন্য জীবন মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। অধর্ম্ম বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং বিস্তারই এই দলের কার্য্য। ইহারা যদিও খৃষ্ট সম্প্রদায়ী তথাপি ইহারা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন সাধারণ খৃষ্টানদের মত কোন বিশেষ বিশেষ মতে আবদ্ধ নহেন। ঈশার বৈরাগ্য এবং জীবন্ত বিশ্বাস ইহাদের জীবনের অন্নপান ভগবানের পবিত্র আবির্ভাব প্রণোদন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নিজ ভাব এবং রুচিতে পরিচালিত হইয়া জীবন যাপন কিম্বা ধর্ম্ম প্রচার করেন না। তাঁহারা লোককে আহার-সংস্থাপন পথ দেখাইয়া এবং ধরাইয়া দিয়া তৎপর তাহাদিগকে নীতিবান হইতে এমন গভীর উত্তেজনাপূর্ণ শিক্ষাদান করেন যে প্রতি ব্যক্তিই নৈতিক তেজসম্পন্ন হইয়া নীতিরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট যেমন ভয়ে জড়সড় হইয়া ছোট ছোট অনাবিষ্ট ছেলেরা অনিচ্ছা সত্বেও লেখা পড়াতে যেরূপ বাহ্যভাবে নিরত থাকে ইহাঁদের দ্বারা উপদিষ্ট লোকেরা ভয়ে কিম্বা অনুরোধে নীতিরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জীবনের অন্নপান রূপে নীতি গৃহীত হয়। ইহারা যে বিবাহ করেন তাহাতেও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার এবং বিধাতৃর আজ্ঞা জীবনে পালন করিতে অধিকতর সক্ষম হইবেন ইহাই লক্ষ্য থাকে। ইহাদের শারীরিক বিষয় আধ্যাত্মিক অন্তর্ভূত। স্ত্রী পুরুষ সমভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন। মুক্তিফৌজের নেতা জেনারল বুথ সাহেব কলিকাতায় কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এসেছিলেন। এবার প্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে নারী জাতির প্রতি মুক্তি ফৌজের লোকেরা কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহার এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়া যান এবং অনুরোধ করেন যেন দলের সর্ব্বস্থানে উহা পঠিত হয় অথচ তৎসহ কেহ কোনরূপ আপন মতামত প্রকাশ না করেন। জীবন ভরিয়া, আপন পত্নী কন্যা পুত্রবধূগণ হইতে যেরূপ প্রচারপ্রণালী গঠন এবং জীবনদান করিয়া জীবনের কার্য্যে সহায়তা পাইয়াছেন তাহা হইতে নারী জাতির সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নারী জাতি সম্বন্ধে আমার ভাব এবং মত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। এ বিষয়ে আমার আদর্শ তোমাদের সম্মুখে আছে এবং আমি চাই যে সমগ্র ফৌজ এই আদর্শ গ্রহণ করেন। প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমি চাই যে, নারীর সমকক্ষতা দৃঢ়রূপে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর উন্নতির জন্য নারীর ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তা, মূল্য এবং আবশ্যকতা পুরুষেরই মত। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিশ্রেণীরই অনেক লোক অন্যরূপ ভাব পোষণ করেন। তাহারা প্রাচীন কালের মত 'নারী পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট' ধরিয়া আছেন।

অনেকের নিকট নারীজীবন বিশ্রাম সময়ের ক্রীড়ণক। আর একশ্রেণীর নিকট মতে না হউক কার্য্যতঃ নারী সর্ব্ববিষয়ে ক্রীতদাসী। বধোদ্দেশে যে সকল পশুদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করা হয় কিম্বা গাড়ী টানিবার জন্য ঘোড়ার স্বাস্থ্য এবং সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নারীরা তদপেক্ষা লঘুতর ব্যবহার পাইয়া থাকেন। এইরূপ জঘন্য এবং ধর্ম্মশূন্য ভাব তিরোহিত করার জন্য মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। মুক্তি ফৌজ জন্মগতই দুই জাতিতে (পুরুষ এবং নারী) সমতা রক্ষা করিতেছেন। সুখ দুঃখ বোধ শক্তি এবং আত্মার মূল্য উভয়েরই সমান।"

"ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নরনারী সমান এবং উভয়ই তুল্যরূপে স্বর্গীয় পিতার প্রেমের অধিকারী। যীশুপ্রদর্শিত পরিত্রাণবিধিতে উভয়েরই সমান অধিকার; ঈশ্বররাজ্য-বিস্তার এবং পরিত্রাণবিস্তারে উভয়েই সমভাবে দায়ী; উভয়ে সমভাবে তাঁহার ন্যায়বিচারের অধীন; স্বর্গীয় নগরের অধিবাসীর অধিকারে একই অবস্থাপন্ন; ভাবী অনন্তজীবন সম্ভোগ এবং ব্যবহারের উভয়ের তুল্য ক্ষমতা।"

"এতদ্দ্বারা নারীর প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ গুণ নরেতে থাকিবে কিম্বা নরের বিশেষ বিশেষ গুণ নারীতে সমভাবে থাকিবে তাহা আমি বলিতেছি না। তাঁহাদের উভয়ের গুণনিচয়ের মধ্যে প্রকৃতি এবং পরিমাণে পার্থক্য থাকিবে। এক জন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, অপর অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে ইচ্ছাশক্তি এবং শারীরিক শক্তিতে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপর পক্ষে, অনুভব করার শক্তি, সহিষ্ণুতায়, ক্ষমতাতে এবং ভালবাসার শক্তিতে নারী নর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব মোটের উপর ঈশ্বর প্রদত্ত গুণে এবং প্রভাব বিস্তারে নারী পুরুষের সমান। তাঁহাকে ভাল সুবিধা দেওয়া হউক তিনি তাহার প্রমাণ কার্য্যতঃ দিবেন।

"আমি এই চাই যে তোমরা এই সত্য অনুধাবণ করিয়া গ্রহণ কর। আমাদের কর্ত্তব্য যে এই সত্যেতে দৃঢ় হইয়া আমাদের নারী সহযোগিনীর সহ ব্যবহারে জগতে এই সত্যের প্রমাণ দেই। মতে এবং কাজে যুবকদিগকে শিক্ষা দেই। শারীরিক বল ব্যতীত জীবনের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা উভয়ের মধ্যেই সমান। ছেলেবেলা হইতে বেটা ছেলেকে, জানিতে দেও যে তাহার ভগ্নিতে আর তাহাতে ইতর বিশেষ নাই। কন্যা সন্তানকে অনুভব করিতে দেও যে, ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকট তাঁহার আদর এবং প্রয়োজনীয়তা তদ্রূপ যদ্রূপ বেটা ছেলে হইলে হইবে।

বৃদ্ধেরা যুবকদের এবং ছেলেদের সম্মুখে অপ্রতিহত জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যীশু যেরূপ স্ত্রীলোকের প্রতি চিরদিন কোমল এবং সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রূপ করুন। বিবাহিত অবিবাহিতনির্ব্বিশেষে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান ধৈর্য্য এবং যত্নের সহিত ব্যবহার করুন। বিবাহিত ব্যক্তির যদি প্রকৃত পুরুষকারের জ্ঞান থাকে তবে স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষণে, তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করা;

তাহার আত্মার তত্ত্বাবধান করা এমন কি প্রয়োজন হইলে খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহার জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। জীবনসংগ্রামের সহচরী, স্ত্রী মাতা এবং কন্যারূপে নারীকে অধিকতর সম্মান দানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। *

তোমাদের স্নেহের জেনারেল বুথ।"

মহিলাদের রচনা।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে লিখিত।

কতদিন হ'ল পিতা গিয়াছ চলিয়া
সুখময় স্বর্গধামে সে অমৃত লোকে
হ'য়ে পিতৃহীন মোরা কাঁদি তব শোকে
কাতর অন্তর সদা তোমার লাগিয়া
আর নাহি হেরিব সে স্নেহময় মুখ
আর না শুনিব সেই বাণী স্নেহময়
এ কথা হৃদয় মাঝে হইলে উদয়
অসহ্য শোকেতে হায় ফেটে যায় বুক
আমাদের মঙ্গলের কারণে নিয়ত
দিতে কত উপদেশ নিশি দিনমান
সেই স্নেহপূর্ণ বাণী অমৃত সমান
মনে পড়ে কাতর এ হৃদয় সতত
জীবিত থাকিতে সদা বলিতে যে পিতা
দেহত্যাগে দূরে রব ভেবনাক মনে
ইহলোক পরলোক রহিব যেখানে
তোমাদের কাছে আমি রহিব সর্ব্বদা
এখন সে কথা তাত! পড়ে সদা মনে
ব্যাকুল অন্তর হয় তোমার লাগিয়া
কতবার অন্য মনে ভাবিয়ে বসিয়া
কাছে তুমি আছ পিতা আমার এ মনে
আদর্শ জনক তুমি আছিলে মোদের
দয়া ধর্ম্মে প্রেমে পুণ্যে শোভিত হৃদয়,
বিদ্যা ও ধর্ম্মের জ্যোতি কত শোভাময়
দেখাইলে জগতেরে মহিমা ধর্ম্মের।
আসিয়া জগত মাঝে সহিয়াছ কত
শারীরিক মানসিক কতই যাতনা
কিন্তু সব ধৈর্য্যসহ সয়েছ কতনা
যোড়করে দয়াময়ে ডেকেছ সতত!
কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গেছ পিতা তুমি
কাটাইয়া আমাদের স্নেহ মায়া সব
সে রাজ্য কোথায় পিতা? কোন অভিন[illegible]
কোন ঊর্দ্ধ লোকে তাত! কোন দেব ভূমি
পুণ্য স্মৃতি জেগে রবে সদা শোভাময়
পুণ্য জ্যোতি পূর্ণ ওই অমূল্য জীবন
যতদিন ধরা মাঝে রহিবে জীবন
নিশিদিন অবিরত স্মরিবে হৃদয়
পরলোকে গেলে দেখা হবে পুনরায়
বিনাশ নাহিক কভু অমর আত্মার
এ বিশ্বাস হ'ক দৃঢ় অন্তরে আমার
কৃপাময় কৃপা কর দীন তনয়ায়

কশৌলী শ্রীমতী সা—

আমার শ্বশুর বাড়ী যাত্রা।

সাত আট মাস হইল আমি বিবাহের পর সেই প্রথম শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলাম সে দিন অমাবস্যা শনিবার ছিল। আমার পিতা অমাবস্যা পূর্ণিমা কিংবা অন্যান্য বাধা বিঘ্ন মানেন না। কারণ সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা বিদেশে ঘুরিতে হয় সে সময় দিন দেখিলে চলে না। আমার বিষয়ে শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধ

---

* এই মতে আমাদের ঐক্য আছে।

তাড়াতাড়ি আমাকে শ্বশুরালয় ঢাকায় যাত্রা করিতে হইল। সকাল বেলা মা আমাকে কিছু খাওয়াইয়া সাশ্রু নয়নে বিদায় দিলেন। আমি দুঃখিত মনে বাবার সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী বরাবর কলিকাতাভিমুখে চলিতে লাগিল, রাস্তার দুইধারে কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, সুসজ্জিত দোকান ও নানা প্রকার জিনিস পত্র দেখিতে লাগিলাম।

গাড়ী হাবড়া পুলের উপর উঠিল। নিম্নে সুদূর প্রবাহিণী গঙ্গা, বাঁধান ঘাটে শত শত নরনারী স্নানাহ্নিকে মত্ত। প্রবল স্রোতে এত বড় প্রকাণ্ড পুলও কম্পিত হইতেছিল। আমার বোধ হইল বুঝি গঙ্গা এরূপ একটা পুলের বাঁধন মোটেই পছন্দ করেন না। তাই এটাকে জোর করিয়া তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে গাড়ী আমার পিসা মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া থামিল। আমার প্রাণটা যেন সহসা কাঁপিয়া উঠিল। স্নেহময়ী মাতা ও ভাই ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া আমার কেবলই কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু বাবার সাক্ষাতে কাঁদিতে পারিলাম না। আমার পিসিমা সে সময় শক্ত পীড়ায় কাতর ছিলেন। তবু তিনি সস্নেহে আমাকে কত আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

রাত্রি ৯ টার সময় আমি গোয়ালন্দের রেলে উঠিলাম। সঙ্গে আমার—ছিলেন। রেল গাড়ীতে গায় গহনা নিরাপদ নয় শুনিয়া আমার সমস্ত গহনাপত্র বাক্সের ভিতর রাখিয়াছিলাম। আমাদের কামরায় অনেক গুলি যাত্রী ছিল। তাহারা পর পর ষ্টেশনে নামিয়া গেল। বাকী রহিলাম আমরা দুই জন। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আমরা সজাগ ছিলাম। তার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ কাহার চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিল এবং ঘুমের ঘোরে শুনিলাম আমাদের জিনিস পত্র চুরী হইয়া গিয়াছে। চকিতে চাহিয়া দেখিলাম বেঞ্চের নীচে যে ট্রাঙ্কটা ছিল তাহা নাই। সেই ট্রাঙ্কে আমার যথা সর্ব্বস্ব গহনা ও মূল্যবান রেশমী কাপড় জামা ইত্যাদি ছিল। তখন আমি ভয়ে ভয়ে আমার কাণ দুটীতে হাত দিয়া দেখিলাম তাহাও চুরী গিয়াছে কিনা। কারণ কাণের দুল দুটি খুলিয়া বাক্সে রাখিবার সময় পাই নাই। যখন বুঝিলাম তাহা ঠিকই আছে তখন গালে হাত দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এ দিকে পুলিস আসিল, কত কি লিখিয়া লইয়া গেল। প্রত্যুষে গাড়ী গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া ঠাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইল। শীতকাল, তখনো খুব ফরসা হয় নাই; আমার গায় একটা পাত্‌লা জামা— শীতে আমার সমস্ত শরীর কেবলই কাঁপিতে লাগিল। সেই অবস্থায় তিনি আমাকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজের হুইসিল্ ও চাকার গভীর গর্জ্জনে চারিদিগ তোলপাড় করিয়া তুলিল।

কামরার ভিতর অনেক গুলি মেয়ে ছিলেন সকলেই আপন আপন স্থানে বিছানা পাতিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী

পুরুষেরা তাঁহাদের খবরাখবর লইতে লাগিল। আমি একে বালিকা তাহাতে একাকী; লজ্জা ও ভয় আসিয়া আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি দাঁড়াইয়া এদিগ ওদিগ চাহিতে লাগিলাম। প্রায় আট ঘণ্টা পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত। তাহার ত্রস্তভাব দেখিয়া বুঝিলাম আবার একটা নূতন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। পরে শুনিলাম তাহাকে পারে রাখিয়াই জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি অতি কষ্টে নৌকা করিয়া জাহাজ ধরিয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক!! তিনি যদি না আসিতে পারিতেন আমার দশা কি হইত?

তাই আমি পুজনীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ইহা কি আমার অমাবস্যা শনিবারের যাত্রার ফল? *

কোন্নগর } শ্রীমালতী বালা (হিন্দু পরিবারের ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্কা কন্যা)।

সংবাদ।

বিগত ১১ই আশ্বিন নিজাম রাজ্যে বন্যা আরম্ভ হইয়া ১২ই তারিখে মুসি নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি পায়। প্রবল বন্যায় রাজধানী হায়দারাবাদ নগরীর এক তৃতীয়াংশ এক বারে ধুইয়া যায়। তত্রস্থ অনেক জনপদ জলপ্লাবনে ভাঙ্গিয়া যায়। মুসি নদীতে শব সকল ভাসিতে ভাসিতে কৃষ্ণা নদীর অভিমুখে বেগে চলিয়া যায়। হায়দারাবাদের প্রায় এক লক্ষ লোক বিনাশ এবং দুই কোটী টাকার উর্দ্ধ সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। গাড়ীতে গাড়ীতে মৃতদেহ নিয়াও সমস্ত শব স্থানান্তরিত করিতে পারিতেছে না। পূতিগন্ধে সহরে চলা এবং তিষ্ঠা ভার হইয়াছিল। এতদিনে নগরমূত জীবদেহ মুক্ত হইয়াছে।

---

* যাঁহারা অমাবস্যা মানিয়া চলেন তাঁহাদেরও এরূপ বিপদে পড়িতে হয়। সং।

জন মানব এবং অন্যান্য জীব জন্তুর এরূপ ভীষণ এবং বিস্তৃত মৃত্যু আর কখনও এ দেশে শুনা যায় নাই। সম্পত্তির ক্ষতিও কস্মিন কালে কোথাও এরূপ ঘটে নাই। রেল রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাইয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাল লোকের গতিবিধি বন্ধ ছিল। টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ তার ছিন্ন হইয়া গিয়া দুই এক দিন সংবাদ চলাচলেরও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। হুসেন সাগর দিঘী যদি প্লাবিত হইত তাহা হইলে হায়দারা রাজ্যের চিহ্নও থাকিত না—পূর্ব্বেই তাহার প্লাবন যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নৌকা এবং হাতীর সাহায্যে বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ভীষণ গর্জ্জনে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রবাহে বড় বড় উৎপাটিত বৃক্ষ জল স্রোতের ঢেউয়ের ক্রীড়াবস্তু হইয়াছিল। ঘোলীগুদা নামক নগরী এক হাজার ঘর বাড়ীসহ সম্পূর্ণ রূপে কাদায় ডুবিয়া গিয়াছে।

একা নবাব ছলারজঙ্গের তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। নিজাম এই ভীষণ ঘটনাতে মহা শোকার্ত্ত হইয়া অনেক অশ্রুপাত করিয়াছেন। কোথায় পার্থিব ক্ষমতা কি করিতে পারে? এখানে রাজা প্রজার সকলেই অসহায়—অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত সকলেই এ সময় পরস্পরের জন্য ব্যস্ত হয়। এই রূপই বিধাতার লীলা। এরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকেই মানুষ মানুষকে ভাই বলিয়া চিনিয়া থাকে এবং প্রাণের মধ্যে স্থান দেয়। ত্রিশ হাজার লোক প্রতিদিন অন্নছত্রে আহার করিতেছে। নিজাম তাঁহার কোন একটী রাজপ্রাসাদাংশ নিরাশ্রিতদের বাস জন্য ছাড়িয়া দিয়াছন। ভরসা করি এরূপ ঘটনা আলোচনা করিয়া মানব মাত্রেই জীবনে ঈশ্বরের আবশ্যকতা কত তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। এবং মনুষ্যশক্তি কত অকিঞ্চিৎকর এবং ক্ষীণ তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

জীবের শত্রু জীবাণু।

আমরা যে চারিদিকে চলিয়া বেড়াই কত যে শত্রু আমাদের চারিদিকে থাকে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমরা তাহা চক্ষে দেখিতে পাই না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র যাহা দ্বারা একটী অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসকে হাজার গুণ বড় দেখায় তাহার দ্বারা ঐ জীবাণু গুলিকে দেখা যায়। আমরা যে এগুলিকে সব সময় দেখিতে পাই না, তাহা খুব ভালরই জন্য। তাহা হইলে আমাদের প্রাণ ধারণ করা শঙ্কটময় এবং কষ্টকর হইত। আমরা যদি এক গ্লাস জল খাইতে গিয়া গ্লাসটী ভরা পোকা দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে আমাদের কি ভয়ানক ঘৃণা হইত এবং আমরা খাইতে পারিতাম না। কিংবা যদি আমরা প্রত্যেক প্রাণীর এমন কি প্রত্যেক পিপীলিকার পদধ্বনী শুনিতে পাইতাম তাহা হইলে আমরা অস্থির হইয়া উঠিতাম জীবন ধারণ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত।

দয়াময় পরমেশ্বরের এ সকল বিষয় ভালরূপে জানিয়া শুনিয়াই আমাদের শ্রবণ কি দর্শন শক্তিকে এত তীক্ষ্ণ করেন নাই। আমরা আগেই শুনিয়াছি যে রোগের জীবাণু আছে।

সে গুলি উদ্ভিদ জাতীয়। কিন্তু আমাদের শরীরে এক রকমের জীবাণু আছে সে গুলি প্রাণী। সে গুলির শরীরের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের রক্ত যে লাল তাহার কারণ হইতেছে তাহার মধ্যে এক রকম জীবাণু আছে তাহারা লাল রংএর এবং আমাদের শরীরের রক্তের রং বস্তুত নারিকেল তেলের মত। আর এক রকম আছে তাহারা সাদা।

খানিকটা জলে একটু সিঁন্দুর গুলিলে জলটা লাল দেখায়। সিঁন্দুর তেলে যে রকম মেশে জলে সে রকম মেশে না। এজন্য উহাকে অনবরত পড়িলে জলটা লাল দেখায় এবং রাখিয়া দিলে, নীচে সিঁন্দুর ও উপরে জল হইয়া যায়।

মানুষের শরীরের রক্তও ঠিক এইরূপ।

শরীরের ভিতরে যে আর এক প্রকার সাদা রংএর পোকা থাকে তাহারা সমস্ত ক্ষণ চারিদিক পাহাড়া দিতে থাকে। শরীরের চারিদিকে ঘুরিবার ইহাদের শক্তি আছে। যখন কোন রোগের বীজ আসিয়া আক্রমণ করে তখন ইহারা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। আমাদের শরীরের ভিতর আর এক রকম জীবাণু আছে তাহাদিগকে বিষঘাতী" বলে।

ইহারা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। উহাদের বিষ নাশক শক্তি যত বাড়ান যায় ততই বাড়ে। ইহার প্রমাণ, একজন লোক যে একটী সরিশার মত ছোট আকারের পরিমাণ আফিং খাইতে আরম্ভ করিল এবং প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পরে এক দিন দেখা গেল যে সে একেবারে এতটা পরিমাণ আফিং খাইতে পারে যে তাহাতে হয়তো এক সঙ্গে আট দশ জনকে মারিয়া ফেলা যায়। আর একটী প্রমাণ, ঠিক যে রকম করিয়া Diphthiria রোগের ঔষধ প্রস্তুত করে। এই ঔষধ প্রস্তুত করা হয় কোন Diphthiria রোগীর গলা হইতে একটু লাল লইয়া খানিকটা জেলিতে দিয়া জেলিটুকু একটী

কাচের বাক্সে রাখিতে হয় তাহার কয়েক দিন পরে অণুবিক্ষণ দ্বারা দেখা যাইবে যে অনেক সংখ্যক ঐ রোগের বীজ উহাতে জন্মিয়াছে। তখন উহা হইতে ছুরীতে করিয়া একটু লইয়া একটী ঘোড়ার গায়ে বেশ প্রকারে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। সে দিন ঘোড়াটীর একটু সামান্য জ্বরের ভাব হইবে কিন্তু পূর্ব্বের মতই চলিয়া বেড়াইবে ও খাইবে। তার পর দিন আর একটু বেশী পরিমাণে এইরূপে প্রতিদিন মাত্রা বাড়াইবে ও খাইবে। তার পর দিন আর একটু বেশী পরিমাণে এইরূপে প্রতি দন আর একটু বেশী পরিমাণে এইরূপে প্রতিদিন মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে এক মাস পরে দেখা যায় যে ঘোড়াটী এখন যতটা বিষ সহ্য করিতে পারিতেছে ইহাতে এমন কি এক সঙ্গে আট দশটী ঘোড়া মারিয়া ফেলা যায়। তার পর ঐ ঘোড়াটীকে মারিয়া ফেলা হয় এবং ঐ সমস্ত রক্ত একটী বড় কাচের পাত্রে রাখা হয়। এক একটী ঘোড়ার গায়ে অনেকটা করিয়া রক্ত থাকে। অনেকক্ষণ রাখার পর ঐ সমস্ত রক্ত জমিয়া যায় এবং উহা হইতে এক প্রকার নারিকেল তৈলের ন্যায় উহার উপরে ভাসে অর্থাৎ রক্তের লাল অংশটা নীচে পড়ে এবং সাদা অংশটা থিতিয়া উপরে উঠে।

সেই নারিকেল তৈলের মত জিনিসটাই ছোট ছোট শিশিতে রাখিয়া কাচ গলাইয়া মুখটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারে তৈয়ারি করিয়াই ইংরাজেরা এদেশে পাঠাইয়া দেন। ইহা অনেকটা বসন্তের টিকা দেওয়ার মত কাজ হইল। বিষে বিষক্ষয় করা হয়। ইহা কিন্তু Diphthiria অব্যর্থ মহৌষধ অবশ্য সময়ে জানিতে পারিবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

দ্বাদশ বৎসর।

শ্রীমতী শান্তশীলা শাসমল, ২৲
„ সুশীলাবালা সিংহ, দ্বারভাঙ্গা ২৲
কুমারী লীলামঞ্জরী চৌধুরী, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত, কুমিল্লা ২৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কটক ২৲
„ তরীন্দ্রমোহন সেন, শিমলা ১৲

ত্রয়োদশ বৎসর।

শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন, জামালপুর ২৲
„ গোপালচন্দ্র গুহ, টাঙ্গাইল ১৲
„ সুরেশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ১৲
„ তরীন্দ্রমোহন সেন, শিমলা ১৲
„ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত, কুমিল্লা ২৲
„ রামলাল, ভাগলপুর ১৲
„ হরলাল সাহা, কলিকাতা ২৲
„ শরৎকুমার লাহিড়ী, কলিকাতা ২৲
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা,
শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক, বাঁকিপুর
„ সুলতা দেবী, সম্বলপুর
„ মৃণালকুমারী দত্ত, বদরপুর ২৲
„ এস কে সেন, সম্বলপুর ২৲
„ বি এন দাস, ঢাকা ২৲
„ শান্তশীলা শাসমল, কাঁথি ২৲
„ কুলদা দেবী, ঢাকা ২৲
„ সরলাবালা সেন, মরীয়ানী ২৲
„ চারুবালা দেবী, রেঙ্গুন ২৲
„ যোগীনিবালা বসু, পুষা ২৲
„ হেড়ম্বজননী সেন, জয়পুর ২৲
„ সরোজিনী রায়, কলিকাতা ২৲
„ ক্ষিরোদাসুন্দরী সেন, ঢাকা ২৲
„ সুরমা দত্ত, কলিকাতা ২৲
„ হৈমবতী চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর ২৲
„ ইন্দুমতী দাস, ঢাকা ২৲
কুমারী লীলামঞ্জরী চৌধুরী, কলিকাতা ২৲

চতুর্দ্দশ বৎসর।

শ্রীযুক্ত এনাতুল্লা প্রধান, হলদিবাড়ী ২৲
শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী হালদার, পীনমানা ২৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১৫, নভেম্বর ১৯০৮। [৪র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে গৃহের গৃহিণী পরিবারস্থ সকলকে প্রীতি করিতে পারেন না, সেই গৃহে সেই পরিবারে কখনও শান্তি কুশল প্রতিষ্ঠিত হয় না। স্বামী হউক বা বালক বালিকা হউক, কিংবা দাস দাসী হউক, কাহারও দোষ ত্রুটি হইলে ক্রোধ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তিনি প্রেমের শাসনে সকলকে শাসন করিবেন চরিত্রের মিষ্টতা, ধৈর্য্য ও ক্ষমার পরিচয় দান করিবেন, তাহাতে সকলে বশীভূত হইবে, পারিবারিক শান্তি ও কল্যাণ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। গৃহিণী বাইবেল শাস্ত্রের নিম্নলিখিত মহামূল্য বচনটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবেন।

"যদিও আমার সকল সম্পত্তি দুঃখীদিগের আহারের জন্য দান করি, যদিও আমার শরীরকে দগ্ধ হইতে দি, তথাপি প্রীতি না থাকিলে উহাতে আমার কোন লাভ নাই। প্রীতি দীর্ঘ কাল সহ্য করে, এবং দয়ালু; প্রীতি পরদ্বেষ করে না, প্রীতি আত্মশ্লাঘা করে না, এবং স্ফীত হয় না। উহা অনুচিত ব্যবহার করে না, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না; অনিষ্ট চিন্তা করে না, অধর্ম্মে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সত্যেতেই আনন্দিত হয়, তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে, এবং তাবৎ সহ্য করে।"

গৃহিণি, তুমি কি বিশ্বাস কর, এক্ষণ বঙ্গদেশে কতকগুলি লোকের মধ্যে প্রীতির নামে যে সকল ব্যাপার হইতেছে সে সকল বাস্তবিক প্রীতি? না, স্বদেশের ও স্বজাতির বিষম অনিষ্টজনক হিংসা দ্বেষ। সম্মিলননামে স্বজাতির সঙ্গে যোগস্থাপন নামে কতকগুলি উপকারী লোকের কৃত উপকার অস্বীকার, তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ বিচ্ছেদ ও শত্রুতা সাধন: এসকল পরদ্বেষ, স্বার্থান্বেষণ, আত্মশ্লাঘা ও নানা প্রকার অনুচিত ব্যবহার কি প্রীতি? তুমি কি তোমার বালক বালিকাদিগকে প্রীতির নামে এই সকল বৈর সাধন ও অপ্রীতির কার্য্যে প্রশ্রয় দিবে? উৎসাহ দিবে?

—

আমাদের অবস্থা।

সম্পাদকীয় উক্তিতে, "আমি" ও "আমার" এরূপ এক বচনস্থলে আমরা ও আমাদের বহুবচন শব্দ প্রয়োগ করা চিরন্তন প্রচলিত নিয়ম। প্রবন্ধের শিরোনাম "আমাদের অবস্থা" বিষয়টির সকল কথা বুঝিতে পাঠিকাদের পক্ষে জটিল হইয়া না পড়ে এই উদ্দেশ্যে "আমরা" ও "আমাদের" পরিবর্ত্তে সোজাসোজি "আমি" ও "আমার" শব্দ সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতেছে।

আমি প্রায় ৬ মাস যাবৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি। এপর্য্যন্ত মহিলাতে পীড়ার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে দুই তিনবার সংবাদস্তম্ভে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বন্ধুগণ ও নানা স্থানের পাঠিকা কন্যাগণ আমি যে পীড়িত মোটামোটি জ্ঞাত হইয়াছিলেন, লোকপরম্পরায় এবং পত্র যোগেও অনেকে জানিতে পারিয়াছেন। আমি গর্ভধারিণী বৃদ্ধা জননীকে পৃথিবীতে হারাইয়া মাতৃহীন হই নাই। দেশ বিদেশের অনেক তরুণবয়স্কা কন্যা আমার ন্যায় বৃদ্ধের মাতৃস্থানীয়া হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের আমার প্রতি অধিক স্নেহ, এবং আমার জন্য অধিক ভাবনা। তাঁহারা আমার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া থাকেন। আমি দুর্ব্বলতা বশতঃ নিজে সকল সময়ে পত্রের উত্তর দান করিতে পারিতেছি না। সময়ে সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন ভাবিয়া অন্য লোক দ্বারা সংক্ষেপে উত্তর লিখিয়াছি। তাহাতে তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হন নাই। এই সকল মা আমার জন্মিবার বহু বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিতান্ত বয়ঃকনিষ্ঠা হইলে কি হইবে, কিন্তু এই রুগ্ন বৃদ্ধের প্রতি স্নেহ ভালবাসায় ৯৪ বৎসরবয়স্কা স্বর্গগতা বৃদ্ধা জননীকে অতিক্রম করিয়াছেন। নিজের রোগ ও দুর্ব্বলতাদি বিষয়ে আমি বিস্তারিতরূপে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন পত্রে লিখিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের অবগতির জন্য এবার মহিলাতে আনুপূর্ব্বিক তাহা লেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ দুইটী কন্যার পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

বাঁকিপুর হইতে একটী কুমারী কন্যা বিগত ১০ই অক্টোবর নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রের মধ্যে শেষ পত্র।

"অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাইনি। মনটা তাই বড় অস্থির হয়েছে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে বলে অনেক সময় কাহারই সংবাদ নিতে পারি না। আপনার গিরিডি যাওয়ার কথা ছিল, বোধ হয় গেছেন। জানিনাত, সেখানকার ঠিকানাও জানি না। তাই ৩নং পাঠাইলাম। আশা করি তবুও পাবেন। ওখানে গিয়া শরীর কেমন বোধ করছেন? আপনার সঙ্গে কে গেছেন? কে সেবা যত্ন করেন? কাহার চিকিৎসা হচ্ছে? কার বাড়ীতে আছেন? ওখানকার জল হাওয়ার পরিবর্ত্তনে শরীরের উন্নতি কেমন বোধ করেন? এসব বড় জানতে ইচ্ছা হয়।

বিশেষতঃ শরীর কেমন আছে এখন, অনেক দিন শুনিনি। জান্‌বার জন্য মনটা বড় অধীর হয়েছে। যদি শীঘ্র জান্‌তে পাই বড় সুখী হব। ওখানে দুধের ব্যবস্থা কি রকম হয়? আর সব খাবার ব্যবস্থাই বা কি রকম করেছেন? খুব পেট ভরিয়া ডাক্তারে যে খাইতে নিষেধ করেন, তা জানি। কিন্তু দিনে বারে অনেক বার খাইতেও কি নিষেধ? সকল বিষয় অনুগ্রহ করিয়া যদি পারেন লিখিবেন, তা যদি না পারেন কেহ যেন লিখিয়া জানান। মহিলা পাইয়াছি। এবারকার মহিলায় বেশ পড়বার ও জানবার বিষয় আছে।"

এই পত্রখানা একটী ব্রাহ্মিকা কন্যা কর্ত্তৃক লিখিত। নিম্নলিখিত পত্রাংশ, সাহিত্যসেবিকা মতিচুর পুস্তকের রচয়িত্রী সুকবি মোসলমান কন্যা আর্ এস্ হোসেন কর্ত্তৃক লিখিত; * * * "পত্রে আপনার কঠিন পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই আপনার মায়ের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জীবনক্ষয় করিলেন, আপনার এ ঋণ আমরা (নারীজাতি) কখনও শোধ করিতে পারিব না।—(পারিলে) শোধ করিতে চাহিবও না। আপনার পবিত্র চরণে ঋণবদ্ধ হইয়া থাকিতেও সুখ আছে। পরম করুণাময় আপনাকে রোগমুক্ত করুন।

আমিনা

* * * *

"আপনি ইদানীং যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহাতে আমার ভয় হইয়াছিল যে, আপনার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এত শ্রম কি মানুষের সহ্য হয়? মাঝে মাঝে আপনার সংবাদ পাইলে বাধিত হইব। নানা কারণে আপনাকে পত্র লিখিতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে ভুলি নাই। আজি যেই একটু সুবিধা পাইয়াছি অমনি প্রথমে আপনাকেই চিঠী লিখিতে বসিলাম। এক রাশি পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে, সে সব আর আজ লেখা হইবে না। আপনার আরোগ্য কামনা করি।"

"আপনার অতি স্নেহের মা।"

আমার অবস্থা;—বিগত ১৬ই বৈশাখ রাত্রিতে আমাকে রাঁচি নগরে যাত্রা করিতে হয়। তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এক দিন আমি তথায় গমনে উদ্যোগী হইয়াছিলাম, সেস্থান হইতে সমাগত কোন কোন বন্ধু আমাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন, এই সময়ে রাঁচিতে অত্যন্ত উত্তাপ, আপনি সেই উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবেন না, আপনার এক্ষণ না যাওয়া ভাল, অসুখ হইবে। আমি তিন বৎসর পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ভীষণ উত্তাপের সময়ে লক্ষ্ণৌতে, লাহোরে এবং উত্তপ্ত চুল্লি সদৃশ ঝান্‌সী নগরে বাস করিয়াছি, তখন লাহোরে এরূপ অসহ্য গ্রীষ্মোত্তাপ হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে দুই দিন উর্দ্দূ ভাষায় বক্তৃতা এবং একদিন হিন্দিতে উপাসনা করা নির্দ্ধারিত ছিল, উত্তাপের একান্ত বৃদ্ধি হওয়াতে একদিনের বক্তৃতা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হওয়া গিয়া-

ছিল। আমি অবিলম্বে লাহোর হইতে সিন্ধুদেশে সামুদ্রিক শীতল বায়ু সেবনের জন্য আরব সমুদ্রের তীরবর্ত্তী করাচি বন্দরে চলিয়া গিয়াছিলাম, তথা হইতে হায়দরাবাদ হইয়া রাজপুতনার দুস্তর মরুভূমির পথে গ্রীষ্মপ্রধান আজমির, জয়পুর, এবং আগ্রা প্রভৃতি নগরে গিয়া ২।৪ দিন করিয়া স্থিতি করিয়াছিলাম। আমি কেন রাঁচির গরমের কথা শুনিয়া তথায় যাইতে ভীত হইব? রাঁচি যতদূর উষ্ণ হউক না কেন আমি সামান্য ও তুচ্ছ মনে করিয়াছিলাম; বন্ধুদের কথা কর্ণে স্থানদান করি নাই। যাহা হউক কোন বিঘ্ন হওয়াতে আমি সেদিন রাঁচিতে যাত্রা করিতে পারি নাই। তাহার অব্যবহিত পরেই হিমাচল শিখর খর্শিয়ং পর্ব্বতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আমার স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান্ গঙ্গা গোবিন্দ গুপ্ত কয়েক বৎসর হইতে রাঁচিতে কমিশনারের পার্সেনেল আসিষ্টান্টের পদে নিযুক্ত আছেন, তথায় তিনি সপরিবারে বাস করিতেছেন। এক বৎসর হইল লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর মহানুভব ফ্রেজার সাহেবের উদ্যোগে রাঁচিতে রেলওয়ে খোলা হইয়াছে, তথায় গমনাগমনের আর কোন কষ্ট নাই। ভাগিনেয় তথায় যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং পাথেয় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন. অপিচ তিনি জানাইয়াছিলেন, এখন এস্থান যদিও গরম, কিন্তু অচিরেই বৃষ্টি হইবে, তখন এস্থান অতিশয় রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। আপনার যখন শরীর সুস্থ ও সবল নয়, তখন এখানে আসিয়া কিছুকাল আমাদের নিকটে বাস করা ও আমাদের সেবা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ইতি পূর্ব্বে আমার শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হ য়া পড়িয়াছিল। রোগ বিশেষের সঞ্চারে আমি ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্যাদির বিশেষ নিয়ম পালনে বাধ্য হইয়া ছিলাম, কিয়ৎ দিনের ধ্যে রোগের প্রশমন হয়, কিন্তু দুর্ব্বলতার বিশেষ হ্রাস হয় নাই। তখন কোরাণের অনুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় আমাকে সংশোধনানন্তর তাহার তৃতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। জল বায়ু পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য কলিকাতা হইতে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার উদ্যোগী হইয়াছিলাম এই কারণে তাহা আর হইল না। সটীক কোরাণের তৃতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রুফ ইত্যাদি সংশোধন না করিলে চলে না, সুতরাং আমি কলিকাতায় থাকিতে বাধ্য হইলাম; ছাপা খানার লোকদিগের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করাইয়া প্রত্যহ এক একটি ফরমা মুদ্রাঙ্কিত করাইতে লাগিলাম। স্মল পাইকা ও বর্জ্জাইস অক্ষরের রয়েল প্রায় এক শত ফরমা পুস্তক সত্বর মুদ্রিত করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া বিশ্রাম করিব আমার এই সঙ্কল্প ছিল। তখন আমার পক্ষে ইহা কিছু অধিক কষ্টদায়ক হইয়াছিল। এরূপ সত্বর মুদ্রাঙ্কনজন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া তাড়াতাড়ি সেই বৃহৎ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে আমি অনেক ঋণগ্রস্তও হইয়া পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক কোরাণের তৃতীয় সংস্কর সমাপ্ত হওয়ামাত্র আমি

রাঁচিতে প্রিয় ভাগিনেয়ের আবাসে কিছুকাল স্থিতি করিয়া সেবাপ্রিয়া বধূমাতার বিশেষ সেবা ও যত্নে শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য ১৬ই বৈশাখ রাত্রি ১০ টার গাড়ীতে যাত্রা করি। ১৭ই প্রাতঃকালে পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া আমাকে রাঁচির গাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। আমি পুরুলিয়া জংশন হইতে ৮।৯ ঘণ্টার মধ্যে রাঁচিতে পৌছি, তখন এত উত্তাপ ছিল যে, এই সময়টুকু যেন আগুনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। বেলা ৪ টার সময় রাঁচি ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি, শ্রীমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও এক জন আরদালি ঘোড়ার গাড়ীসহ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। ষ্টেশন হইতে শ্রীমানের আবাস নগরের এক প্রান্তে, প্রায় তিন মাইল দূরে। আমি গৃহে পৌছিয়াই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত প্রাপ্ত হই। স্নানাগারে স্নান করিয়া ভোজন করিতে যাইব, তখন বধূমাতা সাবধান করিলেন, যেন উষ্ণ জল না মিশাইয়া হটাৎ ঠাণ্ডা জলে স্নান না করেন তাহা সহ্য হইবে না। সেখানকার জল বড় শীতল কেহই তাহাতে গরম জল না মিশাইয়া স্নান করিতে পারে না। আমি মহা উত্তপ্ত আগার গরম জলে স্নান করিব ভাবিয়া মনে একটু দুঃখ হইল। কিন্তু পরে জল স্পর্শ করিয়া দেখিলাম যেন বরফের জল, ভয়ানক গরমের সময়েও সেই জলে স্নান করিলে সর্ব্বাঙ্গে কম্প উপস্থিত হয়। সে জন্য কেহই গরম জল মিশাইয়া তাহার শীতলতার হ্রাস না করিয়া তাহাতে স্নান করেন না। ভীষণ উত্তাপজনিত তৃষ্ণার সময়েও রাঁচিতে বরফের প্রয়োজন হয় না। এক গ্লাস কূপোদক পান করিলেই বরফের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। বিশেষ বিশেষ কূপের জল চমৎকার মুখপ্রিয়।

যাহা হউক আমি ভাগিনেয়ের বাড়ীতে নানা বিষয়ে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম। তাঁহার কোঠা বাড়ী, তিন দিকেই খোলা মাঠ। আমি সকালে বিকালে পাদচারণা করিয়া ও প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিশেষ রূপে তৃপ্ত হইতে লাগিলাম। আমার থাকিবার ও বসিয়া লেখা পড়ার কাজ করিবার জন্য সেই গৃহের একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহাতে কি হইবে, দিন দিন উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার যাওয়ার পর প্রায় এক মাস অতীত হইতে চলিল, এক বিন্দু বৃষ্টি নাই, দিনের বেলায় লু চলিতে লাগিল, রাত্রিতে হাওয়া বন্ধ। তথাকার অধিবাসীরা বলিয়াছেন রাঁচিতে এরূপ গরম পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, আমি রাত্রিতে ঘরের ভিতর থাকিতে না পারিয়া খোলা বারণ্ডায় মাদুরে শয়ন করিতাম। কিয়ৎ দিনের মধ্যে দেখি শ্বাস-কষ্ট হইয়াছে, ও অরুচি জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে বিকাল বেলায় ভ্রমণ করিতে যাইয়া এক মাইল দেড় মাইল পথ চলিতে আয়াস হইত না। এক্ষণে দুই চারি পদ চলিতে যেন বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে। ৪ঠা আষাঢ় মধ্য রাত্রিতে শ্বাস-কষ্ট অতিশয় বৃদ্ধি পায়, আমার বাক্‌শক্তি যেন রোধ হইয়া আসিয়াছিল, ঘন শ্বাসের শব্দ দূর হইতে শুনা যাইতে ছিল, ঘর্ম্মের স্রোতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া বরফের ন্যায় শীতল হইয়া

গিয়াছিল। শ্রীমান্ জানিতে পারিয়া অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। কিয়ৎক্ষণ পরে যন্ত্রণার লাঘব হয়, জোরে বাতাস করাতে শ্বাসের রোধ ও ঘর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। আমি একটু ঘুমাইতে সমর্থ হই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পারিবারিক উপাসনা হইতেছিল, সে দিন আমি পূর্ণ উপাসনা করিতে পারি নাই, সংক্ষেপে প্রার্থনামাত্র করিয়াছিলাম। সকালে ডাক্তার ডাকান হয়, তথাকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নরেশ্বর বাবু cheast পরীক্ষা করিয়া বলিলেন Heart discast এর সঙ্কা হইয়াছে। ডাক্তার বাবু ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। প্রায় মাসাবধি কাল তাঁহার ব্যবস্থা মতে ঔষধ সেবন ও নিয়মে থাকা হইল, তিনি অর্থ প্রত্যাশা না করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া chest পরীক্ষা করিয়া বলেন, রোগের হ্রাস হয় নাই। এ দিকে আমি শ্বাস কষ্টের জন্য রাত্রিতে ঘুমাইতে পারি না, ক্ষুধা মন্দ, অরুচিতে কিছুই খাইতে পারি না। বধূমাতা একজন সুপাচিকা, তিনি পূর্ব্ব বঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ও নিজের উদ্ভাবিত নানা প্রকার মুখরুচিকর নিরামিষ ব্যঞ্জন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিতেন, তাহা খাইতে আমার কিছুই প্রবৃত্তি হইল না। তখন দুগ্ধ পানের উপর আমার এক প্রকার জীবন ধারণ হইতেছিল। রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য যত্ন করিতাম শ্বাস-কষ্টের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হইত, এদিকে অরুচির জন্য খাইতে পারিতে ছিলাম না। আমি দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলাম। অগত্যা কলিকাতায় যাইয়া ডাক্তার আচার্য্যের গৃহে স্থিতি করিয়া তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকা পরামর্শ স্থির করা গেল। ডাক্তার আচার্য্যের পত্নী আমার আপনার ভাগিনেয়ী। সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষা ও যত্নের কোন ত্রুটি হইবার কথা নয়। দুই দিন পূর্ব্বে আমি ভারতের উত্তর প্রান্ত পেশওয়া হইতে দক্ষিণ প্রান্ত করাচি বন্দর পর্য্যন্ত নির্ভীক্ হৃদয়ে একাকী ভ্রমণ করিয়াছি। আজ ১৬।১৭ ঘণ্টার পথ কলিকাতা যাইতে আমার সাহস ও শক্তি নাই। কলিকাতা হইতে এক জন যুবক বন্ধু আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইবার জন্য পত্র লেখা গেল। তদনুসারে ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ রাঁচিতে যাইয়া সঙ্গে করিয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া আইসেন। ডাক্তার বাবুর মত গ্রহণ করিয়াই রাঁচি হইতে যাত্রা করা গিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত সাবধানে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, গাড়ীর ঝুলানীতে বিশেষ কষ্ট হইলে পুরুলিয়াতে Halt করিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহা আর করিতে হয় নাই। ২৬শে আষাঢ় মধ্যাহ্ন কালে আমি রাঁচি হইতে বিদায় গ্রহণ করি, প্রিয় ভাগিনেয় বিষণ্ণ বদনে আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া যান। রাঁচি দুই হাজার ফিট উচ্চ ছোট লাট সাহেবের অতিশয় আদরের স্থান। তিনি রাঁচিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন, দার্জিলীং অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান

বলেন, প্রতি বৎসর ২। ৩ বার করিয়া রাঁচিতে যাইয়া সার্কিট হাউসে ১৪। ১৫ দিন যাপন করেন। তাঁহারই উদ্‌যোগে শিবপুর হইতে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ রাঁচি নগরে উঠিয়া যাইতেছে, অন্য অনেক বড় বড় কার্য্যালয় তিনি রাঁচিতে স্থাপনে উদ্যোগী। তাঁহার ভালবাসায় ও দৃষ্টান্তে বাঙ্গালা দেশের বড় লোকেরা রাঁচিকে ভাল বাসিতেছেন, ও স্বর্গ তুল্য মনে করিতেছেন, বর্দ্ধমানের রাজা প্রভৃতি রাঁচিতে বিশ্রাম-ভবননির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আমার ন্যায় গরিবের প্রতি রাঁচি প্রসন্ন হইলেন না, ২। ৪ মাসের জন্যও স্থান দিলেন না, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

আমি ২৮শে আষাঢ় প্রাতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ডাক্তার আচার্য্যের হ্যারিসন রোডস্থ নবনির্ম্মিত ভবনে যাইয়া স্থিতি করি ও তাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়া থাকি. এবং স্নেহের ভাগিনেয়ীর প্রাণগত সেবা যত্ন প্রাপ্ত হইতে থাকি। সুপ্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন আর এল্ দত্ত মহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কলিকাতায় উপস্থিতির এক দিন পরে কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ আমার কথা শ্রবণ করিয়া অযাচিত ভাবে আমাকে দেখিতে আইসেন। ডাক্তার আচার্য্যের নিকটে রোগের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি আমাকে নানা বিষয়ে সাবধান করেন, বিশেষ ভাবে শারীরিক মানসিক বিশ্রাম করার কথা বলেন, মানসিক উত্তেজনা অধিকতর শরীর চা না না হইলে এক মাসের মধ্যে রোগের নিবৃত্তি হইবে এরূপ আশা দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার সমুদয় উপদেশ পূর্ণরূপে পালন করিতে সমর্থ হই নাই।

প্রেরিত দরবার হইতে ১৪ বৎসর হইল আমি মহিলা পত্রিকাসম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া তৎকার্য্যে ব্রতী আছি। ইহার লাভালাভ ও অর্থাদির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা দরবারের পত্রিকা। আমি দূরতর দেশে থাকি, বা পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকি, সকল অবস্থায় আমাকে যথাসময় ইহার জন্য প্রবন্ধাদি যোগাইতে হয়। দুই এক জন নারীহিতৈষী বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া অনিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি দান করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন মনস্বিনী মহিলা গদ্য বা পদ্য রচনা সময়ে সময়ে পাঠাইয়া মহিলার হিতসাধন করেন। তাহার উপর কিছুই নির্ভর করা যায় না। আমি এই সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া মহিলার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং সময়ে সময়ে প্রুভ সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছি, সম্পাদকীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চিন্তা ও মানসিক উত্তেজনা হইতে মুক্ত করেন, আমি এমন কাহাকেও প্রস্তুত প্রাপ্ত হই নাই। তবে কোন বন্ধু নিজে রোগাক্রান্ত হইয়াও কিছু কিছু লেখা যোগাইয়া প্রুভ সংশোধন করিয়া সাহায্য করিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত আমি ইহা স্বীকার করি। আবার কেহ কেহ কোন কোন লেখা সম্বন্ধে অথবা বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া আমার মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে ত্রুটি করেন নাই। পূর্ব্বে মহিলা ঠিক প্রতি

মাসে প্রকাশিত হইত, এক্ষণ জানি না মুদ্রাঙ্কণের সুব্যবস্থার অভাবে না কি কারণে পর মাসে ১২ই ১৩ই প্রকাশিত হয়। আজ ১৪ই কার্ত্তিক গিরিডিতে বসিয়া কার্ত্তিক মাসের মহিলার জন্য এই প্রস্তাব লিখিতেছি, কিন্তু আশ্বিন মাসের মহিলা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ অনিয়মের জন্য—সত্যের অপলাপ হওয়ায় মন ক্ষুব্ধ হইতেছে।

সুবিস্তীর্ণ আরব্য ভাষার হদিস শাস্ত্র মেশ্‌কাত শরিফের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্ববিভাগ বহু বৎসরের যত্ন পরিশ্রমে সমাপ্ত হইয়াছে, সম্প্রতি উত্তর বিভাগের অন্তর্গত ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে আর ৬ খণ্ড হইলে উত্তর বিভাগ সমাপ্ত হইয়া উক্ত মহাশাস্ত্র পূর্ণ হইতে পারে। আমি রাঁচিতে বসিয়া অবকাশমতে চতুর্থ খণ্ডের কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া যন্ত্রস্থ করিতেছিলাম, পারস্য ভাষার একখানা সাধন ভজনসম্বন্ধীয় গভীর আধ্যাত্মিক পুস্তক মকতুব শরিফ (মহালিপি) * কিছু কিছু অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। হদিস পুস্তক কিয়দ্দূর অনুবাদ হ য়াছে, এবং কয়েক ফরমা ছাপা হইয়া আসিয়াছে ইতিমধ্যে আমি দারুণ রোগে আক্রান্ত হই। বাধ্য হইয়া আপাততঃ উক্ত মকতুব শরিফের অনুবাদে নিবৃত্ত থাকি। কিন্তু হদিস কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে প্রকাশ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হই। আমি আশ্বিন মাসে উক্ত চতুর্থ খণ্ড হদিস বাহির করিয়াই গিরিডিতে চলিয়া আসিয়াছি। নদীয়া জিলার এক জন মোসলমান প্রচারক বন্ধু হদিসের অনুবাদ সমাপ্ত দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সেই অনুবাদ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বা আমি দেহত্যাগ করি, তজ্জন্য তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদের বিশেষ ভাবনা। এক সময়ে তিনি আমার দীর্ঘ জীবনের জন্য মস্‌জেদে মণ্ডলীসহ প্রার্থনাদি পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আমিতো এরূপ অসুস্থ ও দুর্ব্বল, এদিকে তিনি ৪র্থ খণ্ড হদিস প্রাপ্ত হইয়া ৫ম খণ্ড অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি কিনা গত ১০ই কার্ত্তিক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তাঁহার পত্র এই, "বিনীত সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন" ৪র্থ খণ্ড হদিস ও পত্র পাইয়াই তাহার উত্তর যথাসময়ে দিয়াছি। পাইয়াছেন কিনা জানি না! যাহা হউক পত্রপাঠমাত্র কুশল লিখিবেন। আজকাল আপনার শরীর কেমন? ক্রমশঃ শরীরের অবস্থা ভাল হইতেছে কি না? হদিস সম্বন্ধে কি করিতেছেন? লিখিলে সুখী হইব।"

আমি রোগের বর্ত্তমান অবস্থায় দুরূহ আরব্য পুস্তক হদিসের অনুবাদে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্ক নিপীড়ন ও রোগবৃদ্ধি কি করিতে পারি? এই সকল অনিবার্য্য কারণে আমি ডাক্তার দত্ত সাহেবের উপদেশ সমগ্র পালন করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি, মানসিক উত্তেজনা ও চিন্তার হাত এড়াইতে পারি নাই।

---

* "মাকতুব শরিফ" শরফোদ্দীন নামক একজন মহামান্য সাধু কর্ত্তৃক লিখিত শততম মহালিপি। ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে সেই এক শত লিপির মধ্যে ৭। ৮ লিপি অনুবাদিত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমি ডাক্তার আচার্য্যের চিকিৎসাধীনে তাঁহার আবাসে প্রায় আড়াই মাস স্থিতি করিয়াছি। এত দিন তিনি নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ Heart পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। আমি তাঁহার দ্বিতল গৃহের একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সঁড়ি দিয়া ত্রিতলে আরোহণ করা বা নীচে অবতরণ করা আমার সম্বন্ধে বিধি ছিল না। দুই চারি পদ চলা আমার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার ছিল। একদিনও আমি ত্রিতল গৃহে আরোহণ করি নাই, কিন্তু আড়াই মাসের মধ্যে কেবল তিন দিন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অনুমতি গ্রহণ করিয়া কোনরূপে নীচে নামিয়াছিলাম। ক্রমে আহারে রুচি জন্মিয়াছে। মধ্যাহ্নে অন্নভোজন ও দুগ্ধপান, প্রাতে টোষ্ট রুটি ও দুগ্ধ এবং অপরাহ্নে ফলাদি ভক্ষণ, অপিচ রাত্রিতে রুটি ও দুগ্ধ পথ্য ছিল। শরীর এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমি ৩।৪ দিন প্রাতঃকালে ভাগিনেয়ীকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে সংক্ষেপে উপাসনা করিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ আয়াস ও শ্রান্তি বোধ হওয়াতে তাহা হইতে নিবৃত্ত হই।

দেড় বৎসর পূর্ব্বে আমি বর্ম্মদেশে বাস করিয়াছিলাম. তখন বেশ ভাল ছিলাম, শরীর অতিশয় সুস্থ ও সবল ছিল। বর্ম্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয়ে তথাকার একজন প্রধান উকীল বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার বয়স কত? আমি ৭১। ৭২ বৎসর বলিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি ভুল বলিয়াছেন। ইহা বলিয়া নিকটে উপবিষ্ট তাঁহার এক জন বন্ধুকে বলিলেন, আপনি ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলুন দেখি ইহার কত বয়স হইবে। তিনি বলিলেন ৫০। ৫১ বৎসর হইবে। রেঙ্গুণে বারিষ্টার পি, সি সেনও তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি ৭১। ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে বলিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি আমি ভুল বলিয়াছি বলিয়া স্বীয় পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি ইহার কত বয়স? তিনি ৫০ বৎসর বলিয়াছিলেন। ৫০ বৎসরের পুরুষকে বৃদ্ধ কে বলে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কর্ম্মচারীদিগকে বৃদ্ধ বলিয়া পেনসন দানে কর্ম্ম হইতে বিদায় দান করেন, ৫৫ বৎসরের পূর্ব্বে বৃদ্ধ বলেন না। দুই জনেই সাক্ষ্য দান করিলেন, আমার ৫০ বৎসর বয়স, তখন আর আমি বৃদ্ধ কিরূপে? এ দিকে আমি জানি আমার ৭১। ৭২ বৎসর বয়স, দুই এক বৎসর নয় ২০। ২১ বৎসর অধিক। কিন্তু আজ কাল আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহা দেখিয়া কে আমাকে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ বলিবে না? যাহা হউক, বৃদ্ধত্বের বিশেষ লক্ষণ কেশপুঞ্জের শুক্লতা, দন্তের স্খলন ও ধনুর ন্যায় পৃষ্ঠদেশের বক্রতা। এ সকল আমার শরীরে সম্পূর্ণ ঘটে নাই, কেশ শুভ্র হইয়াছে বটে, সমস্ত নয়, এক্ষণও গঙ্গাযমুনা সম্মিলনের ন্যায় সাদা কালতে মিশ্রিত চুল, কিন্তু দন্তের স্খলন এবং পৃষ্ঠের বক্রতা এখ-

নও হয় নাই। ইহা কি চল্লিশ বৎসর নিরামিষ ভোজনের ফল নয়? এক জন পারস্য কবি বলেন।

"মূয়ে সফেদ আজ আজল আরদ পেয়াম : পোশ্‌তে খম ব আজল্‌ রছানদ সেলাম।"

অর্থাৎ শুভ্রকেশ শমনের পরওয়াণা—তলবনামা আসিয়াছে এরূপ ব্যক্ত করে, এবং শমন নিকটে উপস্থিত তাহাকে সেলাম করিতেছে, কুব্জপৃষ্ঠ এই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি কুব্জ হইয়া যাই নাই, অতএব শমন এখনও আমার নিকটে আইসে নাই, দূরে আছে। কিন্তু আমাকে ডাকিয়াছে। তাহার তলবনামা আসিয়াছে।

বৰ্ম্মদেশের একটী মা এক সময় লিখিয়াছেন "আমার বুড় ছেলে, কোন্‌ সময় না জানি তাহার কোন্‌ সংবাদ আইসে, আমার এই ভাবনা।" এদেশের একটী মা লিখিয়াছিলেন, "আমার মা আমার দাদার জন্য কেমন পাগল! আমার কি আর পাঁচটা ছেলে আছে? আমারই ভাবনা। আমার ন্যায় আপনার অনেক মা আছে।"

রাঁচিতে থাকিতেই অত্যন্ত সর্দ্দি কাসী হইয়াছিল, তাহা কিছুই সারে নাই। সৰ্ব্বদা গলায় কফ জমিয়াছে। কাসী নিদ্রার বিষম বিঘ্ন হইয়াছে, কয়েকটী ঔষধে কিছু কমিয়াছিল, পরে আবার বাড়িয়াছে। হ্যারিসন রোডের উপর ডাক্তার আচার্য্যের বাড়ী, দিবারাত্রি রাস্তার বিষম কোলাহল। বাড়ীর ভিতরের কাজও সমাপ্ত হয় নাই। দিবাভাগে রাজমিস্ত্রীদের গণ্ডগোল, তাহার উপর রোগ-যন্ত্রণা। আমি ঘুমাইতে না পারিয়া অনেক সময় ফাঁফর বোধ করিয়াছি। যাহা হউক পরে মূল রোগের অনেক উপশম দেখিয়া ডাক্তার আচার্য্য বলিলেন, এক্ষণ আর এখানে এই ভাবে বদ্ধ হইয়া থাকা উচিত নয়। একটি স্বাস্থ্যকর সমতল স্থানে যাইয়া কিছুদিন বাস করা এবং দুই বেলা ধীরে ধীরে পদচারণা করা কৰ্ত্তব্য। এই ব্যবস্থাতে আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, যেন কঠিন কারাগার হইতে মুক্ত হইলাম। গিরিডিতে বন্ধুবর বাবু অমৃত লাল ঘোষের সুন্দর আবাস বাটী, সে স্থানে যাইয়া কিছু দিন অবস্থিতি করা স্থির করিলাম। অমৃত বাবু আমার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আদর ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন দুর্গা পূজার ছুটী, রেল গাড়ীতে যাইতে ভয়ানক ভিড়, ভিড় কমিলে অমৃত বাবুর সঙ্গে গিরিডিতে যাত্রা করা স্থির হইল।

পেন্‌সন প্রাপ্ত বগুড়ার সিভিল সার্জ্জন রায় বাহাদুর ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাহ নগরে স্থিতি করিতেছেন, তিনি আমার পরম বন্ধু। অনুগ্রহ করিয়া ৩।৪ দিন আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, আহারাদির ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে আঙ্গুর বেদানা এপোল নাস্‌পাতি মনক্কা খৰ্জ্জুর ইত্যাদি কাবোলী সুরস পুষ্টিকর ফল। এই ব্যবস্থাতে আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। স্বর্গগত বন্ধু কুঞ্জবিহারী দেব দীর্ঘকালব্যাপী দুরারোগ্য রোগে

আক্রান্ত থাকিয়া সেইরূপ ফল খাইবার ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কৃতজ্ঞতাসূচক এইরূপ গান রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন;—মা আমার প্রতি তোমার বড় দয়া! আমি গরিব মানব, এইরূপ মূল্যবান্ সুমিষ্ট ফল খাইতে পাইতাম না, তুমি রোগ পাঠাইয়া আদর করিয়া তাহা আমাকে খাওয়াইতেছ। তোমার স্নেহ দয়া বলিহারি যাই! আমার পক্ষে কি এই কথা খাটে না? উক্ত ডাক্তার বাবু গিরিডিতে শীতে কষ্ট না হয় এই উদ্দেশ্যে গরম জামা ক্রয় করিয়া সঙ্গে দিয়াছেন। ডাক্তার দিগকে ভিজিট দিতে হয় না। যে সকল Priscrepson করেন সেই সকল ঔষধের মূল্যও তাঁহারা দিয়া থাকেন, তাহার উপর কথন কখন বস্ত্রাদি দান হয়। মজার ব্যাপার! তাঁহাদের হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান জীবনে হইয়া উঠিবে না।

ভিক্টোরিয়া কলেজের পূজার ছুটি হইলে আমি ৭। ৮ দিনের জন্য সেই বাড়ীতে উঠিয়া যাই। সেখানে উক্ত কলেজের ম্যানেজার ভাই ব্রজ গোপাল নিয়োগী সপরিবারে স্থিতি করিতেছেন। উহা একতালা বাড়ী, সম্মুখভাগে প্রমুক্ত সমতল ভূমি আছে, তথায় কিছু কিছু পদচালনা করিবার সুবিধা। পল্লীগ্রামের বাড়ীর ন্যায় তখন উহা নির্জ্জন ছিল। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া গৃহস্থ ও গৃহিণীদের সেবা লাভ করিয়া আমি বিশেষ আরাম বোধ করিয়াছিলাম। ১৮ই আশ্বিন প্রাতে ৬টার গাড়ীতে গিরিডিতে যাত্রা করা স্থির ছিল। অমৃত বাবু রাত্রি ভোর না হইতেই গাড়ীসহ তাঁহার দুই জন আত্মীয়কে পাঠাইয়া দেন। রাস্তায় আসিয়া ঘোড়া দুইটি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। শত প্রহার খাইয়াও এক পদ অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইল না। ভাবিলাম ট্রেণ হয়তো এই বিলম্বের জন্য পাওয়া যাইবে না। সঙ্গের এক জন বন্ধু দৌড়িয়া যাইয়া আর এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া আসিলেন। পথে অমৃত বাবুর গাড়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পোল পর্য্যন্ত যাইয়া দেখি পোল খোলা হইয়াছে, ৭ টার পর পোল জুড়িবে। তখন ট্রেণ পাইবার আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করা যায়। আমি চলৎশক্তিবিহীন, ফেরির জাহাজে মহাভিড়, তাহাতে পার হওয়ার সাধ্য নাই। সঙ্গের এক জন বন্ধু ধরাধরি করিয়া আমাকে ডিঙ্গি নৌকায় তুলিয়া দিলেন, তিনিই আমাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া ষ্টেশনে লইয়া গেলেন। ট্রেণ পাওয়া গেল। অমৃত লাল তাঁহার এক জন বন্ধুসহ নিজে ইণ্টার ক্লাশে উঠিলেন, আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তুলিয়া দিলেন। অপরাহ্ন ৫টার সময় ঈশ্বরের কৃপায় এখানে আমি নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিলাম।

কলিকাতা এক রাজ্য গিরিডি অন্য রাজ্য। ইহা এক নূতন স্থান। কলিকাতায় কোলাহলব্যঞ্জক অশান্তি, গিরিডিতে নির্জ্জনতা নিস্তব্ধতা ও শান্তি। গিরিডি, হাজারিবাগ জিলার সব্ডিভিজন কলিকাতা হইতে দুইশত মাইল দূরে। অমৃত লালের আবাস নগরের বাহিরে উত্তর

প্রান্তে উচ্ছীনাম্নী ক্ষুদ্র নদীর পার্শ্বে। সম্মুখে প্রমুক্ত মাঠ, এ স্থানে লোকালয় অধিক নাই, তবে এখন অনেক বাঙ্গালী বাবুর স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইতেছে। ইতস্ততঃ সতেজ শালতরু সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে উর্দ্ধ-মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগদ্বাসীদিগকে ধীরতা স্থিরতা ও যোগধ্যান যেন শিক্ষা দিতেছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ॥"

অর্থাৎ নিত্য পরমেশ্বর যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন, জগতের নিকটে তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। আপনার ভিতরে যে অত্যুৎকৃষ্ট রস আছে, বাল শালতরু নিজের সৌন্দর্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ করে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এখানে আসিয়া দেখিয়াছি রৌদ্রের উত্তাপে অপর বৃক্ষাদি দগ্ধ ও বিনষ্ট প্রায়, কিন্তু শালতরু জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া আরক্তিম নব পল্লবে সুশোভিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এজন্য ভাবুক সাধক-গণ শালবনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। তরুণ শালতরুকে দেবাধিষ্ঠিত পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়। কেহ তাহা ছেদন করিতেছে দেখিলে কষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় এস্থান সেত্‌সেতে নয়। এখানকার ভূমি শুষ্ক ও বায়ু শুষ্ক, সকলই অনার্দ্র, জলে লৌহের অংশ আছে তজ্জন্য এস্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। কলিকাতায় আমার দুই পা ফুলিয়া গোধের আকার ধারণ করিয়াছিল, এখানে আসার পর তাহা একেবারে সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু কফ কাসীর বৃদ্ধি হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া কলেজ বাড়ী সেত্‌সেতে, আর্দ্র, সেখানে কয়েক দিন বাস করাতে ও গ্রীষ্মোত্তাপবশতঃ ঘরের দ্বার জানালা খুলিয়া রাত্রি যাপন করাতে এবং আসিবার দিন প্রাতঃকালে হিম ভোগ করাতে বোধ করি কাসী বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্য অনেক সাবধানে আছি। ক্রমশঃ ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও শক্তি-বৃদ্ধি হইতেছে। দুই বেলা খোলামাঠে কিয়দ্দূর পথ চলিয়া বেড়ান যায়। কলিকাতায় পথ্যাদি যে নিয়মে হইত প্রায় সেই নিয়মেই হইতেছে। দুগ্ধের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করা গিয়াছে, সেখানে তিন বার দুগ্ধ পান হইত, এখানে চারি বার পান করা যায়। কলিকাতায় সায়ংকালে দুধ রুটি খাওয়া যাইত রাত্রিতে লঘু আহারের আবশ্যক হওয়াতে সায়ংকালে এখানে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মাত্র পান হয়। পূর্ব্বোক্ত কাবোলী ফল অনেক সময় খাওয়া যায়। অমৃতবাবু তাহা যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় এখানেও সুনিদ্রার অত্যন্ত অভাব।

অমৃত লাল স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌সত্যানন্দের জন্য একটি পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, ২৪শে শুক্রবার সেই গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। সত্যানন্দ ও তাঁহার কনিষ্ঠ প্রেমানন্দ এবং তাঁহাদের পূজনীয়া গর্ভধারিণী এবং নিমন্ত্রিত কতিপয় বন্ধু উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। পরে সেখানে

খিচরান্ন ভোজন হইয়াছিল। উপাসনা করিবার জন্য আমার প্রতি অনুরোধ ছিল, অশক্তিবশতঃ আমি সাহস করিতে পারি নাই। কলিকাতা হইতে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী আসিয়াছিলেন। তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন, আমি প্রার্থনা মাত্র করিয়াছিলাম। আজ যোগিপ্রবর সাধু অঘোরনাথ দেহে বিদ্যমান থাকিলে এই নব নির্ম্মিত গৃহকে যোগকুটিরে পরিণত করিয়া এখানে থাকিয়া আনন্দে সাধন ভজন করিতেন। এক্ষণ উহা ভাড়া দেওয়া হইবে। ছুটী উপলক্ষে নানা স্থান হইতে অনেক বন্ধু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। অমৃত লালের বাসগৃহের পর্শ্বে নিত্য উপাসনার জন্য অতিসুন্দর উপাসনাকুটীর নির্ম্মিত। আমি অনুরুদ্ধ হইয়া দুইদিন উপাসনার কার্য্য করিয়া অতিশয় ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আর সজন উপাসনা করি নাই। অমৃতলালের গৃহের নাম "তৃপ্তিকুটীর।" প্রথমে বহুলোকের বাসজন্য তৃপ্তিকুটীরে থাকিতে কিছু অসুবিধা হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশ চলিয়া যাওয়াতে এখন আর কোন অসুবিধা নাই। একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ আমার স্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অমৃতলালও কলিকাতা গিয়াছেন, তাঁহার পরিবার আর একটী যুবক বন্ধু এখানে আছেন। সেবা যত্নের কোন ক্রুটি হইতেছে না। নিয়মিতরূপে সকল কার্য্য চলিতেছে। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইতেছে। অমৃতলাল আমার সুখ সুবিধার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন।

আমার এখানে পঁহুছিবার অল্প দিন পরেই ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী আসিয়াছিলেন। এস্থান দেখিয়া তাঁহার মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি দুই তিন দিন এখানে ছিলেন, পুনঃ পুনঃ নদী তীরে শালতরু মূলে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। এখানে একটী সাধন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সময় সময় আসিয়া সাধন ভজন করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তিনি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহা হইলে এস্থানের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার হয়। আমার ন্যায় শারীরিক রোগ সারিবার জন্য সকলেই আসেন, আত্মার কল্যাণের জন্য কয় জন আসেন? যাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে আসেন তাঁহারাই ধন্য! এইস্থানে প্রাতঃ সন্ধ্যা সূর্য্যোদয়াস্ত কালে পূর্ব্বাকাশ ও পশ্চিমাকাশ বিচিত্র শোভা ধারণ করে। বিশ্বশিল্পীর অদৃশ্য হস্ত সমুজ্জ্বল পীত লোহিতাদি বর্ণে মনোহর রূপে আকাশকে রঞ্জিত করিয়া থাকে। মুহুর্মুহু বর্ণের পরিবর্ত্তন সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তন হয়, এরূপ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও নয়ন গোচর হয় নাই। সূর্য্যমণ্ডল ঘন শালবন হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে শালবনগর্ভেই লুক্কায়িত হইয়া থাকে। অপর কূলস্থ শালবনে দিনান্তে নিশান্তে নানাজাতীয় বিহঙ্গ মধুর স্বরে সঙ্গীত করিয়া কর্ণযুগলকে যেন সুধাশিক্ত করে। ভক্ত সাধকদিগের পক্ষে এরূপ অনুকূল স্থান আর কোথায় আছে? অসভ্য সাওতালদের অরণ্যাকীর্ণ পার্ব্বত্যদেশে বিচিত্রকর্ম্মা করুণাময় বিধাতার কত

লীলা ও মহিমা এবং করুণার প্রকাশ দেখা গেল। ধন্য লীলাময়ের লীলা! এস্থান হইতে ৬। ৭ মাইল দূরে নিবিড় শালবনের ভিতরে উচ্ছ্রীর জলপ্রপাতে বিচিত্র গম্ভীর দৃশ্য। এখানে আসিয়া অনেক লোক তাহা দেখিতে গিয়াছেন। আমি একপ্রকার চলচ্ছক্তিবিহীন, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। নিজের শারীরিক অবস্থা তদানুসঙ্গে অন্যান্য কথা লিখিতে লেখাটি সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভরসা করি রোগের অবস্থাদি জানাইবার জন্য স্নেহের মাদিগকে আর আমার পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পত্রলিখিবার প্রয়োজন হইবে না। এই লেখা পড়িলেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বার বার আমার স্বহস্তে পত্র লেখা বা অন্য লোক দ্বারা লেখান কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমি এখান হইতে অবিলম্বে অন্যত্র যাইবার উদ্যোগী। নবেম্বর মাস এ অঞ্চলে যাপন করার ইচ্ছা।

উপসংহার কালে বলিতেছি যে, আমি গ্রীষ্মকালে বুঁদেল-খণ্ডের প্রধান নগর ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ঝান্সিতে যাইয়া প্রচারের কার্য্য করিয়াছিলাম। ঝান্সির উত্তাপের তুলনায় রাঁচির উত্তাপ সামান্য। কিন্তু সেখানে যাইয়া কয়েক দিন থাকিয়াই আমি কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। রোগ উত্তাপ জনিত, না অন্য কোন কারণে তাহা জন্মিয়াছে. সুবিজ্ঞ ডাক্তরেরা বলিতে পারেন। ভগবান্ আমাকে এখন বসাইয়া রাখিয়া কি কাজ করাইবেন জানি না। বর্ত্তমান অবস্থায় লেখা পড়ার কাজে অধিক পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই। অধিক চিন্তা করিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মতি বাবুর পারিবারিক অবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ত্তা ও গিন্নীর স্নেহমমতায় ও শ্যামার বালিকাসুলভ সুমিষ্ট ব্যবহারে হারাধনের মনের কষ্ট ক্রমেই চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার বয়স বার বৎসর সুতরাং শ্যামা তাহার ৩ বৎসরের ছোট ছিল। সে বড় সুশীল বড় সুবোধ। মতি বাবু তাহাকে পড়িবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তাঁহার একজন ব্রাহ্ম বন্ধু ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা বালকের খবরাখবর লইতেন।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এবার হারাধনের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়। পূজা আগত প্রায়। হারাধন পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবে না চিঠি লিখিল। মতি বাবু ভাবিলেন, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, এবার পূজার আমোদটা যেন তাঁহারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভোগ করেন; বালক যেরূপ পড়া শুনা করিতেছে, সে নিশ্চয়ই এবার জলপানি পাইবে।

কর্ত্তা মনে মনে দুঃখিত হইলেও মুখে কিছু বলিলেন না। কিন্তু গিন্নীর মুখ বড় ভার হইল। আকাশে যখন মেঘ দেখা দেয়, বায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখনই বর্ষণ অনিবার্য্য। গিন্নীর মুখখানি ভার হওয়া মাত্র চক্ষু ও নাসিকা হইতে ঝর্ ঝর্ উষ্ণ প্রস্রবণ বহির্গত হইতে লাগিল।

নাকের নথ ভিজিল, বসন ভিজিল। তিনি কিছুক্ষণ কাঁদিয়া শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে বাবার চিঠি পড়া শুনিয়া ও মাতার কান্না দেখিয়া অভিমানে এক দিস্তা ডাক কাগজ 'আগুনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।' সে আর কখনো হারাধনকে চিঠি লিখিবে না—নিশ্চয় না। মার ডাক শুনিয়া বিরস বদনে আসিয়া উপস্থিত।

মা—তুই দোয়াত কলম কাগজ লইয়া আয়তো, শিগ্‌গীর আসিস্। মার হুকুম তামিল না করিলে নয়। তাই অনেক খুঁজিয়া শ্যামা কাগজ ইত্যাদি লইয়া আসিল। মা বলিলেন "আমি যাহা বলি হারুকে লেখ্ দেখি।"

মার পত্র।

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা হারু, তুমি নাকি এবার পূজায় বাড়ী আসিবে না? শিব বাবু (মতি বাবুর বন্ধু) লিখিয়াছেন, তুমি জলপানির জন্য এই কাঁচা বয়সে বড় খাটিতেছ। কেন? কে তোমাকে এই সর্ব্বনেশে বুদ্ধি দিল? গরিব ছেলেদেরই জলপানি না পাইলে নয়। তোমার কিসের অভাব? তোমার এই বয়সে কত ছেলের পড়াও আরম্ভ হয় না। আমার মাথার দিব্বি, তুমি ছুটির সময় অবশ্য অবশ্য বাড়ী আসিবে। নতুবা আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না।

তোমার মা।

শ্যামা কতক্ষণ কি ভাবিল; তার পর সে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

শ্যামার পত্র—

শ্রীচরণেষু—

তুমি গত গ্রীষ্মের ছুটিতেও বাড়ী আস নাই, পূজায়ও আসিবে না। জলপানির জন্য সকলকেই ভুলিয়াছ। কেন? আমি কি আর এখন তোমার সঙ্গে দুষ্টুমী করি? না, পড়া শুনার সময় ত্যক্ত বিরক্ত করি? যদি না আস, আমি ভগবতীর পায় ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিব তুমি যেন এবার পরীক্ষার ফেল হও।

শ্যামা।

যথা সময়ে হারাধন উভয় চিঠিই প্রাপ্ত হইল, শ্যামার চিঠি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। সেই দিনই মাকে লিখিয়া জানাইল যে, পূজার কয়দিন সে বাড়ীতেই কাটাইয়া যাইবে; তিনি যেন সেজন্য দুঃখিত না হন। শ্যামাকে লিখিল যে তাহার অভিসম্পাতের ভয়েই সে পূজায় বাড়ী আসিবে।

হারাধন ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। গিন্নীর মুখে হাসি আর ধরে না। তিনি তাহাকে ষাট্ ষাট্ বলিয়া কত স্নেহ আদর করিলেন। শ্যামা একটু লজ্জাশীলা। এক বৎসরের ভিতর তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হারাধন শ্যামাকে দেখিয়া খুব হাসিল। মা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে শ্যামার চিঠির কথা বলিল। তিনিও হাসিতে লাগিলেন।

পূজার আমোদ ফুরাইয়াছে। আজ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন। বাহির বাড়ীতে

ঢাক ঢোল মহারোলে চণ্ডীমণ্ডপ কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। একদল সাঁনাইবাদক করুণ-সুরে বিজয়া সঙ্গীত গাইতে লাগিল।

"আর কত দিনে দেখব মা তোমায় ত্রিনয়নী,
—দুর্গতি নাশিনী মা ত্রিতাপনাশিনী।"

গানের ভাবে স্ত্রীলোকদিগের শোকোচ্ছ্বাস বাড়িয়া উঠিল। সকলেরই দৃষ্টি প্রতিমার দিকে। পুরোহিত ঠাকুর পূর্ব্বেই দুর্গাঠাকুরাণীর চক্ষের নিম্নে কয়েক ফোঁটা জল দিয়াছিলেন; তাঁহার কান্না দেখিয়া সকলেই মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সাঁনাই বলিয়া উঠিল—

"কাঁদিস্‌নে, কাঁদাস্‌নে ও মা ভবতারা,
প্রাণে পাই ব্যথা সর্ব্ব দুঃখহরা।"

হারাধন পুরোহিত ঠাকুরের চালাকী বেশ বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, ভাল, ভাল, পুরুত ঠাকুর অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছেন"।

—এ সময় বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়? মতিবাবু নিজ শয়ন কক্ষে একাগ্র মনে কতকগুলি খাতাপত্র দেখিতেছেন। চক্ষু কিন্তু খাতার উপর নয়, দৃষ্টি দেয়ালের উপর সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। গহনার কিন্ কিন্ শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গল। তিনি মুখ ফিরাইয়া গিন্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন "আঁ কি বল্‌ছিলে?"

গিন্নি—ও মা, আমি কখন কি বল্লুম? বলি, তুমি ও রকম বসে বসে কি ভাব্‌ছ?

বাবু—দেখ, ভাবনাটা ছোট খাট নয়। আগে দোরটা বন্ধ কর, পরে বল্‌ছি।

গিন্নি অবাক হইয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

বাবু—কালই হারাধন চলিয়া যাবে; যেরূপ গতিক্ দেখ্‌ছি এ ছেলে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। শিবুর সঙ্গে থাকিয়া তা'র মতি গতি বদ্‌লে গিয়াছে। আজ সকাল বেলায় পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে তার যে সব তর্ক বিতর্ক হয়েছে তাহা শুনে আমি বেশ বুঝিয়াছি এ সব পুতুল পূজায় তা'র বিশ্বাস নাই। এখন ইহার একটা উপায় না কর্‌লে নয়।

গিন্নি দাঁড়াইয়াছিলেন, পালঙ্কের উপর মুখ খানা ভার করিয়া বসিলেন।

গিন্নি—হারুর শিগ্‌গির করে বিয়ে দাও, সব আপদ চুকে যাবে।

বাবু—তাতো বুঝিলাম। কিন্তু বিয়ে দিলে এ ছেলে কা'র হবে তা'কি ভেবে দেখেছ? তুমিতো তা'র গর্ভধারিণী যে একটা বাঁধাবাঁধি টান থাকিবে? পরের ছেলে, যেখানে আদর পাবে, যত্ন পাবে সেথ নেই যাবে।

গিন্নি—তাইতো, এখন উপায়? আ ম হারুকে ছেড়ে কেমন করে ঘরে থাক্‌বো গো—তিনি কাঁদিতে বসিলেন।

বাবু—তোমার সব কথায়ই কেবল কান্না। কেন কি হয়েছে? আমি শ্যামার সঙ্গেই তা'র বিয়ে দিব।

গিন্নী—নাকটা ঝাড়িয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন "সে তো ভয়ানক, কিন্তু হারু যে শ্যামাকে আপন বোনের মত দেখে।"

বাবু—তাতে কিছু আট্‌কাবে না, এতো কেবল মুখের ডাক বৈ নয়? তোমার ছেলে বেলার কথা ভুলে গেছ?

গিন্নী—এবার সহজ ভাবে মৃদুহাসে

মুখ খানা ঈষদ্ বাঁকাইয়া বলিলেন, "সব সময়েই তোমার ঠাট্টা তামাসা!"

হারাধনের সঙ্গে শ্যামার বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল। পরীক্ষার পর বিবাহের দিন কাল ঠিক হইবে। পিতা মাতার এই গুপ্ত পরামর্শ, কিন্তু সুচতুরা শ্যামার অগোচর রহিল না। সে কপাটের আড়ালে থাকিয়া সমস্তই শুনিল। ভোরের জাহাজে হারাধন কলিকাতায় যাত্রা করিবে, এতক্ষণ সে তাহারই কাপড় চোপড় বই ইত্যাদি ট্রাঙ্কে কত যত্নে রক্ষা করিতেছিল। পিতা মাতার কথা শুনিয়া বালিকা লজ্জায় মরিয়া গেল। আর তেমন ধারা গোছান হইল না। হারাধন আসিয়া দেখিল শ্যামার সঙ্গে ট্রাঙ্কের রুষ জাপানী যুদ্ধ বাধিয়াছে। সে কিছুতেই ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করিতে পারিতেছে না।

হারাধন। ওটা হচ্চে কি? বই ক'খানা কাপড়ের তলায় না রাখিলে বাক্সের ডালা যে ভেঙ্গে যাবে। শ্যামা— ও ছাই ভাঙ্গুগ্‌গে। একটা বড় ট্রাঙ্কও কি দিলে না?

হারাধন হাসিতে হাসিতে শ্যামের হাত ধরিল। শ্যামা মুখ নীচু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—এটা মাতৃধারা।

যাহা হউক কান্না শুনিয়া কর্ত্তা ও গিন্নী ঘরের বাহির হইলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, শ্যামার হাতে আঘাত লাগিয়াছে, তাই কান্না। মতি বাবু কিন্তু কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিলেন। তিনি বলিলেন "ওটা শ্যামার চালাকী; আজ বিজয়া, তাতে আবার রাত পোহালে হারাধন চলে যাবে, তাই শ্যামার কান্না।" তিনি এই বলিয়াই হাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। গিন্নীও মুখে আঁচল গুজিয়া হাসির ফোয়ারা চাপিয়া রাখিলেন। তাঁহার আজ কার্য্যের কুরুক্ষেত্র; তিনিও চলিয়া গেলেন।

হারাধন অবাক্ হইয়া দুঃখিত মনে শ্যামাকে বলিল, "শ্যামা একি? আমি যে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই ঘণ্টা খানেকের ভিতর তোমার যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে! আমার মাথার দিব্বি, বল ইহার অর্থ কি?"

শ্যামা—বেটা ছেলে মেয়েদের মত দিব্বি দিতে জানে কখনো শুনি নাই। তোমাকে এ রোগে কদ্দিন ধরেছে?

হারাধন—সে যা'উক, আসল কথা বল। কি হয়েছে?

শ্যামা—হবে আর বেশী কি? ওঁরা তোমার ও আমার বের সম্বন্ধ ঠিক করেছেন; আমি চুপে চুপে সব শুনেছি।

হারাধন—বটে? "কোন্ জায়গায়, কা'র সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে শ্যামা?"

শ্যামা বড় বেহায়া, বড় মুখরা। উত্তর করিল "আগে তোমার কথাই শোন, তার পর আমার কথা।"

হারাধন—"আমার বিবাহের জন্য ওঁরা এত ব্যস্ত কেন?"

শ্যামা—"পাছে তুমি পর হয়ে যাও, কেউ যদি পিছন থেকে তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।"

হারাধন—"শ্যামা, রহস্য ছাড়; আমার যে মৃত্যু যাতনা উপস্থিত।"

শ্যামা—"মাইরি! তবু ভাল, এখনো সামনে দাঁড়িয়ে আছ। শুনবে? তবে শোন, তোমার ও আমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা দুজনে তীর্থবাসী হবেন। আমার বিয়ে হইবে—হবে এক ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে। আর তোমাকে তাঁদের খুব আপনা আপনির মধ্যে বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে রাখবেন। তোমার জন্য যে কণে ঠিক হয়েছে সেটা বেজায় কালো, বড় কুৎসিতা; তাতে আবার ডান পা খানা খাটো। মেয়েটার বে হচ্চে না, তোমার ঘাড়ে চাপাতে হবে।"

হারাধনের চোখ মুখ বসিয়া গেল? মুখে বাক্য নাই, সে এক দৃষ্টে শ্যামার দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিল "ওকি? অমন ধারা চেয়ে আছ যে?"

শ্যামা দেখিল তাহার দুই চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া ইস্তিরি করা সাটটা ভিজিতেছে। শ্যামা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

হারাধন—"শ্যামা, এত দিনে বুঝিলাম এ সংসারে আমার কেহই নাই। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না।"

সে যেমনই ঘর হইতে বাহির হইবে, অমনই শ্যামা হাসিতে হাসিতে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া নিল "কোথায় যাবে? জলপানি তবে খাবে কে?"

হারাধন—"শ্যামা, তুমি বড় নিষ্ঠুরা, তুমি রাক্ষসী।"

শ্যামা—"আমি নিষ্ঠুরাও নই, রাক্ষসীও নই। তুমি যে, হারাচন্দ্র গঙ্গারাম তাই তাই দেখলেম। এই বলিয়া আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইতে মুছাতে কাণে কাণে কি বলিল। হারাধন লজ্জিত বদনে বাগান দেখিতে চলিল।"

— —

কেশবজননী সাধ্বী সারদা দেবী।

(৬৩ পৃষ্ঠার পর।)

আজ ৭। ৮ বৎসর পরে আবার বলিতেছি ইহার ভিতর আমার শোকের উপর শোক হইয়াছে। মেয়ে গেল, নাত বৌ মোহিনী সরযুবালা গেল, নবীনের মেয়ে শিলু গেল, আমার মেজ বৌ গেলেন, শেষে আমার কৃষ্ণ বিহারী পর্য্যন্ত গেলেন। এখন এক মাত্র ফুলেশ্বরী আছেন। এখন আমার নিজের শরীর ও মন কিছুই ভাল নাই। মনেও সব ঠিক আস্ছে না। যাহা হোক্ তুমি যখন লিখিতে চাহিতেছ তখন যাহা মনে আসে তাই তোমায় বলি।

আমার বৃন্দাবন দর্শনের কথাই বলিতে ছিলাম, সেখানে অনেক দেখিবার জিনিষ আছে। চরণ পাহাড়ী একটী দেখিবার বস্তু। আলতাপটী আমি যাই নাই। বড় চরণ পাহাড়ীতে রাধার চরণ চিহ্ন আছে। আমি তুলসী ও চন্দন সরাইয়া ফেলিলাম এবং যশোদা কুণ্ডের জল লইয়া তাহা ধুইয়া দেখিলাম তাহাতে বেশ আলতার ছাপ আছে, আমার দাসী তারাকেও তাহা দেখাইলাম। সে তাহা দেখিয়া তাহার উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে নবীন আমার জন্য

লুচির মচ্ছোব দিয়াছিলেন। আবার রাধাকুণ্ডে আমি ভাতের মচ্ছোব দিলাম। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, কত বামুন বৈষ্ণব একত্রে বসিয়া খাইলেন।

মথুরায় তোমার ঠাকুর দাদার শ্রাদ্ধ করিলাম, তাহাতে সমুদায় রূপার দান ইত্যাদি দিতে হইয়াছিল। আমি চারি মাস বৃন্দাবনে কাটাইয়া পরে কাশী আসিলাম, সেখানে দিন তিনেক থাকিয়া গয়াতে গেলাম, সেখানে বার দিন ছিলাম। আমি পাঁচ জায়গায় পিণ্ড দান করিলাম। তার পর বাড়ী আসিলাম। ইহার পর আমি আরও কয়েকবার তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বৃন্দাবনে তিন বার, জয়পুরে দুইবার একবার কৃষ্ণ বিহারীর সঙ্গে যাই। কেশবের সঙ্গে নৈনীতাল মুশুরী পাহাড়, লাহোর লক্ষ্ণৌ অমৃতসর কুরুক্ষেত্র এবং ইহার ভিতর অন্যান্য ছোট ছোট স্থান সব দর্শন করিয়াছিলাম।

আমি নববিধান প্রচারক শ্রীমান্ প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে হরিদ্বার দেখিতে যাই। মুশুরী পাহাড়ে আমার সঙ্গে প্রচারক বিজয় কৃষ্ণ ত্রৈলোক্য অমৃত, মহেন্দ্র ও হরনাথ বোস্ ইত্যাদি ছিলেন। দেরাদুনের গুহ্যপানী ও নালাপানী বড় চমৎকার দেখ্‌লে ভয় করে। পাহাড়ের গুহার ভিতর অন্ধকার, সেখানে কোনও খানে হাঁটু জল, কোন খানে কোমর জল, কোন খানে বুক জল, কোন খানে আবার পা ডুবে না, সব অন্ধকার। কেশব ও বাবুরা লাঠী ধরিয়া আস্তে আস্তে সে গুহার ভিতর দিকে কোন খান থেকে জল আসিতেছে দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আমার বড় যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু খানিক দূর গিয়াই পা পিছ্‌লে ভয়ানক পড়িয়া গেলাম। কি করিয়া যে বাঁচিলাম বলিতে পারি না। বোধ হয় এ সব কষ্ট ভুগিবার জন্য তখন বাঁচিয়া আসিলাম। অনেক কষ্টে উঠিয়া গুহ্যপানীতে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সন্ধ্যার সময় বাবুরা ফিরিয়া আসিয়া সেখানে চড়িভাতি করিয়া খাইলেন। আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল হাঁটিতে পারিলাম না। কেশব ও বাবুরা একটী বাঁশ আনিলেন, আমি তাহাতে জড়াইয়া রহিলাম, উঁহারা আমায় কাঁধে করিয়া বাসায় আনিলেন। আমরা দেরা-দুনে গোপাল চন্দ্র সরকারের বাড়ীতে ছিলাম। গোপাল বাবুর স্ত্রী আমার মেয়ের মতন আমায় যত্ন ও সেবা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের কত উপদ্রব করিয়াছি। এখন একবার তাঁহাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। এই গোপাল বাবুর বাড়ীতে প্রায় দু'মাস ছিলাম। আমার পা সারিলে লাহোরে গেলাম। পথে আমার সমস্ত জিনিস চুরী গেল, এমন একখানি কাপড় ছিল না যে আমি স্নান করিয়া পরি। প্রচারক প্যারীমোহন সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি তখন এত ভাল মানুষ ছিলেন যে, নামিয়া দেখিতে পারিলেন না। তিন দিন ভিজা কাপড়ে থাকি, পরে অমৃতসরে আসিলে প্রচারক মহেন্দ্র বাবুকে টাকা দিলাম। তিনি এক থান কাপড় কিনিয়া দিলেন, পরিয়া বাঁচিলাম। আমি আম্বালা হইতে কুরুক্ষেত্রে গেলাম, থানেশ্বরের

মহাদেব দেখিতে বেশ। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দেখিবার জিনিস বাণ গঙ্গা ও পদ্ম পুকুর। কুরুক্ষেত্রের নিকট এক খানি বাড়ী আছে। তাহাতে আমাদের কাঁচরা পাড়ার ব্রাহ্মণ মোহান্ত আছেন। সেখানে এক বাবু আমার নবীনের সঙ্গে চাকুরী করিতেন, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কেশব বাবুর মা, আপনি কেন তীর্থ করিতে আসিয়াছেন! আমি বলিলাম "তীর্থ এক একটী পুরাতন স্থান, এবং ভগবানের রাজ্য, দেখিতে দোষ কি?

দরোয়ান রাম গোলাম আমার সঙ্গে ছিল। আমরা রাস্তা ভুলিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম। বড়ই কান্না পাইতে ছিল। কিন্তু সেই সময় এক জন এক্কা গাড়ীর গাড়োয়ান আসিয়া আমরা কুরুক্ষেত্রে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিল এবং সেই গাড়োয়ান সঙ্গে করিয়া আমাদের দেশের লোকের কালী বাড়ীতে লইয়া গেল। তার পর দিন কুরুক্ষেত্রে যাই।

কুরুক্ষেত্র হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম; সেই বার চন্দ্র গ্রহণ ছিল। মাঝে এক জায়গায় আসিয়া আমার সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গেল, একেবারে নিরুপায় হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছি এমন সময় একটী ব্রাহ্মণের ছেলে আসিয়া আমায় অনেক যত্ন করিলেন, এবং শেষে আমার কি দুঃখ তাহা জানিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি টাকার কথা বলিলাম, তিনি আমায় টাকা আনিয়া দিলেন, আমি সেই টাকার দ্বারা কাশীতে আসিলাম। পরে সেই টাকা ব্রাহ্মণের ছেলে যাঁহাকে দিতে বলিয়াছিলেন তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। সে ছেলেটী দেখিতে অনেকটা ধর্ম্মপালের মত।

কাশীতে গিয়া দেখি কেশবও সেই সময় কাশীতে আসিয়াছেন।

কাশীতে কুচবেহারের গুজরাটি রাণীর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি একজন গুজরাটের অতি ভাল সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহ নামটী ভুলিয়া গিয়াছি, এই মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। পরে তিনি কুচবেহারে আসিয়া যখন শুনিলেন যে মহারাজা ব্রাহ্মণ নহেন, তখন তাঁহার মনে বড় ঘৃণা হইল। তিনি কুচবেহার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসি হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক ভাই ছিলেন। তিনি রান্না করিলে দু'জনে তাহা খাইতেন। গুজরাটি রাণী কাশীতে থাকিবার জন্য আমাকে খুব অনুরোধ করিতে লাগিলেন আমি চলিয়া আসিলাম।

যখন জয়পুরে যাই তখনকার একটি ঘটনা আমি বলিব। সকাল বেলায় গোবিন্দজীর আরতি দেখিবার জন্য আমি আমার ভাশুরের (হরিমোহন সেনের) বাড়ী হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া কেমন এক রকম মন হইল, ছুটিয়া আরতি দেখিতে চলিলাম। রাস্তায় গিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরে যেমন উঠিতে যাই এমন সময় দেখিলাম যেন গোবিন্দজী আসিয়া

আমায় আটকাইয়া রাখিলেন, আমি থমকে দাঁড়াইলাম, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে যেন তাঁহাকে সরাইয়া ফেলিয়া আরতি দেখিতে ছুটীলাম। এখন হইলে আমি ঐ রকম করিতাম না। এখন আমি বুঝিতেছি যে গোবিন্দজীর ইচ্ছা ছিল না যে আমি সাকার ভাবে তাঁহাকে দেখি। কেন যে আমি কেশবকে ছাড়িলাম, তাহাতে এত কষ্ট হয়। তিনি আমায় নৈনীতালে তাঁহার সিদ্ধিস্থান হিমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, মেজ বৌ তাঁহার ছেলে পুলেদের লইয়া যাইতে চাহিলেন বলিয়া আমার যাওয়া হইল না।

আমার তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে আমি কাল নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলাম না। সব তীর্থ আমি এক সঙ্গে যাই নাই, ক্ষেপে ক্ষেপে করিয়াছি। আমি ২৫ বৎসর বয়সে বিধবা হই। বিধবা হইবার দেড় বৎসর পরে (কৃষ্ণ বিহারী তিন বৎসর বয়সে) আমার প্রথম তীর্থ ভ্রমণ আরম্ভ হয়। সে বার আমি সাগর যাই, তার পর আর একবার গিয়াছিলাম। আমার শেষ তীর্থ ভ্রমণ নবীনের ছেলে মোহিতের সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন দর্শন। কৃষ্ণ বিহারী যাইবার ৬ মাস পরে (১৮৯৫ ইং অক্টোবর নবেম্বর) প্রায় ৪৪ বৎসর ব্যাপিয়া আমি এই তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ সময় কোথায় গিয়াছিলাম আমার এ ঠিক করিবার আর এমন শক্তি নাই।"

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটীর নাবালক রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া কিছু কালের জন্য আমার চট্টগ্রামে যাইতে হইয়াছিল এই কারণে ও সরোজা সুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র আমার স্বর্গীয় শ্বশুর কৃষ্ণ বিহারী সেন মহাশয়ের মৃত্যুর দরুণ তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হওয়াতে কয়েক বৎসর লেখা বন্ধ ছিল এবং সেই সময় তিনি পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন্। *

হামিদাদেবীর পত্র।

স্বর্গগতা হামিদাদেবীর জীবনী ও আত্মীয় স্বজনদিগের নিকটে লিখিত গভীর ধর্ম্মভাব পূর্ণ তাঁহার কতকগুলি পত্র ত্রয়োদশ ভাগ মহিলার কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই অল্প বয়সে এই কন্যা যেরূপ উচ্চ ধর্ম্মভাব, চরিত্রের বল ও জীবনের প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বস্তুতঃ এই সতী সাধ্বী কন্যা রমণী কূলের মধ্যে সমুজ্জ্বল রত্নবিশেষ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার আরও কয়েক খানা পত্র প্রিয় প্রমথলালের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। এবার তন্মধ্য হইতে একখানা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এরূপ আধ্যাত্মিক পত্র লেখা তাঁহার স্বাভাবিকছিল, তিনি বাহ্যিক ভাবে

---

* কেশব জননী সাধ্বী সারদা দেবীর জীবনী লেখক শ্রীমান্ যোগীন্দ্র লাল কাস্তগিরির লিখিত কয়েকটী কথা সাধারণের অবগতির জন্য উপরে প্রকাশিত হইল। ভরসা করি কেহ ইহাকে বাদানুবাদ রূপে গ্রহণ করিবেন না। সঃ—

সংসারিক ভাবে কাহাকে কিছু লিখিতেন না।

শ্রীচরণেষু।

লালুদা, আপনার সুন্দর চিঠির জন্য অনেক অনেক নমস্কার। দিনের মধ্যে কতবার প্রাণটা আপনাদের কাছে ছুটে চলে যায়। হয়ত রাত দুপুরে অনিদ্রার ভেতর, সন্ধের উপাসনার ভেতর, আর যখনই মনটা বেশ পবিত্র ও সুন্দর হয় সেই প্রকৃতির পানে ছুটে যেতে চায় যখন পৃথিবীর সব সুখ দুঃখের কথা প্রাণ হতে অন্তর্হিত হয় সেই নিস্তব্ধতার ভেতর, পাখীর সঙ্গীতের বন্যার সঙ্গে, শীতল বাতাসের সঙ্গে মিশে আপনাদের পবিত্র সঙ্গ যেন লাভ হয়। আমি মনে করি এই আধ্যাত্ম সুখের অবস্থাকেই স্বর্গ বলে। আমি নিজেকে তখন বড় সুখী মনে করি। ১৫। ১৬ বছর বয়সে একবার দীক্ষিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু বছরে বছরে কত সুযোগে আমার পুনর্দীক্ষা লাভ হইল। কষ্টের কঠিন পেষনে আমার জীবনে বার বার অগ্নি দীক্ষা হইল। একবার রোগ যন্ত্রনার পর সত্যই আমার এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যেমন আমি জীবিত হ'য়ে উঠি, কত বিষয় নূতন হ'য়ে যায় যে সে যাতনাকে আমি দীক্ষা না বলে কি বলিব? কাল আমার সেই দিন ছিল। হয়ত এমন হ'তে পারত আর জীবনে অপনাদের দর্শন লাভ হ'তনা। হয়ত বিদায় না লইয়াও আপনাদের নিকট হইতে চলে যেতাম। মৃত্যু যন্ত্রণা কি, একবার নয় দুবার নয় কতবারই আমি দেখিয়াছি। মৃত্যু ভয় যদি বিশ্বাস করেন তবে বলি, আমার অন্তর হ'তে চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রস্তুত নই অপূর্ণ [illegible] রাখিয়া যাইতে মনটা শান্ত যতটা হওয়া দরকার [illegible] তে পারি না।

রোমান [illegible] nun দের উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁদের চেহারা দেখিলে তাঁদের কাছে বসিলে আমার শরীর মন পবিত্র মনে হয়। Convent এ আর ঢের বার আমরা গিয়াছি। ওঁরাও আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। আমাদের ইচ্ছা কলিকাতা হ'তে আসিয়া ওঁদের কাছে ইংরাজি ও Painting শিখিবার ব্যবস্থা করিব। [illegible] এতে মত আছে?

এখন ও শরীর বড় দুর্ব্বল। দাদা মশাই কেমন আছেন? আপনার শরীর কেমন? আমার একান্ত ভক্তি আপনি গ্রহণ করুন।

বাঁকিপুর।	আপনার আদরের—
২৮। ২। ০৫	হামিদা।

—

সংবাদ।

সম্প্রতি গিরিডিতে প্রতিনিধি সব্‌ডিভিশনের আফিসর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে এক খুনী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি ডাইন ভাবিয়া স্বীয় বিমাতাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার ২। ৩টি সন্তান ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া মারাগিয়াছে, সে একজন ভূতবৈদ্যের নিকটে তাহার সন্তান হঠাৎ মারা যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। ভূতবৈদ্য তাহার বিমাতাকে ডাইনরাক্ষসী বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া তাহা দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, এইরূপ বলে। সে এই কথা বিশ্বাস করিয়া গলা চাপিয়া মাকে মারিয়া ফেলে। বিহার প্রদেশে বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধ স্ত্রী লোককে ডাইন ভাবিয়া পল্লীর লোকেরা নানা প্রকার যন্ত্রণা দানে সচরাচর হত্যা করিয়া থাকে। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার মানুষকে কি ভয়ানক অন্ধ করিয়া রাখে!

ছোটনাগপুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান অরণ্য ও পর্ব্বতাকীর্ণ, এইদেশের প্রকৃত নিবাসী কোল সাওতাল ভুঁয়া প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতি। হাজারিবাগ রাঁচি পালামো, সিংহভুম ও মানভুম এই পাঁচটি জেলাতে ছোটনাগপুর বিভক্ত। গিরিডি হাজারিবাগের একটি সবডিভিশন। গিরিডির নানা অংশে ঘন শালবন। শালবনে সাঁওতালেরা বাস করে। ছোটনাগপুরের সমস্ত অসভ্য বন্য লোক ঘন কৃষ্ণবর্ণ নিরীহ ও শান্ত, আসাম প্রদেশের নাগা কুকী লুসই প্রভৃতির ন্যায় বিবাদপ্রিয় ক্রোধী দুর্দ্দান্ত নহে। সাঁওতালেরা তাহাদের কল্পিত বুড়া বুড়ী দেবতার পূজা করে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে তাহাদের উৎসব হয়। একটা বাছুরকে নানা সাজে সাজাইয়া তাহার উপর ছত্র ধারণ করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে নৃত্য করিয়া থাকে, দুই তিন দিন ব্যাপিয়া সেই গোবৎসের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। মুসার অনুগামী বনিএস্রায়েল গোবৎসের মূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন। ইহারা জীবন্ত গোবৎসের পূজা করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদ্য পান করে, সমস্ত জীব জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা অতিশয় নৃত্যপ্রিয়া। সাওতালেরা এমন সাহসী ও বলবান্ শুনিয়াছি জঙ্গলের বাঘ ধরিয়া আনিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে।

জনহিতৈষী পুণ্য শ্লোক মহাত্মারা বহু পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন ও সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়া থাকেন। আবার এক জন নরহত্যাকারী মহাপাপী ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড করিয়া সেরূপ জন সমাজে প্রসিদ্ধ হয়, জগতের ইতিহাসে আপনাদের নাম অঙ্কিত করে। আন্দামান দ্বীপে দুরাত্মা সের আলি গভর্ণর জেনরেল লর্ড মেওকে হত্যা করিয়া পৃথিবীতে খ্যাতনামা হইয়াছে। দুইটি ইউরোপীয় মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে বিহারে ক্ষুদীরাম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কত খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঘরে ঘরে তাহার ছবি আদৃত হইয়াছে, সংবাদ পত্রাদিতে তাহার জীবনী ও ছবির ছড়াছড়ি। তাহার ফাঁসীর দিন স্কুল কলেজের বহু স্বদেশী দলের ছাত্র শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। গত ২৫শে কার্ত্তিক স্বদেশী দলের যুবা কানাই লাল দত্ত ও তাহার সহকারী সত্যেন্দ্র নাথ বসু হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

"আমাদের অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে, আমার দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগ যন্ত্রণা চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাদির বিবরণ পাঠিকারা অবগত হইবেন। সম্প্রতি প্রায় দেড় মাস গিরিডিতে স্থিতি করিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ ও সবল হইয়াছি। গত কল্য (১৬ই নবেম্বর) বেলা ১১টা ট্রেণে

গিরিডি পরিত্যাগ করিয়া মিহিজামে যাত্রা করিয়াছিলাম। মিহিজাম কলিকাতা যাওয়ার পথে, গিরিডি হইতে ৬। ৭ ষ্টেশন পরে। মিহিজাম স্বাস্থ্যকর স্থান, খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট সব রেজিষ্টার ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন সেহানবিশ মহাশয় একটি সুন্দর বাড়ী সেখানে প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই বাড়ীতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীমান্ ডাক্তার রণেন্দ্র নাথ ঘোষ স্থিতি করিতেছেন, আমি সেখানে কিছুদিন স্থিতি করিব মনস্থ করিয়াছিলাম। রণেন্দ্র ষ্টেশনে আমার জন্য পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন। আমার সঙ্গের বিছানা ব্যাগ ইত্যাদি দ্রব্যজাত নামান হইয়াছিল, ট্রেণ দুই মিনিটের অধিক ছিল না, আমি ভিড়ের জন্য নামিতে পারি নাই। আমি দুই ষ্টেশন পরে সীতারাম পুরে অবতরণ করিয়া প্রেমাস্পদ সতীশ চন্দ্র দত্তের আবাসে রাত্রি যাপন করি। সতীশ চন্দ্র সেখানে সোডা ওয়াটারের ব্যবসা করেন। তিনি তখন কলিকাতায় ছিলেন। বধূমাতার যত্নে আমার কোন কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এ দিকে আমার অসুস্থ ও দুর্ব্বল শরীর, আমি রাত্রিতে ক্লেশ ভোগ করিব ইহা ভাবিয়া মিহিজামে ডাক্তার রণেন্দ্র প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কোন কোন ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করিয়া অনুসন্ধান করেন। রাত্রি ১০টার সময় স্বয়ং সীতারামপুরে যাইয়া আমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হন। আমিও তাঁহার ভাবনা দূর করিবার জন্য সীতারামপুরে পঁহুছিয়া মিহিজামে urgent টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম। আমি আজ প্রাতঃকালের গাড়ীতে মিহিজামে পঁহুছিয়াছি। সতীশ চন্দ্রের আত্মীয় একটি ব্রাহ্ম যুবা আমাকে সযত্নে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহাই আমার অবস্থার উপসংহার। আমি রেল গাড়ীতে শত শত বার চড়িয়াছি জীবনে এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই। মধুপুর জংশনে একটি বন্ধু আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমাকে যত্ন পূর্ব্বক মিহিজামের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাকমাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্য দানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৫, ডিসেম্বর ১৯০৮। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রী-নীতিসার।

মাতা ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগকে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্ম কথা শিক্ষা না দিয়া বিশুদ্ধ নীতি কার্য্যতঃ শিক্ষা দিবেন। তাহারা যেন সর্ব্বদা সত্য কথা কহে ও সত্য আচরণ করে; গরীব দুঃখীদিগের প্রতি যেন সদয় ব্যবহার করে, কোন জীবের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ না করে, পিতা মাতাকে যেন ভক্তি করে তাঁহাদের আদেশ যেন মান্য করিয়া চলে, তাঁহাদের বাধ্য থাকে, জ্যেষ্ঠ গুরুজনদিগকে যেন সম্মান করে, কাহারও কোন দ্রব্য চুরি না করে; মাতা আকার ইঙ্গিতে উপদেশ ও দৃষ্টান্তে শিশুসন্তানদিগকে এরূপ নীতি শিক্ষা দিবেন।

ঈশ্বর আছেন, আত্মা অমর, পরকাল আছে, পরমেশ্বর ইহলোকে বা পরলোকে পাপ পুণ্যানুসারে মনুষ্যকে দণ্ড পুরস্কার বিধান করেন। মাতা মোটামুটি এই সকল সত্য শিশুদিগকে শিক্ষা দিবেন। তিনি গল্পচ্ছলে অনেক নীতি ও ধর্ম্ম কথা শিক্ষা দিতে পারিবেন। কথার অনুরূপ নিজে চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, অন্যথা সমস্ত নিষ্ফল হইবে, তিনি রাগ করা অন্যায় বলিয়া নিজে যদি রাগ করেন, মিথ্যা বলা পাপ বলিয়া নিজে যদি মিথ্যা কথা বলেন, সেই উপদেশ শিশুরা কেন গ্রাহ্য করিবে? উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রবল।

বালক বালিকারা ক্রমে বয়োধিক্যানুসারে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ বিষয় বুঝিতে ও ধারণা করিতে ক্ষমতা লাভ করিলে মাতা তাহাদিগকে সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাসনা ও প্রার্থনাতত্ত্ব এবং নানা আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা দিবেন। সে সকল বিষয়ক পুস্তক পড়িতে দিবেন, তাহাদিগকে লইয়া প্রার্থনাদি করিবেন। বিশুদ্ধ নীতিকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহার উপর উচ্চ ধর্ম্ম প্রাসাদপ্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা স্থায়ী হইবে। তাহারা যাহাতে কুসঙ্গে পড়িয়া চরিত্রহীন না হইয়া পড়ে জননী সে বিষয়ে সাবধান হইবেন।

এ দেশের নারী জাতির উন্নতি।

ইয়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক পাইয়া বঙ্গদেশের নব্যশ্রেণীর নারীজাতির ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাঁহারা প্রাচীন রীতি নীতি ও কুসংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রায় সর্ব্ববিষয়ে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রাচীন মহিলাদিগের ন্যায় তাঁহারা আর অন্তঃপুর-কারাগারে বদ্ধ ও অবগুণ্ঠনে আবৃত নহেন। তাঁহারা অনেকে প্রমুক্তমস্তকে প্রকাশ্য রাজপথে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, কেহ কেহ বাইসাইকেলে চলেন ও বগি হাঁকাইয়া থাকেন। অনেকেই ইংরাজি লিখিতে ও বলিতে এবং সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন, এবং বি এ, এম এ, উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বেশ ভূষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে মোটা সোটা অলঙ্কার পরেন না, বারাণসী সাড়ীর আদর করেন না। তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কার সভ্যজনোচিত হইয়াছে। প্রাচীন শ্রেণীর মহিলারা মাংস-ভোজনে কুণ্ঠিত, কিন্তু এই নব্য শ্রেণীর মহিলাগণ নিত্য কুক্কুটাদির মাংস ভক্ষণ করেন, অনেকে চেয়ারে বসিয়া আত্মীয় স্ত্রী পুরুষদিগের সঙ্গে টেবিলের উপর ছুরী কাঁটা যোগে ছিন্ন ও বিদ্ধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ যে ডিনারের সময় মদ্য একেবারে স্পর্শ করেন না ইহা আমরা বলিতে পারি না। এ সকল দেখিয়া অনেক বিলাতী সভ্যতা-নুরাগী পুরুষ মনে করেন এ দেশের নারী জাতির পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে, তাঁহারা ইহা ভাবিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা এইরূপ বাহ্যিক পরিবর্ত্তনকে উন্নতি বলি না। এ দেশের প্রাচীনা নারী-দিগের সুনীতি, সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সাধুভক্তি ও দেবভক্তির সঙ্গে ইয়ুরোপীয় কুসংস্কার-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সভ্যতার মিলন না হইলে এ দেশীয় নারী দিগের প্রকৃত উন্নতি কখনও হইতে পারে না। বরং অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত বিষয়ে ইয়ুরোপীয় সাধারণ মহিলা এদেশের আর্য্যনারীদিগের আদর্শ হইতে পারেন না। এক্ষণ যাহা হইতেছে অস্বাভাবিক ও দেশকালের অনুপযোগী নিতান্ত বহির্মুখীন উন্নতি। প্রাচীন শ্রেণীর নারীদিগের ন্যায় আতিথ্য সৎকার পরসেবা ধর্ম্মনিষ্ঠা আহারাদিতে বৈরাগ্য গৃহকর্ম্মাদিতে অক্লান্ত পরিশ্রম, নব্যশ্রেণীর মধ্যে কয়টি মহিলাতে দেখিতে পাওয়া যায়? আত্মসুখপ্রিয়তা ও বিলাসিতাই অনেকের জীবনে লক্ষিত হয়। পরের জন্য, স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ কোথায়? আমরা নব্য শ্রেণীর সকল মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি না। অনেক মহিলা নানা সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম নিষ্ঠায় সকলের পরম শ্রদ্ধার হইয়াছেন। আমরা সাধারণ ভাবে ইহা বলিতেছি। ভক্ত কেশব চন্দ্র বলিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করি, এবং চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের ব্রাহ্মিকা কন্যাগণ সায়ংকালে নির্জ্জনে বসিয়া সচ্চিন্তা ও যোগধ্যান করিবেন, পবিত্র গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত হইয়া এক তন্ত্রী যোগে ভগবত্স্তব কীর্ত্তন করিবেন। তাহাতে

তাঁহারা কিছুমাত্র উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করেন না, সুবিধা হইলেই সেই সময়ে বুট পায়ে টি-পার্টিতে যোগ দিয়া কেবল হাস্য গল্পে কালযাপন করেন। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি একেবারে নাই, কেবল বহির্মুখীন ভাব।

পূর্ব্বে শাক্ত শ্রেণীর পুরুষেরা মাংস ভোজন করিলেও বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন ছাগমাংসাদি ভোজন করিতেন। প্রাচীন শ্রেণীর মেয়েরা মাংস ভক্ষণ করিতেন না, এক্ষণ পুরুষ অপেক্ষা অনেক মেয়ে অধিক মাংসাশিনী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামী চির নিরামিষ ভোজী পত্নী ঘোরতর মাংসানুরাগিণী এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মহিলা আহার দানে ঝাঁকে ঝাঁকে মুরগী পোষণ করিয়া প্রত্যহ তাহার দুই একটিকে মারিয়া উদরস্থ করেন। এ দিকে ফেরিওয়ালাও ছাগল ভেড়ার মাংস যোগাইয়া থাকে। অনেক মহিলা মনে করেন কুক্কুট মাংস ভক্ষণ না করিলে শরীর রক্ষা পায় না, মাথা ঠাণ্ডা হয় না। তাঁহারা কুক্কুট মাংসযোগে নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধবদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করেন। অনেক ব্রাহ্ম পরিবারমধ্যেও সচরাচর এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। তাঁহাদের আহারাদিতে কোন রূপ নিষ্ঠা ও সাত্বিকতা নাই। অনেকে অন্য কিছু না খাইয় টেবিলের উপর ছুরি কাটা যোগে ছিন্ন ও ভিন্ন করিয়া তাহা চিবাইয়া খাইয়া থাকেন। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এক সময় একটী শিক্ষিত মহিলা মাংসের সহিত একখানা মোটা হাড় তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিতেছিলেন, সেই হাড়খানা এরূপ গলাতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। একজন সুনিপুণ ডাক্তারের যত্ন চেষ্টায় অস্থিখণ্ড অধঃকৃত হয়। কি দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দু সমাজ বা অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নহে এরূপ এক শ্রেণীর পরিবার আছে, তাঁহারা কোনরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মবিধির অধীন নহেন। সকল বিষয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার এবং হিন্দু পরিবারেও এই দশা ঘটিয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতে পূজার্চ্চনাদি কিছুই নাই, কেবল পান ভোজনের ঘটা; সৎপ্রসঙ্গ ও সদালোচনা নাই। নামে ব্রাহ্ম, এদিকে ব্রহ্মোপসনা করেন না, পরিবারমধ্যে ব্রহ্মোপসনা নাই, পরিবার মধ্যে দেখা যায় যে, কেবল পরচর্চ্চা। ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ একেবারে নাই, কেবল অসার কাব্যোপন্যাস পাঠ। এইরূপ অবস্থার কি এদেশের নারীজাতির উন্নতি—পারিবারিক উন্নতি সম্ভব? কলির প্রাদুর্ভাবে এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। পরিবারমধ্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মানুরাগিণী নারীগণই করিয়া থাকেন, পুরুষের দ্বারা তাহা হয় না। তাঁহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া খ্যাতির জন্য দুই একটা সৎকর্ম্ম ও বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে পারেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ও শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যেরূপ কলির প্রতাপ ছিল, এখনও কি সেইরূপ নয়? "অদ্বৈত-

বিলাসনামক" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জীবনচরিত পুস্তকে এ দেশের যেরূপ অবস্থা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—অতি মাত্র হীন ছিল, সমস্ত নরনারী সদাচারভ্রষ্ট, বিলাসপরায়ণ ঘোর সংসারাসক্ত, কাহারও অন্তরে সাত্বিকভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠার লেশমাত্র ছিল না। কেহই পাপের অনুষ্ঠানে ভয় করিত না। ন্যায় ও সত্য, পুণ্য ও ধর্ম্ম, প্রেম ও ভক্তি কাহাকে বলে লোকে এককালে জানিত না। পরলোকে বিশ্বাস নিতান্ত শিথিল, ইহলৌকিক সম্পদই লোকের সর্ব্বস্ব হইয়াছিল। আত্মা উপেক্ষিত; শরীরই সর্ব্বস্ব হইয়াছিল। ঘোর কলি অক্ষুণ্ণ প্রভাবে সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। একটি প্রাণীও বুঝিতে পারিতে ছিল না মানবসমাজ কি বিসদৃশ হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছে।"

"দেশের তদানীন্তন অবস্থাসম্বন্ধে পদগাথক বৈষ্ণব দাস এইরূপ বলিয়াছেন;—

"বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনামতত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলি কাল সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি।
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে, ধন ধাম করে সবে,
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।
যক্ষে (ধন দেবতায়) পূজে মদ্য মাংসে,
নানা মতে জীব হিংসে।
এই মত হইল সর্ব্ব দেশ।"

সে কালের এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে এ কালের বর্ত্তমান অবস্থার কি সাদৃশ্য হয় না? বরং তদপেক্ষা কলি এক্ষণ অধিক প্রবল। তখন কুবেরমিশ্রনামক একজন ভগবদ্ভক্ত পূর্ণাত্মা পুরুষ দেশের ধর্ম্মহীনাবস্থা—দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি নির্ম্মল ভক্তি প্রচার করিয়া দেশের দুর্গতি মোচন করিবার জন্য পরম ভক্ত মহাপুরুষের অভ্যুদয় জন্য নিরন্তর কাতর প্রার্থনা করেন। পরে তাঁহার পুত্ররূপে মহাভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে, ভক্ত কুলচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য সচী মাতার গর্ভে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্ম সমাজেও অনেক গৃহলক্ষ্মী ও সুপত্নী ছিলেন ও আছেন। পাঠিকারা ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী স্বর্গগতা মুক্তকেশী দেবীর জীবনবৃত্তান্ত সম্প্রতি মহিলাতে পড়িয়াছেন, ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে ইহাকে আদর্শ ব্রাহ্মিকা বলা যায়। টাঙ্গাইলনিবাসী নববিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্ম স্বর্গগত উকিল বাবু রাধানাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী বিদ্যুল্লতা দেবী প্রকৃত সুগৃহিণী ও ধর্ম্মগিন্নী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিয়া পরিবারস্থ সকলকে—দাসদাসীকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন; গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগকে গৃহাগত ক্ষুধার্ত্ত দুঃখী কাঙ্গালিদিগকে আহার দিয়া সর্ব্বশেষে নিজে ভোজন করিতে বসিতেন। পল্লীর সমস্ত লোক প্রত্যেকে তাঁহাকে নিজেদের স্নেহময়ী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার এরূপ প্রাণের যোগ ছিল যে, যে দিন রাধানাথ বাবু ওকালতী কার্য্যের

ব্যস্ততাপ্রযুক্ত উপাসনা সংক্ষেপে করিতেন, সে দিন বিদ্যুল্লতা মর্ম্মাহত হইতেন, অশ্রু বর্ষণ করিতেন, পল্লঙ্কের উপর শয়ন না করিয়া ভূতলে শয়ন করিতেন রাধানাথ বাবু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,"তুমি অর্থোপার্জ্জনের অনুরোধে আজ আরাধনার ভাগ খর্ব্ব করিলে কেন? ঈশ্বরোপাসনাপেক্ষা তুমি ধনকে অধিক আদর কর।" এরূপ সুপত্নী ও সুগৃহিণী কোথায়? বিদ্যুল্লতা তিনটি পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া বহু বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন, দুই মাসের অধিক কাল হয় নাই রাধানাথ বাবু অকস্মাৎ পত্নীর অনুগামী হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমরা সাওতাল পরগণায় একটী ব্রাহ্মবন্ধুর পরিবারমধ্যে কিছুদিন স্থিতি করিয়াছিলাম। বন্ধুর একাদশবর্ষীয়া একটি কুমারী কন্যা প্রফুল্ল বদনে আমাদিগের যেরূপ সেবা করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। কন্যাটি আচমণের জল স্নানের জল স্বহস্তে যোগাইতেন, বিছানা পাতিয়া দিতেন, প্রায় সকল কাজ স্বেচ্ছায় উৎসাহপূর্ব্বক করিয়াছেন। সেবা করিয়া যেন তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইত।

এ দেশের ধর্ম্মপ্রাণা আর্য্য নারীদিগের ধর্ম্মভাব ও সুনীতির সঙ্গে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সভ্যতার যোগ করিয়া চলিলে নব্য মহিলাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চিত অবনতি। মনে করিতে হইবে, পুণ্য প্রেম ও জ্ঞান এবং ধর্ম্মসাধনে জীবনের উন্নতিতেই যথার্থ উন্নতি, কাপড় চোপড় বেশ ভূষার উন্নতি অসারের অসার। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ, শীতপ্রধান ইয়ুরোপ নয়,ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশে ইয়ুরোপীয় নারীদিগের ভোজ্য পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিলে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইবে। সে দেশের নারীদিগের আচার ব্যবহারাদি এ দেশের নারী জাতির প্রকৃতির উপযোগী নহে। এক্ষণ যেরূপ পুরুষোচিত বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে, তাহাতে কোমল নারী প্রকৃতি বিকৃত হইতেছে এই অস্বাভাবিক শিক্ষায় অনেক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

ইয়ুরোপীয় সতী সাধ্বী মহিলাদিগের সদ্‌গুণ সকলের অনুকরণ হউক, এদেশের নারী জাতির মুখোজ্জল হইবে। মুক্তি ফৌজের অন্তর্গত মহিলাদিগের বিবাহে কেমন উচ্চ ধর্ম্মভাব প্রকাশ পায়! তাঁহারা বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ার পূর্ব্বে মনোনীত বরকে বলিয়া থাকেন, আমি ধর্ম্মবলহীন, তুমি সহায় হইয়া আমাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিবে, আমাকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করিও। আমা দ্বারা যদি তোমার ধর্ম্মবলের হানি হইবে, বুঝিতে পার তবে আমাকে বিবাহ করিও না। তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেম অতি বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক। তাঁহারা বিলাসবর্জ্জিত বৈরাগিণীর বেশে চির জীবন যাপন করেন। কাপড়ে কখনও ল্যাস ব্যবহার করেন না। যে দেশে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন বা স্থিতি করিয়া থাকেন সে দেশের ভোজ্যাদি সে দেশের মহিলাদিগের ভাবে ও কার্য্যে মিলন রাখিবার জন্য ব্যবহার করেন। মুক্তিফৌজের

নারীগণ এদেশে আসিয়া এদেশের নারী-দিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, মস্তক শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়াছেন, চেয়ার ছাড়িয়া মাদুরে বসিয়াছেন, গৈরিক উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছেন, নিরামিষ ভোজন করিয়াছেন। এ দেশের অনেক মহিলা এ দেশে থাকিয়া আড়ম্বরপূর্ণ বিলাতী ভোজ্য পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করেন নিতান্ত বাহ্যিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

বিলাতের কত পরহিতৈষিণী সেবা-প্রিয়া মহিলা দয়া ও প্রেমের আবেগে সর্ব্ব প্রকার সুখবিলাস পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজনবর্গ ছাড়িয়া দূরতর দেশে যাইয়া প্রাণপণে পরসেবায় নিযুক্ত আছেন। ইয়ুরোপীয় এই সকল দেবী প্রকৃতি মহিলা-দিগের এ সমস্ত স্বর্গের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলে এ দেশের নারীজাতির মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে। জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তৃণের ন্যায় দীন না হইলে কিছুই হইবে না।

মূল কথা প্রাচীন শ্রেণীর ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাদিগের ধর্ম্মভাব বিনয় ভক্তি সুনীতি সদাচার এবং ইয়ুরোপীয় সমুন্নতমনা নারী-দিগের বিশুদ্ধ ভাব ও সভ্যতা এই দুইয়ের সমবেত উন্নতিতে এদেশের নব্যমহিলাদের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে নহে। ধর্ম্ম, সদাচার ও সাত্বিকতা-স্বার্থপর সভ্যতাতে নারীজীবনের অধোগতি হয়।

স্ত্রীশিক্ষা।

আমরা মুক্তি ফৌজের নেতা জেনারল বুথের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে একটি বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠিকাবর্গের নিকট গতবারে উপস্থিত করিয়াছি। "নর-নারীর সমান অধিকার" প্রথমে নগর সংকীর্ত্তনে প্রচারিত হইয়াছে। সেই অধিকার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে দ্বিমত উপস্থিত হয়। একদল বলেন স্ত্রী এবং পুরুষের মানসিক বৃত্তি সমানরূপে বিকশিত হইবে—আর এক দল বলেন যে, কতকগুলি বৃত্তি নারী জাতির বিশেষ এবং কতকগুলি পুরুষ জাতির মধ্যে বিশেষ। এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া শিক্ষা দান কর। প্রথমোক্ত দল নারীকে পুরুষের ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা দান করিতে বলেন এবং তাঁহাদের আন্দো-লনে নারীদের জন্য কলেজও গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ পাঠ্য নির্ব্বাচিত ছিল তাহাতে সকলকেই জটিল অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষা দিতে হইত। এক্ষণ পাঠের এমন সুবন্দোবস্ত হইয়াছে যে, যাহার মস্তিষ্ক অঙ্কবিদ্যায় অপারগ তাহার অন্যবিধ বিষয় অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিলে চলিবে। সুতরাং এক্ষণ যাহার যাহা রুচি এবং ক্ষমতানুযায়ী পাঠ্য নির্ব্বাচন করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার পথ সুগম হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে যাইয়া যেটা ছেলেদের শরীর সকল সময় বহন করিয়া উঠিতে পারে না। আর যাঁহারা মাতা হইবেন তাঁহাদের শরীর যদি পরীক্ষালব্ধ উপাধিলালসায় ক্ষয় হয়, তবে ভাবী বংশের স্বাস্থ্য যে ক্রমে কোথায় দাঁড়াইবে ভগবানই

জানেন। ক্ষীণবীর্য্য স্বল্পায়ু লোকই বেশী দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকরিয়া অতি অল্পসংখ্যক মহিলাই কতকটা চলনসই স্বাস্থ্য লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারেন। যাহারা আজীবন কুমারী থাকিবেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ শিক্ষা কতকটা শোভা পায়,আর যাহারা নিজে অন্ন সংস্থান করিতে বাধ্য কিম্বা আপন বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রতিপালন অথবা আপন ভাই ভগিনীর লেখা পড়া শিখাইতে নিজের কর্ত্তব্য বোধ করেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ শিক্ষায় গত্যন্তর না দেখিয়া অবলম্বন করিলে বলিবার কিছু থাকে না। অপরাপর বালিকাদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষা না দিয়া কেবল বি এ, এম এ পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানলাভ হইবে, কিন্তু এরূপ জ্ঞান যদি স্ত্রীজনোচিত কমনীয় ভাব নিচয়ের বিকাশপক্ষে সহায় না হয় তবে তদনুসরণ বিধাতার অভিপ্রেত কি না দেখিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষায় প্রবৃত্ত মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় রত হইয়া অকাল মৃত্যু এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির ব্যত্যয় এবং অন্যান্য অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বালকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন স্বাধীনভবে চলা ফিরা করিতে পারাতে যথেষ্ট মুক্ত বায়ু সেবন এবং অঙ্গ চালনা করিতে পারেন। নব নব শিক্ষিত লোক এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায়সহ সাক্ষাৎ হওয়াতে শরীরমনের অনেক স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, এবং স্বাধীনভাবে দেহ মনের বিকাশের সুবিধা পান, কিন্তু অধ্যয়নরতা নারীরা বোর্ডিংএর সীমাবদ্ধ বাড়ীতে কিম্বা স্বগৃহের সীমাবদ্ধ মধ্যে অবস্থান করাতে মুক্ত বায়ু লাভে প্রায়ই বঞ্চিত থাকেন। যে পর্য্যন্ত নারীদের স্বাধীন ভাবে চলা ফিরার অবস্থাতে দেশ উন্নত না হয় তাবৎ নারী শিক্ষা অতি সাবধানে এবং ক্রমে ক্রমে দেওয়া বিধেয়। এটি ধ্রুব সত্য যে যে পর্য্যন্ত নারী জাতির শিক্ষা বি এ এম এ, বি এস্ সি, এবং এম্ এস্ সির মত উচ্চ না হইবে সে পর্য্যন্ত নারী জাতি পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না এবং দেশেরও সম্যক্ উন্নতি হইবে না। নারীর উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। আমরা বর্ত্তমান সময়ের ভাবকে অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিলাম। নারীর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং কোমল ভালবাসা বৃত্তি যে শিক্ষা নষ্ট করে সে শিক্ষা মানব জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। কেননা নারী হইতেই পুরুষ এবং নর নারীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মবৃত্তির পত্তন হইয়া থাকে। যাঁহারা নারীর এ সমস্ত গুণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল ইউরোপীয় এক সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ করেন তাঁহারা নারীর মৌলিকতা বিনাশ করিয়া দেশের যে কত অনিষ্ট করিয়াছেন তাহা বুঝিলে দেশের অনেক ভাবী অকল্যাণ পথ অবরুদ্ধ হইত। দুঃখের বিষয় "নারীর প্রকৃত প্রশস্ত এবং উচ্চ শিক্ষা কিরূপ" তাহার আদর্শ যাঁহারা মুখে প্রচার করেন তাঁহারা কার্য্যে কয়েকটী নারী প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারিলে দেশ রক্ষা পাইত। গ্রাম দেশে অনেকে অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক পাঠশালা স্থাপন করেন

নিজের জীবিকা অর্জ্জন জন্য, দুঃখের বিষয় অনেকে নারী শিক্ষায় জীবন দিয়া অনেক খাটেন,নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উত্তেজনার চরিতার্থ জন্য। সুতরাং আদর্শ নারী শিক্ষা প্রণালী এ যাবৎ কেহই দাঁড় করাইতে পারেন নাই। এদেশে সে দিন আসিবে কি না জানি না। ভরসা করি এ বিষয়ে শিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কোন্ উপায়ে প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন হইতে পারে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায় গণ্য মান্য এবং শরীর বিদ্যায় পটু তাঁহারাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক মোহিত চন্দ্র সেন এ বিষয়ে একটা আদর্শ স্থাপন করিতে যত্ন করিতেছিলেন কিন্তু তিনি পরলোকস্থ হওয়াতে আর কেহ সে স্থান পূরণ করিতে পারিতেছেন না।

সীতা।

সন্ধ্যাকালে বালক বালিকাদিগকে লইয়া পড়িতে ও পড়াইতে বসিয়াছিলাম। গৃহিণী এক'গ্রমনে কন্যাদিগের পড়া শুনিতেছিলেন। একটী কন্যা কীর্ত্তিবাস রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। সীতার জন্ম বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে বালিকা হঠাৎ থামিয়া গেল। বালক বড় চঞ্চল, সে নিজের পড়া ভুলিয়া গিয়া দিদীর পড়া শুনিতে ছিল সে বলিয়া উঠিল "বাহবা বেশ ত? রাজা আবার নাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করে।" আসল কথা—কীর্ত্তিবাস বলিতেছেন রাজর্ষি জনক ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে নাঙ্গলের ফলার অগ্রভাগে মাটীর নীচে একটী পরমা সুন্দরী কন্যারত্ন লাভ করিলেন। সেই কন্যাই সীতা। গৃহিণী হাস্যমুখে বলিলেন "তা'হলে সীতা "কুড়ান" মেয়ে, রাজ কন্যা নহে।"

আমি। তা'তে কি আর সন্দেহ আছে?

গৃহিণী। তবে, সীতা "জনক দুহিতা" না হইয়া "জনকপালিতা" বলা সঙ্গত। আচ্ছা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যদি এই কন্যাটী পরমাসুন্দরী না হইয়া নিতান্ত কুৎসিতা হইত, তা'হলে জনক রাজা কি করিতেন?

আমি সহাস্যে উত্তর করিলাম "তাহা হইলে হয়তো জনক রাজা শিশুটীকে কলিকাতার কোন অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন।" আমার উত্তর শুনিয়া সকলেই খুব হাস্য করিয়া উঠিল।

গৃহিণী। বোধ হয় আগেকার রাজাদের সময় সামাজিক শাসন বিধি কিছুই ছিল না। আজ কাল এমনধারা একটী শিশু পাইলে হাঙ্গামার অবধি থাকে না। দারোগা পুলিশের টানাটানি শেষ হইলে পর শিশুটির অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটে। হাজার সুন্দর হইলেও কোন ব্যক্তি সেই অজ্ঞাতকুলশীলকে গ্রহণ করিতে সাহসী হয় না। সমাজ তাহাতে বাধা দেয়।

আমি।—সে সময় সামাজিক শাসন না থাকিলেও লোক নিন্দার ভয় যে যথেষ্ট ছিল, সীতা—নির্ব্বাসনই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

ফলতঃ যে সীতা আমাদের প্রাতঃ-স্মরণীয়া, আর্য্যনারী-কুলের শিরোমণি, তাঁহার জন্মটা এরূপে সন্দেহজনক ও প্রহেলিকাপূর্ণ কেন করা হইল, বুঝিতে পারা গেল না। লঙ্কার অত্যাচারী রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিবার জন্য নারায়ণ চতুর্ম্মূর্ত্তিতে অযোধ্যার রাজ পুরীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আর সাত বৎসর পরে, লক্ষ্মীরূপিণী সীতা বিদেহ নগরের জঙ্গলে মৃত্তিকার নিম্নে আবিষ্কৃতা হইলেন। ইহা যে একটা ঘোর সমস্যা। ত্রেতা যুগের দেবতারা অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াও একটা রাক্ষসের ভয়ে যেরূপ দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাই তখন প্রধান ছিলেন। ব্রহ্মা রাক্ষস-রাজকে এমন একটা বর দিয়া ফেলিলেন, যাহাতে তাহার অস্ত্র-ভয় চলিয়া গেল, সে এক প্রকার 'অমর' হইয়া গেল। ভোলামহেশ্বর রাক্ষসের ছল বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অতি ভক্তির মায়ায় বাঁধা পড়িয়া নিজ স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিলেন। রাবণ বিষ্ণুর জন্য ততটা ভাবনা করিল না। কারণ, বোধহয় তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঘোর সংসারী; লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া একপাও তাঁহার নড়িবার সাধ্য নাই। সুতরাং তিনি হানাহানি কাটাকাটিতে আসিবেন না। তার পর রাবণ উল্লাসে ছোট ছোট দেবতা যথা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, যম প্রভৃতিকে ধরিতে লাগিল, আর তাঁহাদের হাত পা বাঁধিয়া একেবারে লঙ্কায় আনিয়া ফেলিতে লাগিল। কি বিড়ম্বনা! কি কষ্ট!!—ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, সূর্য্যের বিশ্বধ্বংসীতেজ যমের সর্ব্বনাশী যমদণ্ড, তখন কোথায় ছিল! দেবতাদিগের এহেন অবস্থা, এবং রাক্ষস-বল ক্রমেই প্রবল হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা নিজের জন্য ভাবিত না হইবেন কেন?

বন্দী দেবতাবর্গের সন্তানাদির ক্রন্দন রোল এবং দেবপত্নীদিগের বিলাপধ্বনি বিষ্ণুর একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন এই রাক্ষস বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া দেবতাদিগের উদ্ধার করিতেই হইবে। এদিকে পৃথিবীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, রাত বেজায় লম্বা, বৃষ্টি নাই, সমুদ্র শুষ্কপ্রায়; আধমরা রোগী অস্তিমশয্যাশায়ী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পৃথিবীতে হাহা-কার ধ্বনি!

বিষ্ণু কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্মীঠাকু-রাণীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি মর্ত্তলোকে চলিলাম। তুমি দেবপত্নী ও তাঁহাদের সন্তানদিগের সুবন্দোবস্ত করিয়া পশ্চাতে চলিয়া আসিও।" সে সময় দশরথ রাজা পুত্রলাভার্থে একটা বিরাট যজ্ঞের আয়ো-জন করিয়াছিলেন। তিন রাণী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী পুত্রবতী হইয়া মহা-রাজকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করি-বেন। বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়া যজ্ঞের চরুতে মিশ্রিত হইয়া গেলেন, এবং তার পর ঘটনা-চক্রে রাণীদিগেরগর্ভে চতুর্ম্মূর্ত্তিতে জন্ম-গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মীঠাকুরণী নারায়ণবিরহে অধীরা

ও চঞ্চলা হইলেন ও দ্বারীর আদেশ পালন করিতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের সমস্ত কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে সাতটি বছর কাটাইলেন। তার পর অস্থির চিত্তে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বর্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত, লক্ষ্মী যদি পৃথিবীর আবর্ত্তনে পাহার পর্ব্বতে বা সমুদ্রে পতিত হন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। তিনি তাড়াতাড়ি শূন্যপথেই লক্ষ্মীকে সদ্যপ্রসূতা বালিকার আকারে গড়িয়া ধীরে ধীরে মৃত্তিকার উপরে রক্ষা করিয়া আসিলেন।—এইরূপ একটা ঘটনা বিশ্বাস না করিলে রামায়ণ 'অশুদ্ধ' হইয়া পড়ে। বলিহারী কবির কল্পনা !!

যাহাহউক, সীতা জনক রাজ ভবনে শশি-কলার ন্যায় দিনদিন বাড়িতে লাগিলেন। অজ্ঞাত কুলশীলা বলিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ মমতা বা যত্নের ক্রটি হইল না। কারণ, রাজর্ষি দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, ইনি স্বয়ং লক্ষ্মী। সীতার কিশোর কাল প্রায় অবসান, যৌবন আসিবার জন্য পঞ্জিকায় ভাল দিন খুঁজিতেছে—এমন সময় অর্থাৎ তাঁহার দশম বৎসর বয়সে রাজা জনক তাঁহার বিবাহের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ।

জনৈক মহিলা হইতে

প্রাপ্ত।

আজ আমি কোন বিশেষ কারণে "মহিলার" নিকট উপস্থিত। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি এ কয়টী কথা লিখিয়া সাধারণ মহিলাগণের সঙ্গে মন খুলিয়া সত্য কথাগুল বলিয়া যাই। দুই চারিজনকে এ ভাব আমার প্রকাশ করিয়া লিখিবার কথা বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, "কথা ত সত্য, কিন্তু এখন বাহির না করাই ভাল।" আমি ভাবিয়া দেখিলাম সময় কাহারও জন্য বন্ধ থাকে না, আর মৃত্যুও লোকের ইচ্ছামত আসে না। আর যখন জীবন এত অনিশ্চিত, তখন সত্য কথা যে যত পরিমাণে যত শীঘ্র প রে প্রচার করিয়া যায় ততই ভাল।

আমার উদ্দেশ্য এই কুচবিহারের বিবাহসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে। আমি যত এ বিষয় দেখিতেছি ও জানিতেছি ততই আমার হৃদয়ে একটা এ বিবাহের বিরোধী দিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি বাড়িতেছে। আমি কুচবিহার রাজ্যের অনেক খবর রাখি, সেখানকার প্রধান কর্ম্মচারী হইতে অনেক কর্ম্মচারীদিগকে জানি। কন্যাকে এ রকম বলিদান দিতে ধর্ম্মাচার্য্য ভিন্ন কে পারে? কিন্তু আমি সামান্য সংসারী, আমার কন্যাকে কখনও এমন করিয়া দুঃখ পরীক্ষায় জন্মের মত ফেলিবার জন্য আমি বিবাহ দিতাম না। তিনি কন্যাকে বলি দিলেন ধর্ম্মবলে, ব্রহ্মবলে। এ বিবাহে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের নিজ জীবনও তাহারা কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে।

সর্ব্বসাধারণে জানে কুচবিহারের প্রধান কর্ম্মচারী একজন এ বিবাহের মহা বিরোধী, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য. এ লোকটি এ রাজ্যে

এখনও প্রধান পদে নিযুক্ত !! যখন বিবাহ-সময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন মহারাণীর (কোন কোন) চিঠী যাহা তিনি তাঁহার শাশুড়ী প্রভৃতিকে লিখিতেন,বিপক্ষ সমাজকে সেই ব্যক্তি সে সকল জানাইত। লোকে বলে উক্ত প্রধান কর্ম্মচারী শিক্ষিত ও সভ্য, কিন্তু কোন্ রাজকর্ম্মচারী রাজার শত্রুতাচরণ করিয়া সে রাজ্যে থাকিতে চাহে? তাহাকে educated কি বলা যায়? প্রধান কর্ম্মচারীর উৎসাহে ও সাহায্যে কুচবিহার রাজ্যে আবার এক বিপক্ষ সমাজ হইয়াছে। কোন ভাল খৃষ্টান কি য়িহুদি-দিগের মন্দিরের জন্য টাকা দেয়?

কুচবিহারের বিরোধী দল একটা মন্দির, একটা দল, এমন কি একটা নূতন ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বাহির করিল! আচ্ছা কেন তবে সে সব লোকে মহারাজা ও মহারাণীর কাছে দুই চারি টাকার জন্য ভিক্ষা চায়! আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে, সাধারণ সমাজকে কুচ বহারবিরোধী সমাজ বলা উচিত। তাহারা কি করিয়া তাহাদের মন্দির কুচবিহারে প্রস্তুত করিল, ইহা ভাবিতেও পারি না। ইংরাজিতে যে বলে gentleman যে সে কখনও অভদ্র ব্যবহার করে না শিক্ষিত যে সে মূর্খের ব্যবহার করে না। মহারাণীকে অনেকে বলে, "কেন এ সমাজ কুচবিহারে? এই একটা লাইনে বুঝা যাইতেছে, কুচবিহার রাজ্যের এখনও কত অবনতি? কর্ম্মচারী-রাই এ রাজ্যকে মলিন করিতেছে! মহা-রাজ ও মহারাণী কুচবিহারে থাকিয়া এরূপ নীচ কার্য্যকে প্রশ্রয় দেন ইহা বড়ই আশ্চ-র্য্যের বিষয়।

শুনিতেছি শীঘ্রই কুচবিহারবিবাহের সমস্ত কথা ও চিঠি লিপিবদ্ধ হইয়া বাহির হইবে। সে সব পড়িয়া সাধারণে জানিবে কি ভয়ানক নীচ, অভদ্র, অশিক্ষিত কথা যাহারা জন্যসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচিত তাহারা লিখিয়াছে।

একটি কথা আমার সকলের অপেক্ষা নীচ বলিয়া মনে হয়, এই যে,যাহারা দীক্ষা-গুরুকে অপমান, অভক্তি, অবিশ্বাস করিল লোকে তাহাদের কিরূপে শ্রদ্ধা করে? গুরুনিন্দা মহাপাপ শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন কি কলিকাল বলিয়া পৃথিবী এ পাপ ভার সহিতেছেন!

প্রাপ্ত।

মহিলা সমিতি।

ভাগলপুর ১৮ই জুলাই, ১৯০৮।

ষোড়শ অধিবেশন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত;—

শ্রীযুক্তা দীন তারিণী মুখোপাধ্যায়।
" যমুনা কুমারী।
" করুণাময়ী দাস।
" হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
" সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়।

একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনার পর সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব সমিতির বিবরণ পাঠ হইলে পর শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবু ব্রহ্ম-গীতোপনিষৎ হইতে "অন্তরে বাহিরে ভ্রমণ" বিষয়ে পাঠ করিলেন যে,প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরের দিকে, প্রথমে বাহিরের সমস্ত সংযম করিতে পারিলে ক্রমেই ভিতরে

যাইতে হইবে। বাহিরে যেমন অনেক দীর্ঘ পথ ভিতরের পথও তেমনি অনেক দূর। ভিতরের দিকে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থান আছে। উপাসনা করিতে হইলে চক্ষু মুদিত করিতে হয়, ধ্যান করিতে হইলে কাণ বন্ধ করিতে হয়, পূজা করিতে হইলে হাত দুটি জোড় করিতে হয়, পা দুটী সঙ্কুচিত করিতে হয়। যত বারই উপাসনা করিবে ততবারই এ সকল ইন্দ্রিয়কে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যাইতে হইবে, ভিতরের রাজ্যে যাইতে না পারিলে যোগধ্যান করা যায় না। অন্তর সাধিত হইলে সেই অবস্থায় বাহিরে আসিতে হয়।

পরে স্বর্গগতা মুক্তকেশী দেবীর জীবন বিষয়ে আলোচনা হইল। শ্রীযুক্তা দীনতারিণী মুখোপাধ্যায় তাঁহার জীবনসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেন, তিনি বলিলেন যে "স্বর্গীয়া ভগ্নী মুক্তকেশী দেবীর সহিত আমরা কিছু দিন বাস করিয়াছি, তাঁহার জীবনে কতকগুলি সুন্দর গুণ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মজীবন গভীরতা লাভ করিয়াছিল। বাহিরে কেহ না জানিতে পারে, কিন্তু আমরা একত্র থাকিয়া তাহা দেখিয়াছি, তাঁহার আদর্শ জীবন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। ভগিনীর জীবনে ভক্তি-প্রেম সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের —প্রচারকের পরিবারে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, নিজ হাতে তাঁহাকে সমুদয় করিতে হইত। তথাপি তাঁহাকে কখনও বিরক্ত বা বিমর্ষ দেখি নাই। অতিথি আসিলে কখনও বিরক্ত হইতেন না, অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন। এই সমস্ত সংসারের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াও প্রতিদিন নিয়মিত রূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন।"

(১) পরে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিতে এই নির্দ্ধারণ হ'ল যে, এই সমিতি অত্যন্ত দুঃখের সহিত পরলোকগতা দেবী মুক্তকেশী মজুমদার মহাশয়ার পরলোক গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন ও এই দুঃখের ঘটনায় শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন; তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে একজন বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার জীবন অনেক বিষয়ে অনুকরণীয়; প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এবং বঙ্গ রমণীর স্বাভাবিক সরলতা, লজ্জাশীলতা বিনম্রতা মিষ্ট শান্ত ভাব এবং সাধারণে প্রকাশিত হইবার অনিচ্ছুকতা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াও নিজে বিভিন্ন প্রকার গৃহকার্য্য সকল সমধিক সুদক্ষতা ও পারিপাট্যের সহিত প্রসন্ন চিত্তে সম্পন্ন করিতেন, ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনগঠনে ও লাভে অক্ষুণ্ণ যত্নবতী থাকিতেন, এবং অনেক নিষ্ঠা ভক্তি দৃঢ়তালাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পরলোক গমনে আমরা একটী উৎকৃষ্ট আদর্শ হারাইয়া শোক সন্তপ্ত হইয়াছি।

(২) শ্রীমতী যমুনা কুমারীর প্রস্তাবে ও শ্রীমতী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল—এই নির্দ্ধারণের নকল তাঁহার ভক্তিভাজন স্বামী ও স্নেহভাজন পুত্রগণের নিকট পাঠান হউক।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ

মজুমদার মহাশয় সমীপেষু—

আপনি বোধ হয় জানেন যে এখানে

লিখিত। তাহার টীকাতে "সাধারণের অবগতির জন্য উপরে প্রকাশিত হইল" স্থলে নিম্নে প্রকাশিত হইল, হইবে।

নিম্নলিখিত পত্রখানা যোগীন্দ্রলাল আমাদিগকে লিখিয়াছেন।

শ্রীচরণেষু—

এবারকার মহিলায় দেখিলাম ঠাকুমার জীবনী সম্বন্ধে কোনও মহিলা প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদ পত্রটি অবশ্য আমরা দেখি নাই, যে টুকু মহিলাতে বাহির হইয়াছে তাহাতে বুঝিলাম স্বর্গীয়া ঠাকুমার জীবনীর কোন কোন অংশ তাঁহার মতে ত্যাগ করা উচিত ছিল। এ বিষয় আমি দু'একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমার ভক্তিভাজন পরলোকগত শ্বশুর মহাশয়ের (কৃষ্ণবিহারী সেনের) এবং ভক্তিভাজন পরম ভক্ত কোনও প্রচারকের বিশেষ অনুরোধে আমি এ জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই। ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় আমাকে এই বলিয়া উৎসাহিত করেন, তোমার দিদী মোহিনী ও তোমার দেশের প্রচারক প্যারীমোহন যেমন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং উপদেশ লিখিয়া পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন, সেই রকম তুমিও আচার্য্যমাতার জীবনী লিখিয়া নিজে ধন্য হও ও জগতের উপকার কর। উপরি উক্ত উপদেশ বাস্তবিক আমার মনঃপুত হইয়াছিল। তাহার পরেই আমি ঠাকুমাকে তাঁহার জীবনী বলিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তিনি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হয়েন নাই। "আমার আবার জীবন চরিত কি?" এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। তার পর তাঁহাকে আমি এবং অন্যান্য আরও অনেকে বুঝাইয়া সম্মত করি। তাঁহাকে এই বলিয়াছিলাম যে "আপনার জীবনী আপনার সম্পত্তি নয়, সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক যখন আপনাকে খুঁজিবে, এবং আপনার সম্বন্ধে নানারূপ সত্য মিথ্যা কল্পনা করিবে, তখন আপনি এই জন্য ভগবানের নিকট এবং জগতের লোকের নিকট দায়ী হইবেন। তার পর আমার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ঠাকুমা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন তাঁহার জীবনী বলিতেন তখন সেইখানে তাঁহার কন্যা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন। জীবনবৃত্তান্ত বলিবার আগে তিনি আমাকে এই অনুরোধ করেন। যেন তাঁহার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর অনেক দিন পরেও এই লেখা বাহির না হয়। পূর্ব্ব অনুরোধ আমি রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু শেষ অনুরোধ আপনার আদেশে রক্ষা করিতে পারি নাই। তবে যদি আপনারা বলেন তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবনী এখন বন্ধ রাখিতে পারি।

তিনি যখন এ জীবনী বলিতেন এবং আমি যখন তাহা লিখিতাম, তখন আমি ইহাকে একটি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতাম, এবং সমসাময়িক সমুদায় লোককে ভুলিয়া সহস্র বৎসর পরে নববিধানাশ্রিত লোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া লিখিতাম; সারদাসুন্দরীকে ঠাকুমা

না মনে করিয়া কেশবজননীরূপে দেখিতাম, আমি নিজেকে সহস্র বৎসর পরের একজন কেশবপন্থী বলিয়া মনে করিতাম। ইহা দ্বারা আপনি বুঝিবেন সারদাসুন্দরীর জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাবলী তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার সংসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এবং তাঁহার পুত্র কন্যা ইত্যাদির সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় কত আবশ্যকীয়, কত মূল্যবান, কত মনোহর মনে করিতাম। এই সঙ্গে আর একটী কথা বলি, সারদাসুন্দরীর মধুর প্রকৃতির বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনগ্রন্থ লিখিতে লিখিতে আমি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইতাম। তিনি কি আশ্চর্য্য সত্যপরায়ণা ছিলেন! তিনি সত্য ঘটনা সমুদায় বলিবার সময় এমন করিয়া বলিতেন যেন ইহার দ্বারা কাহারও মনে আঘাত না লাগে। প্রথমতঃ আমি তাঁহার কথানুসারে জীবনী লিখিয়া যাইতাম। লিখিবার পরই আবার সেইটী তাঁহাকে পড়াইয়া শুনাইতে হইত। যদি কোনও স্থানে একটী কথার ব্যতিক্রমের জন্য তাঁর মনের ভাবও ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা প্রকাশ পাইত তখনই তাহা কাটাইয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাব ও ভাষা ঠিক না হইত তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোনও রকমে স্থির হইতেন না। বলিতেন "না ভাই, ঐটী ঠিক হইল না কাট।" ইহাতেই বুঝিবেন তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে তিনি একবিন্দু মাত্র মিথ্যা এ জীবনেতে আসিতে দেন নাই। ইহার পর তাঁহার পুত্র কন্যা ও নাতি নাত্নীদের ও কুচবেহারের বিবাহের বিষয় যাহা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা যখন তাঁহার নিজের সরল ভাষায় ব্যক্ত হইবে তাহা পড়িয়া সকলেরই মন আকৃষ্ট হইবে এবং অনেক পরিমাণে বিরোধী ভাব দূর হইবে। সকলের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে, কেশব জননীর জীবন পাঠ করিবার সময় আমরা যে, তাঁর সমসাময়িক লোক এই ভাবটি যেন ভুলিয়া যাই। এই সঙ্গে আমার আর একটি বিশেষ নিবেদন এই যে, কেশবজননী, কেশব চন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ও প্রেরিতগণ, আমাদের পিতা মাতা কিংবা অন্যান্য নিকট আত্মীয় একথাটী যেন আমরা আরও বিশেষ করিয়া ভুলিতে চেষ্টা করি। কারণ শেষে যখন আমাদের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না, তখন তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার ভিতর দিয়া জগতের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিবে। যদি এ জীবনীতে আপাততঃ কাহারও অপ্রিয় ঘটনা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সারদা সুন্দরী ও তাঁহার এই অনুগত জনকে জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া যেন ক্ষমা করা হয়। ইতি

আপনার স্নেহের

সেবক শ্রীযোগেন্দ্র লাল কাস্তগীর।

পুঃ—তাঁহার জীবনের অনেক ক্লেশকর ঘটনা ছিল, এবং তিনি তাহা সব সময় বলিতেন, কিন্তু জীবন চরিতে তিনি তাহা লিখিতে স্বীকৃতা হন নাই। পাছে ইহার দ্বারা কাহারও প্রাণে আঘাত

আমাদের ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের একটী সমিতি আছে। এই সমিতিতে আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিষয় সকল আলোচিত হয়।

বিগত ১৮ই জুলাই এই সমিতির এক অধিবেশন হয়। তাহাতে স্বর্গগতা মুক্তকেশী দেবীর জীবন আলোচ্য বিষয় ছিল।

এই অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিতে উক্ত জীবন সম্বন্ধে একটি নির্দ্ধারণ ধার্য্য হইয়াছে ও তাহার নকল আপনাদের নিকট পাঠাইবার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমিতির এই নির্দ্ধারণ অনুসারে উক্ত নির্দ্ধারণের নকল আপনাদেব নিকঠ শোকসন্তপ্ত চিত্তে পাঠাইলাম, কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

আপনার নিকট পাঠাইলেই পরিবারস্থ সকলের নিকট পৌঁছিবে জানিয়া পৃথক ভাবে পুত্রগণের নিকট আর পাঠাইলাম না। অনুগ্রহ করিয়া আপনিই তাঁহাদিগকে দেখাইবেন

একান্ত বিনয়াবনতা
শ্রীমতী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়।
ভাগলপুর ৩০শে জুলাই, ১৯০৮।

হামিদাদেবীর পত্র।

১। শ্রীচরণ কমলেষু—

লালুদা, আপনার সুন্দর চিঠীর যদি আমি উপযুক্ত হ'তে পার্ত্তাম আজ আমার কত সুখ হোত।

আশীর্ব্বাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি কোন রাজ্যে চলিয়া যাই; এই ২২। ২৩ বছর তাঁর পূর্ণ আশীর্ব্বাদে আপনাদের কাছে রয়েছি। সেদিন আপনি "অসুস্থতার ভিতর তাঁর আশীর্ব্বাদ বিশেষ ভাবে আমাদের কাছে আসে" এবিষয়ে কত কথা বল্‌ছিলেন, তখন আমার অনেক কথা মনে হচ্ছিল, যে চিরদিন রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, তাহার কাছে এসকল সমাচার আপনা হইতেই আসে। আমি ১৫ বছর বয়স থেকে রোগের সংঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি। তার আগে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। আমি মনে করি ইহা ভগবানের লীলা। ইহার ভিতর আমি তাঁর অজস্র আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ করিতেছি, তাঁর চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য ও পরিচয় পাইতেছি, জানি না আরও কত পাইব। যদি এত কষ্ট যন্ত্রণা আমার জন্য না আসিত আমি বুঝি এ সকল গভীর অনুগ্র ও আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হইতাম। ইহার ভিতর কত শিখিলাম, কত বুঝিলাম। অনুতাপ, আত্মচিন্তা, আত্মতত্ত্ব লাভ করিলাম, আপনাকে কি বলিব? এই অসুস্থতার ভিতর সকলের কত গভীর সহানুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা, আদর যত্ন লাভ করিতেছি ইহাই আমার জীবনের বিশেষ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করুন আমি যেন এই বিশেষ আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত হইতে পারি।

১৯।৩।০৬। আপনার আদরের হামিদা।

২। শ্রীচরণেষু—

লালুদা, দুদিন আপনার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। এ বাড়ীতে আস্‌লে আমার মনটা যত খুলে যায়, যত সুন্দর সুন্দর ভাবের যাতায়াত হয় কেন জানি না ও বাড়ীতে ততটা পাইবার সুযোগ হয় না।

তার কত কারণ হ'তে পারে। এক দেখি নির্জ্জনতার মত প্রিয় আর অনুকূল অবস্থা আমার আর নাই। আমার এই পুরাতন কত দিনের কত স্মৃতি অঙ্কিত এই নির্জ্জন ঘরখানিতে যখন আমি চুপ করে বসি একে একে অতীতের যেন সব রুদ্ধ দ্বারগুলি আমার সাম্‌নে খুলে যায়, আর অতীতের চিত্রগুলি আমার কাছে এত মিষ্ট লাগে এত আকর্ষণীয় লাগে যে, সে কথা আমি প্রকাশ করে উঠ্‌তে পারি না। অতীতে যত কিছু আমি পাইয়াছিলাম তাহা আমার পক্ষে যথেষ্ট ; তখন আমি তাহা পাইরাই সুখী হইয়াছিলাম ; কিন্তু জানিতাম না তার পর ভবিষ্যতে আমার জন্যে এত সুখ এত ব্যবস্থা অপেক্ষা করিতেছে। আমার অজানিতে ভগবান্ আমার সুখের জন্য এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি না চাহিতে তাহা আমার নিকট আনিয়া ধরিলেন, সম্ভোগ করিতে বলিলেন। সকল পাইলাম বটে, কিন্তু তবুও মনে কিসের আশঙ্কা কিসের ভাবনা। তখন মনে হয় এ অযাচিত আশীর্ব্বাদ গুলির কিরূপে আমি মর্য্যাদা করিলাম ; তাহা যথেষ্ট পারিলাম কি না, তাহা গ্রহণের উপযুক্ত হইলাম কি না, এসকল প্রশ্নের উত্তর দেয় কে ? যদি এ প্রশ্ন না উঠিত এ সম্ভোগে বাধা পড়িত না। বাধা ও আঘাত না পাইলে মানুষ খাঁটি হয় না, এ সুখও এত মিষ্ট লাগিত না, ভগবানের আশ্রয়লাভের জন্য এত ব্যাকুলতা আসিত না। দুঃখের ভেতর পড়িয়া মানুষ খাঁটি হইতে শেখে, ভাল হইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, আর সে আকাঙ্ক্ষা ভগবানে পরিতৃপ্ত হয়। সেই পরিতৃপ্তির নামই সুখ। অযাচিত এই সুখে কত বারই আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম।

এখন আমার সুখের এক একটি অংশ আপনাদের হাতে, আমার জীবন ও চরিত্র-গঠনের কত ভার আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। ভগবান্ আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া কত পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। কত সময় নিজেকে ধন্য মনে করি। দূরে থাকিয়াও যে সেবা আপনার পাই তাহা আর কে দিতে পারে ? এ পবিত্র সরল আকর্ষণ কোথা হ'তে আসিল ? এ আকর্ষণের ভিতর ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি আছে ? কোন্ মলিনতার চিহ্ন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে ? ধর্ম্মপথের সহায় আপনারা। আমার জন্য আপনার এ দায়িত্ব যেন কোন দিন কম না হয়। সকল সময় আপনাদের পবিত্র স্মৃতি যেন আমাকে অন্যায় এবং পাপ হইতে রক্ষা করে। ভগবান্ আমাদের নিকট উন্নতির পথ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার করিয়া দিন। তাঁর ইচ্ছা ধন্য হোক। আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাঁকিপুর
২২শে ফেব্রুয়ারী

আপনার আদরের
হামিদা।

কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত কার্ত্তিক মাসে মহিলার ১০১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ পেরাগ্রাফ হইতে শ্রীমান্ যোগেন্দ্র লাল কাঞ্জিগিরির

লাগে। ঐ সব বিষয় বলিলে তাঁহার জীবনটি আরও প্রকৃত সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইত। যোঃ—

এই ত গেল আচর্য্যের জননীর নিজ-মুখে বিবৃত আত্মজীবন বৃত্তান্ত। ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী। তিনি নিজে না বলিলে ইহার অধিকাংশ আমাদের জানিবার উপায় ছিল না নিজের সদ্‌গুণ ও উচ্চভাব সকল কে নিজে বলিয়া থাকে? ঐতিহাসিক বিবরণ আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা প্রকাশ করিয়া মাতার স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও দীনতা ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনাশীলতা পরসেবা ও গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য ইত্যাদি তাঁহার জীবনের অসাধারণ সদ্‌গুণ সকল পরিষ্কার রূপে লিখিয়া যোগীন্দ্র লাল বা সরলা দেবী জীবনীর উপসংহার করেন, এবং তাহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-মহিলাদের হিতার্থ প্রচার করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।—সং।

দেবী গান্ধর্ব্বী।

টাঙ্গাইল বেড়া বুচিনা নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয় হরিভক্তিপরায়ণা পরমা সাধ্বী স্বর্গগতা জননী গান্ধর্ব্বী দেবীর জীবনবৃত্তান্ত সংশোধিত বর্দ্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম দেবী গান্ধর্ব্বী। এই পুস্তকে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। আমরা পুস্তক পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমরা এই পুস্তক এক এক খানা গ্রহণ করিয়া পড়িবার জন্য মহিলাদিগকে বিশেষ-রূপে অনুরোধ করি। এবার সেই জীবনী পুস্তক হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

জীবনের নানা কথা।

গান্ধর্ব্বী সাধন ভজনের প্রায় সমুদায় কার্য্য নির্জ্জনে গভীর ভাবে সম্পন্ন করিতেন। নামজপ, গ্রন্থপাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন সজনে আর কোনরূপ সাধন করিতে দেখা যাইত না। অতি সহজ প্রেমের মধুময় ধর্ম্ম তাঁহার ছিল। কুম্ভকাদি অস্বাভাবিক উপায় তাঁহাকে কখনও অবলম্বন করিতে দেখা যায় নাই। নির্জ্জনতার অনুরোধেই তিনি শেষে জীবনে অপেক্ষাকৃত কোলাহলপূর্ণ বৃন্দাবন হইতে নিভৃত রাধাকুণ্ডে যাইয়া সাধন ভজনে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। গৃহে থাকা সময়ে অনেক সময় ভজনে রত থাকিতেন। সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় স্বগণের প্রতি বাহিরের ভাবে তত অধিক স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিতেন না। তাহা দেখিয়া সাধারণ লোকের অনেকে তাঁহাকে স্নেহ মমতা-হীন কঠিন হৃদয় বলিয়া মনে করিত। প্রকৃত পক্ষে তিনি স্নেহমমতা হীন ছিলেন না। যে হৃদয় স্বর্গীয় মহাপ্রেমে পরিপূর্ণ তাহা কখনও কঠোর হইতে পারে না। তাঁহার স্নেহ মমতা অসাধারণ ছিল, এজন্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত না।

তাঁহার সন্তানগণ উচ্চ পদাভিষিক্ত বি বিভবশালী হউক, এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহা অধিক ছিল না। সন্তানগণ সচ্চরিত্র ভগ

বস্তুক্ত ও হরিপরায়ণ হয়, এই তাঁহার হৃদ-য়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাহিরের ধন সম্পত্তি হইতে তিনি নিত্যধন ধর্ম্মধনকে অধিক মনে করিতেন। সন্তানগণ তদনুরূপ জীবন পায়, এ আশা ও প্রার্থনা তাঁহার চিরদিন ছিল। সন্তানগণের চরিত্রগঠনের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অসার সাংসারিক প্রসঙ্গ, নারীজনসুলভ নানাবিধ বৃথা বাক্যালাপ হইতে গান্ধর্ব্বী সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। গ্রাম্যকথায় মন দিলে ধর্ম্মজীবনের গভীরতা নষ্ট হয়, ব্যর্থ প্রসঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অতি গুরুতর অপরাধ এ বিশ্বাস তাঁহার অতিশয় উজ্জ্বল ছিল। "গ্রাম্যকথা না কহিবে আর গ্রাম্য কথা না শুনিবে" এই মহা উপদেশ-বাণী তিনি অনেক সময়ে উচ্চারণ করিতেন এবং সাবধানে তদনুরূপ জীবন গঠন করিতে নিয়ত যত্নশীলা ছিলেন। গৃহে থাকিয়া তাঁহার সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ও বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ডে গমনের ইহাই একটি প্রধান কারণ ছিল।

গান্ধর্ব্বী সাধুভক্ত এবং শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন ভক্তিমতী বৈষ্ণবী ও ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ হইলেই শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেন, এবং সুযোগ পাইলে পরমার্থবিষয়ে কিছু প্রসঙ্গ করিতেন, তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সাধক বলিয়া বুঝিতে পারিলে সমধিক শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন। হীনজাতীয় ব্যক্তিও যথার্থ বৈষ্ণবাচারসম্পন্ন হইলে তিনি কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না। তিনি বলিতেন বৈষ্ণবদিগের জাতিবিচার মহাপাপ। জাতি বিচার করিয়া বৈষ্ণবকে ঘৃণা করিলে জীবের অধোগতি হয়। জাতি কুল মান শ্রীভগবানের চরণে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ ও অকিঞ্চন বৈষ্ণব হইতে হয়, তাঁহার সম্বন্ধে আবার জাতিবিচার কি? বৈষ্ণব যে কৃষ্ণ-দাস। তাঁহার এই উদার মত সামাজিক নিগ্রহের অন্যতর কারণ হইয়াছিল। পরে এই নির্য্যাতনের ভাব অনেক হ্রাস হইয়া আইসে। সাধু বৈষ্ণবদিগকে তিনি পরম সমাদরে আহারাদি করাইতেন, কখন কখন অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। শেষজীবনে তাঁহার এই সাধুসেবা ব্রতপালনের ভাব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সামাজিক ও লৌকিক প্রথানুরূপ সর্ব্ব সাধারণের ভোজ দিতে আর তেমন আগ্রহ ছিল না। সাধুসেবাই জীবনের একটা উচ্চ লক্ষ্য হইয়াছিল। এক একটি সাধু ভক্তের সেবা করিতে পারিলে তিনি যে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাহা বলা যায় না। সুযোগ পাইলেই বৈষ্ণবমহিমাসূচক কত তত্ত্বকথা বলিতেন। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তপরায়ণঃ" এই শাস্ত্রীয় বচনে তাঁহার প্রবল বিশ্বাস ছিল। সাধুগণের সঙ্গ লাভ হইলে তাঁহাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, সাধু কৃপা ভিন্ন পারমার্থিক জীবন-লাভে কেহ সমর্থ হয় না, এ বিশ্বাস তাঁহার অতি দৃঢ় ছিল। "বিনা মহৎ পাদরজোঽভি-ষেকং" এই শ্লোকাংশ তিনি এক এক সময়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন।

গান্ধর্ব্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি ভক্তি-হীন বলিয়া কৃপাপাত্র মনে করিতেন। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ না করিয়া, হরিভক্ত না হইয়া তাঁহারা কেবল কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন যাপন করেন, ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। যে গ্রন্থে হরিনাম নাই, সে গ্রন্থকে তিনি গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। একদিন বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালক পরস্পর বলিতেছিল, "অমুক পুস্তকখানা অতি উত্তম" তাহা শুনিয়া গান্ধর্ব্বী বলিয়াছিলেন, "যে পুস্তকের সকল পাত উল্টাইলেও একটি হরিনাম পাওয় যায় না তাহা আবার উত্তম পুস্তক হইল কিরূপে?" যেমন হরিনামহীন গ্রন্থকে তিনি গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তেমনি হরিভক্তিহীন জীবনকে তিনি প্রকৃত মনুষ্যজীবন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। একবার কোন ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিত কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার যুবক জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার পুত্রের সকলই আছে. কেবল হরিভক্তির অভাব। যেমন মনোহর দ্রব্য-জাতে সজ্জিত নাট্যশালায় দীপাধার সকলে বর্ত্তিকা পর্য্যন্ত সঞ্চিত, কেবল আলোকের অভাবে অন্ধকার রজনীতে তাহার কোন শোভাই দৃষ্টিগোচর হয় না, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবস্থা তদনুরূপ। তাহার দয়া, নিরহঙ্কারিতা, নির্লোভিতা, প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণসত্ত্বেও কেবল হরিভক্তির অভাবে সে সকল বিফল হইয়াছে।"

প্রথমবার বৃন্দাবনে গমনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও গ্রামবাসী আর একটি জ্ঞাতি-বালক স্বদেশে আগমনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"বৎসগণ, আমার জন্য ব্যস্ত হইলে কি হইবে? আমি তোমাদের কিছুই করিতে পারিব না। তোমরা আমার জন্য যেরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, ভগবানের জন্য সেইরূপ ব্যস্ত হও, সংসারে নিরাপদ ও সুখী হইতে পারিবে। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া দুঃখ করিও না, হরি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার পদে যেন তোমাদের মতি থাকে, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতে পারিব।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে একমাত্র হরির আরাধনাই গান্ধর্ব্বীর জীবনের ধর্ম্ম ছিল। হরির আরাধনা ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য দেব দেবীর অর্চ্চনা নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জীবনও ঠিক তদনুরূপ ছিল। "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গীতোক্ত এই শ্লোকাংশের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কাহারও জীবনে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস দেখিলে আনন্দিত হইতেন। একবার গয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সহ তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত এবং বিশ্বাস-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে ধর্ম্মে নামে রুচি ও জীবে দয়া এবং

যে ধর্ম্মের মূলে প্রেম আছে তাহাতে জীবের পরিত্রাণ হইবে, সন্দেহ নাই।

গান্ধর্ব্বী পুরুষোত্তম, গয়া, কাশী, প্রয়াগ ও শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থে গমনাগমন করিয়াছিলেন। কুত্রাপি তিনি পুরুষের ন্যায় নির্ভীক ভাবে গতি বিধি করিতে পারিতেন না। নারীজনসুলভ লজ্জাশালতা চির দিন তাঁহার ছিল। প্রথম বার বৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় কতিপয় স্বদেশীয় স্ত্রীপুরুষ তীর্থযাত্রীর সহিত তাঁহার আসিবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে তিনি অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন যে পুত্র কিম্বা ভ্রাতা সঙ্গী না হইলে তিনি দূর পথ পর্য্যটন করিতে পারিবেন না। তদনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যাইয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া আসিয়াছিল।

ভোগবিলাসপূর্ণ কল্পিত স্বর্গ তিনি মানিতেন না। তিনি বলিতেন, "এই যে, তাঁহার নাম করিতেছি ভজন সাধন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি, ইহাই স্বর্গ, ইহার উপর আবার স্বর্গ কি ?" কার্য্যে, বাক্যে, চিন্তায় স্বীয় জীবন পবিত্র রাখিতে তিনি নিয়ত যত্নবতী ছিলেন। কোন প্রকার অপবিত্রতার সংস্রব তিনি দূষণীয় মনে করিতেন। গ্রামবাসিনী একটী ব্রাহ্মণ বিধবার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল, কিন্তু উপায়হীনা বলিয়া অনেকে তাঁহার দ্বারা বিগ্রহের ভোগ পাকাদি কার্য্য করাইত। গান্ধর্ব্বী সময় সময় তাঁহার সাহায্য করিতেন, কিন্তু কখনও দেবসেবার ভোগ পাকের সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। শুনিয়াছি এ বিষয়ে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়েরও নিষেধ ছিল। বৃন্দাবনে একটি গোস্বামিনীর সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় ও ভালবাসা ছিল। পরে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবন পবিত্র নহে। তখন হইতে আর তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই।

তিনি অবিশ্বাসী ভজনহীন মনুষ্যজীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। অনেক সময় গভীর ভাবে বলিতেন ;—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পুত্রের হয় জন্মে জন্মে তাপ"

ক্রমশঃ।

মহিলার রচনা।

সেবা।

মঙ্গলময় ভগবান্ সমস্ত পৃথিবী এবং নরনারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্যবিহীন করিয়া তিনি কিছু সৃষ্টি করেন নাই। সকলকেই এক একটি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন ; এমন কি চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী পর্য্যন্ত সকলেই কার্য্য করিয়া তাঁহারি আদেশ পালন করিতেছে। সকল কার্য্যের শ্রেষ্ঠ কার্য্য সেবাধর্ম্ম। চন্দ্র, সূর্য্য আলো দান করিয়া, বৃক্ষ, লতা ফল ফুল দান এবং বায়ু সঞ্চালিত হইয়া নদনদী সুশীতল জল দান করিয়া সর্ব্বদাই জীবের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কৃপাময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে মানব জন্ম দান করিয়াছেন। আমরা এই শ্রেষ্ঠ মানব-জন্ম লাভ করিয়া কি এই উচ্চ পবিত্র

সেবা ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিব না? পরসেবা করিলে জীবনে কত সুখ এবং আনন্দ লাভ করা যায় তাহা বর্ণনাতীত। ধন সম্পত্তি দ্বারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন ক। অপেক্ষা তাহা দ্বারা দীন দুঃখী অনাথদিগের দুঃখ মোচন করিলে শতগুণ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা যায়। অনন্ত স্বর্গের রাজরাজেশ্বরী জগজ্জননী সেবাময়ী মা হইয়া জগতের দীন দুঃখী সন্তানদের জন্য কত ব্যস্ত হইয় সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং কিরূপে সেবা করিতে হয় তাহার আদর্শ হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন, আমরা কি সেই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইব না? আমাদের নানাপ্রকারে সকলের সেবা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ আমাদের সকলেরি পিতামাতার সেবা করা উচিত। পিতামাতা সন্তানদিগকে যেরূপ কষ্টে লালনপালন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা কাহারও নিকট অজানিত নাই। সন্তান শত বৎসর পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিয়াও তাঁহাদের দায় ও স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। তাঁহারা যখন বৃদ্ধ হন তখন তাঁহাদের প্রাণপণে সেবা যত্ন করা উচিত। সন্তানের নিকট পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। কায়মন বাক্যে তাঁহাদের আদেশ পালন করা উচিত। পিতামাতা যদি কখনও সন্তানকে কোন কঠোর কথা কহেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত কি ক্রুদ্ধ হওয়া কি তাঁহাদিগকে অসম্মান করা উচিত নয়; তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকা কর্ত্তব্য। তৎপর প্রতিবাসীদিগের সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর যে আমাদের সমাজবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তখন পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা করা এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রতিবাসী, আত্মীয় স্ব ন কেহ পীড়িত হইলে তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবা করা ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া উচিত।

জগতে অতি প্রাচীন কাল হইতে সেবা ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারত মহিলা পর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া সেবায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও ভারতে সেবা ধর্ম্মের আভাস নারী বিশেষের মধ্যে চলিতেছে। পাশ্চাত্য মহিলাদিগের মধ্যেও সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বড় কম নহে। অনেক সেবাপরায়ণা ইউরোপীয় মহিলা আত্ম সুখ ভুলিয়া গিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কত সেবাপরায়ণা পাশ্চাত্য মহিলা দরিদ্র কুটীরে, পীড়িতের আলয়ে অসহায় জনের সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতিজনের জীবনে গ্রহণ করা উচিত। যখন আমরা তাঁহাদের উচ্চ দৃষ্টান্তে বর্দ্ধিত হইব তখন বাস্তবিকই আমাদের সুখী পরিবার হইবে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যেন জীবনে সেবার পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি।

কুচবিহার।

বিধাননন্দিনী মজুমদার।

সংবাদ।

একজন মাননীয়া মহিলা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "পূজাবর ঠাকুরমাতার জীবনীতে কয়েকট বিষয় লেখা হইয়াছে জানি না কে এরকম ভুল লিখিয়াছে, আর ক্ষমা করিবেন আপনার না ছাপাইলে ভাল হইত। ঠাকুমার জীবন সকলের পূজ্য, সে জীবনে এসকল লিখিয়া ছোট করিবার ন্যায় যেন হইয়াছে। গুজরাটি মহারাণীর বিষয় যে লেখা হইয়াছে তাহা একেবারে ভুল কারণ তিনি অনেক কাল স্বামীর সংসার করেছিলেন। আর সিমলায় ঠাকুরমার যাওয়া, একথা আমাদের সকলের মনে আছে। পিতৃদেব ঠাকুরমাকে অনেকবার বলেছিলেন, কিন্তু ঠাকুমা কিছুতেই গেলেন না।"

সম্প্রতি সাওতাল পরগণায় আমরা একজন ব্রাহ্মবন্ধুর পরিবারমধ্যে কয়েক দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। সেই বাড়ীতে পুষ্পোদ্যানের কাজে নিযুক্ত একজন সাওতাল আছে। তথায় সে সস্ত্রীক বাস করিতেছে। তাহার পোষ্যের মধ্যে স্ত্রী ও ৬৭ বৎসরের একটি ও তিন বৎসরের একটি পুত্র। সে ৫৲ মাত্র মাহিয়ানা পাইয়া থাকে। স্ত্রী ধান ভানিয়া চাউল করে, দুই বেলা রাঁধিয়া ফেণশুদ্ধ স্বামী ও পুত্রদ্বয় সহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্নের উপকরণ বনজাত শাকপাত মাত্র। তাহারা সকলে প্রফুল্ল অন্তরে জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদের কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ হয় না। কখনও বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ নাই। বড় বালকটির নাম ক্ষেপা, ছোটটির নাম কানু। মা সংসারের কাজ করিতে করিতে সময়ে সময়ে ছোট ছেলেটিকে বুকে করিয়া আদর করে; মধুর বচনে বড়টির প্রতি আদর প্রকাশ করিয়া থাকে কোন সভ্য ও স্বচ্ছল পরিবারে এরূপ মধুর ভাব ও মিষ্ট ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসভ্য সাঁওতালদিগের নিকটে আমাদের অনেক নীতি ও শিষ্টতা শিক্ষণীয় আছে। সেই বাবুর নাতী সম্পর্কিত একটি বালক আছে. ক্ষেপা সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়। উক্ত বালক ইঞ্জিন হয়, কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষেপা কয়লার গাড়ী হইয়া তাহার পেছনে ছুটিয়া বেড়ায়, এবং নৃত্য করে।

দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ মক্কা মদিনায় যাওয়া তীর্থযাত্রিক মোসলমানদিগের দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল এবার মোসলমান মণ্ডলীর নেতা তুরস্কের সোলতানের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এবং সাধারণ মোসলমানের অর্থসাহায্যে হেজ্জাজ রেলওয়ে খোলাতে সেই কষ্ট আর নাই। হেজ্জাজ রেলওয়েযোগে উক্ত দুই তীর্থনগর যুক্ত হইয়াছে। যে দিন এই রেলওয়ে খোলা হইয়াছিল, সেই দিন সর্ব্বত্র মোসলমানগণ আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন।

আমরা কয়েক মাস রোগ বিপদাদিতে আক্রান্ত থাকাতে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে প্রাপ্য মূল্যের জন্য উপস্থিত হইতে পারি নাই। তাঁহারা দয়া করিয়া অন্ততঃ গত বৎসর এবং পূর্ব্ব বৎসরের বাকি মূল্য অচিরে পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

কিছুদিন হইল ওভর টাউন হলে একটি বিশেষ সভাতে ছোটলাট মহামতি ফ্রেজার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি দুরাত্মা বাঙ্গালী যুবা তাঁহাকে লক্ষ করিয়া পিস্তল ছোড়ে, ভাগ্যক্রমে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তখনই সে ধরা পড়ে। বিচারে তাহার প্রতি সশ্রম দশবৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মজফফরপুরে যে পুলিশ ইন্সপেক্টরের বিশেষ যত্নে ইয়ুরোপীয় মহিলা দ্বয়ের হত্যাকারী ক্ষুদীরাম ধরা পড়িয়াছিল, কলিকাতায় তাঁহাকে রাত্রিকালে অসহায় পাইয়া ২।৩জনে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনুসন্ধান এক্ষণও হইয়া উঠে নাই।

ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহিতাদি সূচক কিছু লেখা হইয়াছে বলিয়া "বন্দেমাতরং" ও "সন্ধ্যা" পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া যন্ত্রালয়াদিও হস্তগত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যুগান্তরাদি আরও কতকগুলি পত্রিকার প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে। পুলিশ সন্দেহ করিয়া অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী যুবাকে গেরেপ্তার করিয়াছে। এক্ষণও আলিপুরের বোমা মামলা সংক্রান্ত প্রায় চল্লিশজন বাঙ্গালী বিচারাধীন আছে, তাহারা ৬।৭ মাস যাবৎ হাজতের ক্লেশ ভোগ করিতেছে। কত দিনে যে বিচার নিষ্পত্তি হইবে তাহার স্থিরতা নাই। শীঘ্র শীঘ্র বিচার নিষ্পত্তি হইতে পারে সম্প্রতি এরূপ এক আইন পাশ হইয়াছে।

বিগত ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে গিরিডির বাবু মনোরঞ্জন গুহ, সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বরিশালের বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বন্দেমাতরংএর সম্পাদক বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লক্ষ মুদ্রা দানে স্বদেশী দল হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক স্বদেশী দলের আরও চারি জন বাঙ্গালী বাবু সর্ব্বশুদ্ধ নয়জন অকস্মাৎ বন্দী হইয়া স্থানান্তরিত বা দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। ১৮১৮ সনের বিশেষ আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী। ইহারা পত্রিকা লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া সাধারণের মন উত্তেজিত ও রাজ্যে অশান্তি বিস্তার না করেন এই উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে। তবে ইহারা অন্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ডনীয় নহেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে পাঞ্জাবের লাজপদ রায়ের ন্যায় শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে পারেন, অন্যথা আবশ্যক বোধ হইলে দীর্ঘকাল দেশচ্যুত করিয়া রাখিতে পারেন। শুনা যায় সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার বাবুকে আগ্রার কেল্লাতে রাখা হইয়াছে। অনধিকার চর্চ্চা ও একান্ত বাগাড়ম্বর, অহঙ্কার ও আতিশয্যের এই পরিণাম।

ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড মরলী সাহেবের ভারতসাম্রাজ্য শাসনের নূতন ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার ন্যায়পরতা ও উদারতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

কুচবিহারে স্ত্রীশিক্ষা।

কুচবিহার-বিবাহ হইতে যে কুচবিহারে সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে তাহা কেনা স্বীকার করিবে? সত্যপ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী, ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শোণিতদানের মধ্যে কুচবিহারের উন্নতির বীজ নিহিত ছিল। শোণিত-তত্ত্ব না বুঝিলে কুচবিহারের এ ক্রমোন্নতির তত্ত্ব কে বুঝিবে? কুচবিহারে স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতিই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। একদিকে শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা বাহাদুর পুরুষ শিক্ষার ভূরি উন্নতির কল্পে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠা সাধনে এরাজ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন তেমনি শ্রদ্ধাস্পদ মহারাণী মহাশয়াও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে অতুল উৎসাহ, ও উদ্যম প্রকাশ এবং বহু অর্থদান করিয়া এদেশে নারীজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। কুচবিহারে বহু দিন হইতে প্রতিষ্ঠিত সুনীতি কলেজ ও মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয় সমূহই তাঁহার সহৃদয়তা, বদান্যতা ও আব আর মহোচ্চ ভাবের পরিচায়ক। বর্ত্তমান বর্ষে মহারাণী মহাশয়া স্থানীয় সুনীতি কলেজের উন্নতিবিধানে যার পর নাই প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুচবিহার ষ্টেট্ হইতে মাসিক সাহায্যের বৃদ্ধি ও নিজ হইতেও বিশেষ মাসিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া সুনীতি কলেজকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। এবার সুনীতি কলেজের পরীক্ষার ফল বড়ই আশাপ্রদ হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগীয় উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় যে ছয়টী বালিকা প্রেরিত হইয়াছিল সেই ছয়টি বালিকাই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বাস্তবিকই স্ত্রীশিক্ষানুরাগীদিগের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের মধ্যে তিন জন ছাত্রী বিভাগীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া পারদর্শিতানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। আর দুই জন ছাত্রী ক্রমান্বয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে ছাত্রী মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে সে ছাত্রীও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগীয় ছাত্রদিগের মধ্যে পারদর্শিতানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বাস্তবিকই পরীক্ষার এই আশাপ্রদ ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

অধিক বয়স্কা সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগেরও উন্নতি কল্পে শ্রদ্ধাস্পদ মহারাণী মহাশয়ার আশা, উৎসাহ ও উদ্যম সহজ নহে। এই শ্রেণীর মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এখানে "মহিলা শিল্প বিদ্যালয়" নামে একটী নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাসে দুই দিন মাত্র বিদ্যালয়ের অধিবেশন চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে যে অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলাগণের শিল্পশিক্ষার বিশেষ উন্নতি ও দরিদ্র পরিবারের মহিলাগণের জীবিকা উপার্জ্জনের একটা পথ প্রস্তুত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা মহারাণী মহাশয়ার এইরূপ সহৃদয়তাপূর্ণ উৎসাহ, আয়াস ও অর্থদানের জন্য হৃদয়ের আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশ ও তাঁহাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। আদেশবাদী বিশ্বাসী যে এ সমুদায় ব্যাপারের মূলে বিধাতার ইচ্ছা ও ক্রুশবাহী ব্রহ্মানন্দের শোণিত দান স্বীকার করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

কুচবিহার } শ্রীগৌরীপ্রসাদ
১০।১২।০৮ } মজুমদার।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] পৌষ, ১৩১৫, জানুয়ারী ১৯০৯। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

অন্তরে নীতির প্রভাব নাই, বাহিরে তাহার প্রকাশ, এরূপ অনেক নারী দেখিতে পাওয়া যায়। নীতি কি? বিবেকানুমোদিত কার্য্য। অন্তরের ভাবের সঙ্গে বাহিরে কার্য্যের মিল না হইলে কপটতা হয়, উহাকে নীতি বলা যায় না। স্বামীর প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা নাই, কেবল মুখে ভালবাসা ও আদরের কথা, ইহাকে নীতি বলা যায় না, ইহা কপটতা পাপ। নীতিপরায়ণ লোকের চরিত্র উন্নত হয়, সুখ শান্তির জীবন হয়, কপটতা অনীতি ও অধর্ম্ম, তাহাতে অধোগতি হইয়া থাকে। নীতি স্বর্গীয় আলোক বিশেষ, অনীতি নরকের অন্ধকার। কি শ্রেয়, কিরূপ কার্য্য করিলে কল্যাণ হয় বিবেকবাণীরূপে ঈশ্বর অন্তরে বলিয়া দেন। তুমি বিবেকবাণীর অনুসারে চল, তাহা অগ্রাহ্য করিও না। তুমি স্বামীকে ভাল বাস, তাহার নানা দোষ সত্ত্বে তাহাকে ভাল বাসিতে থাক, কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাক, কিন্তু বাহিরে আদর করিয়া পাপকার্য্যে তাহাকে প্রশ্রয় দিলে তাহার প্রতি ভালবাসা হয় না। স্বর্গীয় মঙ্গলের জন্য তাহাকে শাসন করিবে, ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবে। প্রেমের শাসন কঠোর হয় না, মিষ্ট হয়।

তোমার নীতির শাসন—চরিত্রের দৃষ্টান্ত বালক বালিকা প্রভৃতি সকলের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহারা অনীতি কপটতাকে ভয় করিয়া চলিবে, পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হইবে। যে পরিবারে নীতি নাই, অনীতি কপটতার প্রাদুর্ভাব সেই পরিবার দুঃখের পরিবার ও পাপের পরিবার। সেই পরিবার কখনও সুখী হইতে পারে না।

গৃহকর্ত্রি, তোমার জীবনের বড় দায়িত্ব, তুমি চরিত্রের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে নীতি শিক্ষা দিবে। তুমি নীতিকে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারিণী হইয়া চলিতে পার না। তোমাকে বিশেষ সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে।

বিশেষ নারীর বিশেষ প্রতিভা।

মানব জাতি প্রতিভা বা প্রকৃতি অনুসারে সাধারণ ও বিশেষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণ শ্রেণীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী। তাহাদের আত্মোন্নতির জন্য কোন উচ্চাভিলাষ নাই, জগতের সেবাকার্য্যে উপযুক্ত হইবার জন্য অন্তরে কোন প্রকার আবেগ নাই, তাহারা সংসারে ও শরীরে বদ্ধ, তাহারা সামান্য শারীরিক সুখ ও সংসারের স্বচ্ছলতা হইলেই সন্তুষ্ট। অর্থোপার্জ্জন করিয়া সামান্য সুখ স্বচ্ছন্দতায় জীবনযাপন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। মেয়েরা বোম্বাই শাড়ী বা দশ পাঁচ খানা গহনা পরিতে পারিলে বা কোন প্রকার নূতন ধরণের সাজে সজ্জিত হইতে পাইলে, উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করিয়া সচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করিতে পারিলে আর কিছুই চাহেন না। এ সমস্তই শারীরিক ও সাংসারিক, সকলই সাধারণ ও অসার। ইহাতে নারীজাতির উন্নতি, নারী প্রকৃতির উন্মেষ এবং নারী-জীবনের বিশেষত্ব কি হয়? সাধারণতঃ আত্মদৃষ্টিবিহীন পার্থিব সুখপ্রিয় নারী তাহাই চায়, তাহার জন্যই ব্যাকুল। তাহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যাদিগের সেরূপ জীবন দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের উচ্চজীবন ও উচ্চসুখ হয়, তাহাদের দ্বারা জগতে মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয়, কয়জন পিতামাতা তদ্রূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সন্তানদিগের বিদ্যা শিক্ষা ও বিবাহাদি কার্য্য তাঁহারা সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগকে আর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন না। এই প্রকার সাধারণ কার্য্যে সাধারণ জীবনে পরমেশ্বরের সাধারণ অভিপ্রায় সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ কার্য্য ও সাধারণ জীবন দ্বারা জগতের বিশেষ সেবা হয় না, উহা জগতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয় না।

মঙ্গলময় বিধাতা যাহাদ্বারা নিজের বিশেষ অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে চাহেন কোন বিশেষ বিষয়ে তাহাকে বিশেষ প্রতিভা অসাধারণ শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহার শৈশবকালেই সেই শক্তি ও প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায়। বিশেষ নারীর বিশেষ প্রতিভা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অতএব আমরা বিশেষ পুরুষের বিশেষ প্রতিভার বিষয় আলোচনা না করিয়া, প্রতিভাশালিনী নারীর দুই চারিটী কথা বলিতেছি।

এক একটী ক্ষুদ্র বালিকা শিক্ষা ও উপদেশ না পাইয়া বিশেষ দৃষ্টান্ত না দেখিয়া নিজের জীবনে এক একটি বিষয় অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সে বিষয়ে ভগবান্ তাহার অন্তরে আশ্চর্য্য আলোকের সঞ্চার করেন। সে লোকের নিকটে শিক্ষা না পাইয়া বিশেষ যত্ন পরিশ্রম না করিয়া এক একটি কঠিন বিষয়ে আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ করে। ১০।১২ বৎসরের বালিকার কবিতা রচনায় অদ্ভুত কল্পনা শক্তি ও বচনবিন্যাসের নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এইরূপ ক্ষুদ্র বালিকা

কাহারও নিকটে শিক্ষা বা উৎসাহ না পাইয়া এরূপ কবিত্ব লাভ করিল। ইহার ভিতরে বিধাতার বিচিত্র ক্রিয়া নয় কে বলিতে পারে? বিধাতা তাহার জীবন দ্বারা সাহিত্যজগতের উন্নতিবিধান করিবেন, তাহাকে কবিত্বরসে মুগ্ধ করিবেন, তজ্জন্য তিনি মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে তাহাকে তদ্বিষয়ে সহজ শক্তি ও প্রতিভা দান করেন। কিন্তু অনেক পিতা মাতা ও গুরুজন বালিকার রুচি, শক্তি ও প্রতিভাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় না বুঝিয়া তাহার জীবনের উন্নতির পথে বিঘ্ন হন, তাহার উন্নতির দ্বার একেবারে অবরুদ্ধ করেন, অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাকে সাধরণ পার্থিব সুখ ভোগে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করেন। তাহার সেই প্রতিভা ও শক্তি চাপা পড়িয়া যায়, সে সাধারণ নারীদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া জীবনযাপন করে। কোন কোন বালিকার শিল্পকার্য্যে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ পায়, সে বাধা না পাইলে আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্য করিয়া জগতের সেবা করিতে পারে, তাহার নিজেরও হৃদয় প্রশস্ত হইয়া যায়, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। অনেক বালিকার কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর, রাগ রাগিণীবোধে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা যায়, অভিভাবকের দোষে তাহার সেই ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি প্রস্ফুটিত হইতে পারে না চাপা পড়িয়া যায়। বিধাতার অভিপ্রায় ও কার্য্যে এইরূপ বাধা দিলে নিজেদের অকল্যাণ ও জগতের অকল্যাণ হয়। বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া চল, তিনি যাহাকে যে বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য পাঠাইয়াছেন তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দাও, সংসারের অনুরোধে তাহাতে বাধা দিও না, অচিরে দেখিবে তাহার জীবন কত উন্নত ও সুখী হয় জগৎ তাহা দ্বারা কত উপকৃত হয়। যে নারীর অন্তরে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাব প্রবল তাহাকে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিতে দাও বাধা দিও না। তাহা দ্বারা মহাকার্য্য সাধিত হইবে।

রন্ধনকার্য্য অতি পবিত্র কার্য্য।

এদেশে শারীরিক শ্রমের প্রায় সর্ব্ববিধ কার্য্যই নীচ বলিয়া গণ্য। যত দিন যাইতেছে ততই এ দেশের লোকে নিজেরটা নিজে করা অন্যায় এবং অপমানজনক মনে করিতেছেন। এই দরিদ্র দেশে মেয়েদিগকে আজও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়; গৃহ পরিষ্কার, ঝাটদেওয়া, গৃহলেপন, জল আনা, বাসনধোয়া, উচ্ছিষ্ট নেওয়া, রন্ধনকরা, ধানসানিয়া চাউল করা, চিড়া কোটা ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত গমন পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। রন্ধনপটুতা মেয়েদের একটি অতীব প্রশংসনীয় গুণমধ্যে পরিগণিত। পূর্ব্বে মেয়েরা রন্ধনজন্য খ্যাতি লাভ করিলে নিজেকে কত কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিতেন। স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া রন্ধনশালাতে যাওয়ার নিয়ম ছিল, উননে আগুন জ্বালার পূর্ব্বে অগ্নি এবং উননকে সেই দেব দেব মহাদেবের অদ্ভুত জ্ঞান কৌশল এবং জীব শরীরের পোষণ উপযোগী খাদ্যপ্রস্তুতির প্রধান সহায় জানিয়া ভক্তির সহিত নমস্কার

করিবার রীতি ছিল। স্বর্গীয় আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন গাইয়াছেন "জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল" সুতরাং এই রন্ধনশালাতে অগ্নিতে, উনানে হরি দর্শন করিয়া ভক্তিমতী নারীরা প্রণাম পূর্ব্বক পতি পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক,এবং অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতকরিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইয়া নিজেকে অত্যন্ত তৃপ্ত এবং সুখী মনে করিবেন ইহাতে আর সংশয় কি? রন্ধন এবং খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা কত দূর পবিত্র এবং উচ্চ কার্য্য তাহা বাক্যে বলা দুষ্কর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ কাল রন্ধন কার্য্যটা অতি ছোট লোকের কার্য্যমধ্যে দাঁড়াইয়াছে—ছোট লোকের না হউক অন্ততঃ নিকৃষ্ট কার্য্য দরিদ্রতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্তদিন কিছুই করিবার নাই তাহারও সেবা করিতে হয় না, এমত স্থলেও নিজের অন্ন নিজে প্রস্তুত পুরুষেরাতো করেনই না, এমন কি কোন কোন বিধবারাও পার্য্যমানে করিতে ইচ্ছা করেন না। এবং করেনও না। হায়! যে রন্ধনকে আচার্য কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই রন্ধন-সেই ভোজনে পবিত্রতা সাধন আজ কত তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া পরিবেশন করিতেন, অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সতী সীতা রন্ধন করিতেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঘরে ঘরে মেয়েরা রান্না করিয়া সকলকে আহার করাইতেন। ইহা অতি পবিত্র কার্য্য ছিল। অন্য জাতিতে সে রন্ধন কার্য্যের অধিকার পাইত না। আজও পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে অধিকাংশ গৃহেই গৃহিণীরাই রন্ধন কার্য্য করিয়া থাকেন; পঞ্চাশ হাজার টাকা যাহার জমিদারীতে আয় তাঁহার পত্নীও স্বহস্তে রেঁধে সকলকে খাওয়াইতে ভালবাসেন এবং তিনি এখন যে বিধবা হইয়াছেন, তবু অন্যের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে সুখ বোধ করেন। দুই প্রহর রাত্রিতে অতিথি উপস্থিত হইলে তিনি সকলের পূর্ব্বে উঠে অতিথিসেবায় রত হইয়াছেন। গৃহের বৌঝিকে তজ্জন্য ব্যস্ত করেন না। তাঁহারা স্বতঃ উপস্থিত হইলেও নিজেই রন্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা মাত্র সহায়তা করিতে পাইয়াছেন। এই যে নিষ্ঠা স্নেহ দয়া ভক্তিসহ ভোজ্যজাত প্রস্তুত হইত সেই পবিত্র অন্ন যাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা স্বাস্থ্য, পবিত্রতা লাভ করিতেন। আহারের পূর্ব্বে দেবতাকে নিবেদন করিয়া হিন্দুরা আহার করেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া এবং অন্নশক্তিতে ভগবানের প্রেম শক্তি উপলব্ধি করিয়া আহার করেন। আহার এইরূপই উৎকৃষ্ট কার্য্য, আহার পানেই লোকের ধর্ম্ম। নববিধানের উপাধ্যায় মহাশয় আহারের সময়ে স্মর্তব্য একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাব নিহিত রহিয়াছে। মাতার হস্তের প্রস্তুত আহার যেমন মিষ্ট এবং মধুর পাচক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ঘৃতপক্ব অন্ন

এবং নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য তেমন বোধ হইবে না। ঔদরিক লোকেরা বোধ হয় এ কথায় প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব এই যে নিষ্ঠার সহিত প্রস্তুত আহারের নিকট কোন আহারই শ্রেষ্ঠ নয়। এই জন্য এ দেশের ভোগের প্রসাদ বড় ভাল লাগে। শ্রদ্ধা ভক্তি মিশ্রিত দ্রব গ্রহণে শরীর মন সতেজ এবং শুদ্ধ হয়।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ ইত্যাদি সমারোহের ব্যাপারে দুইশত তিনশত লোকের অন্নব্যঞ্জন গ্রামের মেয়েরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন পাচক ব্রাহ্মণ না হইলেই চলে না। এমন নয় যে তাহারা জনহিতকর কিম্বা পরিবারেরই কোন অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে অবসর হয় না বলিয়া পাচক ব্রাহ্মণের হাতে রন্ধন ভার দিতে বাধ্য হয়েন। অলস হইয়া ঘরে বসে থাকিবেন তবু সেবার কার্য্যে রত হইবে না। আজকাল একশত দুইশত টাকা আয় হলে গৃহিণী কি রন্ধন করিবেন? নীচকার্য্যে শরীর ময়লা হইবে যে। পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাইয়া শরীর মনের কি সুস্থাবস্থা থাকে? ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী হইতেছেন যে তাঁহারা লেখাপড়া বেশী শিখিয়াছেন তাহা নয় পরসেবা যে বেশী কিছু করেন তাহাও নয়, কিন্তু রান্না করিবেন না; রান্নাটা নীচ কার্য্য। কবে সুবুদ্ধি সুমতি প্রবেশ করিবে? অনেকে বলেন রন্ধন কার্য্য করিতে গেলে উপাসনায় যোগ দেওয়ার পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, পূর্ব্ব বাঙ্গলায় নববিধান বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে একটী নারী (ছয় সন্তানের মাতা হইয়াছেন) প্রাতঃ সন্ধ্যায় রান্না করেন, অথচ পারিবারিক উপাসনা প্রাতে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় সন্তানদিগকে লইয়া কীর্ত্তন প্রার্থনায় প্রায় এক ঘণ্টা যাপন করেন, দুই প্রহর হইতে অপরাহ্ণ চার ঘটিকা পর্য্যন্ত অন্তঃপুরিকাদিগকে শিক্ষা দান করেন, কেননা তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্তঃপুরিকা শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত।

দেশের গতি ক্রমে যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে অচিরেই বাজার হইতে (হোটেল হইতে) ভাত তরকারী ক্রয় করিয়া খাওয়ার প্রথাই আসিয়া দাঁড়াইবে। এখনি রাত্রির আহার অনেকেই দোকান হইতে খরিদ করিয়া সমাধা করেন। হিন্দুর আহারের নিষ্ঠা তিরোহিত হইয়া যাওয়ার মধ্যে। পশ্চিম দেশীয় উন্নতিজনক প্রথার অনুকরণ নাই, কিন্তু বিলাসিতার অনুকরণটা বিলক্ষণ চলিতেছে। ধর্ম্ম প্রবল ভারত ক্রমে নিতান্ত ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং আহার নিষ্ঠায় তেমন দৃষ্টি নাই, আহার ভোগমাত্র দাঁড়াইতেছে। যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আহার পানে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায় ভোজনক্রিয়াতে নিষ্ঠা হারাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে নিগূঢ় জীবনের পবিত্রতা নিহিত রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা যদি রন্ধন কার্য্যকে পবিত্র কার্য্য বলিয়া ভক্তি এবং নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে পারেন তবে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

হিন্দুসমাজের মেয়েদের মধ্যে রন্ধন এখনও গুরুতর নিষ্ঠা ভক্তিরকার্য্য বলিয়া পরিগণিত আছে। ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে এই নিষ্ঠা ভক্তি প্রচলিত হইলে হিন্দুসমাজের মেয়েদের ভক্তি নিষ্ঠা ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে ক্ষয় প্রাইবে না। অতএব ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের এ বিষয়ে স্বতঃপরতঃ দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন কি ?

সীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ দিকে ব্রহ্মা মহাদেবকে ধরিয়া বসিলেন যেন সীতা যার তার হাতে না পড়েন। আশুতোষ তাঁহার লোহার ধনুক খানা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা ভাঙ্গিতে পারে এমন শক্তি মানুষের নাই। আপনি ভৃগুরামকে আনাইয়া তাঁহাদ্বারা এই ধনুক খানা জনক রাজার নিকট পাঠাইয়া দিন, এবং তাঁহাকে আদেশ করুন যে, এই ধনু যিনি বাহু বলে দুই খণ্ড করিতে পারিবেন তিনিই সীতার বর হইবেন। ভৃগুরামের নিকট তৎক্ষণাৎ আর্জ্জেণ্ট তার গেল; তিনিও স্বর্গ পার হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনতিবিলম্বে অমর ধামে পৌঁছিলেন। সে সময় স্বর্গের সিঁড়িটা না জানি কেমন ছিল। স্বর্গধামে যাইবার এহেন সুগম রাস্তাটা কি না রামচন্দ্র বাণ মারিয়া খাণ খাণ করিয়া একেবারে অস্তিত্বহীন করিলেন! আজ কাল যদি ইহার এক আধটু ধ্বংশাবশেষও থাকিত, সরকার বাহাদুরের কত ইঞ্জিনিয়ার মহোল্লাসে স্বর্গ আবিষ্কারের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। সে কথা যাউক, মহাবীর ভৃগুরাম সেই প্রকাণ্ড ধনুকখানা অবলীলাক্রমে জনকপুরে আনিয়া হাজির করিলেন। এবং রাজর্ষিকে প্রজাপতির আদেশ জানাইলেন।

ধনুক খানা যেমন তেমন নয়—
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনু খানি ভারি,
দিলে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি।

জনক রাজার প্রাণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত। হর্ষ, কেন না তাঁহার কন্যার প্রতি দেবতাদের শুভদৃষ্টি,—বিষাদ, কেন না এই ধনুক ভাঙ্গা দূরে থাকুক ইহাকে হাতে ধরিয়া তুলিবার শক্তি কাহারো নাই। তিনিত ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। দলে দলে দেশ বিদেশ হইতে কত লোক হরধনু দেখিতে আসিতে লাগিল। লোকের মস্ত ভিড়, লোকের বিষম ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি। ছেলেদের ভারি আমোদ। বড় বড় রাজা রাজপুত্র সীতার বর হইবার আশায় ধনু ভাঙ্গিতে আসিলেন, এবং ছেলেদের হাত তালি খাইয়া লজ্জিত বদনে সরিয়া পড়িলেন। তার পর আসিয়া উপস্থিত লঙ্কার সেই নামজাদা রাক্ষসরাজ রাবণ। ত্রেতাযুগে বোধ হয় তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তার কৌশল অজানা ছিল না, অথবা রাক্ষসেরা ব্যোমযান চালনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিল যে তাহারা যথা ইচ্ছা তথায় যাতায়াত করিতে পারিত। লঙ্কাধীপ বোধ হয় তাড়কার বেটা মারীচের নিকট হইতেই সীতার বার্ত্তা অবগত হইয়াছিলেন। রাবণ একা আসিলেন না

সঙ্গে ফিল্ডমার্শেল মাতুল প্রহস্ত, ব্রিগেডার জেনেরল অকম্পন, লেপটেণ্ট মহোদয় ও এডিকং মারীচ। মিথিলায় হুলুস্থুল ব্যাপার। রাজা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মন্ত্রীদিগের ডাক পড়িল—গুপ্তসভা বসিল। রাজা নিরাশভাবে বলিলেন—

স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে,
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন্ জনে।

যাহা হউক, রাক্ষসরাজের বড়াই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কুড়ি হাতে প্রাণপণে টানিয়াও ধনুকখানা নাড়িতে পারিলেন না; লজ্জায় মরিয়া গেলেন। প্রহস্ত ব্যাপার সাংঘাতিক বুঝিয়া ইতঃপূর্ব্বেই রথখানা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। রাবণ এক লম্ফে রথে যাই উঠা অমনি বোঁ বোঁ শব্দে রথখানা আকাশে উঠিয়া বিদ্যুৎ বেগে দক্ষিণ মুখে প্রস্থান করিলেন।

পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী,
সকল বালক দেয় তারে টিট্‌কারী।
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল রাজা দশানন,
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।

তখন দেবতাদের প্রাণেও একটা মহা আতঙ্ক উঠিয়াছিল, পাছে দশাননের কুড়ি হাতের টানে ধনু খানা না টেকে। এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা ধনুকের গায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন অযোধ্যার রাজপুরোহিত মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র মুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণসহ বিদেহ নগরে পদার্পণ করিলেন। প্রায় এক হাজার মণ অতি কষ্টে বহন করিয়া হরধনু সভাস্থলে আনয়ন করিলে রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বাম হস্তে তাহাকে উত্তোলন করিয়া মড়্ মড়্ শব্দে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ধন্য শক্তি, ধন্য বাহুবল। এই ধনুর্ভঙ্গে রামচন্দ্রের অসাধারণত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স কত ছিল? মাত্র সতের বৎসর। কথিত আছে ত্রেতাযুগে মানুষ চতুর্দ্দশ হস্ত, পরমায়ুঃ দশ হাজার বৎসর ছিল। সেই হিসাবে রামচন্দ্র নিতান্ত বালক বা শিশু ছিলেন বোধ হয়। শিশুর গায় এত শক্তি যে, যে ধনুক রাবণ প্রভৃতি মহাকায় বীরগণকে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করিল, তাহাকে অক্লেশে ভাঙ্গিয়া ফেলিল!

এরূপ গল্প আজকালকার স্কুলে পড়া ছেলে মেয়েরা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত। হলেনই বা রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। মানুষের ন্যায় তাঁহাকেও জীবনে অশেষ শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

তৎপর মহাধুম ধামে সীতার বিবাহ হইয়া গেল। সীতা এখন রাজবধূ অযোধ্যার ভাবী মহারাণী। সীতা শ্বশুরালয় যাইতেছেন, রাজ অন্তঃপুরে এক মহা বিচ্ছেদসূচক শোকের তরঙ্গ উত্থিত।—

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদনকমলে
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে।

করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ।

শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিহ সুমতি
রাগ দ্বেষ অসূয়া না করো কারো প্রতি।

সুখ দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে
স্বামী সেবা, সতি, না ছাড়িও কোন কালে।

বড় সুন্দর কথা প্রত্যেক মহিলার হৃদয়ে ইহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকুক। ঈশ্বর করুন হিন্দুনারী যেন এই কথামৃত পান করিয়া সংসারে নিজের সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন।

কীর্ত্তিবাস রামচন্দ্রের বনবাস বর্ণনকালে বলিতেছেন, বিবাহের এক বৎসর পরই কোথায় রাম রাজা হইবেন, না চৌদ্দবৎসরের জন্য বনবাসী হইলেন। অভাগিনী সীতা রাজভোগ, গুরুজনের অনুরোধ উপদেশ, কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। বনবাসের নিদারুণ কষ্ট হিংস্র পশু, নরখাদক রাক্ষসদিগের ভীতি, তাঁহার পতিগতপ্রাণ একটুও বিচলিত করিতে পারিল না। ১১ বৎসরের একরত্তি মেয়ে; রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন ভয় দেখাইলে আর তাঁহার বনবাসে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু এযে যেমন তেমন মেয়ে নয় গো।

শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে।
নিজনারী রাখিতে যে ভয় করে মনে
দেখ, তারে বীর বলে কোন্ ধীর জনে।
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।

আর কি চাই? বালিকার সরল প্রাণ ছাড়া এমন অকপট সকরুণ হৃদয়স্পর্শী কথা কোথায় ফোটে? বালিকা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছলছল নেত্রে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেন তুমি আমাকে সঙ্গে যাইতে মানা করিতেছ"—

যখন জনক ঘরে ছিলাম শৈশবে
বলিতেন দেখিয়া আমাকে মুনি সবে।
শুনহে জনকরাজ তোমার দুহিতা
করিবেন বনবাস পতির সহিতা।
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন।

ভগিনীগণ, কন্যাগণ, তোমরা বালিকা বধূ সীতার কথা শুনিলে? ইহা কবিকল্পন নহে। সীতা যে জনমদুঃখিনী তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গর্ভধারিণী জননীর পরিচয় নাই, জনকরাজা লালনপালন করিয়াছিলেন, তাই 'জনক দুহিতা'। মনের মত গুণবান্ ও রূপবান্ স্বামী লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে একটি বৎসর কত লুকাচুরী কত পুতুলখেলা খেলিয়া বালিকা যে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শুধু তাঁহার স্বামী নহেন, তাঁহার খেলার সাথী, উপদেষ্ট গুরু ও একমাত্র সর্ব্বস্ব। এমন বান্ধব, এমন ভালবাসার জিনিষ, তিনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাইলেন না। বন—বনবাসের কষ্ট তাঁহার ভাবনার মধ্যেও আসিল না। দাঁড়াও মা, একটু দাঁড়াও। তোমার প্রেম ভক্তিমাখা বিষাদমাখা মুখখানি একবার আমাদিগকে ভালরূপ দেখিতে দাও। এমন সোণার মূর্ত্তি কে শ্রীহীন করিল গো? কোন্ নির্দ্দয় কোন্ প্রাণে তাঁহার কুসুম কোমল কমনীয় দেহখানি আভরণ শূন্য করিল? হায়! হায়! অযোধ্যার ভাবী মহারাণী সন্ন্যাসিনী বেশে স্বামী ও দেবর সঙ্গে রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন!! ননীর পুতুলি সীতা প্রখর সূর্য্যকিরণে, কণ্টকাকীর্ণ

দুর্গম পথে কষ্টে নিপীড়িত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা ও পশ্চাতে দেবর লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়ার কষ্টে মর্ম্মাহত। পথে মুনিকন্যাগণ সেই দিব্যকান্তি জটাবল্কল-ধারিণী ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ। তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতি।
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী,
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি।
সুন্দর বদন দীর্ঘ উন্নত আকার,
ধনুর্ব্বাণ করে, উনি কে হন তোমার।

আহা! সীতা লাজে অধোমুখী; কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইলেন, "ইনি আমার স্বামী।" তার পর যমুনা নদী পার হইয়া দুরন্ত রাক্ষসের হাত এড়াইয়া এবং ভরদ্বাজ মুনির নির্দ্দেশমতে তাঁহারা অবশেষে পঞ্চবটীবনে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন।

রাম সীতা কুটীরের ভিতরে তৃণশয্যায় শায়িত; লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণহস্তে পাহারায় নিযুক্ত, এই দৃশ্য দেখিবার জিনিষ। সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম, পার্থিব নয়; যথার্থই স্বর্গীয়।

যৎকালে তাঁহারা পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে রামচন্দ্রের বনবাসকাল অবসান প্রায়; অর্থাৎ তখন ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সীতা তখন পূর্ণ যুবতী; তাঁহার লাবণ্য-গরিমা উছলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান রূপবহ্নিতেজে সূর্পনখা কুরূপা হইল, খরদূষণ সদলে পুড়িয়া মরিল। তারপর হতভাগ্য রাবণ দিশাহারা পতঙ্গের ন্যায় সপরিবারে সেই জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত হইল। হায়! সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া গেল। সীতাহরণের পর দশমাসের ভিতরে কি একটা অলৌকিক কাণ্ড, লোমহর্ষণ বিভীষণ সমরক্রীড়া হইয়া গেল! ত্রেতাযুগে বোধ হয় সেস্থানে সমুদ্রের তত্টা গভীরতা ও পরিসর ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় লঙ্কাধিপ দুর্জ্জয় রাবণ সেতুবন্ধকালে বিপক্ষকে কোন বাধা দিতে সাহসী হইল না? এতগুলি নামজাদা জেনেরেল, লক্ষ লক্ষ রণনিপুণ যোদ্ধা— সকলেই চুপ্ চাপ্! তাহাদের এই দশা না হইবে কেন? রাবণ পরস্ত্রী-হরণে মহা-পাপী—তিনি পাপের জ্বালায় মতিভ্রষ্ট, হতবুদ্ধি ও ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই মহাপাপেই এতশীঘ্র তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

অভাগিনী সীতার দুঃখ কষ্টের বুঝি এইবার অবসান হইল। বন্দিভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া এতদিন পরে স্বামীসন্দর্শন কত মধুর, কত উল্লাসজনক। কিন্তু একি? রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক তাঁহার প্রতি দৃক্পাতও করিলেন না? এই স্থানে আমরা রাম-চন্দ্রকে সাধারণ মনুষ্য বই আর কিছুই দেখিতেছি না। সীতা যে ভাবে দীর্ঘকাল রাবণের করায়ত্ত ছিলেন, তাঁহার স্বভাব চরিত্রে সন্দিহান হওয়া মানুষের পক্ষে অসঙ্গত নয়। তার পর লোকনিন্দার ভয় কাহার না আছে? সীতার অপবাদ, নিন্দা

ও কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্যই সীতার 'অগ্নি পরীক্ষ' রূপ বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠান। রক্ষকুলতিলক মায়াবিদ মিত্র বিভীষণ, প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রী জাম্বুবান, অসাধারণ বৈজ্ঞানিক নল নীল প্রভৃতি রয়েল ইঞ্জিনিয়ারগণ এবং বৈদ্যরাজশ্রেষ্ঠ সুষেণ যথায় বর্ত্তমান, তথায় বোধ হয় সহজেই অগ্নি-পরীক্ষারূপ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

আজকাল সখের থিয়েটারে সখের রাজপুত রমণীরা অম্লান বদনে প্রজ্জ্বলিত চিতায় 'জহরব্রত' পালন করিতেছে, এবং দর্শকমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছে। রাম বোধ হয় সেইরূপ দর্শকই ছিলেন—অথবা সেই দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক সীতাদেবী মেঘমুক্ত শশিকলার ন্যায় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া পুনরায় স্বামিসোহাগিনী হইলেন, ইহাতেই আমাদের আনন্দ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রাজহংসচালিত পুষ্পক রথে শূন্যপথে অযোধ্যায় অভিযান করিলেন। হনুমান পূর্ব্বাহ্লেই পদব্রজে যাত্রা করিয়া লম্ফে ঝম্ফে পাহাড় নদী পার হইয়া চক্ষের নিমেষে অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। সিংহল হইতে অযোধ্যা কত দূর পথ? তখনকার নিমেষ এখনকার লাট সাহেবের স্পেশেল ট্রেণ গাড়ীকেও পরাস্ত করিয়াছিল বলিতে হইবে।

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পতিপরায়ণা সীতাদেবীর ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি অযোধ্যার রাজরাজেশ্বরী, শাশুড়ীবর্গের আনন্দদায়িনী, আত্মীয়বর্গের হিতকারিণী ও সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণোদিনী। এমন দেবী—এমন পতিপ্রাণা সতীসাধ্বীর অদৃষ্টে সুখ মিলিল না। এই আক্ষেপ রাখিবার স্থান কোথায়? হায়, সগর্ভা রাজমহিষী একটা কুচরিত্র সামান্য ইতর লোকের কথায় লোকরঞ্জনার্থ, নির্ব্বাসিত হইলেন। রামচন্দ্র তোমায় ধিক্। তোমাকে কে বলে দয়াবান্, সুবিবেচক রাজা? তুমি পতিধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়া সংসারে নিজ স্থূল বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছ। অভাগিনী সীতা! মা, তুমি নিষ্ঠুর স্বামীকর্ত্তৃক অন্যায়রূপে পরিত্যক্তা হইলেও সকলের পূজ্যা। হিন্দুরমণী তোমার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া চিরকাল তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিবে।

নির্ব্বাসিতা সীতার দৃশ্য অসহনীয়। সেই দুঃখের সঙ্গীত গাইতে গাইতে কবিবর ৺হরিশ্চন্দ্র শোকাবেগে সহসা থামিয়া গিয়াছিলেন।

নির্ব্বাসিতা সীতার বিলাপ সঙ্গীত
গাহিতে হরিশ পারে না আর।
কল্পনার বীণা, হইল স্থগিত;
সীতা শোকে তার ছিঁড়িলেক তার।
আমাদেরও সেই অবস্থা।

মতিবাবুর পারিবারিক অবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পরীক্ষার ফল বাহির না হইতেই মতিবাবু হারাধনকে জামাতৃপদে বরণ

করিয়া তাহার সঙ্গে একমাত্র কন্যা শ্যামা-সুন্দরীর বিবাহ দিলেন। এই শুভ কার্য্যে তিনি মুক্ত হস্তে দীনদুঃখীদিগকে আর্থিক সাহায্য করিয়া যশস্বী হইলেন। বিবাহের পর সংবাদ আসিল জামাতা বাবাজী ২০৲ টাকা জলপানি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বাড়ীর সকলের আনন্দের সীমা রহিল না।

হারাধন এখন জামাই বাবু, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে জামাই বাবু বলিয়াই ডাকিব। জামাই বাবু কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। সহপাঠীদিগের মধ্যে কয়েক জন বড় লোকের ছেলে ছিলেন। তাঁহারা পড়াশুনা অপেক্ষা আমোদ প্রমোদই বেশী ভালবাসিতেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিতেন না, কিন্তু পরে আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। শিববাবু তাঁহার মতিগতি দেখিয়া একদিন বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিলেন। জামাই বাবুর অনুতাপ হইল বটে, কিন্তু রোগ কঠিন হইলে সামান্য চিকিৎসায় সুফল হয় কৈ? তিনি তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারিলেন না। একদিন তাঁহাদের সমুদ্র দেখিবার সাধ হইল। ঘটনাক্রমে সে সময় একখানা জাহাজ যাত্রী লইয়া পুরী যাইতেছিল। জাহাজ খানার নাম ছিল 'অরেন্'। শেষরাত্রে তাঁহারা জাহাজে উঠিলেন। ভোরবেলা শিববাবুর কাণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, মতিবাবুকে জামাতার গুণের কাহিনী লিখিয়া জানাইলেন।

সারা দিন বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বেই দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হারাধনের পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার বন্ধুবর্গের মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনি দোলায়মান জাহাজের অভ্যন্তরেই রহিয়া গেল। ঝড় উঠিল, জাহাজের কাপ্তান বিচলিত হইলেও নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিলেন না। তিনি হাস্যমুখে আরোহীদিগকে আশ্বাসিত করিয়া খালাসীদিগকে যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সমুদ্র মহাকালরূপ ধারণ করিয়া জাহাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহার বামে দক্ষিণে উর্দ্ধে কেবলই পর্ব্বত প্রমাণ বিশাল তরঙ্গ। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ভীষণ গর্জ্জনে জাহাজখানা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উপক্রম করিল। প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মাস্তুল মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আরোহীরা প্রায় সকলেই অচেতন; হারাধন অসম সাহসে বুক বাঁধিয়া নিজকে রক্ষা করিতেছিলেন। মাস্তুল ভাঙ্গিবামাত্র কয়েক জন খালাসী তাহার উপর চড়িয়া বসিল। হারাধনও অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়া তাহার একখণ্ড দড়ি ধরিয়া ফেলিলেন। তন্মুহূর্ত্তে মাস্তুল বিচ্ছিন্ন হইয়া জাহাজ হইতে বহুদূরে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং জাহাজখানা হতভাগ্য আরোহীদিগকে সঙ্গে করিয়া সাগরবক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার পোর্টকমিসনর আফিসে তার পরদিন এক হৃদয়বিদারক সংবাদ আসিয়া পৌছিল যে 'অরেন' জাহাজ

চাঁদবালীর ৩০ মাইল উত্তরে মারা গিয়াছে, জাহাজস্থ একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই। সহরে গ্রামে এই নিদারুণ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে অনেক পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। মতিবাবু পাগলের ন্যায় সপরিবারে কলিকাতায় বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাস্থানে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল, কিন্তু কোন সুফল ফলিল না। হতভাগিনী শ্যামার অবস্থা আমরা আর কি বলিব? তাহার বৈধব্যদশা অদৃষ্ট লিখন। শিববাবুর বাড়ীর নিকটেই স্বতন্ত্র বাসায় মতিবাবু অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্যামার মা অসহ্য শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইলেন, স্বরভঙ্গ হইল, গহনাপত্র শরীরে যাহা ছিল দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

যখন ঝড় থামিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। হারাধন কি ভাবে যে সারারাত্রি মাস্তুলের উপর কাটাইয়াছিলেন একমাত্র বিধাতাই জানেন। তিনি চক্ষু মেলিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে তিনি একটা কেবিনের ভিতর শয়ান। নিকটে একটি বৃদ্ধ সাহেব ও মেম বসিয়া ইংরাজীতে কি বলাবলি করিতেছিলেন। সাহেব গ্লাসে করিয়া তাঁহাকে কি একটা ঔষধ খাইতে দিলেন, অমনি তাঁহার শরীরস্থ নির্জ্জীব ইন্দ্রিয় সকল যেন সজীব হইয়া উঠিল। মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন্ "তুমি ইংরাজী জান?"

হারাধন ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন। সাহেব ও মেম সাহেব বড় খুসী হইলেন।

সাহেব—তোমার শরীর কেমন আছে?

হারাধন—বেশ আছি; বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

সাহেব—তুমি হিন্দু, আমাদের খানা খাবে?

হারাধন খাব।

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন "তোমার জাত যাবে যে, তোমার বাপ মা তোমাকে ঘরে নিবেন না।"

হারাধন—মেমসাহেব আমার বাপ মা আত্মীয় বান্ধব কেহই নাই। এখন আপনারাই আমার সর্ব্বস্ব। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি?

সাহেব—আমাদের জাহাজ লণ্ডনে যাবে, আজ তোমাকে একটা ভাসমান মাস্তুলের উপর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঝড়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদের জাহাজও বিপন্ন হইয়াছিল। তুমি কোথায় যাইতেছিলে?

হারাধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের জাহাজের নাম ছিল 'অরেন্'। অসংখ্য যাত্রী লইয়া পুরী যাইতেছিল জাহাজখানা কি ডুবিয়া গিয়াছে?"

সাহেব—সম্ভবতঃ তাহাই হইবে। তুমি এখন কি চাও?

হারাধন—আমি আপনাদের সঙ্গে বিলাত যাইব।

সাহেব—তা'হলে তোমাকে ব্যাপ্‌টাইজ হতে হবে। আমি কে জান?

হারাধন—না মহাশয়।

সাহেব—আমার নাম রেভারেণ্ড হেণ্ডারসন্। আমরা সস্ত্রীক বহুকাল আসামে বাস করিয়া দেশে যাইতেছি। তুমি যদি পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তবে আমরা তোমার ধর্ম্ম পিতামাতা হইয়া তোমার লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিব।

হারাধন সম্মত হইলেন।

তার পর জাহাজ যখন এডেন বন্দরে পৌঁছিল, পাদ্রী সাহেব যথারীতি তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া বাজার হইতে তাঁহার জন্য একসুট পোষাক ক্রয় করিয়া আনিলেন। নবধর্ম্মের আশীর্ব্বাদে হারাধনের যেমন বেশভূষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল, তেমন তাঁহার শৈশবকালের নামটীরও একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার নাম হইল মিঃ আর্থার হেরিসন বস্।

পাদ্রী সাহেব সস্ত্রীক ধর্ম্মপুত্র মিঃ বসকে সঙ্গে করিয়া হাস্যমুখে ষ্টিমারে আসিলেন। অনেক সাহেব মেম খানায় বসিয়া গিয়াছেন। তিনি মিঃ বসএর কাহিনী বর্ণনা করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া মিঃ বসকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন।

একে রংটী ফর্সা, তা'তে সাহেবী পোষাকে অঙ্গ ঢাকা, মিঃ বসকে বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বস সাহেব মনের সুখে কাঁটা চামচ ধরিয়া ডিনার খাইতেছেন,—আর এদিকে নির্জ্জলা একাদশীর ভীষণ পীড়নে অভাগিনী শ্যামার ওষ্ঠাগত প্রাণ। সেদিন মতিবাবুর বাড়ীতে উনান ধরে নাই, সকলেই উপবাসী। হারাধন কি নিষ্ঠুর, কি কৃতঘ্ন!! তিনি যদি জাহাজ হইতে তাঁহার শ্বশুরের নিকট তাঁহার প্রাণরক্ষা ও বিলাতযাত্রার কথা লিখিয়া জানাইতেন, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় ছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া এসম্বন্ধে তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন, তিনিই বলিতে পারেন।

যথাসময় জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিলে মিঃ হেরিধন পূর্ণ মাত্রায় সাহেব হইলেন।

জেনারেল বুথের পরিবার।

(একটী কুমারী কন্যা হইতে প্রাপ্ত।)

জেনারেল বুথের প্রতিষ্ঠিত দল মুক্তি-ফৌজের এরূপ প্রবল প্রতাপশালী হইবার মূল কারণ কি? জেনারেল বুথ তাঁহার দলকে উপদেশ দিবার আগে একটী আদর্শ পরিবারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধারণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পুত্র কন্যার চরিত্র গঠন করেন। কেবল তাঁর একাকীর চেষ্টায় তিনি কখন ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার অভিন্নহৃদয়া সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় তিনি মনোমত উপযুক্ত পুত্র কন্যা গঠন করিয়াছেন। পুত্র কন্যারাও পিতামাতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া তাঁহাদের নাম সার্থক করিয়াছেন।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই অনেক মহানুভব মহচ্চরিত্র লোকের সন্তানেরা পিতার কোন সদ্গুণের উত্তরাধিকারী না হইয়া, ভিন্নচরিত্র নীচ প্রকৃতির লোক হন। লোকে পিতার গুণ পুত্রে আশা

করে, না দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন। পুত্র কন্যা পিতার অপেক্ষা মাতার চরিত্রের উত্তরাধিকারী হয়। পিতা গুণবান্ মহানুভব হইলে কি হইবে? মাতা যদি সেরূপ না হন, পুত্র কন্যা কখন পিতার নাম রক্ষা করিতে পারে না। এই বুথ পরিবারে আমরা দেখিতে পাই, পিতার সঙ্গে মাতার এক মত, এক আদেশ, এক লক্ষ্য হওয়াতে পুত্র কন্যা পিতা মাতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, নাম সার্থক করিয়াছে। বুথ পরিবার হইতে, মুক্তি-ফৌজ হইতে আমাদের অনেক জানিবার শিখিবার আছে। আমরা ব্রাহ্মসমাজে ও অন্যান্য স্থলেও কি দেখিতে পাই দরিদ্রতা-ব্রতধারী প্রচারকদের সন্তানদের জীবনের লক্ষ্য কি? তাহাদের জীবনের আদর্শ কি বৈরাগী প্রচারক হইয়া পরসেবায় জীবনাতিপাত করা নহে? কিন্তু তাহাদের জীবনের আদর্শ সংসারে দশজনের একজন হইয়া ধনী সংসারী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা। তাঁহারা দরিদ্র প্রচারকের জীবনকে অত্যন্ত দুঃখের জীবন মনে করে। অপর দিক দিয়া ধরিতে হইবে, প্রচারকেরা যে ধর্ম্মকে ভাল বাসেন, বড় বড় উপদেশ দিলে বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁহারা যদি পুত্র কন্যাকে ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করেন, তাদের জীবনে যদি ধর্ম্মকে জয়যুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবেই বুঝা যায়। অনেক স্থলে পিতা নিজে বৈরাগী প্রচারক, কিন্তু পুত্রের জন্য ধন, মান, পদ, প্রাধান্য চান। কিন্তু বুথ পরিবারে সেরূপ নহে, পিতা, মাতা পুত্র ও কন্যার জীবনে ধর্ম্মকে জয়যুক্ত দেখিতে চান ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। পুত্র কন্যাদের সংসারের সুখ সম্পদ প্রার্থনা করেন না। পুত্র কন্যাদেরও জীবনের সর্ব্বোচ্চ আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ কি পিতামাতার ন্যায় পরসেবায় জীবন দান করে। মনে হয় জগতে এরূপ ধর্ম্ম-পরিবার আর কখনও হয় নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, জামাতা, বধূ সকলের জীবনের এক শিক্ষা দীক্ষা এক কার্য্য, চেষ্টা, সকলে এক দলে পৃথিবীর পাপীতাপী দীন দুঃখীর পাপভার দুঃখভার বহন করিতে অগ্রসর। বাল্যকাল হইতে তাদের কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী জেনারেল বুথের দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্গগতা এমার বাল্যকালের কথা।

যখন মিসেস বুথ পোর্টস্‌মাউথে প্রথমবার বেড়াইতে আসেন, এমা তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, সেই সময়ে একটী ঘটনা হয়। সেই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়, তাঁর সন্তানেরা নিষ্ঠুর আচরণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। অন্যান্য দিনের ন্যায় এমা তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী গর্দ্দভের গাড়ী তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। এমা দেখিল যে একটী বালক ছড়ি দিয়া গর্দ্দভটীকে মারিতে মারিতে লইয়া চলিয়াছে। এমা বালকটীকে গর্দ্দভকে মারিতে নিষেধ

করিল, কিন্তু সে তাহার কথায় হাসিয়া আরও জোরে মারিতে লাগিল।

এমা শিক্ষয়িত্রীর হাত ছাড়াইয়া গিয়া গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটীতে লাগিল, অনেক ক্ষণ দৌড়াইবার পর সে গাড়ীর নিকট পৌঁছিল ও লাগাম ধরিল।

এমা ঐ বালকের হাত হইতে ছড়ী টানিয়া লইয়া বালকটীকে প্রহার করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "এইবার এখন কেমন লাগছে"? বালকটি অত্যন্ত বলবান্ ছিল, সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এমাকে আক্রমণ করিতে পারিত, কিন্তু এমার প্রহারের অপেক্ষা চোখের জল ও কাতর প্রার্থনা অধিক ক্ষমতাশালী ছিল। এমার এই ব্যবহারে বালকটি মুগ্ধ হ'য়ে, অবাক্ হ'য়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সে বিনা বিচারে নিঃশব্দে তার কথায় সম্মতিদান করিয়াছিল ও আর কখনও সে এরূপ করিবে না বলিয়াছিল। এমার অনুরোধে ধূলার উপরেই গর্দ্দভের পাশে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বালকটি এমার ব্যবহারে পরাজিত হইয়া তাকে তার পথ হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। বালকটি তাহাকে গাড়ী ক'রে ফিরে আসিতে চাহিল। এমা গাড়ীর উপরে বালকটির পাশে বসিয়া বিজয়ী হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। এমা যাইতে যাইতে গাধাটির অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিল, গাধাটিকে উত্তমরূপে আহার দিতে ও সদয় ব্যবহার করিতে বলিল। ইতিমধ্যে তাহার শিক্ষয়িত্রী মাতার নিকট যাইয়া এমার দুঃসাহসের কথা বলিলেন। কিন্তু মাতা আনন্দে সকল কথা শুনিলেন, আদরের সহিত কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহার সংচেষ্টার সার্থকতা দেখে অধিকতর আনন্দ করিতে লাগিলেন।

পোর্টসমাউথে বাস করিবার সময়েই একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক মেছুনী কাঁকড়া ও চিংড়িমাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেই মেছুনী বাড়ীর ভৃত্যটীর সঙ্গে এইরূপ গল্প করিতেছিল, যে গত রাত্রিতে যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন একটা চিংড়িমাছ লাফাইয়া পড়াতে সে কিরূপ ভয় পাইয়াছিল। এমা এই কথোপকথনটী শুনিতে পাইয়াছিল। এমা আরও শুনিতে পাইল যে সেই মেছুনী বলিতেছে, যে যখন জল অল্প অল্প উষ্ণ হয় তখনই চিংড়িগুলি জলের মধ্যে দেওয়া হয়, পাছে তাহারা তাহাদের দাঁড়া বাহির করে। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন ছোট ছেলের মত চিংকার করিতে থাকে, ও মৃত্যু না হওয়া অবধি ছটফট করিতে থাকে।

এই কথাগুলি শুনিয়া সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রামওয়েল বুথের নিকট গমন করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রামওয়েলের উপর সকলের ভার ছিল, এমা ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া সন্ধ্যাবেলাতেই মেছুনীর বাড়ীতে গিয়া, তাহার নিষ্ঠুরাচরণের বিষয়ই তাহার সহিত কথা বলিবার অনুমতি চাহিল। ব্রামওয়েল বলিলেন, কাল প্রাতঃকালে গেলেই হবে. কিম্বা এবিষয়ে তিনি

নিজে একখানা পত্র লিখিতে রাজি আছেন, ইত্যাদি নানা কথায় তাহাকে সন্ধ্যাবেলাতে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই এমাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা গেল না, সে নিজে সেই রাত্রিতেই গিয়া দেখা করিবে, তাহাই ঠিক হইল।

একটা ল্যাম্প হাতে লইয়া সেই অন্ধকার গ্রাম্য পথে, এমা তাহার ধাত্রীর সঙ্গে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল স্বামী স্ত্রী দুজনেই শয়ন করিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাইবার পর উপরের ঘরের জানলা খুলিয়া একজন লোক বাহির হইল। "মহাশয়া আপনি" সেই ধীবর বলিল। সেই ধীবর যখন জানিতে পারিল বালিকা তাহার স্ত্রীর নিকট কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া নীচে আসিল। এমা ধাত্রীকে বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এমা মনে করিলেন, আর একজন লোক সম্মুখে থাকিলে সে যেরূপ সরল ভাবে জোরের সহিত বলিতে চায় তাহা বলিতে পারিবে না। যখনই কোন লোককে তাহার অপরাধ দুর্ব্বলতার কথা সরল ভাবে বলিতে চাহিতেন, এমা চিরজীবনই এই নিয়মানুসারে চলিতেন। আমরা সেই বালিকার অদম্য উৎসাহপূর্ণ ছবি মনে ভাবিয়া লইতে পারি, কিরূপ আবেগের সহিত সে তাহার রুদ্ধ ভাব উন্মুক্ত করিল। সে এরূপ ভাবে কথাগুলি বলিল যে, সেই ধীবর দম্পতী নতজানু হয়ে কাঁদিতে লাগিল, এবং এমা তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং পুনরায় এরূপ কখনও করিবে না বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ করিল।

স্বীয় প্রচারে কৃতকার্য্য হ'য়ে সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল, মধ্যে মধ্যে পথে পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, এইরূপে সে আপনার ক্লান্তি লুকাইতে চেষ্টা করিল, তাহার ধাত্রী তাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। গৃহে আসিয়া ভ্রাতার সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন, ভ্রাতা তাহার সাক্ষাৎকারের সকল কথা আনন্দের সহিত গর্ব্বের সহিত শুনিলেন। ভ্রাতা তাঁহার পাশের ঘরে এমার শুইবার বন্দোবস্ত করিলেন, পাছে সেই চিংড়িমাছের ভয়ানক যাতনার কথা মনে হইয়া ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

আর একদিন এমা তাঁহার উপরের ঘরের জানালা হইতে দেখিতে পাইল যে, সম্মুখের ময়দানে দুইটি বালক মারামারি করিতেছে, সে দ্রুতবেগে তাহাদের নিকট গমন করিয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া তাহাদের সহিত এরূপভাবে কথা কহিল যে তাহারা বন্ধুভাবে, পরস্পরের হস্তধারণ করিল ও তাহাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

দেবী গান্ধর্ব্বী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

গান্ধর্ব্বীর উপাস্য দেবতা তাঁহার জীবনীর নানা স্থানেই সুপ্রকাশিত, তথাপি তৎসম্বন্ধে এ স্থানে পরিষ্কাররূপে কিছু

লিখিত হওয়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পরম উপাস্য ছিলেন। অন্য দেবতা প্রকৃত পক্ষে তিনি মানিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই এক-নিষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, সংসার, ইহকাল, পরকাল সমস্ত সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পিতা মাতা প্রাণপতি ও জীবন সর্ব্বস্ব শ্রীহরি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল; মনের সমুদয় আঁধার দূর হইয়াছিল; তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের হইয়া গিয়াছিলেন। নিরন্তর নয়ন ভরিয়া শ্রীভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন, শুদ্ধ ভক্তি-যোগে তাঁহার লীলানুধ্যান এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নিত্য প্রেমসুধা পানই গান্ধর্ব্বীর জীবনের সার সামগ্রী ছিল। আমরা তাঁহাকে অনেক সময়েই ঐরূপ শুদ্ধ প্রেম-সুধাপানে বিভোর দেখিয়াছি। তাঁহার ভাবপূর্ণ সৌম্য মুখকান্তি দর্শন করিয়া ও ভাবময়ী মহাজনপদের আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহার অন্তরস্থ ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। গোপীভাবের পূর্ণ পরিণতি গৌরাঙ্গভাবে মগ্ন থাকাই তাঁহার বিশেষ সাধনা ছিল। ইহাতে তিনি প্রচুর পরি-মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের মনোনীত কত পদ ধীরভাবে আবৃত্তি করিয়া ভাবামৃত পান করিতেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

একবার যার হৃদয়ে লাগে,
সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণ তনু যেন আম্র আঠা।
নারীর মনে পশি যায়,
যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেহা কুলের কাঁটা॥

সময় সময় এইরূপ নানা পদাবলী আস্বাদন করিয়া একেবারে ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতেন, সেই পবিত্র স্মৃতি এখনও প্রাণে সমুদিত হইয়া হৃদয়ে বিমলানন্দ দান করে।

যত্ন সহকারে যে সকল উৎকৃষ্ট ও রস-ময় শ্লোক এবং পদাবলী শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, জীবনের নানা অবস্থায় নানা সময়ে সেই সেই অবস্থা ও সময়ের অনুকূল শ্লোক ও পদ আবৃত্তি করিয়া ভাবসুধা-পানে কৃতার্থ হইতেন। তাঁহার জীবন সাধনময় ছিল।

(বর্ত্তমানে ভাগলপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।)

গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণী আমার পিতৃব্য-কন্যা। আমাদের পরিবার একান্নভুক্ত ছিল, সুতরাং খুড়তাত জেঠতাত ও সহো-দরা ভাই ভগিনীদের কোন প্রকার ভিন্নতা ছিল না। তাঁহার যখন যৌবন আরম্ভ হয় তখন আমার জন্ম হয়। সে সময়ে ভাইদের মধ্যে আমিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলাম। এই জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক, আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ ছিল আমার মাতুলালয় তাঁহার শ্বশুরালয়ে

নিকটে ছিল, দুই তিন ঘণ্টার পথ মাত্র। আমার বাল্য জীবনের অধিকাংশ মাতুলালয়ে অতিবাহিত হইয়াছে। ১০।১১ বৎসর বয়সের সময়ে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম, বিশেষতঃ আমার কিশোর বয়সে প্লীহা ও জ্বর হওয়ায় প্রায় বৎসরাধিক পীড়িত ছিলাম। সেই সময়ে আমার শুশ্রূষা ও চিকিৎসা নিয়মিতরূপে হইতেছে না শুনিয়া তিনি আমাকে নিজালয়ে লইয়া যান। তখন দুই তিন মাস একাদিক্রমে তাঁহার নিকট ছিলাম। সেই সময়ে তাঁহার আচার ব্যবহার ও চলন চরিত্র যাহা দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি তাহার দু একটি কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। মধ্যে মধ্যে যে তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম, তাহা ব্যতীতও প্রায় প্রতি বৎসর দু একবার তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিবার সুযোগ হইত। প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আমাদের নিজালয়ে লইয়া যাইতেন; সেই সময়ে আমি আমার মাতাঠাকুরাণীসহ সেখানে যাইতাম।

তাঁহার জীবন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রধান ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গলার পল্লীগ্রামের মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থগণের মহিলাদিগের যে সকল সাংসারিক গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, সে সমস্তই তাঁহাকে করিতে হইত; তথাপি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম যতই কেন অধিক বা শ্রমসাধ্য হইক না, তাঁহার দৈনিক পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদির কোন ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। হরি নামে রুচি, হরিকৃপায় বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার অতি উজ্জ্বল ছিল। আমি যখন পীড়িত অবস্থায় তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার ওলাউঠা অর্থাৎ ভেদবমি হয়। কয়েকবার দাস্ত হইলে তাঁহার মনোহর সুবর্ণ বর্ণ মলিন হইয়া গেল, চক্ষুদ্বয় কোটরস্থ হইল। তখন তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা রহিল না বটে, কিন্তু এক প্রকার গাম্ভীর্য্য আসিয়া মুখমণ্ডলে দেখা দিল। সে গাম্ভীর্য্য মনের ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই; মুখে কেবল হরিনাম ভিন্ন আর কোন শব্দ ছিল না। আহা উহু আর্ত্তনাদ কিছুই নহে। আমি এবং তাঁহার স্বামী তাঁহার শুশ্রূষার জন্য যথা কর্ত্তব্য করিতে লাগিলাম। তিনি ঠাকুর ঘরের উঠানে ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। কোন ঔষধাদি গ্রহণ করিলেন না, এই ভাবে এক কি দেড় দিন থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। অন্য এক সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনাথ প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। তিনি কেবল হরিনাম মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার জ্বর দূর করিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বস্তু সকল হরিনামমন্ত্রপূত করিয়া তাহাকে আহার করিতে দিতেন। আমি তখন একটু ইংরাজী পড়িয়াছি; আমার নিকট ও প্রকার আচরণ অবৈধ বোধ হইত। তাই আমি এক দিন অন্য একটি লোকের নিকট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমার প্রতি রুষ্টভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই আমি আমার প্রতি তাঁহার বিরক্ত ভাব একবার দেখিয়াছি: তদ্ব্যতীত

চিরকাল তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়াছি।

লেখা পড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধার্ম্মিক পিতার সহায়তায় পৌরাণিক ধর্ম্মতত্ব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ব বিলক্ষণ জানিতেন। সাধারণ পল্লীগ্রামবাসিনী নারীদিগের ন্যায় বাজে গল্প করিয়া সময় কাটাইতে তাঁহাকে দেখি নাই। সাংসারিক কাজ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিতে শুনিয়াছি।

বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে যৌবনকালে সংসারে অনেক কাজ কর্ম্ম করিতে হইত বলিয়া নিজের কেশমার্জ্জনও যথারীতি করিতে পারিতেন না, সুতরাং মাথায় অনেক উকুন হইয়াছিল। সংসারে কাজ কর্ম্ম করিয়া এবং স্বামী প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া যখন নিজে ইষ্ট দেবতার পূজা আরম্ভ করিতেন তখন ঐ উকুনগুলি বড় বিরক্ত করিত, এবং মন স্থির করিয়া পূজা করিতে পারিতেন না, তাই এক দিন নিজের হাতে দীর্ঘ কেশগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। পাছে বা লোকে টের পাইয়া কিছু বলে, সেই ভয়ে কেবল কপালের দুই দিকে ছোট ছোট দুই গাছা কেশ রাখিলেন। মস্তকের পশ্চাদ্দিক্ কাপড়ে ঢাকা থাকিত। তখন আর উকুনের যন্ত্রণায় পূজার ব্যাঘাত হইত না।

অন্য পুরুষদিগের সঙ্গে ব্যবহারে অত্যন্ত নিয়মপরায়ণা ছিলেন। এক দিন তাঁহার দেবরসম্পর্কীয় একটী লোক আসিয়া বলিলেন, "বৌ আমি একটা পান খাব।" তিনি গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণীর অপেক্ষায় বয়সে অনেক কনিষ্ঠ হইলেও গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণী নিজে পান সাজিতে গেলেন না; কেননা সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না। দেবরকে বলিলেন, "ঘরে পান আছে সাজিয়া খাও।" বোধ হয় দেবরের ইচ্ছা ছিল, এই উপলক্ষে দুদণ্ড তাঁহার সহিত গল্প করেন; নির্জ্জনে পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা তিনি পছন্দ করিতেন না। এ কথা গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণী নিজে আমাকে বলিয়াছেন।

তিনি যে অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাহা ত দেখিয়াইছি। তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই, তাঁহার বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে যাইবার অল্প কয়েক দিন পরে এক দিন গ্রামস্থ দেবর সম্পর্কীয় একটী লোক অতি ক্ষুদ্র ও পাতলা এক টুক্‌রা নিমকাঠ লইয়া গ্রামের সব বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া বধূদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি কাঠ?" কোন বধূই চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণীর বাড়ীতে আসিয়া একজন লোক দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাইলেন, "এটা কি কাঠ?" তিনি কাঠের ঘ্রাণ লইয়া বলিয়া দিলেন, "নিম কাঠ।" প্রশ্নকর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "গ্রামের সব বউগুলি নির্ব্বোধ, কেবল এই বউটি বুদ্ধিমতী।"

বাজে কথা প্রায়ই কহিতেন না। কিন্তু সময়ে সময়ে এক একটি কথায় বেশ নির্দ্দোষ রসিকতা করিতেন। একদিন তাঁহার দেবর সম্পর্কীয় শ্যামাপ্রসাদ নামক একটী লোক তামাসা করিয়া হরিপ্রসাদ নামক একটী বালককে বলিয়াছিলেন,

"তুমি হরিপ্রসাদ, তবে তুমি বাতাসা; কেন না বাতাসা দিয়া হরির লুট হয়।" গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণী যখন এই কথা শুনিলেন, তখনই বলিলেন, "হরিপ্রসাদ যদি বাতাসা হয়, তবে শ্যামাপ্রসাদ পাঁঠা।"

মহিলাদিগের রচনা।

কোন কবি ভগিনীর প্রতি।

সুদূর প্রবাসে বসি বন্ধুহীন গেহে
মনে পড়ে প্রবাসীর স্বদেশের কথা,
শারদীয় উৎসবেতে জননীর স্নেহে
জাগায় হৃদয় মাঝে কত সুখ কথা!
যদিও সে পারে না গো হেরিতে মায়ের
সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি; তথাপি তাহার—
সুখ স্মৃতি মনে পড়ে; মনে পড়ে আর—
করুণাময়ীর সেই স্নেহ হৃদয়ের।
তেমতি আজিকে সখি সুদূরে বসিয়া,
পেয়েছি শুনিতে তব বীণার ঝঙ্কার,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
নীরব আনন্দ এক হৃদয় মাঝার!
সফল হউক সখি লেখনী তোমার,
বিলাও তৃষিত-জনে প্রীতি পারাবার॥

শ্রীমতী সা—
কাসৌলি।

জানি আমি।

জানি আমি—সার তুমি সকল সময়,
জানি আমি—চির তুমি অক্ষয় অব্যয়,
জানি আমি—আছ তুমি সবার নিকটে,
জানি আমি—বন্ধু তুমি বিপদে সঙ্কটে।
জানি আমি—হও তুমি দয়াময় স্বামী,
জানি আমি—সদা তুমি হও অন্তর্যামী,
জানি আমি—ব্যস্ত তুমি কল্যাণের তরে,
জানি আমি—হও তুমি সবার অন্তরে।
জানি আমি—হও তুমি সবার সহায়,
জানি আমি—পূর্ণ তুমি অসীম দয়ায়,
জানি আমি—নাথ তুমি অনাথ জনার,
জানি আমি—বিশ্বে তুমি জননী সবার।
জানি আমি—আশা তুমি নিরাশ হৃদয়ে,
জানি আমি—ধন তুমি দরিদ্র আলয়ে,
জানি আমি—বিনা তুমি কিছু নাহি আর,
জানি আমি—হও তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
জানি আমি—প্রভু তুমি সবার-সবার,
জানি আমি—লও তুমি ভক্তি উপহার,
জানি আমি—জানি নাক কিছুই তোমার,
জানি আমি—শুধু তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
জানি আমি—হও তুমি ভক্ত-জন প্রাণ,
জানি আমি—চাও তুমি মহা আত্মদান,
জানি আমি—সার ধর্ম্ম ইচ্ছার পালন,
জানি আমি—সার ধন তোমার চরণ।
জানি আমি—লও তুমি পূজা উপহার,
ভক্তি ভরে নত শিরে করি নমস্কার॥

সুনীতি কলেজ
কুচবিহার,
৩০।১১।০৮

আপনার স্নেহের;—
স——

ভ্রাতা ও ভগিনী।

(নীতি বিদ্যালয়ে পঠিত)

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া পরস্পরের মঙ্গল-

কামনা করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। ভাইভগিনী পরস্পরের এই যে সম্বন্ধ অতি মিষ্ট সম্বন্ধ। একমাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র ও মিষ্ট ভাব ধারণ করে। এই সম্বন্ধকে অগ্রাহ্য ও অনাদর করা কখনও উচিত নহে। এ জগতে ভাই ভগিনী ভগবানের অমূল্য দান। তাঁহারি অসীম করুণায় আমরা ভাই ভগিনী লাভ করি। মঙ্গলময় দেবতার এই করুণা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ভাই ভগিনী মিলিয়া সদ্ভাবে ও আনন্দে যেন দিন কাটাইতে পারি। হিন্দু পরিবারে ভাই ভগিনীর সুমিষ্ট সম্বন্ধ উপলক্ষে বিশেষ ভাবে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। আমাদিগের ব্রাহ্ম পরিবারেও এই উৎসব আসিয়াছে। আমরা বাঁকিপুরে এই উৎসবে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছি। স্বর্গগতা দেবী অঘোরকামিনী এই উৎসব সেখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বৎসরে বৎসরে অঘোর পরিবারে এই উৎসব হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই উৎসব কেবল ব্রাহ্মপরিবারে আবদ্ধ নহে। বাঁকিপুরে এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকলকেই আহ্বান করিয়া সমাদর করা হয়। এক সময় এই উৎসবে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল। যখন ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত বৃদ্ধ ফ্লেচার উইলিয়ম বাঁকিপুরে এই উৎসবের দিনে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে সেই উৎসবের সভায় আহ্বান ও বিশেষ ভাবে সমাদর করা হইয়াছিল। যখন আমাদের একজন ভগিনী তাঁহার ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন, বৃদ্ধ উইলিয়ম মস্তক অবনত করিয়া আদরের সহিত সে ফোঁটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমাদিগের এই পবিত্র সম্বন্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যপ্ত হউক ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

সুনীতি কলেজ } সংযোজিনী
কুচবিহার } মজুমদার

সংবাদ।

রেঙ্গুণ হইতে পুষ্পমালা দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"আমাদের মহিলা-সমিতি বেশ চলিতেছে। অনেকগুলি মেয়ে হ'ন। সেখানে কি প্রকারে কাজ হইলে আমাদের উন্নতি হইতে পারিবে জানাইবেন। আপাততঃ ২।৩টী ব্রহ্মসঙ্গীত হয়, এবং কেহ কোন প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িয়া থাকেন, অথবা কোন সদ্গ্রন্থ পাঠ হয়। গেলবারের সমিতিতে মহিলার 'মাতৃশিক্ষা, শীর্ষক প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল।"

সম্প্রতি ইটালীর অন্তর্গত সিসিলী দ্বীপে ভূমিকম্পে ও সমুদ্রের আকস্মিক জলপ্লাবনে দুই লক্ষেরও অধিক লোক মারা গিয়াছে, দ্বীপটি উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

এক্ষণ আর কলিকাতায় পথে মাঠে স্বদেশী বক্তৃতা ও স্বদেশী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোথাও প্রকাশ্য

ও গুপ্ত সভা সহজে হইতে পারে না। কতিপয় লোক একত্র হইয়া মন্ত্রণাদি করিলে, সন্দেহ হইলেই পুলিশ গেরেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারে। সমুদায় লোক ভয়ে তটস্থ ও নিস্তব্ধ। একান্ত আতিশয্য ও অর্ব্বাচীনতার এই বিষময় ফল। যে দিবস ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সঙ্গে ও ইংরাজ-জাতির সঙ্গে পুরুষানুক্রমে চিরবিচ্ছেদ ও বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে সেই বয়কটের দিন পুণ্যদিন ও আহ্লাদের দিন বলিয়া উৎসব করিয়া সকলের মনে বিদ্বেষ ভাবকে বিধিমতে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়, এবং যে দিবস ঢাকা নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গে নানা বিষয়ে উন্নতি ও কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে সেই দিবস শোকপ্রকাশের দিন বলিয়া শোকচিহ্ন ধারণ ও শোককারীদের প্রসেশন বাহির হয়, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! লাভের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালী যুবা ও বালকের সর্ব্বনাশ হইল, নীতি ধর্ম্ম গেল, কয়েকজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল, আরও কত দূর কি হইবে কে জানে? বাঙ্গলা দেশের কি দুর্দ্দশাই ঘটিল, নেতারা ভাবেন কি? সকল স্বাধীনতার পথে যে কণ্টক পড়িল।

ভারত সচিব মহামতি লর্ড মর্লির ভারত শাসনের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সকল লোকই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

এবার মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। চরম পন্থী বিপ্লবকারী দলের লোক যোগদান করেন নাই।

কয়েক জন রাজবিদ্রোহী বক্তা ও পত্রিকা সম্পাদক এবং কতকগুলি শ্রোতা ও পাঠকের মত বাঙ্গালায় ৭ কোটি লোকের মত হইতে পারে না। তাঁহারা ৭ কোটি লোকের প্রতিনিধি নহেন। বঙ্গদেশের প্রবল মোসলমান দল তাঁহাদের মতের বিরোধী। দুই চারি জন কেবল অর্থাদি সম্বন্ধীয় বাধ্য বাধকতায় তাঁহাদের মতে মত দিয়া থাকেন। সমস্ত বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের মতাবলম্বী নহে। অতএব ৭ কোটি লোক রাজনিয়মের বিরোধী, একথা সত্য নহে।

প্রেমাস্পদ শ্রীমান্ শরৎকুমার দত্ত এম্ এ ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য জর্ম্মাণীতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিত ও বিজ্ঞানে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়া টাটার ছাত্রীয় বৃত্তি অবলম্বনে ৫ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মাণীতে গিয়াছিলেন, সেখানে অতি বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন, কোনরূপ মাদক দ্রব্য এমন কি চুরুট পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই, চরিত্রগুণে তত্রত্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। জর্ম্মাণীতে যাত্রা করার পূর্ব্বে নবসংহিতানুসারে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ এবং একটী সুপাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া জর্ম্মণ, ফ্রান্স এবং ইটালী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী বালকের জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায়

পরীক্ষাদানে জর্ম্মাণীতে সর্ব্ব প্রথম হওয়া সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। শ্রীমান্ সাড়ে ৫ বৎসর পরে ঈশ্বরকৃপায় সুস্থ শরীরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বম্বে হইতে তাঁহার টেলিগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমানের গর্ভধারিণী ও প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ও প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং গুরুজনগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে সতৃষ্ণ নয়নে রহিয়াছেন। শরৎকুমার এক্ষণ স্বদেশের সেবা করিয়া মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আমরা গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে সানুনয়ে মহিলার প্রাপ্য মূল্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করুন।

রাজবিরুদ্ধে সাধারণ লোকের মন উত্তেজিত ও বিদ্বিষ্ট করিয়া রাজ্যে অশান্তি বিস্তার করেন বলিয়া বিপ্লবকারী দলের নয় জন বাঙ্গালী বাবুকে গভর্ণমেণ্ট গেরেপ্তার করিয়া যে স্থানান্তরিত ও দ্বীপান্তরিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুত হইল সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিবারের জন্য মাসিক দুই শত টাকা দান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা নাকি গ্রহণে অনিচ্ছুক।

ছিদ্রান্বেষণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জনের কেবল নিন্দা ও কুৎসা রটনা করা হয়, তিনি যে এ দেশের কত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মঠ উপকারী উপযুক্ত গভর্ণরজেনারেল এ দেশে কয় জন আসিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি মহামান্য লর্ড মিণ্টুর প্রিয়তমা কন্যার সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরজেনরেল লর্ড ল্যান্স ডাউনের পুত্রের শুভ পরিণয় কার্য্য গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতাস্থ কেথিড্রাল গির্জ্জাতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বরের মাতা বরকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ আদর অভ্যর্থনা হইয়াছে।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাকমাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিককাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্য দানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

ত্রয়োদশ বৎসর।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি সেন,	কোন্নগর	২৲
„ কুন্দমালা সেন,	কলিকাতা	২৲
„ সরলাসুন্দরী দাস,	কটক	১৲
„ হেমলতা ঠাকুর,	কলিকাতা	২৲
„ তরঙ্গিণী দেবী,	কুল্টী	১৷৵০
„ কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ সুশান্তবালা বসু,	তারকেশ্বর	২৲
„ সরসীবালা সেন,	ভাগলপুর	১৲
„ সাবিত্রীবালা দেবী,	কোচ বহার	২৲
শ্রীযুক্ত মোহিতলাল সেন,	কুচবিহার	২৲
„ কালীপদ দাস,	কলিকাতা	২৲
„ নিত্যগোপাল রায়,	গাজিপুর	২৲
„ রাজা মহিমরঞ্জন রায়,	কাকিনা	২৲
„ মহারাজা,	দিনাজপুর	২৲
„ দামোদর পাল,	বাঁকিপুর	২৲
„ অমৃতলাল সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ সুরেশচন্দ্র [illegible]সু,	কলিকাতা	১৲
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়,	ঢাকা	২৲

চতুর্দ্দশ বৎসর।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দাস,	কটক	১৲
„ সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী,	নোওয়াখালী	২৲
„ অমিয়া দেবী,	বেসিন	২৲
„ পুষ্পমালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
„ কুসুমকুমারী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ কিরণকুমারী মিত্র,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত কালীগোপাল রুদ্র,	ধুবড়ী	২৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] মাঘ, ১৩১৫, ফেব্রুয়ারী ১৯০৯। [৭ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

অনেক মা নিজের বালকবালিকাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, আদর করেন, কখনও তাহাদের প্রতি রাগ করেন না, তাহাদের সকল প্রকার আবদার রক্ষা করেন, কিন্তু মোহবশতঃ দুর্নীতির জন্য তাহাদিগকে শাসন করেন না। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিলে, মিষ্টান্নাদি চুরি করিয়া খাইলে বা মিথ্যা কথা কহিলে মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া মা সেই দুষ্ট বালকবালিকাদিগকে কিছুই বলেন না। তাহাতে তাহাদের দুষ্কর্ম্মে সাহস বৃদ্ধি হয়, দুর্নীতি দিন দিন বাড়িয়া উঠে, পরে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হওয়া দুষ্কর হয়। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া বালক বালিকাদিগকে দুষ্ক্রিয়ায় প্রশ্রয় দেওয়া জননীর পক্ষে অতিশয় অনীতির কার্য্য। এজন্য মাতা পরম মাতার নিকটে দায়ী। তুমি ভালবাসিতে যাইয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিও না, তুমি ভালবাসিবে ও তাহাকে পাপে প্রবৃত্ত দেখিলে মঙ্গলের জন্য শাসন করিবে। সেই শাসন ক্রোধ বিদ্বেষের শাসন হইবে না, প্রেমের শাসন হইবে।

মনে রাখিও, সুমাতা দ্বারাই সন্তানের চরিত্রগঠন হয়, বালকবালিকা সুনীতিপরায়ণ হইয়া থাকে। যত ধার্ম্মিক বড় লোক, তাহাদের চরিত্রের মূলে দেখা যায় সুমাতার সুশাসন। তুমি নীতিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া জীবনে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর, দুর্নীতিকে কোনরূপে অবহেলা ও উপেক্ষা করিও না দেখিবে তোমার সন্তানগণ দেবচরিত্র প্রাপ্ত হইয়া জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইবে।

থিয়োডোর পার্কার একজন ধর্ম্ম সংস্কারক বড় লোক হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননীর গুণে; বিদ্যাসাগর ভারতে পূজ্য হইয়াছেন, সাধ্বী জননীর চরিত্র প্রভাব তাঁহার বাল্যজীবনে পড়িয়াছিল বলিয়া; কেশবচন্দ্রের সাধুতার মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী সারদাদেবী বিদ্যমান। তুমি সুমাতা হইয়া বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দানে সুপথে লইয়া চল। তাহাদের চিরকল্যাণের বীজ তোমাদের হস্তে।

মেয়েদের জীবে দয়া।

এদেশের জৈন সম্প্রদায় জীবহত্যা করে না, জীব হত্যা করিবে কি বরং সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহারা কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবের সেবা করিয়া থাকে, পিপীলিকা ছাড়পোকা প্রভৃতিকে আহার যোগায়। ইতর জীবের সেবা করা তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম। তাহারা বৃদ্ধ ও পীড়িত পশু পক্ষীদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, আহারাদি দানে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। মহানগরীর অনতিদূরস্থ পিঞ্জরাপোলনামক স্থানে জৈনদিগের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জীব সেবার ক্ষেত্র, সেখানে শত সহস্র রুগ্ন ও জরা দুর্ব্বল পশু পক্ষী সংগৃহীত হইয়া সযত্নে সেবিত হইতেছে। বহু সেবক তাহাদের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের বাসের জন্য কোঠা ঘর সকল নির্ম্মিত। শরৎকালে গোষ্টাষ্টমীর দিন পিঞ্জরাপোলে মহা মেলা হয়। সেইদিন কলিকাতা হইতে অনেক গুলি স্পেশাল ট্রেণে লোকের গতিবিধি হইয়া থাকে। গাভী সকলকে নানা সজ্জায় সজ্জিত করা হয়, সেবকগণ ফল পল্লব মিষ্টান্নাদি আদর পূর্ব্বক "খাহ খাহ" বলিয়া গাভীর মুখে অর্পণ করিয়া থাকে। জৈনেরা কোন নিষ্ঠুর কসাইকে গরু বা ছাগল হত্যা করিবার জন্য লইয়া যাইতে দেখিলে অধিক মূল্যদানে ক্রয় করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। একদা আমরা রাজপুতানা প্রদেশের অন্তর্গত সাম্ভারে গিয়াছিলাম, সেখানে ২০ মাইল ব্যাপী লবণের হ্রদ। তৃষ্ণার্ত্ত পক্ষী সকল মিঠা জল পান করিয়া তৃপ্ত হইবে এই উদ্দেশ্যে সারি সারি তরুশাখায় হাড়ী পূর্ণ কূপোদক দয়ালু জৈনেরা রাখিয়া দিয়াছে, দেখিতে পাওয়া গেল।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় জীবহত্যা করে না। তাহারা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলে। কিন্তু তাহারা মৎস্য মাংস ভোজন করে, নিজে কোন জীবকে মারে না। অন্য লোকের দ্বারা মারা গিয়াছে এমন পশু পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। বর্ম্মদেশ বৌদ্ধপ্রধান দেশ, সেদেশের মেয়েরা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য বিশেষ সাধন করিয়া থাকেন, বাজার হইতে কৈ মাগুর প্রভৃতি জীবিত মৎস্য সকল ক্রয় করিয়া আনিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দেন, কসাই হইতে গো মেষাদি খরিদ করিয়া আনিয়া ফুঙ্গিকে (বৌদ্ধধর্ম্ম যাজককে) দান করেন। ফুঙ্গির আশ্রমে বিশেষ ব্রতাবলম্বী হইয়া জীবসেবা ও জীবের প্রতি দয়াবিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করেন। বর্ম্মদেশের বিশেষ বিশেষ পেগোডাতে (ধর্ম্ম মন্দিরে) নরক যন্ত্রণার ভীষণ ছবি সকল স্থাপিত আছে। আহারের প্রলোভন দেখাইয়া বড়শী দ্বারা মাছ শীকার করিয়াছিল, এমন পাপীর কণ্ঠে যমদূত বড়শী বিদ্ধ করিয়া তরুশাখায় তাহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, কোন স্ত্রীলোক জীবন্ত কৈ মাগুর প্রভৃতি মাছকে বঁটি দ্বারা কাটিয়াছিল, যমদূত তাহার দেহ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, এরূপ ছবি সকল ইতস্ততঃ রক্ষিত। তাহা দেখিলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা মাংস ভক্ষণ করে না, এমন কি পাঁটা মহিষ ইত্যাদি বলিদান দর্শন করে না। সাধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণ মাছ খায়, কিন্তু সাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী। বিহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পঞ্জাব মহারাষ্ট্র সিন্ধু গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা বাঙ্গালীর ন্যায় আমিষভোজী নয়, সেই সমস্ত দেশের ভদ্র লোকেরা মৎস্য স্পর্শও করে না, তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। অনেকে মাংস খাইলেও তদ্বিষয়ে নিতান্ত মিতাচারী। একটী গুজরাটী বিদ্যার্থী যুবা কিয়ৎকাল যাবৎ আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছেন, তাঁহার পিতা বৈষ্ণব, মাতা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি ব্রাহ্ম। যাহারা মাছ খায় তাহাদের সঙ্গে উক্ত যুবা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে অক্ষম। তাঁহাকে স্বতন্ত্র গৃহে ভোজন করিতে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "এরূপ মাছ মাংস বাঙ্গালীরা কেন খাইয়া থাকেন? তাঁহাদের মনে কি একটু দয়া হয় না? মারিবার সময় জীব সকল দুঃখে আর্ত্তনাদ করে, ছটফট করিতে থাকে, ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিতে চাহে। তাঁহাদিগকে আঘাত ও নিপীড়ন করিলে যেরূপ ক্লেশ ও যাতনা হয় সেই ইতর প্রাণীদিগেরও তাহাই হইয়া থাকে।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মিকাদিগের ধর্ম্ম বুদ্ধি ভক্তি প্রেম ও হৃদয়ের কোমলতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ সাধন দিতেন। নববর্ষ বৈশাখ মাসে অনেকে তাঁহার নিকটে সাবিত্রী ও মৈত্রেয়ী ব্রত প্রভৃতি সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ব্রত গ্রহণ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশেষ সংযম ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইত। সাধুসেবা, দীনসেবা, জীবসেবা, বৃক্ষসেবা তাঁহাদের নিত্য সাধনের অঙ্গ ছিল। শাস্ত্রপাঠ, রন্ধন, সদালোচনা, সায়ংকালে নির্জ্জনে ধ্যানধারণা ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে তাঁহারা রত হইতেন। এখন আর মেয়েদের ব্রত নিয়ম পালন ও সাধন ভজনাদি কিছুই নাই, তৎপরিবর্ত্তে ইভিনিংপার্টীতে ও টীপার্টীতে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে গল্প আমোদ করিতে দেখা যায়। এদেশের শাক্ত সম্প্রদায়ের পুরুষেরা মাংস ভোজন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী নহেন, মিতাচারী। অনেকে বলির প্রসাদ ব্যতীত বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না। প্রাচীন শ্রেণীর মেয়েরা মাংস ভক্ষণ করেন না, মাছ খাইয়া থাকেন। তাঁহারা মাংস খাওয়া অতিশয় দূষ্য মনে করেন, কিন্তু নব্য শ্রেণীর অধিকাংশ মেয়ে ঘোরতর মাংসপ্রিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে প্রত্যহ ইংলিশ ডিনার করেন। আমরা দেখিয়া স্তম্ভিতও হই যে তাঁহারা অর্দ্ধদগ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ ছাগল ভেড়া ও মুরগী ইত্যাদি ছুরিকাঁটা দ্বারা ছিন্ন ও বিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাহাদের কেবল মাংসই ভোজন হয়। অন্ন বা রুটির সঙ্গে বড় যোগ থাকে না, প্রধান আহার মাংস। অন্ন বা রুটির যোগথাকিলে মাংসের উপকরণস্বরূপ, নামমাত্র। এই উষ্ণপ্রধান দেশের পক্ষে বাঙ্গালীজাতির পক্ষে বিশেষতঃ মেয়েদের

পক্ষে এরূপ মাংসাহার কি যে অস্বাভাবিক বলিয়া উঠা যায় না। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মেয়েকে দেখা যায় যে, প্রত্যহ আহার যোগাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মুর্গী পোষেন, সেই পোষা মুর্গীর দুই একটীকে মারিয়া উদরস্থ করেন, তাঁহাদের সংস্কার যে মুর্গী না খাইলে শরীর সুস্থ থাকে না, মাথা ঠাণ্ডা হয় না। তাঁহারা প্রত্যহ ফেরিওয়ালা হইতে ছাগল ভেড়ার মাংসও খরিদ করেন, এদিকে মুর্গীও মারেন, কখন কখন বন্ধুভোজনের জন্য বাজার হইতে মুর্গী খরিদ করিয়া বাড়ীতে আনিয়া বধ করেন, এবিষয়ে কসাইদের অপেক্ষা তাহাদের মন কম কঠিন নয়? ব্রাহ্মপরিবারেও এইরূপ কুদৃষ্টান্তের অভাব নাই। সভ্য মেয়েদের আহারাদি দেখিলে কে সধবা কে বিধবা চেনা দুষ্কর। বিধবাদের কোন প্রকার ব্রহ্মচর্য্য নাই, কোনরূপ বৈধব্য চিহ্ন নাই। তাঁহারা শারীরিক সুখের জন্য শরীর রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। কি বিষম কলিযুগ উপস্থিত। তাঁহারা কি ভাবেন না, বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা চির নিরামিষ ভোজী হইয়া পর্য্যাপ্ত মাংসাশী বাঙ্গালী অপেক্ষা বহুগুণে সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে? বাঙ্গালীর ন্যায় রুগ্ন দুর্ব্বল ও অল্পায়ু জাতি পৃথিবীতে কোন্ জাতি? বাঙ্গালী বিধবারা একবেলা নিরামিষ ভোজন করিয়া সধবাদিগের অপেক্ষা কি সমধিক সুস্থ ও বলিষ্ঠ নহে? "ভক্ষ্য ভক্ষকয়োর্মধ্যে উভয়ঃ পক্ষতান্তরম্। একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ-প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥" অর্থাৎ ভক্ষ্য ও ভক্ষক এই দুইয়ের মধ্যে কত প্রভেদ লক্ষ্য কর, একজনের মুহূর্ত্তের জন্য রসনার তৃপ্তি অন্যের প্রাণত্যাগ। "স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।" অর্থাৎ অনায়াস লভ্য বনজাত শাকাদিতে যাহাকে পূর্ণ করা যায় এই পোড়া উদরের জন্য কে মহা পাপ করে?

এরূপ ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন থাকিলে কি হইবে? কে তাহা মানে? কোন কোন ব্রাহ্মপরিবারেও আমরা দেখিতে পাই, কর্ত্তা নিরামিষভোজী নিষ্ঠাবান্, গৃহিণী মুর্গী পোষিয়া প্রত্যহ মুর্গী মারিয়া ভক্ষণ করেন। এ সকল ব্যাপার দেখিয়াও গৃহস্বামীর কোন উচ্চ বাচ্য নাই, মনে ক্লেশ নাই। এরূপও দেখা যায়, গৃহস্বামী মাংসাশী, গৃহিণী নিরামিষভোজী, ইহা অতি বিরল। কিন্তু প্রায়ই মাংসাশী স্বামীর চিত্তরঞ্জনার্থে স্ত্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার ন্যায় মাংসাদি ভক্ষণ করেন। স্ত্রীর নিজের হিতাহিতবোধ ও অস্তিত্ব নাই।

এক সময় এরূপ এক যুগ ছিল যে, বিবাহাদির ভোজে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মের মধ্যে অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ লোক নিরামিষভোজী দেখিতে পাওয়া যাইত, এক্ষণ অন্যতর যুগ, তিন শত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মের মধ্যে নিরামিষ ভোজী তিনটি লোক পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। বহুমূত্র রোগের উপক্রম এরূপ ছল করিয়া অনেক চির নিরামিষভোজী খ্যাতনামা ব্রাহ্ম প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। একদা কোচবিহার মহারাজের উড ল্যাণ্ডের প্রসাদে কোন শুভ ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মদের ভোজ হইয়াছিল,

ভোজনে বসিয়া কয়েকটি ব্রাহ্ম পুনঃ পুনঃ মাংসের কারি চাহিয়া লইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া পার্শ্বস্থ একজন বড়লোক দুঃখে বলিয়াছিলেন, "হায়! কেশব চলিয়া যাওয়ার পরই ইহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহাদির নিমন্ত্রণে মাংসের ছড়াছড়ি, এদিকে অনেক হিন্দু বিবাহের ভোজে দেখা গিয়াছে মৎস্য মাংসের কোন সম্পর্ক নাই, সমস্ত নিরামিষ।

"জীবে দয়া নামে ভক্তি কর জীবনের সার ওরে মন আমার" নববিধানী ব্রাহ্মগণ গগনভেদী স্বরে নগর কাঁপাইয়া এই গান গাহিয়া থাকেন কয় জন লোক জীবনে জীবে দয়া সার করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। হয় তো গায়ক বাড়ীতে আসিয়া দেখেন তাঁহারই নির্দ্দেশে গৃহিণী বা স্ত্রী জীয়ন্ত কৈ মাগুর মাছগুলিকে পাথরে সংঘর্ষণ করিয়া ছাল তুলিয়া কচ্ কচ্ করিয়া কাটিতেছে, সেগুলি যেন জীব নয়, সিম বেগুণ। ছিন্ন ভিন্ন কৈমাছগুলি তপ্ত কড়াতে ছট্‌ফট্ করিয়া জীবনের ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ক্লেশ যাতনায় দুঃখ কি? তাহাকে খাইতে যে বড় মজা!

এদেশের মেয়েরা অত্যন্ত কাঁকড়াভক্ত। অস্থি ও রক্তবিহীন জলীয় কীটবিশেষ বিকট আকার কাঁকড়াগুলি তাঁহাদের অতিশয় রসনাপ্রিয়। বিবাহের গা হলুদের ভোজে লাউ কাঁকড়ার ডালনা না পাইলে মেয়েদের ভোজনে কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। এঅঞ্চলনিবাসী একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবার দুই শত মাইল দূরে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছেন সেই পরিবারের একটী কন্যার বিবাহে গা হলুদের ভোজের জন্য কলিকাতা হইতে রেলওয়ে পার্শেলে পুঞ্জ পরিমাণে কাঁকড়া লইয়া গিয়াছিলেন, পথেই সেগুলি কষ্টে মরিয়া পচিয়া উঠে, সেই পচা দুর্গন্ধ কাঁকড়ার যোগে লাউ কাঁকড়ার ডালনা প্যাজ লসুনের যোগে রসাল ও সুগন্ধীকৃত করিয়া গা হলুদের মহা ভোজে উপস্থিত মহিলাদিগকে পরিবেশন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা তাহা খাইয়া না জানি কত তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এদিকে শুনা গিয়াছে একজন মেছুনী একটা কাঁকড়ার ঠ্যাং ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া জীবের প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা হইতে তাহার ॥৹ দণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণ ব্রাহ্মিকার কাঁকড়ার প্রতি এরূপ অত্যাচারের জন্য কিরূপ দণ্ড হওয়া সমুচিত। কাঁকড়া এ অঞ্চলের লোকের বিশেষ প্রলোভনের সামগ্রী। সেদিন আমাদের একটি ব্রাহ্ম বন্ধু কলিকাতা হইতে নিজালয়ে যাইতে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কমলালেবু ও মিষ্টান্ন এবং কতকগুলি কাঁকড়া ছিল। তিনি একটি বালককে কমলালেবু ও মিষ্টান্নের কথা না বলিয়া বিশেষরূপে কাঁকড়ার প্রলোভন দেখাইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন "আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে একদিন থাকিলে তোমাকে কেঁকড়া খাইতে দিব, কিন্তু ছেলেটীর মনের বল খুব, এইরূপ কেঁকড়ার প্রলোভনেও ভুলিল না, সে তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। বন্ধুটির বাড়ী তাহার গম্য স্থানের পথে হইলেও কেঁকড়ার প্রলোভন নামিল না। বাহাদুর ছেলে বলিতে হইবে।

ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের জীবের প্রতি দয়ার কথা বলা গেল, এক্ষণ জেনারেল বুথের কন্যা এমার দয়ার কথা বলা যাইতেছে। পাঠিকাগণ তুলনা করিয়া দেখিবেন। গত পৌষ মাসে "জেনারল বুথের পরিবার" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জেনারেল বুথের কন্যা এমার ক্ষুদ্র জীবের প্রতি দয়ার কথা এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেয়াগেল।

"পোর্টসমাউথে বাস করিবার সময়েই একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক মেছুনী কাঁকড়া ও চিংড়িমাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেই মেছুনী বাড়ীর ভৃত্যটীর সঙ্গে এরূপ গল্প করিতেছিল যে, গত রাত্রিতে যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন একটা চিংড়িমাছ লাফাইয়া পড়াতে সে কিরূপ ভয় পাইয়াছিল। এমা এই কথোপকথনটী শুনিতে পাইয়াছিল। এমা আরও শুনিতে পাইল যে, সেই মেছুনী বলিতেছে, যখন জল অল্প অল্প উষ্ণ হয় তখনই চিংড়িগুলি জলের মধ্যে দেওয়া হয়, পাছে তাহারা তাহাদের দাঁড়া বাহির করে। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন ছোট ছেলের মত চিৎকার করিতে থাকে, ও মৃত্যু না হওয়া অবধি ছটফট করিতে থাকে।

"এই কথাগুলি শুনিয়া সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রামওয়েল বুথের নিকট গমন করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রামওয়েলের উপর সকলের ভার ছিল, এমা ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া সন্ধ্যাবেলাতেই মেছুনীর বাড়ীতে গিয়া, তাহার নিষ্ঠুরাচরণের বিষয়েই তাহার সহিত কথা বলিবার অনুমতি চাহিল। ব্রামওয়েল বলিলেন, কাল প্রাতঃকালে গেলেই হবে, কিম্বা এবিষয়ে তিনি নিজে একখানা পত্র লিখিতে রাজি আছেন, ইত্যাদি নানা কথায় তাহাকে সন্ধ্যাবেলাতে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই এমাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা গেল না, সে নিজে সেই রাত্রিতেই গিয়া দেখা করিবে, তাহাই ঠিক হইল।

"একটী ল্যাম্প হাতে লইয়া সেই অন্ধকার গ্রাম্য পথে, এমা তাহার ধাত্রীর সঙ্গে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে পৌছিয়া দেখিল স্বামী স্ত্রী দুজনেই শয়ন করিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ দরজা ধাকাইবার পর উপরের ঘরের জানলা খুলিয়া একজন লোক বাহির হইল। "মহাশয়া আপনি" সেই ধীবর বলিল। সেই ধীবর যখন জানিতে পারিল বালিকা তাহার স্ত্রীর নিকট কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া নীচে আসিল। এমা ধাত্রীকে বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এমা মনে করিলেন, আর একজন লোক সম্মুখে থাকিলে সে যেরূপ সরল ভাবে জোরের সহিত বলিতে চায় তাহা বলিতে পারিবে না। যখনই কোন লোককে তাহার অপরাধ দুর্ব্বলতার কথা সরল ভাবে বলিতে চাহিতেন, এমা চিরজীবনই এই নিয়মানুসারে চলিতেন। আমরা সেই বালিকার অদম্য উৎসাহপূর্ণ ছবি মনে ভাবিয়া লইতে পারি. কিরূপ আবেগের সহিত সে তাহার

রুদ্ধ ভাব উন্মুক্ত করিল। সে এরূপ ভাবে কথাগুলি বলিল যে, সেই ধীবর-দম্পতী নতজানু হয়ে কাঁদিতে লাগিল, এবং এমা তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং পুনরায় এরূপ কখনও করিবে না বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইল।

স্বীয় প্রচারে কৃতকার্য্য হ'য়ে সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল, মধ্যে মধ্যে পথে পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইল, এইরূপে সে আপনার ক্লান্তি লুকাইতে চেষ্টা করিল, তাহার ধাত্রী তাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভ্রাতার সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন, ভ্রাতা তাঁহার সাক্ষাৎকারের সকল কথা আনন্দের সহিত গর্ব্বের সহিত শুনলেন। ভ্রাতা তাঁহার পাশের ঘরে এমার শুইবার বন্দোবস্ত করিলেন, পাছে সেই চিংড়িমাছের ভয়ানক যাতনার কথা মনে হইয়া ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

মহিলাগণের উচ্চাধিকার।

নারী ঈশ্বরের প্রেম প্রকৃতির প্রতিকৃতি। নারী-জীবনরূপ পবিত্র পাত্রে ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত প্রেম, স্নেহ, দয়া, মমতা স্থাপন করিয়াছেন। নারীর দেহ মন ও জীবন সেই কারণে কোমল এবং স্নিগ্ধ। নারীর জীবনে সেবা পরম ধর্ম্ম। সেবা যদি নীচ কর্ম্ম হয়, তবে ঈশ্বর স্বয়ং জীবের বিবিধ সেবা সতত করিয়া অতি নীচ হইয়াছেন। মা আপন সন্তানের সেবা করেন বলিয়া কি নীচ কর্ম্ম করেন? জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়নে মনের নানারূপ কুসংস্কার দূর হয়, একথা সত্য, অথচ পৃথিবীর আলোকের পাছে যেমন অন্ধকার থাকে, জ্ঞানের সঙ্গেও তেমন কতকটা অন্ধতা বিরাজ করে। সেবা মহিলাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার। ভগিনী, মা, দুহিতা ও পত্নীর পবিত্র করকমল হইতে সেবা ধর্ম্ম যদি কাড়িয়া নেও, তবে তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-হীন ও সত্যই নীচ করিলে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানালোক পাইয়া অনেক মহিলা গ্রন্থপত্রোদ্ঘাটনে এবং জ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন সমর্পণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেকে গৃহকর্ম্মে ও পরিবারের পরিচর্য্যাকার্য্যে বিশেষ উপেক্ষা দেখাইয়া থাকেন। সে সব বেতনভুক্ ভৃত্য বা ঝীর কর্ত্তব্য, এরূপ ধারণারূপ অন্ধকার জ্ঞানালোকিত বঙ্গ মহিলাদিগের চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। আমরা অদ্য একান্তমনে মহিলাগণ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকারগুলির প্রতি যাহাতে উদাসীন না হন তাহার দিকে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

জ্ঞান, সেবা, ভক্তি এবং বাধ্যতা নারী-জাতির এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম। নারীজাতিরও যত্নের সহিত জ্ঞান অর্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। নারীদিগের ঘোরতর অজ্ঞানতা জন্য, অত্যুন্নত সভ্যতারূপ মঞ্চারূঢ় ভারতেরও কি প্রকার অধোগতি হইয়াছিল তাহা পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস দর্শন এবং দেহতত্ত্ব লাভ

করা নারীদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। শরীরের যেমন আহার পান, মনের তেমন জ্ঞান। আহার পান ভিন্ন কোন মহিলার কি শারীরিক শ্রী থাকে? তবে জ্ঞান ভিন্ন নারীদিগের মানসিক শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? জ্ঞানের অধিকার নর-নারীর সমান। জ্ঞানেতে নারীর উচ্চাধিকার নহে; বরং তুল্যাধিকার বলা যায়।

নারীজাতির সেবার অধিকারটি উচ্চাধিকার। সেবাতে সহানুভূতি চাই। হৃদয় ভিন্ন সহানুভূতি বৃত্তির ভূমি কোথায়! হৃদয় রমণীরই নামান্তর। রমণী-হৃদয়ে পবিত্র প্রেমলতা জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। প্রেম অন্যকে সুখদানে এবং আত্মসুখবর্জ্জনে নিয়ত উন্মুখ। রমণীর জীবন বিলাসভবন নহে। রমণী-জীবন অপরের সন্তোষ, শান্তি ও আনন্দবর্দ্ধক। প্রেম স্বর্গ হইতে ধরাতলে নামিয়া নারীর হৃদয়ে স্থিতি করে। তৃষ্ণার্ত্তকে বারি, ক্ষুধিত জনে অন্ন, রোগীকে ঔষধ পথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান, পরিতপ্তকে আরাম, পাপীকে পুণ্য দিয়া প্রেম কৃতকৃতার্থ বোধ করে। প্রেম আপনি কিছুই চায় না। প্রেমের যদি বিলাস বাসনা থাকে তবে ঐ সকলই বিলাস বলা যায়। নারীর ঐ প্রকার সেবা উচ্চ ধর্ম্ম। ভারতের বা বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে নারীগণ ঘোর অজ্ঞানতা কুসংস্কারে অন্ধ থাকিয়াও সেবা ধর্ম্ম-পালনে, প্রিয় পরিজনের দুঃখদর্শনে বড়ই চক্ষুষ্মতী ছিলেন। জ্ঞানের চক্ষু ফুটাইতে যদি তাঁহারা সেবার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেন, অতি উচ্চাধিকার ত্যাগ করিবেন। জ্ঞানের সঙ্গে সেবা ধর্ম্মের যাহাতে মিলন থাকে, মনের সঙ্গে হৃদয়ের যাহাতে বিকাশ হয়, সেদিকে এখনই বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

হৃদয় প্রেমের প্রিয়ভবন, শ্রদ্ধা ভক্তির পবিত্র মন্দির। শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র দুই। মনুষ্য এবং ঈশ্বর। পিতা মাতা, জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাগণ, জ্ঞানে গুণে দয়া ধর্ম্মে ও সৌজন্যে মহত্ত্বে যাঁহারা মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন, মানবমাত্রই ভক্তিভাব তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে। মানবজাতিরই এইটি উচ্চাধিকার। বিশেষ ভাবে ললনাকুলের এ অতি গৌরব-জনক উচ্চাধিকার। যত দেশে যত জাতিতে মহাপুরুষ এ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই জাতীয় নারী-দিগের দ্বারাই গৃহীত পূজিত ও সেবিত হইয়াছেন। নারীর গর্ভেই তাঁহাদের জন্ম; নারীর ভক্তি-গৃহেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকার পাইয়া কি কুলললনাগণ ভক্তি শ্রদ্ধার উচ্চতর অধিকার উপেক্ষা করিবেন? যদি তাহা করেন নিশ্চয় তদ্দ্বারা পাতকস্পর্শ হইবে। তাহার ফলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি হইবে। পুণ্যের দ্বারাই প্রত্যেক জাতি উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। পাপেতে অধঃ-পাত ঘটে। অতএব নারীগণ যেমন ঈশ্বরকে তেমন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মহাপুরুষ-দিগকে যেন স্ব স্ব ভক্তিরূপ স্বর্ণমন্দিরে

প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উচ্চাধিকার ভোগে বঞ্চিত না হয়েন।

মহিলাদিগের সর্ব্বোচ্চ অধিকার বাধ্যতা, কথা বলা, কথা শোনা এবং কথার বাধ্য হওয়া, মনুষ্যের পরিবার ও সমাজ রক্ষার নিদান। কিন্তু বাধ্যতারই অপর নাম দাসত্ব, বশ্যতা বা দাসত্বা নীচতা জনক। স্বাধীনতা ত্যাগ করিলে, অধীন ও পরবশ হইলে লোক নীচতা প্রাপ্ত হয়। ভারতের সীমন্তিনীগণ অধীনতাতেই জঘন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে এ প্রকার মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা তাহা নহে। বাধ্যতাতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা; বিশেষ ভাবে কুল-কামিনীদিগের দেবীত্ব বাধ্যতা ধর্ম্মের অন্ত-র্ভূত ইহা আমরা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে নারীজাতির সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম যে বাধ্যতা তাহা এবং সে বাধ্যতা কিরূপ তাহা প্রমাণ সহকারে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব;

ঈ—সেন।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মূর্চ্ছা।

অকস্মাৎ চৈতন্যহীন হওয়াকে মূর্চ্ছা কহে। মূর্চ্ছা সচরাচর নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ বশতঃ হইয়া থাকে।

১। অপরিমিত শারিরীক দৌর্ব্বল্য বা ক্লান্তি।

২। তীব্র মানসিক অবসাদ বা আবেগ।

৩। শরীরের কোন স্থানে কঠিন বেদনানুভব বা আঘাত প্রাপ্তি।

৪। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রপিণ্ডের রোগ।

৫। অপরিমিত রক্তস্রাব—বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক।

৬। মাদক দ্রব্যাদী সেবন।

দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে কিংবা অপরিমিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে, কোন নিদারুণ শোক চিন্তা বা নৈরাশ্যের প্রাবল্যে মন অবসন্ন হইলে সামান্য শারিরীক আয়াসেই মূর্চ্ছা হইতে দেখা যায়। কোন রূপ তীব্র আবেগে বা উৎক্ষেপের দ্বারা মন উৎক্ষিপ্ত হইলেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ভয়েতে মূর্চ্ছিত হইবার কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। লেখক একদা একটি লোককে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। এ ব্যক্তি রাজমিস্ত্রির কার্য্য করিত। এক-দিবস সে প্রায় ২৫ ফিট্ উচ্চে একটী প্রাচীরের গাতে বসিয়া কার্য্য করিতেছিল এমন সময়ে তাহার নামে একটী টেলিগ্রাম আসিল। নীচে কণ্ট্রাক্টর মহাশয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, টেলিগ্রাফ পিয়ন তাঁহার হস্তে টেলিগ্রামটী দিল। কণ্ট্রা-ক্টর মহাশয় আবরণের উপরে নামটী পড়িয়া মিস্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন। সামান্য রাজমিস্ত্রির জীবনে টেলিগ্রাফটা দৈনন্দিন ব্যাপার নহে। মিস্ত্রি একটু

আশ্চর্য্য হইয়া কণ্ট্রাক্টর মহাশয়কে উহা খুলিয়া পাঠ করিতে বলিল। কণ্ট্রাক্টর মহাশয় টেলিগ্রামের আবরণ উন্মোচন করিলেন, ইতিমধ্যে নিকটস্থ অন্যান্য মিস্ত্রি ও কুলিরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া ব্যাপারটী কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল, প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট মিস্ত্রী কর্ণিক হস্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। টেলিগ্রাম পড়িয়া কণ্ট্রাক্টর মহাশয়ের চক্ষু দুটী অসাধারণ রূপে বিস্তৃত হইল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে তুই কি ঘোড়দৌড়ের টিকিট কিনেছিলি"? মিস্ত্রী প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না, পরে একটু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে বলিল হাঁ হাঁ, মাস কতক হইল একটী বাবু আমার কাছে একটী টাকা লইয়া একখানা কাগজ আমাকে দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "নে যদি তোর কপালে থাকে এই একটাকা দিয়ে তুই একশ টাকা পেতে পারবি—তা কি হয়েছে বাবু"? কণ্ট্রাক্টর বাবু বলিলেন "আরে নেবে আয় নেবে আয় কি হয়েছে কি, আর তোকে কর্ণিক ধত্তে হবে না, শিগ্‌গির নেবে আয়"। সে বলিল "কি হয়েছে বলেন না কর্ত্তা আমি হাতের কাজটা না সেরে এখন নাব্‌বো না"। কণ্ট্রাক্টর বাবু বলিলেন দূর শালা নাববি না, তুই যে তিন হাজার টাকা পেয়েছিস"। এই কথা শুনিবামাত্র তাহার হস্তস্থিত কর্ণিক পড়িয়া গেল এবং কর্ণিকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অচেতন দেহও ভূমিতে পতিত হইল। লেখক নিকটেই ছিলেন, তাঁহার নিকটে সংবাদ পঁহুছিবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন এই অকস্মাৎ তিন সহস্র মুদ্রার স্বত্বাধিকারপ্রাপ্ত গভীর মূর্চ্ছায় অভিভূত। অনেক চেষ্টার পর মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে দেখা গেল এই সৌভাগ্যবান্ হতভাগ্য একেবারে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়াছে, ইষ্টকের স্তূপের উপরে পতিত হইয়া তাহার একটী জঙ্ঘার অস্থি ভগ্ন হইয়াছে। এ ব্যক্তি কৌতুহল বশতঃ একখানা ডার্বির (Derby) টিকিট ক্রয় করিয়াছিল তৎকালে তাহার কিছু পাইবার আশা থাকিলেও তিন হাজার টাকা পাইবে এরূপ আশা বা বিশ্বাস কখন তাহার মনে উদিত হয় নাই। হঠাৎ এত টাকার অধিকারী হইয়া আনন্দের আবেগে তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এইরূপ মনের অপরিমিত আবেগ বা অবসাদ বশতঃ মৃত্যু হইতেও দেখা যায়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল পশ্চিমাঞ্চলের কোন সরকারী ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত লেখকের আত্মীয় একজন ডাক্তার বাবু এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে, প্রায় মাসেককাল তিনি এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ নানারূপে চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ডাক্তার বাবু দিবারাত্রি পুত্রের নিকটে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসাতে নিযুক্ত থাকিতেন, পুত্রের নিকট হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্যও তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ছিল। বলা বাহুল্য ভাবনা চিন্তা অনাহার ও অনিদ্রায় তিনি স্বয়ংও অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর সময়ে তিনি নিকটে ছিলেন।

আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে যখন পরিবারস্থ আর সকলে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল দেহে ও নির্নিমেষ নেত্রে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শব্দ ছিল না, চক্ষে অশ্রু ছিল না। দেখিতে দেখিতে পুত্রের নিশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইল। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ শোকাবেগগ্রস্থ পিতার আপাদমস্তক কম্পিত হইল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। এই মূর্চ্ছা অবিলম্বে মৃত্যুতে পরিণত হইল। অবশ্য এইরূপ মৃত্যু সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু একান্ত বিরলও নহে। আমরা মধ্যে মধ্যে Heart failure বশতঃ মৃত্যুর কথা শুনিতে পাই, ইহার অনেকগুলি দীর্ঘ সময়ব্যাপী শোক, চিন্তা, মানসিক উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের ফল।

মস্তকে কঠিন আঘাত লাগিয়া মূর্চ্ছা হইতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পেটে ঘুষি মারিলেও মূর্চ্ছা হয়, শূলাদী দারুণ বেদনাতে বেদনা অসহ্য হইয়া পড়িলে বারম্বার মূর্চ্ছা হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণোৎপন্ন মূর্চ্ছার লক্ষণ, কারণ ও অবস্থা বিশেষে কতকটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, এবং তৎপ্রতীকারের উপায়ও ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ অপরিমিত শারিরীক দৌর্ব্বল্য বা ক্লান্তি, তীক্ষ্ণ মানসিক অবসাদ বা আবেগ, কঠিন বেদনা বা আঘাত প্রাপ্তি অধিক রক্তস্রাব এই সমুদায় কারণে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে মুখ বিবর্ণ (রক্তহীন) চক্ষু মুদ্রিত এবং শরীর অবসন্ন ও শীতল হয়। নাড়ীর গতি ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অতিশয় মৃদু হয়। এইরূপ মূর্চ্ছাতে মূর্চ্ছিতকে শয়ান অবস্থায় রাখিবে, মস্তকে উপাধান না দেওয়াই উচিত। (অর্থাৎ মস্তক শরীরের অন্যাংশ হইতে একটু নিম্নে রাখিবে)। মস্তকে, মুখে ও বক্ষে শীতল জলের ছিটা দিবে এবং বহির্দ্দেশে রৌদ্রের উত্তাপ না থাকিলে কক্ষের দ্বার জানালাদি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া পাখার বাতাস দিবে। ইহাতেই সামান্য মূর্চ্ছা অপনোদিত হইবে, যদ্যপি তাহা না হয় তবে স্মেলিংসল্ট আঘ্রাণ করাইবে; যদ্যপি ইহাতেও কোন ফল না হয় তবে আর বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসককে সংবাদ দিবে, এবং তাঁহার আসা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে স্মেলিংসল্ট আঘ্রাণ করাইতে থাকিবে, এবং মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শরীর যাহাতে শীতল না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবে। শুষ্ক হস্তে বা শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা হস্তপদাদী ঘর্ষণ করা, বোতলে গরম জল পুরিয়া তাহা পার্শ্বে এবং হস্ত ও পদতলে রাখা এবং উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখাই শরীর উষ্ণ রাখিবার উপায়। যদ্যপি নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল বোধ হয় এবং শরীর অধিক শীতল বোধ হয় তবে বড় চামচায় table-spoon এক চামচা ব্রাণ্ডি (brandy) বা হুইস্কি সমান পরিমাণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত আস্তে আস্তে পান করাইয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে বাহ্যিক রক্তস্রাবজনিত মূর্চ্ছাতে রক্তস্রাব নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে তিলেক মাত্র বিলম্ব করিবে না। রক্তস্রাব নিবারণের নানাবিধ উপায় পূর্ব্বে বিবৃত

হইয়াছে। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব বুঝিতে পারা অনভিজ্ঞের পক্ষে সহজ নহে, তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে হয় চিকিৎসক মহাশয় করিবেন।

মূর্চ্ছা যদি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, এবং চিকিৎসকের পঁহুছিতে বিলম্ব হয় তবে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অনুসন্ধান ও লক্ষ্য করিয়া রাখিবে, এবং চিকিৎসক মহাশয় আসিবামাত্র তৎপ্রতি তাঁহার মনযোগ আকর্ষণ করিবে, ইহাতে প্রকৃত অবস্থা বা রোগ নির্ণয় করিতে তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইবে না, এবং আশু চিকিৎসায় বিশেষ সাহায্য হইবে।

১। কতক্ষণ মূর্চ্ছা হইয়াছে।

২। মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে বা তৎসময়ে মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগে কষ্ট পাইতেছিল কি না। বহু মূত্র বা অন্য কোন প্রস্রাবের রোগ, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি আছে কি না।

৩। মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে মস্তকে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে কঠিন আঘাত পাইয়াছিল কি না।

৪। মস্তকে আঘাত পাইবার পর নাসিকা কর্ণ বা মুখ হইতে রক্তস্রাব হইয়াছে কি না।

৫। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছিল কি না, কিম্বা কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করা তাহার অভ্যাস আছে কি না।

৬। উহার মৃগী বা হিষ্টিরিয়া রোগ আছে কি না।

৭। মূর্চ্ছা সম্পূর্ণ কি আংশিক, অর্থাৎ মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে ডাকিলে উত্তর দেয় কি না, নাড়া চাড়া করিলে সাড়া দেয় কি না।

৮। চক্ষুতে অঙ্গুলি দিলে চক্ষু পল্লব কুঞ্চিত করে কি না। চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত কি প্রসারিত।

৯। মুখে কিংবা নিঃশ্বাসে কোন রূপ শব্দ পাওয়া যায় কি না।

১০। নিশ্বাসের গতি ও শব্দ কিরূপ। নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নাসিকা দ্বারা কিংবা মুখ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

১১। হস্ত পদে বা মুখে কোনরূপ আক্ষেপ বা খিঁচুনি হইতেছে কি না। জিহ্বা দন্তের দ্বারা দংশিত হইয়াছে কি না।

১২। হস্তপদাদী সঞ্চালন করিবার শক্তি আছে কি না।

১৩। বাহ্য প্রস্রাবাদী অজ্ঞাতে সম্পন্ন হইতেছে কি বন্দ আছে।

১৪। শরীরের উত্তাপ কি প্রকার তাপমান যন্ত্রের দ্বারা দেখিয়া রাখিবে। উভয় কুক্ষিতে উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কোন তারতম্য আছে কি না দেখিবে।

অধিককাল স্থায়ী মূর্চ্ছার প্রতীকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ও জানিয়া রাখা আবশ্যক। চিকিৎসক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। মস্তকে আঘাত লাগিয়া যদ্যপি ধীরে ধীরে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় এবং উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তবে মস্তকে শীতল জলের পটি দিবে।

২। মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া মূর্চ্ছা হইলে প্রথমে লবণ মিশ্রিত উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে, পরে মস্তকে ও মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিবে, কিংবা মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে।

৩। মস্তিষ্কের কোন রোগ বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে প্রথমে তাহা কিরূপ মস্তিষ্কের রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সচরাচর তিন প্রকার মস্তিষ্ক রোগে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। যথা মৃগী, মাথায় রক্ত উঠা, বা মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তস্রাব হওয়া apoplexy এবং বায়ু বা সন্ন্যাস রোগ, যাহা হিষ্টিরিয়া Hysteria বলিয়া পরিচিত। মৃগীরোগে রোগী অকস্মাৎ কোনরূপ শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হয় এবং তাহার হস্তপদাদী ও মুখে খিঁচুনি হইতে থাকে মুখ হইতে ফেন নির্গত হয়, দন্তপাটী আবদ্ধ থাকে এবং কখন কখন দন্তের দ্বারা জিহ্বা কঠিন রূপে দংশিত হয়। অজ্ঞানাবস্থায় সময়ে সময়ে মল মূত্রও নিঃসৃত হয়। হিষ্টীরিয়ার মূর্চ্ছা এবং মৃগী রোগের মূর্চ্ছা অনভিজ্ঞের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সহজ নহে, উভয় লক্ষণেই অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বিভিন্নতাও আছে। মৃগী অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, হিষ্টিরিয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়। মৃগীরোগে কোনরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া মূর্চ্ছা হয়, হিষ্টিরিয়াতে তাহা হয় না। হিষ্টিরিয়াতে জিহ্বা দংশিত হয় না, মুখে ফেনও নির্গত হয় না। ইহাতে দন্তপাটি কঠিন রূপে সংবদ্ধ হয় না, কিন্তু পরস্পর সংঘর্ষিত হয়। এবং সেই হেতু কড় মড় শব্দ হইতে থাকে।

মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছাবস্থায় প্রায় একই প্রকার প্রতীকারোপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছিতের পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবে এবং তাহাকে উপাধানযুক্ত শয্যাতে শয়ন করাইয়া দিবে। আক্ষেপ সময়ে হস্তপদাদিতে কিম্বা অন্য স্থানে কোনরূপ আঘাত না লাগে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। মুখে শীতল জল প্রক্ষেপ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে স্মেলিং সল্ট আঘ্রাণ করাইবে। এইরূপ অবস্থাতে লোকে সচরাচর ব্যস্ত হইয়া দন্তপাটী বিচ্ছিন্ন এবং মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উন্মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে অথবা আক্ষেপ সঞ্চালিত দেহকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এরূপ করা উচিত নহে। ইহাতে কোন উপকার হয় না বরঞ্চ আক্ষেপ বৃদ্ধি হয়। সুবিধা পাইলে দন্তপাটীর মধ্যস্থলে একখণ্ড রুমাল কিম্বা তোয়ালে কিম্বা এরূপ অন্য কোন দ্রব্য রাখিয়া দিবে যাহাতে জিহ্বা দন্তের দ্বারা নিষ্পেষিত বা দংশিত না হয়।

হিষ্টিরিয়ার ফিট উপস্থিত হইলে অনেক সময়ে রোগী সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যহীন হয় না। হস্ত পদাদিতে খিঁচুনি হইতে থাকে, হস্তের মুষ্টি কঠিন রূপে সংবদ্ধ হয়, দন্তপাটীর পরস্পর সংঘর্ষণে কড় মড় করিয়া শব্দ হয়, রোগীকে বারম্বার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় না, চক্ষু দুটী চেষ্টা করিয়াও খোলা যায় না, অথচ রোগী নিকটস্থ লোকের সমুদায় কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, নিজে কথা বলিতে অসমর্থ বা অতিশয় অনিচ্ছুক বোধ করে। মনের

আবেগে অনেক সময়ে হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যাইতে দেখা যায়। একদা লেখক একটী হিষ্টিরিয়াজনিত মূর্চ্ছাগ্রস্থা স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা অপনোদন করাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইলে একখানি কাঁচি হস্তে রোগীর নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ইহার মূর্চ্ছাতো কিছুতেই গেল না আমি ইহার চুলগুলি কাটিয়া দিয়া মাথায় বরফ দিব।" স্ত্রীলোকটী যুবতী ছিল এবং তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ সুন্দর কেশ ছিল, লেখক ঐ কথা বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ দুটী হস্তে আপন মস্তক আবৃত করিলেন এবং একটী দীর্ঘ ও কাতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু দুটী উন্মুক্ত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মূর্চ্ছা দূর ভূত হইল।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন কারণে রক্তস্রাব হইলে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে. উহাকে ইংরাজিতে এপপ্লেকসি বলে, সাধারণ ভাষায় মাথায় রক্তওঠা বলিয়া থাকে। এইরূপ মূর্চ্ছা প্রায়ই অকস্মাৎ হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। গভীর মূর্চ্ছার অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য অতিশয় মন্দ গতিতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়। সচরাচর নিশ্বাস বায়ু নাসিকা পথে গৃহিত হইয়া মুখে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে এবং নির্গমনকালে ফুৎকার দিবার ন্যায় গাল দুটী ফুলিয়া উঠে। এপপ্লেক্সির মূর্চ্ছার সহিত অনেক সময়ে অর্দ্ধাঙ্গ (একদিকের হস্ত ও পদ অবশ ও শক্তিহীন হওয়া) হইতে দেখা যায়। চক্ষুর তারা একটী সঙ্কুচিত ও একটী প্রসারিত হইয়া থাকে। শরীরের তাপেও দুই কুক্ষিতে প্রায় এক ডিগ্রির বিভিন্নতা থাকে।

উপরিলিখিত অবস্থাতে রোগীর মস্তক কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ান রাখিবে, সম্পূর্ণ ভাবে পৃষ্ঠের উপরে শয়ান না রাখিয়া পৃষ্ঠের দিকে একটী উপাধান রক্ষা করিয়া ঈষৎ বক্রভাবে এক পার্শ্বের উপরে শয়ন করান উচিত। ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে এবং পদতলে গরম জলের বোতল রাখিবে। এইরূপ মূর্চ্ছায় গৃহ-চিকিৎসা অসম্ভব, শীঘ্রই রোগীকে চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ক্রমশঃ।

নূতন পুস্তক।

"চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী" নামক পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে এস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রথমা পত্নী সাধ্বী খদিজা দেবীর, তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমা দেবীর এবং দ্বিতীয়া পত্নী আয়শা দেবীর অপিচ তপস্বিনী রাবেয়ার জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত। মূল্য ।০ মাত্র।

আমাদের প্রতি মাতৃজাতির সহানুভূতি।

আমি যে দীর্ঘকাল যাবৎ হৃদ্‌রোগে ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমার অনেক তরুণবয়স্কা আদরের মা যে তজ্জন্য ব্যথিত হইয়া পত্রাদি লিখিয়া সহানু

ভূতি প্রকাশ করিয়াছেন গত কার্ত্তিকমাসে "আমাদের অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। তাহাতে ইহাও লিখা হইয়াছে যে সকলকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এই প্রবন্ধ পড়িয়া উৎকণ্ঠাকুল মাতৃগণ সবিশেষ অবগত হইবেন; এখন আমি কিঞ্চিৎ ভাল আছি, ইহাও জানাইয়াছিলাম। তাহার পরও সবিশেষ জানাইবার জন্য ক্রমাগত পত্রের পত্র পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের একটি ব্রাহ্মবন্ধুর কুমারী কন্যা ১৯শে জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছেন;—

"আপনি যে কোথায় আছেন, কেমন আছেন কিছুই জানি না। কত দিন হয়ে গেল আপনার কোন সংবাদ পাইনি। কেবল আপনি কোথায় আছেন তা জানতাম না বলেই কোন সংবাদ এত ইচ্ছে-সত্বেও নিতে পারিনি। কলকাতায় কত লোককে জিগেস করে চিঠী লিখেছি আপনি কোথায় আছেন সংবাদ পাবার জন্য, কিন্তু কারো কাছে কোন উত্তর পেলাম না। আজ হঠাৎ কেমন মনে হলো জ্ঞানাঞ্জনকে চিঠী লিখে আপনার ঠিকানা জানতে পারলাম। তাই আজই লিখছি। এমন মুস্কিলে আমি কখনো আপনার ঠিকানা নিয়ে পড়িনি। মনটা ছট্‌ফট্‌ করত, তবু কোন খবর নিতে পারতাম না। একবার শুনেছিলাম আপনি গিরিডি গেছেন, কিন্তু তারও ঠিকানা জান্‌তাম না। ঠিকানা পেয়ে যেন বাঁচলাম। আপনার শরীর এখন কেমন আছে? গিরিডির পরিবর্ত্তনে শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে কি? এখানে কারও চিকিৎসা হচ্ছে কি? এ বাড়ীতে আপনার থাকার সুবিধা হচ্ছে কি? এখানে আপনাকে দেখা শুনা কে করেন? সেবা যত্ন কে করেন? কেমন বোধ হচ্ছে এখানে এসে, সব জানাবেন। জান্‌বার জন্য মনটা বড় অস্থির হয়ে রয়েছে। আপনার নিজ হাতের লেখা কি পাব? এত অসুখ বিসুখ, অসুস্থতার ভেতরও এত মনে করে আবার দেবী গান্ধর্ব্বীর জীবনী পাঠিয়েছেন। আপনার ভালবাসা এমন নিঃস্বার্থ, এমন গভীর যে এততেও ভুলতে পারেন না! এত অসুখ অসুস্থতার ভেতরেও যা পান অমনি পাঠান। আপনার এ ভালবাসা দেখে আমিই অবাক্ হয়ে ভাবি। এত অনুপযুক্ত হয়েও এত ভালবাসা পাই, এ কার আশীর্ব্বাদে? তিনিই ধন্য! যাঁর জন্যে এত ভালবাসার অধিকারী হোলাম।"

(দ্বিতীয় পত্র। ৩১শে জানুয়ারি।)

আপনার অন্য দ্বারা লিখিত পত্র খানি সময়ে পাইয়াছি। তাহাতে আপনার এত ব্যারামের বৃদ্ধি শুনিয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। বড় আশা করিয়াছিলাম গিরিডির পরিবর্ত্তনে কিছু ভালই শুনিব। বিধাতার বিধি ত বুঝিতে পারি না। আমি এ হৃদ্‌রোগের বিষয় কিছু কিছু জানি। থাকে থাকে হঠাৎ মাঝে মাঝে আপনিই এমন বেড়ে ওঠে, যা এড়ান কিছুতেই যায় না। ডাক্তারেরা

ততই আর কোন উপায় না পেয়ে কেবল খাওয়ার ওপরই কড়া কড়ি করেন। পেট ভ'রে কোন ভারি জিনিষ খেতে দেন না, তাও জানি। তাইত বার বার খাওয়ার বিষয় এত ক'রে জানিতে চাই। আপনার যখন বাড়ে তখন কি রকম কষ্ট হয়? আহা! আমি জানি ভয়ানক কষ্ট, দিন রাত যাতনায় অধীর, ঘুম নাই, তার বিরামও নাই। আপনার সকল কষ্টগুলি আমিও যেন চোখের সামনে দেখ্‌তে পাই। মনে কর্‌লে, মনে হয় ছুটে আপনার কাছে চলে যাই। যতদূর পারি তেমনি করে আপনার সেবা করি, যাতে একটু আরাম পান। কে আপনার কাছে এখানে থাকেন? কে সেবা যত্ন করেন? যে ঘরে আপনি থাকেন, সেটা কি ভাল মনে হয়? দুবেলা কেবল দুধ খেয়ে থাকেন? ভাত কি রুটি মোটে খেতে দেয় না?

(তৃতীয় পত্র। ১৩ই ফেব্রুয়ারি।)

"আপনার চিকিৎসা প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি একাই করেন? আপনার কাছে থাকেন কে? দেখেন শোনেন কে? রাত্রে কে কাছে থাকেন? খাবার বন্দোবস্ত কার হাতে থাকে? আপনি কোথায় একটু বেড়ান? ভাল পরিষ্কার বাতাস পান কি? ওষুধের যেমন দরকার, এ সবও কি তেমনি দরকারী জিনিষ নয়? আজকাল-কার ডাক্তারেরা এ সবই ত বেশী দেখেন, না? আপনার ঘরে, আপনার কাছে ফুল থাকে কি? আমাদের গাছে বেশ গোলাপ ফুল ফোটে, দেখে আমার আপনার কথা মনে হয়। কিন্তু কি করে, পাঠাই। ওখানে আজ কাল ঠাণ্ডা কেমন?"

অন্যতর মা গাজীপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

"আপনার শরীর আজকাল কেমন আছে? অসুখ হইতে উঠিয়াছেন খুব সাবধানে ও নিয়মে থাকিবেন। আজ-কাল কি কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে-ছেন? শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা বল পাইয়াছেন কি না লিখিবেন। আমি সর্ব্বদা আপ-নাকে পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে পারি না, কিন্তু মন আপনার জন্য ব্যাকুল থাকে।" আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন।

আমি ভিন্ন ভিন্ন পত্র না লিখিয়া আমার বর্ত্তমান অবস্থা আমার মাদিগকে জানাই-তেছি। সকল সময় নিজহস্তে পত্র লিখিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিতে অক্ষম। আমি গিরিডিতে প্রায় দেড়মাস ও মিহিজামে ১৪ দিন ছিলাম, কিছু ভাল ছিলাম। গত পৌষ মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কিয়দ্দিন এক প্রকার ভালই কাটান গিয়াছিল। পরে ক্রমে ২।৩ দিন রাত্রিতে হঠাৎ পীড়ার বৃদ্ধি হয়। এক্ষণও খুব ভাল নহে। শরীর একান্ত দুর্ব্বল। কলিকাতার বাড়ীর গোলযোগ ধূলি ও ধূমময় হাওয়া আমার পক্ষে অসহ হইয়া উঠিয়াছে। অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থান মিহিজামে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুকাল স্থিতি করিব এরূপ সঙ্কল্প। এখানে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কোন-

রূপ ত্রুটি হইতেছে না। যখনই দরকার হয় বাড়ীর আত্মীয় মেয়ে পুরুষেরা দৌড়িয়া আসিয়া পরমযত্নে সেবা করেন। শ্বাসকষ্টের প্রবল বেগের সময় বাতাস করা, বুকে হাত বুলান ইত্যাদি তাঁহারা করিয়া থাকেন। আমি প্রাতে ৬টা মিল ও ৯টার সময় একবার কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করি, মধ্যাহ্নে অল্প পরিমাণে ভাত খাই, তাহার সঙ্গে দুধও থাকে, বিকালে দুইটার সময় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করি, ৫টার পর দুগ্ধ ও ঘরের পাতলা রুটি দুই খানা মাত্র খাই; সমস্ত রাত্রি আর কিছুই খাওয়া হয় না। প্রত্যহ ২।৩টি ঔষধ সেবন করিতে হয়, যখনই আবশ্যক হয় ডাক্তার আচার্য্য আসিয়া দেখিয়া যান। দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ আমার নিকটে একজন থাকেন। যাঁহার স্নেহ দয়ার আবেগে দূরদেশ হইতে মা, তোমরা আমার জন্য এত ব্যস্ত, যিনি তোমাদের কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সযত্নে তোমাদের সেবা করেন, যাঁহার স্নেহ প্রেমের বিরাম নাই, যিনি কখনও কাহাকে ভুলেন না সেই পরম মাতা কাছে আছেন। তোমাদের ভিতর দিয়া তাঁহারই স্নেহ প্রেম প্রকাশিত। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকটে ও তোমাদের নিকট পরম কৃতজ্ঞ। মঙ্গলময়ী জননী তোমাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

—

কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী।

বিষয়বিভাগ।

(১২১ পৃষ্ঠার পর।)

আবার সংসারের কথা শুনিতে চাহিতেছ, বলি, সব ভাল মনে নাই। আমি যেবার শ্রীক্ষেত্রে যাই সেইবার আমার ভাশুর অস্থাবর বিষয় ভাগ করেন। নবীন আমাকে অনেক করিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমি কিন্তু ঐসব তুচ্ছ বিষয়ে মন না দিয়া শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যাই। আমি যাওয়ার পর টাকা মোহর এবং রূপার বাসন ভাগ হয়। মোহর পালি মাপিয়া ভাগ হইয়াছিল। ঠাকুরের সোণা রূপার জিনিষ ভিন্ন এক এক ভাগে অনেক রূপার জিনিস পড়িয়াছিল। ভাগ করিবার সময় আমার ছেলেরা কিছুই পান নাই। নবীন যখন আমার ভাশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জেঠামহাশয় আমাদের ভাগ কোথায়?" তিনি বলিয়াছিলেন "তোমাদের ভাগ আমার কাছে রহিল।" শেষে অনেক দিন পরে যখন আমার ভাশুরের খেরোরা তাঁহার ধারের জন্য বাহিরের ফটকে চাবি দিলে, তখন বাহিরের সেই তেতলা হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি সব রূপার বাসন ভিতর বাড়ীতে আনা হইতেছিল। আমি সেই সময় ঐ ঘরের দ্বরজায় বসিয়াছিলাম। তখন আমার ভাশুরের মেজ ছেলেকে বলিলাম "আমার ছেলেরা কিছুই পায় নাই, তাহাদের বাসনগুলা দাও।" আমার এ কথায় তিনি এক ঝুড়ি হইতে কয়েক খানি বাসন লইয়া আমায় দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন তার সঙ্গে এদের ভাগ কিছু নয় বলিলেও হয়। আমার ভাশুরের নিকট যে আমার ছেলেদের মোহর ছিল, তাহা আমার ছেলেরা শেষে পাইলেন না, কারণ তখন

আমার ভাশুরের অনেক দেনা হইয়াছিল, এবং সেই দেনার দরুণ তাঁর কষ্ট দেখিয়া আমিও আর চাহিতে পারিলাম না। আমার শ্বশুর যাওয়ার সময় সোণারূপার বাসন ভিন্ন তাঁর চারিছেলের প্রত্যেককে ৮০,০০০ হাজার করিয়া নগদ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্তই আমার ভাশুরের নিকট ছিল। কলিকাতায় আমার শ্বশুরের প্রায় সতের থানা বাড়ী ছিল। এত দিন আমার সে সব ঠিক মনে নাই, তার ভিতর খুব বড় বড় কএক খানির কথা বলিতেছি। চৌরঙ্গীতে তিন খানি, বড় বাজারে অনেক যায়গা ও একটী বড় বাড়ী, পটলডাঙ্গার স্কুলবাড়ী (এল্‌বার্ট কলেজ) এই বাড়ীটী তাঁর গুরুর জন্য হইয়াছিল, তিনি আসিলে ঐ খানে থাকিতেন। নীচু বাগানের ও মাণিকতলার বড় বাগানবাড়ী, খালের ধারের ধেনো জমি ও অনেক যায়গা এবং শিবপুকুরের নিকট অনেক যায়গা। এইরূপ এক এক বাড়ীর ৩০০।৪০০ শত টাকা করিয়া মাসে মাসে ভাড়া আসিত। কলিকাতার বাড়ীতে আমার শ্বশুর প্রায় ৮।১০ লাখ্ টাকার বিষয় রাখিয়া যান। সোণা মুক্তা ও জড়োয়ার গহনা প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকার কম নয়। আমার ছেলেদের ভিতর নবীন ২০,০০০ ও কেশব ২০,০০০ করিয়া পাইয়াছিলেন। নবীন ২০,০০০ হাজার টাকা প্রথমেই পাইয়াছিলেন, কারণ সকলেই তাঁহাকে একটু ভয় করিতেন। কেশব প্রথম টাকা পান নাই, শেষে যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট মেজ বৌকে লইয়া যান, এবং তাঁহার এ বাড়ীতে আসা ও খরচ আমার ভাশুর বন্ধ করিয়া দেন, তখন কেশব উকীলকে দিয়া তাঁহার ২০,০০০ হাজার টাকার জন্য নালিশ করিতে চাহিলেন। তারপর আমার ভাশুর কেশবের ২০,০০০ হাজার টাকা এবং তাঁহার ভগ্নীদের টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সময় কেশব আমায় বলিয়াছিলেন "মা, তুমি বলত কৃষ্ণবিহারী ও তোমার জন্য উকীলের চিঠী দিয়া তোমাদের টাকাও বাহির করিয়া নিই।" আমি বলিলাম "না টাকা কি বড় জিনিষ? টাকার জন্য তোমার জ্যেঠা কি জেলে যাবেন? যাক্ এখন নিয়ে দরকার নাই।"

আমি নালিশ কাহাকে বলে জানিতাম না, নালিশের নামে ভয় হইল। আমার অমতের জন্য কৃষ্ণবিহারীর ও আমার টাকা বাহির হইল না। আমার জন্যই কৃষ্ণবিহারীর টাকা গেল, কিন্তু সে জন্য কৃষ্ণবিহারী এক দিনও দুঃখ করেন নাই। কলিকাতায় যে সমস্ত বাড়ী ছিল তার ভাড়া আমার সব ছেলেরা নিয়মিতরূপে পাইয়াছিলেন। আমার ছেলেদের ভাগে যে সমুদায় বাড়ী ছিল তার মধ্যে চৌরঙ্গীর বির্জ্জিতলার ২টী বড় বাড়ীও ছিল। মাণিকতলার ধেনোজমীও পাইয়াছিলেন, সেই জমীর খাজনা এখনও আমার নাতিরা পায়। গহনা আমার ছেলেরা তেমন কিছুই পান নাই, নবীন ও কেশব যা অল্প পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণবিহারী কিছুই পান নাই। ছেলেরা যে সব বাড়ী পাইয়া-

ছিলেন, তাহা কোথায় গেল, কি হইল, তাহা কিছুই জানি না। শেষে আমার ভাশুর এবং ভাশুরের ছেলেরা যখন দেনার দায়ে রাত্রে সব সোণা রূপার বাসন লইয়া রাতারাতি জয়পুরে চলিয়া যাইতেছিলেন, নবীন আমাকে না জানাইয়া দরোয়ানকে হুকুম দিয়া সমস্ত জিনিষ আটকাইলেন। যদু ও মোহিন আসিয়া বলিলেন, "মেজখুড়ি, নবীনকে আমার জিনিষ ছেড়ে দিতে বল, আমি যতদিন বেঁচে থাকিব তোমার কখনও কষ্ট হইতে দিব না।" আমি এ কথা শুনিয়া নবীনকে ডাকিয়া বলিলাম, "তোমার দাদার জিনিষ ছেড়ে দাও। কাউকে কষ্ট দিয়ে কাজ নাই।" ছেলেরা জিনীষ লইয়া জয়পুরে গেলেন, কিন্তু যদুর ধর্ম্ম যদু রক্ষা করিয়াছেন। তিনি মাসে মাসে এখনও আমাকে সাহায্য করিতেছেন। আমার শ্বশুরের এত বিষয় আমার কপালদোষে নষ্ট হইয়া গেল। আমার ছেলেরাও বিষয়ী ছিলেন না। তাহারই জন্য নবীন প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়মমত পাইয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। কলুটোলার বাড়ী প্রথম শ্বশুরের বড় ও মেজ ছেলের ভাগে পড়ে। শেষে বড় ছেলের ভাগ শ্বশুরের ছোট ছেলে কিনিয়া রাখিলেন। আমার স্বামীর অংশ আমার তিন ছেলেরা পাইলেন। কেশবের অংশ কৃষ্ণবিহারী ও আমার দুই মেয়ে কিনিয়া রাখিলেন। তিনি নারিকেলডাঙ্গায় যাইয়া বাড়ী করিলেন।

পুত্র কন্যা।

পুত্র কন্যা মেয়েদের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম পুত্র নবীন;—আমার তের বৎসর বয়সে নবীনের জন্ম হয়, তিনি প্রথম সন্তান। তিনি প্রায় ৫৭ বৎসরে মারা যান। তিনি বরাবরই রোগা ছিলেন, তিনি হিন্দু কলেজে পড়িতেন। পড়া শুনায় তিনি চিরকালই মনযোগী ছিলেন, তাঁহার নিকট কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। তিনি চিরকাল স্বাধীনপ্রকৃতি বিশিষ্ট এবং গম্ভীর ছিলেন। অন্যান্য ভাই ভগ্নীরা তাঁর সম্মুখে কথা কহিতে ভয় করিত। তিনি কিন্তু কখনও কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। তিনি যা করিতেন, অতি নিয়মে করিতেন, কখনও নিয়মের বাহিরে যাইতেন না। কেশব ও কৃষ্ণবিহারীর কোন নিয়ম ছিল না। যা যা করিতেন তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। নবীন যদিও বিষয় প্রায় সমস্ত পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানির কাগজের সেয়ার কিনিয়া অনেক টাকা নষ্ট হয়। তাহারই জন্য শেষে তাঁর অনেক অর্থকষ্ট হইয়াছিল। তিনি বহুমূত্র রোগে মারা যান।

কেশবচন্দ্র।

আমার ১৭ বৎসরে কেশবের জন্ম হয়। নবীনের ছোট আমার মেয়ে ব্রজেশ্বরী, তার ছোট কেশব। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবার ভোরে ৭টার সময় ঐ নীচের যেই ঘরটী* তোমায় দেখাইয়া দিয়াছি,

* তাঁর নাতজামাই যোগেন্দ্রলাল কাস্তগিরিকে বলিতেছেন।

সেই ঘরে এবং যে স্থানে আমার দেখান মত তুমি বেদী করিয়া দিয়াছ, ঠিক সেই স্থানে তাঁর জন্ম হয়। সেই ঘরে সুধু আমার ননদের এক মেয়ে হইয়াছিল। সেই ঘরটী দেৎখানার পথে ছিল, নবীনের বড় ঘাম বলিয়া আঁতুর ঘর প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাড়াতাড়িতে সেই ঘরেই কেশবের জন্ম হয়। ঘরটী এত খারাপ ছিল যে, কেশবের জন্মাবার একটু পরেই তাঁর পেট কেঁপে গিয়াছিল। নয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁর মূর্চ্ছা রোগ হয়। এক দিন স্কুলে যান, সেই খানেই রোগ আরম্ভ হয়। মাষ্টার একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেশব জবাব দিতে পারিলেন না, কারণ তখন রোগের আরম্ভ হইয়াছে। মাষ্টার মনে করিল বলিতে পারিবে না বলিয়া কথা কহিতেছে না। এই মনে করিয়া এক খানি ছড়ি দিয়া কেশবের হাতের চেটো বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল. তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া যান, শেষে বাড়ীতে আনিয়া সুস্থ করা হয়। এই মূর্চ্ছা রোগ প্রায় দুই বৎসর ছিল, শেষে ভাল হইয়া যায়। তার পর আর কোন বিশেষ রোগ হয় নাই। তিনি এত সুন্দর ছিলেন যে, সকলে তাঁহাকে গোঁসাই বলিত! তাঁহার কোন দোষ ছিল না। চিরকাল যেন ধোয়া পোঁছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নবীনকে ভয় করিতেন, এবং মান্যও করিতেন। ছোট ভাই বোন্‌দের বিশেষ কৃষ্ণবিহারীকে ছেলেবেলা হইতে বড় ভাল বাসিতেন। কারণ কৃষ্ণবিহারী অতি ভালমানুষ ছিলেন। কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতেন না। কৃষ্ণবিহারী শুধু আমার ও বৌএর সঙ্গে আব্দার করিতেন। বাড়ীতে এত ছেলে মেয়ে ছিল কাহারও সহিত কেশব কিম্বা আমার অন্য ছেলে মেয়েরা ঝগড়া করেন নাই। কেশব সকলের সহিত খেলিতেন, কিন্তু গলাগলি ভাব কাহারও সঙ্গে ছিল না। কেবল আল্‌গা আল্‌গা থাকিতেন। তিনি হিন্দু-কলেজে পড়িতেন। কেশব কখন স্কুল ছাড়িয়াছেন বলিতে পারি না। স্কুল ছাড়িয়া ব্যাংকে কাজ করেন, ট্যাঁকশালেও এক মাস কাজ করিয়াছিলেন।

এক দিন কেশব খেলিতে খেলিতে হঠাৎ আমার মেজ মেয়ের চোখে বল ছুড়িয়াছিলেন, অবশ্য না জানিয়া। পূর্ব্বে থেকেই এই মেয়ের চোখের রোগ ছিল, কিছু কিছু ভাল হইতেছিল, কিন্তু কেশবের এই অজানিত আঘাতে আমার মেয়ের চিরকালের মত চোখটী যায়। কেশব দুঃখে এবং ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছিলেন। তখন কেশবের বয়স ৬।৭ বৎসরের ছিল। আমার শ্বশুর, এ বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেকেই পাঁচ বৎসর হইলেই হাতে এক ছড়া তুলসীর মালা দিয়া হরিনাম দিতেন, কেশবকেও সে রকম দিয়াছিলেন, অন্য ছেলেরা সে নাম সর্ব্বদা করিতেন না। কেশব কিন্তু সে নাম ছাড়িলেন না, সেইটী বরাবরই ছিল। সব সময় তিনি হরিনাম লইয়া থাকিতেন, শেষে এই হরিনামে জগৎ মোহিত করি-

লেন। তিনি ছেলে বেলায় অনেক রকম খেলিতেন, যাহা দেখিতেন, তাহাই নকল করিয়া খেলিতেন। কত বাজি করিতেন, যাত্রা করিতেন, সাহেব সাজিতেন, কখনও পুরুত হইয়া পূজা করিতেন, কখনবা গুরু মহাশয় হইয়া ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। এই সকল বিষয় অনেকে লিখিয়া লইয়াছেন। আর লিখিবার দরকার নাই।

কেশব সন্দেশ ও রসগোল্লা বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ছোট বেলায় একদিন আমার কাছে চারিটী সন্দেশের জন্য আব্দার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি বড় মারিয়াছিলাম। সেইজন্য তিনি বড় কাঁদিয়াছিলেন, আমার শশুর তাঁর কান্না শুনিয়া উপর থেকে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন কাঁদিতেছে?" (তিনি কেশবকে বড় ভাল বাসিতেন) আমার ননদ বলিলেন "কেশব ৪টা সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে বলিয়া বৌ মারিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া আমার শ্বশুর বড় বাজার হইতে ১২ ঝুড়ি সন্দেশ আনাইলেন, এবং আমায় বলিলেন, "আমি ওদের জন্য রোজ ৫০।৬০ টাকা উপরি আনিতেছি, তাহারা যাহা খাইতে চাহিবে তাই দিবে, কখনও মারিবে না।" কেশব এক ঝুড়ি হইতে খাইলেন; তাঁর খাওয়া হইয়া গেলে পর অন্যান্য ছেলেদের দেওয়া হইল। বাদবাকি চার ঝুড়ি সন্দেশ ছিল। আমার শ্বশুর কেশবকে বলিলেন, "২ ঝুড়ি তোমার মা খাইবেন, আর ২ ঝুড়ি তোমার বুড় নানী খাইবেন।" এই বলিয়া তিনি ২ ঝুড়ি আমায় দিলেন, ও ২ ঝুড়ি আমার শাশুড়ীকে দিলেন। কেশব আমার রান্না খাইতে চিরকাল ভাল বাসিতেন। শাক তাঁর বড় প্রিয় ছিল, অড়হর ডালও বড় ভাল বাসিতেন। আমায় বলিতেন, "মা, তুমি যে রকম করিয়া অড়হর ডাল রাঁধ আমাকে তেমি করিয়া শিখাইয়া দাও।" আমার ছোট মেয়ে পান্নার ঘরের উপরকার ছাদে কেশবের একটী কুটীর ছিল। তিনি সেই কুটীরের মধ্যে নিজে রাঁধিয়া একদিন ভাইকে, একদিন বোনদের, একদিন ছেলেদের খাওয়াইতেন। এইরূপে তিনি ভাই ভগ্নী এবং শিশু সেবা করিতেন। কেশব ও কৃষ্ণবিহারী দুজনেই নবীনের ছেলে অমিকে বড় ভালবাসিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে কেশব বলিয়াছিলেন, "আমার বিবাহ করিয়া দরকার নাই।" বিয়ের পর তাঁর মনে কি হইল, তারপর থেকেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিশিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম হইলেন। তাঁর ব্রাহ্ম হওয়ার দরুণ আমি অনেক ভুগিয়াছি, ভাশুরের নিকট অনেক গালাগালি খাইয়াছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি বিনা কান্নায় আমার দিন যায় নাই। আমি কেশবকে তাঁর ধর্ম্মের জন্য কিছুই বলিতাম না বলিয়া তিনি এক এক দিন রাগিয়া এত বকিতেন যে বলা যায় না। আমারও তখন এক এক বার মনে হইত কেশব অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু এখন আর সেই রূপ মনে হয় না।

ভাশুরপো মোহিন, যোগীন ও কেশবের এক সঙ্গে দীক্ষা লইবে সব ঠিক্, গুরু

আসিয়াছেন, মহা ঘটা, কত লোক খা'বে। ওমা সকালে উঠিয়া দেখি কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে পলাইয়া গিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। আমি অন্নজল ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুপুরের সময় কেশব বাড়ীতে ফিরে এলেন, আমার জামাই যাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই—

"তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বল রে আপন
মিছে মায়ায় নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপণ"

এই গানটী পড়িবার পর আমার মন একেবারে ভাল হইয়া গেল। সেই গানটী এখনও আমার মন হইতে যায় নাই। আমি উঠিয়াই সেই বই ও কাগজ লইয়া গুরুর নিকট গেলাম। তিনি সেই সব পড়িয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে যদি এই ধর্ম্ম নিতে পারে সে একজন বড়লোক হবে, দেখ্‌বে তার কাছে কত লোক আস্‌বে, তুমি এই জন্য কোনও দুঃখ করিও না।" গুরুর এই কথা শুনিয়া আমার মন একেবারে শান্ত হইয়া গেল।

আদেশ ও দৃষ্টি।

আমি যখন কেশবের সঙ্গে নৈনীতাল দর্শনে যাই সেই সময় একদিন হ্রদের সম্মুখে বসিয়া কেশবের সঙ্গে উপাসনা করিতেছিলাম। উপাসনা করিতে করিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে যাহা কিছু আছে সমস্ত রক্তেতে পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এবং কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইটী কি? তিনি বলিলেন, মা, তুমি যাহা দেখিলে তাহা তোমার ভক্তির ভাব, কিন্তু আসল এখনও হয় নাই, সে পরে হইবে। দেবালয়ে আমি অনেক সময় অনেক কথা পাইয়াছি, কিন্তু এখন আর কিছুই হয় না।

২। কেশবের যাওয়ার ২।৩ বৎসর পরে আমি দেখিলাম, কেশব পুকুরধারে যেখানে তিনি মাটীর নীচে যোগের জন্য কুটীর করিয়াছিলেন, সেখানে একখানি গেরুয়া কাপড় গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ডাকিলাম এবং বলিলাম "কেশব, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এস" তিনি বলিলেন "আমি সেখানে যাব না ওরা আমার কাছে আসুক"।

৩। আর একদিন দেবালয়ে উপাসনার সময় দেখিলাম কেশব একটী ফুলের সাজি হাতে করিয়া বাগানে ফুলগাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সাজিটী শূন্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ফুল তোল নি?" তিনি বলিলেন, "ফুল নাই, সব ফুল কলুটোলায় লইয়া গিয়াছে"।

৪। আর এক দিন কেশব যাওয়ার দুই তিন দিন পরে আমি বড় কাতর হইয়া লিলিকটেজে ঘরের ভিতর দরজায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছি, মেয়েরা সকলে

চা খাইতেছিলেন সেই সময় আমি দেখিলাম কেশব আমার সম্মুখ দিয়া এ ঘর হইতে অন্য ঘরে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

৫। মোহিনীকে এরূপ উপাসনার সময় অনেকবার দেখিয়াছি। এই সব সত্য কি কল্পনা জানি না, কিন্তু স্বপ্ন নয়, দেখিয়াছি ঠিক। কিন্তু কৃষ্ণবিহারী যাওয়ার পর বিশেষ কিছু দেখি নাই, শুধু শেষ বার যখন কাশী যাই সিক্‌রোলে আমার বড় ব্যমু হইয়াছিল, সেই ব্যমুতে আমি বড় দুর্ব্বল হই, তাই আমার নাতি মণিকে বলিলাম "আমাকে কাশীতে রাখিয়া এস, আমি কাশীতে মরিতে চাই"। এই বলিয়া মনের দুঃখে বসিয়া আছি, আমাকে একজন বলিলেন "তোর কাশী সব যায়গা, এই কি তোর কাশী নয়, তুই যদি ষ্টেসনে মরিস সেখান থেকেও তোকে তুলে নিব"।

কেশব যাওয়ার অল্প দিন পরে আর একদিন দেবালয়ে উপাসনা করিতেছি, এমন সময় কে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস" আমি বলিলাম, "মুক্তি চাই" তিনি বলিলেন "তবে তোর সন্তান সন্ততি কিছুই থাকিবে না"। এই কথা শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। এই কথা আমি একবার ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ীকে কথায় কথায় বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কেন এমন কথা বলিয়া ফেলিলে"। আমি বলিলাম, "কথাত আমি বলি নাই, আমায় জীবন বলিয়াছে আমি কি করিব।" এখন বুঝিতেছি এইজন্য বুঝি আমার একে একে সব যাইতেছেন।

তারপর আমার নবীন যে দিন গেলেন তার পরদিন পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তিনিই আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তুই আমায় ভাল বাস্‌তে পারবি?" আমি তাহার কিছুই জবাব দিতে পারিলাম না। এই কথা কৃষ্ণবিহারীকে বলিলাম তিনি বলিলেন 'মা, তোমায় তিনি ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তুমি আর আমাদের কাহারও দিকে মন দিও না শুধু যাঁহাকে ধরিয়াছ তাঁহাকে এঁটে ধরিয়া বসিয়া থাক, আর কোনও দিকে যাইও না। আমি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাও কৃষ্ণবিহারী জানিতেন, ফুলেশ্বরী তাঁহাকে সব বলিয়া দিয়াছিল। সেই জন্য কৃষ্ণবিহারী মনে মনে জানিতেন তিনিও থাকিবেন না।

মহিলার রচনা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

(নীতিবিদ্যালয়ে পঠিত।)

জগদীশ্বর এই জগত অতি আশ্চর্য্য কৌশল ও সুন্দররূপে সৃজন করিয়াছেন। ভূমণ্ডলের একদিকে প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ মরুভূমি, আর এক ধারে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির উপর হইতে ধূম অগ্নিশিখা ও গলিত ধাতু সকল বহির্গত হইয়া কত নগর দেশ ও গ্রাম ধ্বংস করিতেছে। আর এক স্থানে অত্যুচ্চ শুভ্রাকার তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর চূড়ায় সূর্য্যের রশ্মি লাগিয়া নানাবিধ বর্ণ প্রকাশ করিতেছে, ও অতি সুন্দর শোভাধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের কোন কোন স্থান হইতে অনবরত প্রস্রবণের জল নিঃসৃত হইয়া

নিম্নভূমিতে আসিয়া নদ নদীতে মিশ্রিত হইতেছে, এবং সেই সকল নদ নদী কত দেশ দেশান্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সকল উর্ব্বরা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প মেঘ আসিয়া পর্ব্বতের গায়ে লাগিতেছে, আবার কখনঃকখন অনেক মেঘ আসিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। জগতপিতা সমুদায় জীবের সুখের নিমিত্তই ছয় ঋতু ও দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে পূর্ব্বদিকে স্বর্ণের বর্ণ ধারণ করিয়া সূর্য্য উদয় হয়। তখন ফুলগুলি গাছে গাছে ফুটিয়া কি সুন্দর শোভা ধারণ করে, আলোক দর্শন করিয়া পক্ষী সকল বাসা হইতে বাহিরে আসিয়া ডালে বসে, ও মনের আনন্দে যার যাহা বুলী সে তাহা গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। শিশিরাচ্ছন্ন গাছের পাতা ও ঘাসগুলির উপর রৌদ্রের উত্তাপ নামে। তখন নিদ্রিত জগৎ জাগ্রত হয়, ও সমুদায় প্রাণী নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। আবার সন্ধ্যা হইলে সূর্য্য অল্পে অল্পে পশ্চিম দিকে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া অস্তমিত হয়। তখন পক্ষীসকল আপন আপন বাসায় ফিরিয়া যায়, গরুগুলি মাঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া যায়; চন্দ্র ও অগণ্য তারকারাশি সুনীল অনন্ত আকাশে শোভা বিস্তার করিবার উপক্রম করে। কখনবা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোক, ও কখনবা অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিতে, এই পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য জীব জন্তু নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। কে আকাশের এত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, এবং এই ভূমণ্ডলকে এত সুন্দর করিয়া রাখিয়াছেন? সেই পরমদেবতা পরমেশ্বর যিনি এই সুখময় জগতে কিছুরই অভাব রাখেন নাই। প্রকৃতিতে তাঁহার জ্ঞান বিশেষরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করি।

সাবিত্রী লজ, কুচবিহার। } বিভাবতী নারায়ণ।

সংবাদ।

ইংলণ্ড জর্ম্মাণি প্রভৃতি সভ্যদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করেন। প্রায় কাহারও ঘরে ঝী চাকর নাই। সেখানকার চাকর চাকরাণীর বেতন আমাদের দেশের চাকর চাকরাণীর বেতন অপেক্ষা দশগুণেরও অধিক। সে দেশের বড় ঘরের মেয়েরা বেশী কাজকর্ম্ম করেন না, তাঁহারা গান বাদ্য ও লেখা পড়া করিয়া সময় যাপন করেন। অনেকের ঘরে ঠিকে চাকরাণী আছে, তাহারা প্রত্যহ আসিয়া ২।১ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়া যায়। এ অঞ্চলের এক্ষণ এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, অনেক সামান্য শ্রেণীর গৃহিণীরাও নিজেদের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন না। একদিন রাঁধুনী না থাকিলে পরিবারস্থ সকলকে উপবাস করিতে হয়। অনেক পরিবারের মেয়েরা আমোদ গল্প করিয়া ও তাস খেলিয়া সময় যাপন করেন। তাঁহাদের যেন অন্য কিছু করিবার নাই, জীবনের উচ্চ লক্ষ্য নাই।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের পক্ষের উকিল বৃদ্ধ আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়কে মতিভ্রান্ত দলের চারুচন্দ্র বসু নামক একটি নবযুবক প্রকাশ্য বিচারালয়ে পিস্তলের গুলিতে বধ করিয়াছে। দুরাত্মা তখনই ধরা পড়িয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কি ভয়ানক কাণ্ড!

ভ্রম শোধন।

গত পৌষ মাসের মহিলাতে মূল্যপ্রাপ্তি স্থলে, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, কোচবিহার স্থলে কছোলি হইবে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩১৫, মার্চ্চ ১৯০৯। [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

জননীর দ্বারায় সন্তানের নীতিভূমির সূত্রপাত হয়। ছেলে বেলা হইতে সত্য বলার অভ্যাস মাতা হইতে শিশুরা শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু আমাদের দেশে সত্য কথা এবং সত্য রক্ষার প্রতি অনেকেরই তেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই। এই হেতু সত্যানুরাগ তেমন প্রবল দৃষ্ট হয় না। জননী মিথ্যা বলিতে শিক্ষা না দিতে পারেন কিন্তু শিশুরা মাতার ব্যবহার নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া সত্য মিথ্যার ভাব গ্রহণ করে। যদি লোকের সঙ্গে কথায় ও ব্যবহারে মাতার অসত্য কিম্বা কপট ভাব দেখে তাহারা সেইটী অতর্কিতভাবে গ্রহণ করে এবং তাহা তাহাদের স্বভাব মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়, এস্থলে জননীর কতদূর সাবধান হইয়া কথা বলা এবং ব্যবহার করা আবশ্যক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সত্য বিশ্বাস এবং আস্থা স্তন্য পান হইতেই শিক্ষা লাভ হয়। অতএব নারীমাত্রেরই সত্যানুরাগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ছেলে বেলাতে লোকের বাড়ীর বৃক্ষ তলে পতিত ফল কুড়াইয়া আনা গ্রামদেশে একরূপ প্রথার মধ্যে দাড়াইয়াছে। এমন কি গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া গৃহে নিয়া গেলে অনেক মাতা সেস্থলে ছেলের কত প্রশংসা করেন। অনুমতি ব্যতীত পরের দ্রব্য গ্রহণে যে পাপ সে বোধটী আর জন্মে না। তবে উপযুক্ত বয়সে, শিক্ষা এবং লোকশাসনে এবং ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষে কাহারও, কাহারও এ অভ্যাস পরিত্যক্ত হইয়া যায় কিন্তু অনেকেরই থাকিয়া যায়। কাহারও কাহারও এই পরদ্রব্য গ্রহণ প্রবৃত্তি এত প্রবল হয় যে অবশেষে চৌর্য্যাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। সুতরাং জননীর কর্ত্তব্য যে, অনুমতী ব্যতীত পরদ্রব্য গ্রহণ করার প্রবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া দেন যখনই ছেলে কোন দ্রব্য গৃহে নিয়া আসিবে অমনি তাহার নিকট হইতে জানিয়া নিবেন হইবে কিরূপে ঐ দ্রব্য তাহার হস্তগত হইল। যদি জানিতে পারেন যে দ্রব্য স্বামীর অজ্ঞাতে এবং বিনানুমতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ তাহা ছেলেকে দিয়া ফেরত পাঠাইবেন, এবং ছেলেকে দিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইবেন। এরূপ করিলে বিনানুমতিতে পরদ্রব্য গ্রহণ প্রবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মহিলাদিগের উচ্চাধিকার।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমরা মহিলাদিগের উচ্চাধিকার বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে "বাধ্যতা" নারীকুলের সর্ব্বোচ্চ অধিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অনেকের ধারণা বাধ্যতাই ললনাগণের নীচতার হেতুভূত। সুতরাং বাধ্যতাতে উচ্চাবস্থা কি প্রকারে লাভ হয়, এবং বাধ্যতা কোন্ অবস্থায় দূষনীয় তাহাও প্রদর্শন করা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য যে মনুষ্য মাত্রই ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছেন। পুরুষ ও নারী তুল্য স্বাধীন। শারীরিক মানসিক ও আত্মিক নিয়ম যেমন পুরুষের তেমন রমণীর স্বধীনভাবে সর্ব্বথা পালনীয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিলে নরনারী সমভাবে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া থাকেন। নিয়মপালনের পুরস্কারও তাঁহারা একই প্রকারে প্রাপ্ত হন। মনুষ্যও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীগণও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। তারতম্য এই যে, মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নিয়ম পালন বা ভঙ্গ করিতে সমর্থ, ইতর প্রাণীর সে ক্ষমতা নাই। সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক নরনারী অধীন হইতে সক্ষম। স্বাধীন ভাবে অধীন হওয়ার জন্য মনুষ্যের পুণ্য জন্মে; এবং স্বাধীন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করা নিবন্ধন মনুষ্য পাপকারী হয়। নরনারীর এ প্রকার স্বাধীনতার সহিত ব্যক্তিত্ব অনুস্যূত

আমরা এক একটি পরিবারে আবদ্ধ। পতি পত্নী, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতির সমবায়ে পরিবার গঠিত। পরিবারের প্রত্যেকে এক একটি ব্যক্তি, প্রত্যেকে স্বাধীন। প্রেমই পরিবারের বন্ধন। ন্যায়ানুগত অধীনতা পারিবারিক পবিত্রতা বা পুণ্য। যদি পরিবারস্থ ব্যক্তিরা পরস্পরের অধীন না হয় প্রেম থাকে না, পুণ্য শূন্য হইয়া যায়। আবার অন্যায়রূপে অধীন হইলেও নীচতা ঘটে। ন্যায়ানুমোদিত অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইলে প্রেম পুণ্য উভয়ই পরিবারভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পড়ে। অতএব বাধ্যতা বা বশ্যতা, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের সদ্ব্যবহারও দৃঢ় শক্তি। বাধ্যতা স্বাধীনতার অপব্যবহার বা দুর্ব্বলতা নহে।

নারীর এক নাম শক্তি, অপর নাম অবলা। ন্যায়ানুগত অধীনতা স্বীকার করিয়াই মহিলাগণ উল্লিখিত উভয় নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভারতে যোষিৎবর্গ বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনতা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতাদেবী স্বাধীনভাবে তাঁহার পতি অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কত যে দুঃসহ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি স্মৃতিপথে উদয় হইলে হৃদয়ে অসহনীয় বেদনা বোধ হইতে থাকে। কিন্তু সীতার পবিত্রতা, মধুরতা ও প্রভাব সকলই সেই বশ্যতার অভ্যন্তরে। যদি সীতা স্বাধীনভাবে রামচন্দ্রের অভিপ্রায়ের বাধ্য না

হইতেন, আপনার অভিরুচির অনুযায়িণী হইতেন, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতের সমস্ত ললনাশ্রেণীতে তাঁহার দৃষ্টান্ত পরিগৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হইত না। বাধ্যতা ভিন্ন ভালবাসারও মাধুর্য্য থাকে না। বাধ্যতা ভালবাসাকে উচ্ছসিত করে। বাধ্যতাগুণে ভালবাসা আকর্ষণ করে। পুত্র যদি পিতার বাধ্য হয়, তদ্দ্বারা পিতার স্নেহ এবং পুত্রের ভক্তি উভয়ই নিত্য নূতন উচ্ছাস লাভ করে। সংসারের শোভা বাধ্যতা। সংসারের দৃঢ়তাও বাধ্যতা। পৃথিবীতে ত বাধ্যতার উক্তবিধ পরাক্রম। এখন স্বর্গে ইহার প্রভাব কত তাহা পর্য্যালোচনা করা হউক।

বুদ্ধ বলেন নির্ব্বাণে মুক্তি, ঋষিগণ বলেন যোগে মুক্ত, ঈশ্বর-তনয় ঈশা বলেন বাধ্যতাই জীবনমুক্তি। মনুষ্য ঈশ্বর হইতে স্বাধীনতাধন লইয়া সংসারে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু আপনার ইচ্ছানুসারে মনুষ্য সংসারবাজারে সুখের সন্ধান করিতে করিতে দুঃখের কূপে পতিত হইয়াছে। তাহার স্বাধীনতা অটুট রাখিবার যত্নে সে পাপের অধীনতাবদ্ধ হইয়াছে। মানুষের এই প্রকার দুঃখ, অধীনতা, পতন ও বন্ধনজগতে যাতনার ক্রন্দনে সংসারাকাশ সতত ধ্বনিত। কে কি প্রকারে এ আর্ত্তনাদ নিবারণ করে? কাহারও সাধ্য নাই, ক্রন্দন নিবৃত্ত করে। কেবল এক জন লোক এ দুঃখসাগর পার হইয়াছেন, তিনি যীশু। যীশুখ্রীষ্ট পথও দেখাইতেছেন। যদি সেই পথে পাদচারণ কর, অশ্রুজল মুছিয়া যাইবে। তোমার চিত্তে ও জীবনে আরাম পাইবে। সে পথ কি? বাধ্যতা। তোমার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বিসর্জ্জন কর। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা প্রার্থনাদ্বারা অবগত হও; এবং সেই ইচ্ছার অধীনতা স্বীকার কর। প্রেম ভক্তি ও একান্ততা সহকারে পরমপিতা পরমজননীর ইচ্ছা পালনে রত থাক। ঈশ্বরের বাধ্যতা পুণ্য। ঈশ্বরের বাধ্য হইলে পুণ্য স্বতঃ প্রাপ্ত হইবে; জীবন্মুক্তির রসাস্বাদন করিবে, এবং মনুষ্য হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ ঈশ্বরের সহিত শুভ সম্মিলন লাভ করিবে।

এখন বাধ্যতা যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম এ কথা কি প্রমাণিত হইল না। অবলা নারীরই এই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বাধ্যতাতে অধিকার। নারী নরের দৃষ্টান্ত। নর, নারীর এই পবিত্র বশ্যতা ব্রত পালন দর্শন পূর্ব্বক নতশিরে নারীর পবিত্র পদানুসরণ করিবে। পৃথিবীর দৃশ্য পথে নর নারীর আশ্রয়; কিন্তু স্বর্গের অদৃশ্যপথে নারীই নরের আশ্রয়। স্বাধীনতা যদি অধীনতাবিহীন হয় তবে ইহা শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র। অধীনতা বা বাধ্যতা নারীর (এবং নরেরও) সর্ব্বোচ্চ ব্রত বা অধিকার।

সুনীতি এবং বাধ্যতা মূলতঃ এক। সদ্ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম, জীবন্মুক্তি এবং বাধ্যতাও এক। রমণীহৃদয় বাধ্যতারূপ মহাধর্ম্মের রমণভূমি। রমণীহৃদয় যেমন পবিত্র স্নেহ প্রেমের লীলাস্থল, তেমন বাধ্যতারূপ সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মের নিত্যনিকেতন। নারী সত্যসত্যই পিতা মাতা, পতি ও পতিকুল-

শ্রেষ্ঠগণ দ্বারা যে বাধ্যতা এবং সেবা ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কালসহকারে ঈশ্বরের প্রতি সেই বাধ্যতা ও প্রেম অর্পণ পূর্ব্বক সংসারে স্বর্গীয় পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মবিগর্হিত অন্যায্য অনুগতা স্বীকার দ্বারা যে অধঃপতন হয় তাহাও এমহী মণ্ডলে অনেক দুঃখিনী নারী জীবনদ্বারা জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখাইতেছেন। সে বিষয় অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাধ্যতার উচ্চতা প্রদর্শন জন্যই বিধাতা মহিলাদিগকে বাধ্যতা ধর্ম্মে বিভূষিত করিয়াছেন। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের বাধ্যতার মহিমা সংসারে দৃষ্টান্তযোগে প্রচার করিতেছেন। নারীকুল ও বাধ্যতার মহীয়সী শক্তি এবং বাধ্যতাই যে পবিত্রতা ও শান্তি তাহা প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি আমাদিগের মহিলাগণ ইহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন এবং বাধ্যতার উচ্চাধিকার ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নবতী হইবেন।

আর্য্যনারীদের কথা বলা এবং কথা শোনা।

ঈশ্বর সংসারে বিবিধ পদার্থ এবং বিচিত্র জীব সৃজন করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ঘটে ঘটে কতই শক্তি বিতরণ করিয়াছেন! তাঁহার মহীয়সী শক্তি ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনুষ্যকে যত প্রকার শক্তি ঈশ্বর দিয়াছেন, বাক্‌শক্তি তন্মধ্যে প্রধান। কথা বলা এবং কথা শোনার শক্তি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কারণস্বরূপ। মনুষ্য যদি মনোগত ভাব ও অভিপ্রায় বাক্‌শক্তি সহায়ে অভিব্যক্ত করিতে সক্ষম না হইত, কখনও এতদূর উন্নতিলাভে সমর্থ হইত না। আবার মনুষ্য যদি অন্য লোকের কথা না শুনিত না বুঝিত এবং অভিব্যক্ত অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যসাধনে অপারক হইত, তবুও উন্নতিমঞ্চে তাহার অধিরোহণের ব্যাঘাত হইত। সুতরাং কথা বলা এবং কথা শোনা মনুষ্যের মহাশক্তি। পৃথিবীময় সর্ব্বত্র ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ অর্জ্জিত জ্ঞানরত্ন সকল বাগিন্দ্রিয়যোগে ধরাতলে ঢালিয়া দিতেছেন; একাগ্রচিত্ত শিষ্যমণ্ডলী তাহা কর্ণরন্ধ্রযোগে চিত্তক্ষেত্রে ধারণ করিতেছেন। মানবচিত্তক্ষেত্রে তদ্দ্বারা উর্ব্বরাশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব ও গরিমার মহাফল নিচয় তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে।

বাগিন্দ্রিয় যেমন জ্ঞানাগমের উপায়, মানবসমাজ কিম্বা পরিবারমধ্যে প্রেম সাধনার্থ বাগিন্দ্রিয় তেমন বিশিষ্ট উপায় বটে। কথোপকথনে প্রেম লাভ ও বৃদ্ধি দুইই হইতেছে। মনুষ্য বাগিন্দ্রিয়বিহীন হইলে প্রেমের এত আনন্দোচ্ছ্বাস ধরাতলে পরিদৃষ্ট হইত না। প্রিয়জনকে প্রিয়কথা বলা স্বাভাবিক। যাহাকে প্রেম দিতে কুণ্ঠিত তাহাকে বাগ্দানেও কুণ্ঠিত হইতে হয়। যাহার সহিত বন্ধুতা নাই তাহার সহিত বাক্যালাপও থাকে না। বাক্য দ্বারা মনুষ্য পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্ভ্রম এবং সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে।

মনুষ্য মনুষ্যের কথা শোনে, মনুষ্য মনুষ্যকে কথাদ্বারা শ্রদ্ধা সন্ত্রম করে, ইহা সকলেই স্বীকার করে। অধিকন্তু মনুষ্যের কথা ঈশ্বরও শ্রবণ করেন। মনুষ্যের বাক্‌শক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেমশক্তিকে আকর্ষণ করে। যদি ঈশ্বর মনুষ্যের কথা না শুনিতেন, মনুষ্যগণ আবহমানকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত করিত না। মনুষ্যের সত্য স্তব স্তুতি, ঈশ্বরের প্রাণের সংগীত সাগরে তরঙ্গোত্তোলন করে। সুতরাং মনুষ্য, বাক্যপ্রয়োগে মনুষ্যকে মাত্র তুষ্ট করে এমন নহে, মনুষ্যের বচনে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হইতেছেন। কেবল কি মনুষ্যই বাক্য উচ্চারণদ্বারা অভিমত প্রকাশ করে? ঈশ্বরের কি অভিলাষ এবং অভিমত নাই? ঈশ্বর কি স্বীয় অভিলাষ এবং অভিমত প্রকাশ করেন না? অবশ্য আছে এবং অবশ্যই ঈশ্বরের অভিমত ও অভিলাষও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাহার নিকট? মনুষ্যের নিকট। হায় কি উচ্চাধিকার! মনুষ্যের নিকট ঈশ্বর স্বকীয় অভিমত এবং অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বর আপনার অসীম জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে শরণাগত মনুষ্যমনে প্রকাশ করিতেছেন। তাহাত লাভ করিয়া মনুষ্যের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। প্রেমময় ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত প্রেমালাপ করিবার জন্য উৎসুক। প্রেমার্থী মনুষ্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যেমন তাঁহার পবিত্র সঙ্গ, তেমন তাঁহার উদার প্রেমবাণী ভোগ করিয়া থাকে। যে সকল মনুষ্যকে ঈশ্বর স্বয়ং জ্ঞান দান করেন, প্রেম কথা বলেন এবং স্বকীয় প্রেম উৎসঙ্গে গ্রহণ করেন, তাঁহারা কি পরম ভাগ্যবান্ নহেন? ঈশ্বরের সঙ্গেও মনুষ্যের কথা বলা এবং কথা শোনারূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেমন মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের তেমন ঈশ্বরের সঙ্গেও মনুষ্যের প্রেমের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঈশ্বর প্রেম দ্বারা এবং আপনার স্বরূপ স্বেচ্ছা প্রকাশ দ্বারা মনুষ্যকে পরমাপ্যায়িত করিয়াছেন। প্রথমতঃ মনুষ্য প্রার্থনা এবং স্তুতি গীতি দ্বারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করিয়াছে। ঈশ্বর যাহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন, যাহাকে যোগ্য বুঝিয়াছেন তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম পরিচয় দ্বারা তাহাকে সম্মানিত ও কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। ঈশ্বর যাঁহাদের নিকট সর্ব্বাগ্রে আপনার অভিপ্রায় এবং পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারত মহিলগণ প্রধান। ভারতের বৈদিক যুগের ইতিবৃত্ত যাঁহারা সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্য শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন না। অথচ ভারত মহিলাকে ঈশ্বর পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর পূর্ব্বে এ সম্মান দিয়াছেন জানিয়া বা ক্ষমাত্রই ভারতীয় নারীজাতির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাযুক্ত অবশ্যই হইবেন।

পুরাতন বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মুষার নিকট জগদীশ্বর "আমি আছি" নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে ঋষিদিগের নিকট ঈশ্বরের "আমি আছি" নামে ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের

প্রমাণ যোগবাশিষ্ট নামক গ্রন্থযোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক যুগ সর্ব্ব প্রথম যুগ। বৈদিক যুগে অম্ভৃণ ঋষি-কন্যা বাক্‌নাম্নী পূজ্যা জগদ্দুর্ল্লভা মহিলার নিকটে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথম "আমি" নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। ইহার মত সুখপ্রদ মঙ্গল সমাচার মহিলাদিগের পক্ষে আর কি হইতে পারে ?

ঈশ্বর ভারত মহিলাদিগকে প্রেমে, সম্ভ্রমে, সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের ললনাকুল একসময়ে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, পবিত্রতাতে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা, বর্ত্তমান পাশ্চত্য সভ্যতাপেক্ষা অতি উচ্চভাব সম্পন্না মহিলাকুলের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এবং মহিলাদিগের প্রতি ঈশ্বরের প্রদত্ত প্রেম ও সম্ভ্রম ঐ সভ্যতার মূলীভূত কারণ, একথা বলিলে কিছুমাত্র অযথোক্তি হয় না। ভারতীয় জনসমাজে বাক্‌শক্তির উচ্চতম সদ্ব্যবহার একবার হইয়াগিয়াছে। যেমন পুরুষগণ তেমন পুরনারীবর্গ কথা বলা এবং কথা শোনার উচ্চতম অধিকার উচ্চতমরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সদ্ব্যবহারের উচ্চতম পুরস্কার ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আশা করি "মহিলার" গ্রাহক গ্রাহিকাগণ প্রাচীন আর্য্য মহিলাগণের অদ্ভুত জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্য সন্নীতি এবং সতীত্বের ঐতিহাসিক চরিত্র খ্যাতি অবগত আছেন।

প্রত্যেক দেশের উন্নতির সহিত যেমন অতীত তেমন ভবিষ্যতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান! বর্ত্তমানকাল অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত গ্রথিত। ভারতের অতীতস্মৃতি আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করে। ভারতের বর্ত্তমান শুভলক্ষণ সমূহ দেখিয়া ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল আশা আমাদিগকে নবীনতর আলোকে উদ্ভাসিত করে। একবার ভারতীয় মহিলাবৃন্দ যেমন জগতের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছেন, পুনরপি ভারতের সমুন্নতির এই নবযুগে তাঁহারা মনুষ্য এবং ঈশ্বরের নিকট সেই প্রকার শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সম্ভ্রম সম্মানের যোগ্য হইবেন আমাদিগের এই আশা।

মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের এবং মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের, পক্ষান্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের জ্ঞান ও প্রেমের যে বাক্যবিনিময় ইহা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ হয় মহিলাবৃন্দ এ প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিতে অধিকতর সমর্থ। কারণ মহিলাগণ সংসারের কর্ত্রী, পরিবারের সকল বিষয়ে অধিকারিণী। পরিবারস্থ সকলে যদি মূক হন, তাঁহারা ও যদি মূক হন, সংসার কি অসামান্য ক্লেশজনক প্রতীত হয় না? কথা বলা ও কথাবলার অধিকার ও শক্তি থাকাতে সংসারের আরাম ও সুখ শিক্ষা এবং উত্তরোত্তর বিবিধ বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আমাদের সংসার এবং জীবনের সম্পূর্ণ অধিকারী সেই সর্ব্বাধিকারী ঈশ্বরের সঙ্গে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই বাক্‌বিনিময়ের অধিকার আছে। ইহা কি আমাদের শ্রদ্ধেয়া মহিলাবৃন্দ স্বীকার করেন না? বর্ত্তমানকালের জ্ঞান ও সভ্যতা ও সমুন্নত ললনা-

গণ কি ঈশ্বরের সহিত প্রেম এবং বাক্-বিনিময় আবশ্যক বোধ করেন না? এ প্রশ্নের সদুত্তর চাই।

সাধ্বী ক্যাথারাইন বুথের জীবনের কয়েকটী কথা।

(একটী কুমারী কন্যা কর্ত্তৃক লিখিত।)

এবার ক্যাথারিন বুথের কথা কিছু বলিব। ক্যাথারিনের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণা নারী ছিলেন, তিনি অতি যত্নে সস্নেহে কন্যাকে পালন করিয়াছিলেন। মাতার সহিত আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে আলোচন হইত। মাতাকে আত্মার সকল অবস্থা, অভাব, প্রার্থনা জানাইতেন। বিবাহের পরও নিয়মিতরূপে মাতাকে পত্র দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের শরীর, মন, আত্মার বিষয় জানাইতেন। বাল্যকাল হইতেই উচ্চ আদর্শ, আশা ও সঙ্কল্প লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরজীবনে তাহারই পরিণতি, উন্নতি, বিকাশও প্রকাশ হইয়াছিল। বীজ শৈশবেই রোপিত হইয়াছিল, তাহাই পরে সু বাতাস, সু সঙ্গের গুণে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

কিছুদিন হইল, মহিলাতে জেনারল বুথের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ বাহির হইয়াছিল, আশা করি তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, ও তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, সেই উপদেশটী কত উচ্চ পবিত্রমহান। আমরা নারীকে কত সামান্য জ্ঞান করি, এখন বুঝিতে পারিয়াছি, নারীর কত উচ্চঅধিকার, উচ্চ জীবন, তাঁহার কত সৌভাগ্য, কত দায়িত্ব। এমন আশ্চর্য্য য ক্যাথারাইন বুথ বিবাহের পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মযাজককে নারীর অধিকার বিষয়ে এক পত্র লেখেন, সেই পত্রের আর এই উপদেশের একই কথা।

ক্যাথারিন বিবাহের পূর্ব্বে ৪।৫ বৎসর একটী বাইবেল ক্লাশে নিয়মিতরূপে যোগ দিয়াছিলেন। একটী মহিলার বিশেষ উৎসাহে অনুরাগে ক্লাশটী স্থাপিত হইয়াছিল। এই মহিলাটী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, ক্যাথারিন ইঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তিনি অতি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দিতেন; মহিলাটীর নিজের বেশভূষা অতি সামান্য ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার কন্যাকে বেশভূষা বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিতে দিতেন। কন্যাটী মাতার সম্মতি লইয়া একটী যুবকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। যুবকটী যদিও মেথডিষ্ট পরিবারের ছিল, কিন্তু সে নিজে বিশ্বাসহীন ছিল। ক্যাথারাইন প্রভৃতি নারীগণ যাঁহারা সেই মহিলাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, এই ঘটনায় তাঁহাদের শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। মহিলাটী তাঁহার উপদেশের ভিত্তি হারাইলেন, তাঁহার উপদেশে ও কার্য্যে মিল থাকিল না। ক্যাথারিন ইঁহাকে "Dont do as I do but do as I tell you" "আমি যেরূপ করি তাহা করিও না, যেরূপ বলি তাহাই কর" ধর্ম্ম বলিতেন, ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত

আঘাত লাগে। তখন হইতে তিনি বিশেষরূপে মনোযোগী হন যেন তাঁহার জীবনে কখনও এইরূপ উপদেশ ও কার্য্যের ভিন্নতা উপস্থিত না হয়। সকলেই জানেন তিনি এই ব্রত পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যেমন বলিয়াছিলেন, সেরূপ করিয়াছিলেন। পুত্র কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কোন বিষয়েই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই মহিলাটীর ন্যায় কেবল নিজের জন্য ধর্ম্ম বৈরাগ্য রাখিয়া, পুত্র কন্যার জন্য পদ, মান, সুখ ঐশ্বর্য্য অন্বেষণ করেন নাই। কোনও নিষ্ঠাহীন বিশ্বাসহীন লোকের সঙ্গে, পুত্র কন্যার বিবাহ দেন নাই।

একদা তাঁহার কোন সমবয়সী বালিকার কোন যুবকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় সেই যুবক অন্য কোন ধনীর কন্যাকে বিবাহ করা অধিক লাভজনক মনে করিয়া, বিবাহ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাতে কাথারিণের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। বিবাহের পূর্ব্বেই বিবাহিত জীবনের আদর্শ সুনিয়ম মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাহার মত নিম্নে লিখিত হইল। অনেক স্থলে বিবাহিত জীবন সুখের না হইয়া, অশান্তি দুঃখের হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ কোন বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, কালক্ষেপ না করিয়া ব্যস্ততার সহিত সম্বন্ধ স্থির করা হয়, পরস্পরকে চিনিবার জানিবার যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয় না। পরস্পরের স্বভাব চরিত্র, চরিত্রের বিশেষত্ব উত্তমরূপে জানিয়া তবে সম্বন্ধ স্থির করা উচিত। তাহা না হইলে কোন একটী সামান্য সন্দেহ থাকিলে, তাহাই কালক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া অশান্তি উৎপন্ন করে।

অতি অল্প লোকেই বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে মনে একটী আদর্শ স্থির করিয়া লন যে তাঁহারা যাঁহাকে জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিতে চান তাঁর কি কি গুণ প্রার্থনা করেন। অধিকাংশ লোকই কোনও আদর্শ না লইয়া বিবাহ সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। কোন একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই আলাপে কথায় মুগ্ধ হয়ে বিনা বিচারে অবিলম্বে তাহাতেই সম্মতি দান করেন। যাঁহার সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইব, তিনি আমার বন্ধু হইতে পারেন কি না দেখিতে হইবে, বন্ধুত্ব কোথায় হয়, যেখানে স্বভাবের সাদৃশ্য অনুরূপ থাকে। যদি কোন প্রতিভাশালী লোক উচ্চ আশা সঙ্কল্প লইয়া কোন নারীকে বিবাহ করেন, যিনি কেবল দাসীর ন্যায় ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে পারেন, সেই বিবাহসম্বন্ধ কখনও সুখের হইবে না। সেইরূপ কোন সুরুচিযুক্তা সুশিক্ষিতা নারী যদি কোন পুরুষকে বিবাহ করেন, যিনি কেবল হলচালনা করিতে পারেন বা কল কারখানা দেখিতে পারেন, সে বিবাহে কখনও সুখের আশা করা যায় না। অনেক নারী মনে করেন, যিনি অন্নবস্ত্র দান করিতে পারেন, তাঁহাকেই বিবাহ করা যায়। তদ্রূপ অনেক পুরুষ গৃহকার্য্যে সুদক্ষা নারী পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি

বন্ধু হইতে সঙ্গী হইতে পরামর্শ দিতে পারেন কি না তাহা দেখেন না। অসুখী বিবাহিত জীবনের সাধারণতঃ এই সকল কারণ মন বয়স স্বভাব শিক্ষা ও পূর্ব্ব অবস্থার ভয়ানক ভিন্নতা অসমতা।

বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই, বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পক্ষে, কি কি গুণ অত্যাবশ্যকীয় তাহা ক্যাথারিণের স্থির ছিল।

প্রথমতঃ আমি স্থির করিয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মমতের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মমতের কোন পার্থক্য থাকিবে না। এক হবে। তিনি একজন প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন, নাম মাত্র কিংবা কেবল নিয়মিত রূপে মন্দিরে গমন করিলেই হইবেই না কিন্তু ভগবানের নিকট দীক্ষিত, অকৃত্রিম লোক হওয়া চাই।

এই নিয়মের অনুসরণ না করাই অধিকাংশ দাম্পত্যজীবনের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। যাহারা ভগবানকে চায় তাঁর সেবা করিতে চায় তাহারা এমন লোকের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় যাহাদের ভগবানের আদেশের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই ; মুখে না বলুক এমনি কি ভগবানের অস্তিত্বেই বিশ্বাস নাই।

সহস্র সহস্র নরনারী জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছে, ধর্ম্ম মত বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকিলে অর্থ বিত্ত, পদ, মান, কিংবা সংসারিক কোন প্রকার সুবিধা কিছুই যথেষ্ট নয় কিছুতেই মিলন শান্তি হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই সুবিবেচক বুদ্ধিমান লোক হওয়া চাই, আমি কোন, দুর্ব্বল চিত্ত অল্পবুদ্ধি লোককে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না।

তৃতীয় নিয়ম পরস্পরের মত ও রুচি এক হওয়া চাই।

আর একটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যিনি সম্পূর্ণরূপে মদ্যপানের বিরুদ্ধে এরূপ লোক হওয়া চাই, তিনি যে কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মদ্যত্যাগী হইবেন, তাহা নয়, তাঁহার নিজের মত সেরূপ হওয়া চাই।

উপরিউক্ত গুণ গুলি ব্যতীত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইব না, প্রতিজ্ঞা ছিল। এ সকল ছাড়া অন্যান্য লোকের ন্যায় আমারও কতকগুলি বিশেষ পছন্দ ছিল, অর্থাৎ আমার এই গুলি পাইতে ইচ্ছা করিত। আমার স্বামী প্রচারক হন, ইচ্ছা করিত কারণ প্রচারকের স্ত্রী হইলে জন সেবা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা। আমার ইচ্ছা হইত তিনি যেন দীর্ঘাবয়ব হন, এবং "উইলিয়ম" নামটী আমি খুব ভালবাসিতাম।

আমার যে গুলি দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল সে সকলই যেমন পূর্ণ হইয়াছে. আমার এই সাধগুলিও ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন নাই।

বিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই বিবাহিত জীবনে যে সকল নিয়ম পালন করা উচিত তাহা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম বিবাহের দিন হইতেই আমি নিয়মগুলি পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এত বৎসরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি নিয়মগুলির উপকারিতা ও মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি।

প্রথম সাংসারিক কি অন্য কোন বিষয়ই স্বামীর নিকট হইতে কখনও গোপন করিব না। এই স্থলে, এই বলিতে পারি অনেক সময় অনেক লোক, তাহাদের জীবনের নানা পরীক্ষার কথা আমাকে বলিয়াছে, সেগুলি কখনও বলি নাই, কারণ সেগুলি আমার নিজের।

দ্বিতীয় দুজনের একটী অর্থ ভাণ্ডার থাকিবে।

তৃতীয় কোন বিষয়ে মতের ভিন্নতা উপস্থিত হইলে, আমি আমার মত ও তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিব, উত্তমরূপে বুঝাইয়া আমার মতে আনিতে চেষ্টা করিব। ইহার ফল এই হইত যে তিনি আমার মতে মত দিতেন, সত্য ব'লে স্বীকার করিতেন। না হয়তো আমি তাঁহার মতে মত দিতাম।

চতুর্থ—যখন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য উপস্থিত হইবে, সন্তানদের সম্মুখে কখনও তর্ক করিব না। তাহাদের সম্মুখে তর্ক করা অপেক্ষা, কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেও, সে সময়কার জন্য চুপ ক'রে তাহাতে মত দেওয়া বরং ভাল অবশ্যই প্রথম সুযোগে অবিলম্বে সে বিষয়ে মীমাংসা করিয়া লইতাম।

এ স্থলে আমারও একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। অনেক পরিবারেই দেখিতে পাই পিতা মাতা পুত্রকন্যার সম্মুখেই তর্ক করেন। মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আত্মীয়রমণীগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদিগের সম্মুখে, নানা অযথা বিষয়ে আলোচনা করেন; কত শ্রদ্ধের গুরুজনের দোষ কীর্ত্তন, তীব্র সমালোচনা কত পরনিন্দা কত পরচর্চ্চা করেন। তাহারা এই সকল বিষয় আলোচনা করে মতামত প্রকাশ করে, এইরূপে কত লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারায়। তখন তাহাদের সমালোচনা দেখিয়া, পিতামাতা তিরস্কার করেন।

আজকাল যে বালক বালিকারা এত অকালপক্ক হইয়া উঠিতেছে ভক্তিহীন শ্রদ্ধাহীন বাকপটু তার্কিক হইয়া উঠিতেছে, সকলেরই সমালোচনা করিতেছে এ সকলের জন্য অনেক অংশে পিতামাতা দায়ী। কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, যে বৃদ্ধারা বয়োজ্যেষ্ঠারা কনিষ্ঠদের শিশুদের শত্রু। একথাটী অত্যন্ত সত্য ইহাতে আর কোন ভুল নাই। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও তাঁহারা সন্তানদের এরূপ শত্রুতা সাধন করেন যে পরিবারে এই সুনিয়মটী পালিত হয়, পিতামাতা সন্তানদের সম্মুখে সকল বিষয় বলেন না সেখানেই সুশিক্ষা হয়। তাঁহারা এই পৃথিবীর নানা অপ্রয়োজনীয়, মন্দ বিষয় হইতে সন্তানদের দূরে রক্ষা করেন। পাখী যেমন খুব ঝড় বাতাস হইতে আপনার পক্ষপুট দ্বারা শাবককে রক্ষা করে, কিছু লাগিতে দেয় না, আপনি সহ্য করে তদ্রূপ হিতাকাঙ্ক্ষী পিতামাতারা সংসারের ঝড় বাতাস কুকথা কুবিষয় হইতে তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করেন। কবে সকল পিতামাতা এইরূপ হইবেন। যাহারা এখন বালিকা ভবিষ্যতে মাতা হইবেন,

তাঁহারা এখন হইতে মনে মনে এই সুসংকল্প করিয়া রাখুন।

নারীজাতির অধিকার।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নগর-কীর্ত্তনে আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রমুখ প্রচারক এবং ব্রাহ্মগণ নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করেন; জাতিবিচার নাই প্রতিপন্ন করেন। সে অবধি নারীজাতির সমান অধিকার সম্বন্ধে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায় বটে কিন্তু সমান অধিকারের কার্য্য চলিতেছে। পুরুষ এবং নারী একই ভগবান্ হইতে উৎপন্ন। আকৃতি প্রকৃতিতে যেমন অনেক সৌসাদৃশ্য আছে তেমনি বৈষম্যও অত্যন্ত গুরুতর দৃষ্ট হয়। নারীর মাতৃপ্রকৃতি যেরূপ উজ্জ্বল, কোমল এবং স্নিগ্ধকর, তেমনি পুরুষের পুরুষপ্রকৃতি তেজপূর্ণ, কঠোর এবং রুক্ষ। সাধারণতঃ উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, অথচ বিভিন্ন নয়। একজন আর একজনের অনুপূরক। যেমন শরীরের দক্ষিণ হস্ত এবং বাম হস্ত, দক্ষিণ পদ এবং বাম পদ। এক পা শূন্য হইলে চলা বড় কঠিন। তেমন পুরুষশূন্য নারী, নারীশূন্য পুরুষ তিষ্ঠা বড় কঠিন। এক অঙ্গ অসুস্থ থাকিলে লোকে তাহাকে বিকলাঙ্গ বলে। আমরা উত্তম আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারায় সবল এবং শুদ্ধ হই। আমাদের সমস্ত অঙ্গই যথাযথ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবে চলিলে অর্থাৎ বিধি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং আদেশ পালন করিলে সর্ব্বাঙ্গ সম্যক্ বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই অবনতি অনিবার্য্য। নারী এবং পুরুষ একই মানবজাতির অঙ্গ। মনুষ্য সমাজ মধ্যে যে জাতি উন্নতি লাভ হইয়াছে তাহাদের নরনারী সকলেই স্বাভাবিক বিকাশ সমভাবে লাভ হইয়াছে এইজন্য ইউরোপীয়েরা আজ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠজাতি মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের জ্ঞান কর্ম্মঠতা, প্রেমপুণ্য নরনারী মধ্য দিয়া সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতেছে। ইউরোপের ইতিহাসে কস্মিনকালেও এককালে একাধিক বিবাহ পুরুষের অধিকার মধ্যে দেখা যায় নাই। কিন্তু এসিয়াবাসী মধ্যে একপতি বহুপত্নী, একপত্নী বহুপতি প্রাচীন ইতিহাসে এবং বর্ত্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত দেখা যায়। তবে এক পত্নীর বহুপতি প্রথা এখন বিলুপ্ত বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রকাশ পায় প্রধান অঙ্গ নারী বিকাশ সম্বন্ধে কতদূর বিধাতার বিধি বিরুদ্ধ আচরণ এসিয়াখণ্ডে ঘটিয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ এসিয়া পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রসূতি হইয়াও ইউরোপীয় জাতিদের নিকটে আজ সমকক্ষতা করিতে অক্ষম। এইক্ষণ নারীজাতির মুক্ত বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের নববিধানের বিঘোষিত নরনারীর সমান অধিকার কার্য্যতায় পূর্ণ মাত্রায় পরিণত করিতে এযাবৎ যত চেষ্টা হইয়াছে তদপেক্ষা আরও গুরুতর এবং গভীরতররূপে চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা শুদ্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ করিয়া উঠিতে পারিব না। ক্রমবিকাশ

অভ্যন্তর হইতে হওয়া চাই। পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শকে সদা উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল রাখিতে সহায়তা করিবে। এদেশ ধর্ম্মপ্রধান দেশ। প্রেমভক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব নরনারী নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরে নিষ্ঠা হইতে আপন আপন কায়িক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াস করুন। ভগবানকে সহায় করিয়া, লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে চলিতে থাকুন। অন্যথা উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলপ্রদ হইবে না। নারী তাঁহার বিধি নিয়োজিত অধিকার এবং বিকাশ প্রাপ্তিতে যেন স্বতঃপরতঃ কোন বাধাপ্রাপ্ত না হয়েন। স্বাধীনতা মহারত্ন, ঈশ্বর প্রদত্ত এই স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব যদি নারীজীবনের স্রোত প্রেমময় ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত না হয়। ভগবানের আদেশ পালন করাই কি পুরুষ কি নারীর জীবন ধারণের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে দিতে দেশাচার এবং কুসংস্কারকে অন্তরায় হইতে দিলে চলিবে না। শিক্ষার প্রচার মুক্তভাবে হওয়া প্রয়োজন। প্রতি জীবনের নেতা যখন ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নয় তখন সেই কাণ্ডারীকেই জীবনতরীর সম্পূর্ণ পরিচালনা করিতে দিতে কেহ যেন কুণ্ঠিত না হয়েন। ইহাতে ভয় করিলে হইবে না। স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া চলিতে হইবে। এই স্বর্গীয় বল বর্ত্তমান নারীজাতি মধ্যে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে দেখা যায়। অনেক বঙ্গীয় মহিলার উচ্চ ভাবপূর্ণ কাব্য পাঠ করিয়া ঈশ্বর প্রেরণার ক্রিয়ার বঙ্গনারীসমাজেও প্রবেশ করিয়াছে এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী মানকুমারী, গিরিন্দ্রমোহিনী অম্বুজাসুন্দরী এবং কামিনী প্রভৃতি মহিলাদের নাম এখানে উল্লেখ যোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের নারীরা কেহ কেহ বক্তা হইয়াছেন। কোন কোন মহিলা রাজরাণী হইয়াও নারীসমাজের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য অতি হৃদ্য প্রার্থীরূপে করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোন কোন মহিলা প্রেরণা লাভ করিলে ভোর কীর্ত্তন করিয়া নরনারীর দ্বারে যাইয়া স্বর্গের সুসমাচার দান করেন। এইরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এক অতুল ঐশীশক্তি নারী হৃদয়ে কার্য্য করিতেছে। এদেশের অনেক সহৃদয় মহিলা নারীজাতির শিক্ষা বিস্তার কল্পে এবং গ্রাস আচ্ছাদন জন্য পরপ্রত্যাশী না হইতে হয় এরূপ অর্থকরী শিক্ষা দান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই নব জাগরণ দেখিয়া বড় আশা হয়। সত্য সত্যই এতদিনে "দুঃখের নিশি হলো অবসান।" নরনারীর সমান অধিকার স্রোত সেই ১৮৬৮ সনে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর বেগপ্রাপ্ত হইতেছে। মেরী কার্পেণ্টার হইতে পরবর্ত্তী ইউরোপীয় নারীরা এই স্রোত খরতররূপে প্রবাহিত হওয়ার জন্য কত সহায়তা করিতেছেন। ধন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট। এখন আর ভয় নাই। সকল নারীসমাজ ভগবানকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া নেতা করিয়া অগ্রসর হউন। মহাকালী পাঠশালা,

আর্য্য সমাজের নারীশিক্ষা প্রচারিকাদের কার্য্য, গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত নারীবিদ্যালয়, প্রতি ধর্ম্মসমাজের নারীশিক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নতির চেষ্টা সকলেই সেই বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে তাঁহার লীলা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব বঙ্গনারী বিধাতাকে ভক্তি করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। আপন অধিকার বুঝিয়া লউন।

প্রাচীনা এবং নবীনা।

বিগত চল্লিশ বৎসর সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রতি বিষয়ে যুগান্তর লক্ষিত হয়। সে যুগ নাই, সে ভাব নাই; সে মতিগতি লোকের দেখা যায় না। এ যুগে নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, নব নব মতিগতি প্রবর্ত্তিত। বহির্ব্বাটীতে যেমন পুরুষের, অন্তঃপুরে তেমন স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে অবস্থান্তর উপস্থিত। পুরনারীরা সময়ে সময়ে পাঁচ জন একত্রে এ সকল কথাও আলোচনা করেন।

বঙ্গের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয়াঞ্চলেই পরিবর্ত্তন স্রোত বহমান। আমি পশ্চিমবঙ্গের বিষয় অল্পই জানি। অতএব সে অঞ্চলের বিষয় উল্লেখ না করাই উচিত বোধ করি। পূর্ব্ববঙ্গে আমার জন্ম ও অধিবাস। পঞ্চাশ বৎসর কাল চক্ষের উপরে যাহা ঘটিল তাহার সাক্ষী হইলাম। নারীজাতির গতিবিধি ও অবস্থা বাল্যকালে যাহা দেখিয়াছি, তাহার সহিত অধুনা যাহা অবলোকন করিতেছি তাহার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।

সে সময়ে ভদ্রলোকের সহরে বাড়ী করিয়া বাস করার রীতি ছিল না। ঢাকা নগরে তন্তুবায়, সাহা, পাল প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক, তাঁহাদের গুরু পুরোহিতবর্গ এবং দুই একজন ভদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। চাকরী উপলক্ষে ভদ্রলোকগণ সপরিবারে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। সুবিধা পাইলেই পূজা পর্ব্বোপলক্ষে গ্রামবাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। সুতরাং মেয়েরাও স্ব স্ব গ্রাম্য গৃহে গ্রাম্য সুখ দুঃখ ভোগে রত থাকিতেন।

মেয়েদের লেখা পড়া শিখার রীতি তখন ছিল না। লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয় এ সংস্কার সকল রমণীর মনেই বদ্ধমূল ছিল। মেয়েদের পাঁচ বছর বয়স হইলেই একটা দুটা ব্রতপালন আরম্ভ হইত। পুতুল খেলা, রান্নাবাড়া শিখা, ব্রতপালন কার্য্যে নয় দশ বৎসর বয়স কাটিত। তারপর বিবাহকাল। বিবাহান্তে পতিগৃহে বাস। সেখানে প্রথম দুই এক বৎসর কারাবাসীর ন্যায় ক্লেশে দিন যাইত। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তখন সকল স্ত্রীলোককেই ঘরের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। রান্না, পরিবেশন, বাসন ও স্থান পরিষ্কার নিত্যকর্ম্ম। ধানভানা, চিড়া কুটা, খৈ মুড়ি ভাজা আবশ্যক মত এবং পর্ব্বোপলক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। নারিকেলের নানারূপ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত

করা, পাঁড়ি চিত্র করা আলপনা দেওয়া কোন কোন বিশেষ পর্ব্বে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে করিতে হইত। ঢেঁকি ঘর, মেয়েদের স্নানের ঘাট এবং বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে তরকারী কুটার জায়গা মেয়েদের মন খুলিয়া গল্প করার স্থান হইত। যুবতীগণ ও বৃদ্ধারা সে সব স্থানে নানা ছাঁদে নানা রসের নানারূপ গল্প করিতেন। বালিকারা অনেকে বসিয়া সময়ে সময়ে সে সব গল্প শুনিত; অনেকে বা কোন গাছের ছায়ায় বা ঘরের ছায়ায় খেলা ধুলা ও পুতুলের বিবাহব্যাপারে মত্ত থাকিত।

তখন কদাচিত দুই এক জন মহিলা লেখা পড়া শিখিতেন। লোকনিন্দার ভয়ে অতি গোপনে সে কর্ম্ম মনের আবেগে কেহ কেহ সম্পাদন করিতেন। যখন অধিক বয়স হইত তখন কেহ কেহ রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া স্ব স্ব বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা করিতেন। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কালেও আমার একজন খুল্লপিতামহী লেখা পড়া জানিতেন। তিনি বিবাহের পর সংবৎসর মাত্র সধবা ছিলেন। তাঁর বৈধব্যদশা লেখা পড়া শিক্ষারই ফল এরূপ উক্ত হইত। সৌভাগ্যক্রমে আমি বাল্যকালে তাঁহার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছি। আমার বাল্যকাল গবর্ণমেণ্টের যত্নে অনেকগুলি সারকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল সারকেল স্কুলের শিক্ষকদিগের কাহার কাহারও যত্নে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অভিভাবকগণকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া তখন শিক্ষাদানজন্ম শিক্ষকদিগকে বালিকা সংগ্রহ করিতে হইত।

পুরুষ এবং নারীদিগের মনে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা প্রবল ছিল সে ধর্ম্ম প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম। বারমাসে তেরপর্ব্ব পালনে মেয়েদের খুবই নিষ্ঠা দেখা যাইত। ব্রহ্মপুত্র স্নান, গঙ্গাস্নান, নিত্য সন্ধ্যা পূজা ও আহ্নিক পালন, মালাজপ, প্রাতঃসন্ধ্যা ঠাকুরঘরের দ্বারে প্রণাম করা কোন স্থানে যাত্রাকালে ঠাকুর দর্শন ও নমস্কার অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার ছিল। প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়াই দুর্গানাম হরিনাম ঘরের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বমুখে সূর্য্য নমস্কার সকলেই করিত। নারীগণ নিজেরা ইহা করিতেন, সন্তানগণ ও শিশুবালকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং নমস্কার করাইতেন। এ কর্ম্মে কখন তাঁহাদের ঔদাস্য বা ভ্রম হইত না।

রমণীগণ এদেশে সেকালে সকলেই একখানামাত্র বস্ত্র পরিধান করিতেন। শীতকালে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সামান্য মোটা কাপড় কোন কোন মহিলা শীতনিবারণার্থ ব্যবহার করিতেন। এখনকার মত জ্যাকেট বডি তখন উপহাসের বিষয় ছিল। এ সকলের অস্তিত্ব বিষয়ে এ দেশে স্বপ্নও ছিল না। আমার খুড়া মহাশয় ঢাকাতে স্কুলে পড়িতেন। তিনি পিরাণ গায় দিয়া গ্রামে প্রথম উপনীত হইলে অনেক বৃদ্ধ অভিভাবক তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়াছেন, ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। পুরুষেরা এক রকম মিরজাই এবং সেকেলে আঙ্গারখা ব্যবহার করিতেন। যাহোক মেয়েদের

গহনা পরায় সখ খুব ছিল। সে গহনা এখনকারকালে দেখিলে সভ্য কামিনীগণ অবশ্য খুবই ঠাট্টা করিবেন। কিন্তু তখন সে সকল মোটা মোটা তোড়ল, খাড়ু, কোরবাজু, চন্দ্রহার, বেকী, বাউ এবং অতি মোটা শাঁখা অনেক গরীবেরই অঙ্গের ভূষণ ছিল। ঢাকাই সূক্ষ্ম শাড়ির এত চলন ছিল না। চুণারের এক রকম শাড়ি সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার ছিল। ধনীর ঘরের মেয়েরা বারাণসী শাড়ি, রাশমণ্ডল শাড়ি পরিয়া ধনগৌরব দেখাইতেন।

এখন সেকাল কালের অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে। নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতা দেশের কোণে কোণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয়। নগরে নগরে উচ্চ-শিক্ষা দান জন্য মহিলাদিগের ইংরেজী বিদ্যালয়। শুনিতে পাই সত্বর ঢাকা নগরে বালিকাদিগের জন্য কালেজও সংস্থাপিত হইবে। গ্রামে ঘুরিলে সামিজপরা, কামিজপরা, বডি জ্যাকেট গায়ে দেওয়া অনেক মেয়ে দেখা যায়। সেসব মোটা কাপড়, মোটা অলঙ্কার লজ্জায় কোথায় যে মুখ লুকাইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। ভদ্রমহিলাগণ এখন সহরের ধূল-মাখা বায়ুর খুবই পক্ষপাতিনী। পারতপক্ষে ভদ্রলোক যেমন গ্রামে বাস করেন না, ভদ্র মহিলাও তেমন গ্রামে থাকিতে রাজী নহেন। তবু এ অঞ্চলে অনেক ভদ্রলোকই গ্রামে আছেন। কিন্তু তাঁহাদেরও পূর্ব্ব-ভাবের বহু পরিমাণে তিরোভাব হইয়াছে। লেখা পড়ায় স্ত্রীলোকেরও মনের বিকাশ-সাধন, মনুষ্যত্বলাভ যদিও লক্ষ্য হয় নাই, তবু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা বিবাহ-কার্য্য, প্রিয়জনের সহিত পত্রালাপ এবং গৃহকার্য্যসাধনার্থ অবশ্য করণীয় বোধ হইয়াছে। সেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্ববৎ আস্থা এখন নাই। স্ব স্ব শক্তিতে এবং ধনশক্তিতে এখনকার মহিলাদিগেরও কিয়ৎ-পরিমাণে আস্থা জন্মিয়াছে। দুর্গানামে হরিনামে ও সবিতা দেবতে আর পূর্ব্ববৎ ভক্তি দেখা যায় না। আপন আপন প্রিয়জন এবং বালকগণকেও কোন রমণী নিদ্রা হইতে জাগাইয়া হরিনামাদি করিতে প্রায় বলেন না। শীঘ্র উঠ, বেলা হয়, পড়িতে বোস, মাষ্টার আসিয়াছেন ইত্যাদি কথাই স্মরণ করান হয়। নিরাকার ঈশ্বরের ভজন পূজনে এবং তাঁহার উপাসনা প্রার্থনা ও নাম জপে এ অঞ্চলে কোন কোন মহিলার মন যায়। কিন্তু সে কার্য্যে এখনও তেমন সাহস হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, তাঁহারাও মেয়েরা ও কর্ম্ম করিলে বড়ই উৎপীড়ন ও জ্বালাতন করেন। সুতরাং সে ভয়ে সে কার্য্য করা হয় না। যে ধর্ম্মের খুব জাঁক ছিল তাহা খেলার মত হইয়া পড়িয়াছে। গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মহিলাবর্গ যে সামান্য ধর্ম্মে শ্রদ্ধা রক্ষা করিতেন তাও পাশ্চাত্য-জ্ঞানের সামান্য বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মটি ঢোড়া সাপের মত হইয়াছে। তাহার প্রতি ভয়ও নাই, ভক্তির ব্যবহারও নাই।

সামান্য শিক্ষিতা নারীগণের অবলম্বন

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপন্যাস, নবন্যাস, প্রহসন ও নাটক। ব্রত উপবাস পালি পর্ব্ব অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। শীঘ্রই অবশিষ্ট টুকু শেষ হইবে। নবীনাগণের একটুকুমাত্র অর্থসংস্থান হইলেই, চাকর ব্রাহ্মণ ঘরকন্না তাঁহাদের হাত হইতে কাড়িয়া নিতেছে। পূজা অর্চ্চনা জপাদি সভ্যতা বায়ুতে উড়াইয়া নিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থার যেমন হ্রাস হইয়াছে, পরলোকে আস্থাও তৎসহ কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং কঠোর ব্রতোপবাসে পুণ্য সঞ্চয় ধর্ম্মসঞ্চয়ে যত্ন কেন হইবে? প্রাচীনাগণ অনেকে তীর্থদর্শন সাধুদর্শনে সবিশেষ ক্লেশস্বীকার করিতেন। নবীনারা বায়ু পরিবর্ত্তন ও স্থান পরিবর্ত্তনে অনেকেই যত্নশালা। তাহার লক্ষ্য শরীরের স্বাস্থ্যও শক্তিলাভ। তীর্থপর্য্যটনের লক্ষ্য ছিল পুণ্যলাভ।

নবযুগে কুসংস্কার দূর হইতেছে, সুশিক্ষা ও সুসংস্কার মহিলাদিগের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতেছে। প্রাচীনাদিগের আহ্নিকনিষ্ঠা, পুণ্যলালসা, ধর্ম্মভয়, পারত্রিক সৌভাগ্যলাভে দৃঢ়তা নবীনাদিগের অন্তঃপুর ও অন্তর হইতে যাহাতে দূর না হয় ইহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

হাঁচি পড়িলে, টিকটিকি শব্দ করিলে, ধোপা মহাশয়ের মুখ কোন কার্য্যারম্ভে বা যাত্রাকালে নয়নপথে পড়িলে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইত। এ সকল অতি অশুভ লক্ষণ এবং বাধা বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি ছিল। অপরপক্ষে কোন কার্য্যারম্ভে বা যাত্রাকালে গো দোহন দর্শন ব্রাহ্মণদর্শনাদি শুভসূচক বোধ ছিল। অদ্যাবধি এ সকল সংস্কার একেবারে দূর হয় নাই। যে সকল যুবতীগণ পাশ্চাত্যজ্ঞানের দরজায় দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল সংস্কারের প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছেন। নবীনাগণ আপনারাই বুঝিতে পারেন ওসকল সংস্কার তাঁহাদের আছে কিম্বা নাই।

প্রাচীনাগণ বিলক্ষণ শ্রমপটু, গৃহকার্য্যে দক্ষ এবং পাককার্য্যেও পটু ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম অতিথিকে দেবতুল্য বলিয়াছেন। প্রাচীনাগণ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যাগতব্যক্তি এবং অতিথিদিগের সেবা করিতেন।

নবীনা শিক্ষিতা মহিলারা শারীরিক শ্রমবিমুখ, পাক কার্য্যে অলস এবং অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া উঠিতেছেন। আমরা বাল্যকালে হিন্দুর গৃহে বিবাহাদি ব্যাপারে ও পুরনারীদিগকে বহু লোকের পাককার্য্য পরিবেশনে চারি পাঁচদিন ব্যাপিয়া সমুৎসাহে রত থাকিতে দেখিয়াছি। এখন পঁচিশ ত্রিশজন লোককে আহার করাইতে হইলেও একটি পাচকের সন্ধান দেখিতে হয়। প্রাচীনাদিগের শ্রমশীল দেহ যেমন বলিষ্ঠ ও নিরোগ লক্ষিত হইত নবীনাদিগের বিশ্রাম সুখলোলুপ দেহ তেমন দুর্ব্বল ও রোগ নিকেতন বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীনাদিগকে উপবাস ব্রতে উৎসাহিত দেখা যাইত; নবীনা উপবাসের নামে শশঙ্কিত। অনেক নবীনা রমণী গৃহে শোক হউক দুঃখ হউক বা রোগ যন্ত্রণা উপস্থিত থাকুক, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃকালে এক পেয়ালা গরম চায়ের যোগাড় করি-

বেনই করিবেন। চা পান নবীন সভ্যতার মানদণ্ড। সভ্যতার সঙ্গে ইহাকে গৃহে বরণ করিয়া লইতেই হইবে। প্রাচীনাগণ এ প্রকার দৃঢ়সংস্কার বিবর্জ্জিতা, এ কথাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

প্রাচীনাদিগের অনেকের চিন্তাশক্তি এবং হিতাহিত বোধশক্তি বলবতী ছিল, কিন্তু অনেকে মিথ্যার প্রতি তত্টা বীত রাগিণী ছিলেন না। নবীনাগণ নব্য-শিক্ষার সহিত সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সকল বিষয়ে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ অবশ্যই লাভ করিতেছেন। কথাতে ব্যবহারে ভাবে ও চিন্তায় নবীনাদিগের সত্যের প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। বাস্তবিক তাহা হইতেছে কি না নবীনা শিক্ষিতা মহিলা নির্জ্জনে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমরা নবীনাদিগের চিন্তা আকর্ষণ জন্য প্রাচীনা এবং নবীনা স্বদেশবাসিনী নারীসমাজের অবস্থার বিষয় কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। প্রাচীনারা এখনও নিঃশেষ হয়েন নাই। প্রাচীন রীতি নীতি অদ্যাপি অস্মদ্দেশে বিরাজ করিতেছে। নবীনারা এখনও সমস্ত দেশ অধিকার করেন নাই। এই সন্ধিকালে প্রাচীনাদিগের মধ্যে যাহা কল্যাণজনক ছিল তাহা যত্নের সহিত রক্ষার উপায় করা উচিত। নবাগত আচার ব্যবহারে যাহা অশুভজনক বিবেচিত হয় তাহা যাহাতে সমাজমধ্যে প্রবেশের পথ না পায় সকলের দ্বারা তাহা পরিবর্জ্জিত হয়, তচ্চেষ্টা নবীনা শিক্ষিতা চিন্তাশীলা মহিলাবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনৈক পূর্ব্ববঙ্গবাসী।

ভূতের ভয়।

ভারতবর্ষে ভূতের ভয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক প্রদেশে, সমভূমিতে কি পর্ব্বত-শিখরে, সভ্যাসভ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের নিকট "ভূত" নাম বিদিত আছে। সর্ব্বত্র প্রাচীনা স্ত্রীলোক, ভূতের গল্প যথেষ্ট জানেন। বালক বালিকাগণ পিতামহী মাতামহী প্রভৃতির নিকট ভূতের নানারূপ অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভয়ে আড়ষ্ট হয়। প্রত্যেক গ্রামে বড় বড় গাছ, পুরাতন পরিত্যক্ত বাড়ী, রাস্তার তেমাথা চৌমাথা এবং পচা জল জঙ্গলাকীর্ণ পুকুর বা জলাভূমি ভূতের আবাস। এ তত্ত্ব বোধ হয় গ্রামগুলিতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই রাখেন। আমরা বালককালে যখন গ্রামে থাকিতাম তখন অনেক স্ত্রীলোককে ভূতগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছি। অনেক পুরুষকেও অন্ধকার রাত্রিতে একাকী গ্রাম্য-পথে চলিবার সময় ভূতে নানারূপ উৎপাত করিয়াছে এরূপ শুনিয়াছি। কত আগ্রহে কত ভয়ে ভয়ে যে সে সকল গল্প শুনিয়াছি তাহা মনে এখনও জাগ্রত আছে। কোন কোন ভূতগ্রস্ত স্ত্রীলোকের ভূত ছাড়াইতে ওরূপ কত যে কাণ্ড কারখানা হইয়াছে তাহা মনে হইলে অদ্যাপি হাসি পায়। যে বাড়ীর কোন স্ত্রীলোককে দৈবাৎ ভূতে পাইত সে বাড়ীতে কয়দিন গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া সে রমণীর বিচিত্র হাসি কান্না, অপূর্ব্ব কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের তামাসা দেখিত ও শুনিত। এখন সেরূপ প্রায়

শুনা যায় না। অথবা সকল গ্রামের বিষয় আমরা জানি না। আমাদের গ্রাম্য পাঠিকাগণ এখনও ভূতে ধরার তামাসা দেখেন কি না তাঁহারাই জানেন। ইংরেজদিগের শাসনে দেশের দস্যু তস্করাদির প্রাদুর্ভাব যেমন বহু পরিমাণে দূর হইয়াছে, পশ্চিমদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের পরাক্রমেও তেমন ভূতের ভয় এ দেশে কমিয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে বালক ও বালিকাগণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সে সকল পাঠশালায় ভারতের বালক বালিকাগণ জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অজ্ঞানতা ও মিথ্যাভয় কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত হইতেছে। এ সকল ভাবিলে আহ্লাদ হয়। যে রাজশাসনে এবং যাঁহাদের বিধানে দেশে এরূপ জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহাদের প্রতি আনন্দের সহিত কত কৃতজ্ঞতা অন্তরে উপস্থিত হয়।

ভূতের কথা কি একেবারেই মিথ্যা? ভূতের ভয়ের কি সত্যতঃ কোন মূল নাই? ভূত বলিতে পূর্ব্বে প্রেতাত্মা বুঝা হইত। প্রেতাত্মাগুলি মানুষের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করে এই অযথা সংস্কার আবাল বৃদ্ধ সকল লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। প্রেতাত্মার উৎপাত মিথ্যা এ কথা এখন অনেকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভূতকে ভয় না করিয়া পারা যায় না। যথার্থ ভূত কি? জল, বায়ু, অগ্নি, মাটি এবং আকাশাদি প্রকৃত ভূত। জলপ্লাবন ও বন্যা হইয়া, ঝড় তুফান তুর্ণড উঠিয়া বজ্রপাত হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে; গৃহে অগ্নিসংযোগে সর্ব্বনাশ স্থানে স্থানে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত ভূতের বিবিধ অত্যাচারে যেমন জনপদ সকল পীড়িত, তেমন অল্পাধিক পরিমাণে লোকগণ ভূত-ভয়-গ্রস্ত। হিন্দুর শাস্ত্রে লিখিত আছে "ভৈরবো ভূতনাথশ্চ" অর্থাৎ মহাদেব ভূত সকলের অধিপতি। সুতরাং ঐ সকল ভূতের ভয়ে মহাদেবের শরণ লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সকল দেবতার অধিপতি পরমেশ্বর ভূতনাথ। তিনি এ সমস্ত ভূত লইয়া অহোরাত্র ভবলীলা প্রকাশ করেন। মনুষ্য ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান শক্তি মনুষ্যকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন। কাজেই মনুষ্য ক্রমে ভূতগণের শক্তি সামর্থ্য বিজ্ঞান-বলে অবগত হইয়া আপনার কার্য্য সৌকার্য্যার্থে ভূতগণকে ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতেছে। ভূতগণ অধুনাতনকালে মানবের ভৃত্য হইয়াছে।

আমরা বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছি যে, কোন গৃহস্থের গৃহে একটী ভূত ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ভূতগণ নিরলস। বিনাকর্ম্মে কখন কালযাপন করে না। ভূত গৃহস্থকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইয়াছিল যে সতত তাহাকে কাজ দিতে হইবে। যে দিন কাজ না পাইবে সেদিনই সে চলিয়া যাইবে। গৃহস্থ ভূত ভৃত্য রাখিয়া বড় মুস্কিল বোধ করিতে লাগিল। এক দিন আর কাজ দেখিতে না পাইয়া গৃহিণী আপনার ছেলেটিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার হুকুম দিলেন। ভূত, পুকুরে ছেলে নিয়া ঘাটে আছাড় দিয়া দিয়া ছেলের নাড়ী বাহির করিল, এবং নাড়ীর ভিতর-

কার ময়লাগুলিও পরিষ্কার করিল। বেশ সার্প করিয়া চালের উপরে ছেলেকে রৌদ্রে শুকাইতে দিল। আবার গৃহিণীর নিকট কাজ চাহিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন ছেলে কোথায়? ভূত বলিল ঐ যে ছেলেকে ধুইয়া রৌদ্রে রাখিয়াছি। গৃহিণীরত ছেলে দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল। ভূত ছেলেকে আছড়াইয়া একেবারে মারিয়া ফেলিয়াছে। গৃহে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিল। ভূতকে আর কাজ কে দেয়? ভূত কাজ না পাইয়া অমনি সে গৃহ ছাড়িয়া গেল। গৃহস্থের ছেলে মরিল, ভূত-ভৃত্যের হাত ছাড়াইলেন। এত অলীক কথা। সত্য সত্যই এখন বায়ু বারি ও বহ্নি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যোদ্ধারে দাসাপেক্ষা অধিক অনুগতভাবে সংসারে আমাদের কার্য্যসাধন করিতেছে।

বাষ্পীয় শকট চালন, তাড়িত বার্ত্তাবহন, তৈল এবং বস্ত্রাদি প্রস্তুতি, ভূতগণ নিত্য নির্ব্বাহ করিতেছে। লোকের আহারীয় বস্তু রন্ধন এবং আলোকদান, ভূতেরই কর্ম্ম। বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভূততত্ত্ব বিস্তার ও প্রচার করিতেছে। ভারতের গৃহিণী এবং কন্যাগণ ভূততত্ত্ব অবগত হউন, মিথ্যা ভূতভয় দূর হইবে, ভূতের শক্তি এবং তাহার ব্যবহার জানিতে সক্ষম হইবেন। ভূতভাবন ভগবানের কি অপার মহিমা ও পরাক্রম, মানবসন্তানের প্রতি ভূতবিষয়ক জ্ঞান বিধানে ঈশ্বরের কত স্নেহ করুণা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও অনায়াসে তাঁহারা অনুভব করিবেন। যথার্থ ভূত-তত্ত্ব-জ্ঞানে ভারতমহিলাগণের মনে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইবে।

ঢাকাতে ব্রাহ্মমহিলাবর্গের একটি সমিতি আছে। সেই সমিতির মহিলা-সভ্যাদিগকে অত্রত্য কালেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বি, এন্, দাস মহোদয় বিগত ১৫ই ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্নকালে কালেজের বিজ্ঞানশিক্ষার পরে যন্ত্র সাহায্যে "বায়ুমণ্ডল" বিষয়ে বিবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। বায়ুর চাপ, বায়ুর অগ্নি প্রজ্বলনে সহায়তা, বায়ুর মৌলিক উপাদান কি কি, তাহা সুন্দররূপে দাস মহাশয় মহিলাগণকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। মহিলাগণ ভূতশ্রেষ্ঠ পবনরাজের সম্বন্ধে এরূপ উপদেশ শ্রবণে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আত্মমর্য্যাদা।

আপন সম্মান রক্ষার্থে প্রত্যেকে স্বয়ং যত্নশীল থাকিবে। এ বিষয়ে পুরুষ নারী উভয়েই সমান। মহিলাদিগের মান সম্ভ্রম পরিবার ও সমাজের গৌরবজনক। কোন পরিবারে বা সমাজে সম্ভ্রম রক্ষা করিতে বা পূজালাভে যদি রমণী অসমর্থা হয়েন, সে পরিবার ও সমাজের অকল্যাণ ঘটে। গৃহ পরিবারের মঙ্গলার্থিনী ললনাকুল মানবকুলের অমঙ্গল নিরাকরণার্থ সতত আত্মমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পবিত্রতা মর্য্যাদার হেতুভূত। এ জন্য হৃদয়ে, মনে, বাক্যে ও আচরণে কাহারও পুণ্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ

অবলা নারীকুলের পুণ্যই যেমন ভূষণ তেমন বল। শারীরিক এবং মানসিক বলে পুরুষজাতি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কিন্তু পুণ্যবলে অবলা নারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা দেখিতে পাই হিন্দুসমাজে দেবী ভগবতীর পদতলে মহাপরাক্রান্ত অসুর ও সিংহ বিলুণ্ঠিত হইতেছে। বাস্তবিকই নারীর পুণ্যশক্তির চরণে পাশব এবং মানবশক্তি চিরাবনতী নারীজাতির অন্তঃকরণে এ চিত্র নিরন্তর অঙ্কিত রাখা আবশ্যক।

পুণ্য অপরাজিতা শক্তি। প্রেম সর্ব্ব-সংরক্ষণী শক্তি। নারীজীবনে মণি কাঞ্চন তুল্য প্রেম-পুণ্য-শক্তি সম্মিলিত। আত্ম-দানে মহিলাসমাজ জনসমাজকে পরিরক্ষণ এবং পরিপোষণ করিতেছেন। গৃহিণী এবং জননী ভিন্ন কোন্ গৃহ এবং গৃহস্থ জীবন রক্ষায় সুক্ষম? সুতরাং নারীর অধিকার এবং আধিপত্য অসাধারণ। সুশিক্ষিতা নারীগণ এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিলে সকলেরই কুশল হইবে। হিন্দুশাস্ত্র নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তার জন্য অনু-শাসন করে। নারীদিগের স্ব স্ব হিত চিন্তার সহিত জগতের হিতও জড়িত আছে। অতএব রমণীগণ যেমন দশ হস্ত হইয়া সংসারের দশদিক রক্ষাকার্য্যে অব-হিত হইবেন, নির্জ্জনে নানাবিষয়িনী হিত-চিন্তাকার্য্যেও যেন তেমনই মনোযোগী হয়েন। চিন্তার পবিত্রতা, ভাবের পবি-ত্রতা অন্তরে বদ্ধমূল হইলে, কার্য্যে ও আচরণে তাহা অবশ্য প্রকাশ পাইবে।

প্রেমই রসস্বরূপ। যিনি প্রেমিকা তিনি রসিকা। কিন্তু রসিকতা ও প্রেম-লীলা যদি নারীদিগের চিত্তের লঘুতাসাধন করে তাহা অতি দুঃখজনক। প্রেম আছে বলিয়া রমণীগণ অসামান্য ধৈর্য্য-সহকারে আশ্রিতদিগের বিবিধপ্রকার সেবা করেন, সকলকে আমোদ আহ্লাদ বিতরণ করিতে পারেন; এবং দুঃখ ক্লেশ নীরবে আপনি বহন করেন। প্রেমের সহিত পুণ্য রক্ষা করিয়া যাহাতে কেহ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে না পারে, প্রত্যেকে আপনার প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, নারী-গণের সদা সাবধানে তাহাই করা বিহিত। যে নারী অপরের ন্যায্য মর্য্যাদা রক্ষা না করে, অপরের পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত না থাকে, সে নারী আত্মমর্য্যাদা বা আপ-নার জীবনের প্রতিও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে অসমর্থা হইয়া থাকেন। মনুষ্যজীবন পরস্পরের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত। এ জন্য ঈশ্বর তনয় ঈশা উপদেশ করিয়াছেন "অপর হইতে তুমি যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি তুমি সেরূপ ব্যবহার কর।" এ অতি গভীর তত্ত্ব। অন্য লোক আমাদেরই ছায়ার ন্যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি তোমার ছায়ার প্রতি যাদৃশ আচরণ কর, ছায়াও তোমার প্রতি তাদৃশ আচরণ করে। অন্যের পবিত্রতাদি চরিত্রগুণের এবং মনুষ্যত্বের সংবর্দ্ধনা করাও রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। পরছিদ্রান্বেষণ ও পর-দোষোদ্ঘাটন কার্য্য আত্মাবমাননার মধ্যে পরিগণিত। যে নারী অপরের দোষ খোঁজে ও বলে, সে অতি লঘুহৃদয় হইয়া

পড়ে। তাহার পুণ্য রক্ষা পায় না, এবং তাহার প্রেম ও কৃতছিদ্র পাত্রসদৃশ হয়। যে নারী আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণে যত্নবতী সে নারী উল্লিখিত দুইটি দোষ অবশ্য ত্যাগ করিবেন।

সকল আত্মাতে পরমাত্মা বিরাজিত। সকল আত্মাতে থাকার জন্য পরমাত্মার অন্য নাম সর্ব্বাত্মা। সর্ব্বাত্মা পরমাত্মার প্রতি মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা করাও গুরুতর শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যতদিন এ শিক্ষাটি প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, ততদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য বা পূর্ণতা সম্পাদিও হইতেছে না। এ দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাকার্য্যদ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো প্রসারিত হইতেছে ; কিন্তু তদ্দ্বারা মোহান্ধকার হইতে রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য। যাহাতে মানুষের প্রধান রিপু অহঙ্কার বিনাশ পায় তাহা পরমাত্মার প্রতি আস্থা এবং উপযুক্ত সম্মাননা শিক্ষাদ্বারা সিদ্ধ হয়। নরগণ দেবতার প্রতি ভক্তিবিহীন শিক্ষা পাইয়া দুঃখী হইতেছে। নারীগণ যেন দেবত্বে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দেবী হইবার যোগ্যা হইতে পারেন। যে সকল নারী পরমদেবেতে মর্য্যাদাস্থাপন করেন তাঁহারাই বাস্তবিক আত্মমর্য্যাদা অবগত হন।

মনুষ্যের স্বাধীনতা এবং মর্য্যাদা একই পদার্থ বলা যায়। আপনার স্বাধীনতা যিনি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে শিখেন তিনি আত্মসম্মানও রক্ষা করিতে শিখেন। একটু চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমরা জীবন রক্ষার জন্য পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য। পরমুখ পানে এতটা তাকাইয়া আত্মস্বাধীনতা এবং সম্মানরক্ষা দুরূহবোধ হয়।

ঈশ্বরের রাজ্যে পরস্পর বিসদৃশ অনেক ব্যাপার সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। উপরিউক্ত পরমুখাপেক্ষিতা এবং স্বাধীনতা ও সেইরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। মুখাপেক্ষাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। যাঁহারা নিঃস্বার্থতার সহিত সেবাধর্ম্ম প্রাণপণ প্রতিপালন করেন, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বিষয় সুকৌশলে যোজনা করিয়া থাকেন। যাঁহাদের পরমাত্মাতে আস্থা সম্ভ্রম থাকে, তাঁহারা ইহাই পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করেন। এ জন্য তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইলেও নীচ হইতে হয় না। তাঁহারা স্বীয় স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জগতের সেবা এবং অন্যের প্রতি সম্ভ্রম রক্ষাকার্য্যে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এ প্রকার শ্রদ্ধাস্পদা মহিলাদিগের চরিত্র কাননে আত্মমর্য্যাদারূপ মনোহর কুসুম ফুটিয়া উঠে।

মহিলার রচনা।

মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(নীতিবিদ্যালয়ে পঠিত।)

বিশ্বপতি পরমেশ্বর জগতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, নদনদী, বৃক্ষলতাদি সৃজন করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে একটী চিত্রের ন্যায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎপতি জগদীশ্বর মনুষ্যকে প্রাণীজগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য যে কেবল সুখাদ্য

আহার এবং সুন্দর ভূষণ পরিধান করে বলিয়া প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে; তিনি মনুষ্যের মধ্যে এমন শক্তি সকল দান করিয়াছেন যে তাহারা সেই সকল শক্তির পরিচালনা করিতে পারে বলিয়া অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জীবনকে তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, সেবা, বিনয়, ভক্তি. প্রেম দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত করিয়াছেন। ভূমণ্ডলে মনুষ্য তাহাদ্বারাই জ্ঞানানুশীলন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে সক্ষম হয়।

তিনি মনুষ্যের নিকট উচ্চ আদর্শস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা ও তাঁহার উপাসনা করিলে মনুষ্যত্বলাভ করা যায়। ইন্দ্রিয় সংযম মনুষ্যত্বলাভের প্রধান সোপান স্বরূপ। মনুষ্যের আত্মা আছে তাহা দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব এবং পরোপকার, পরদুঃখ মোচন প্রভৃতি সৎকার্য্য সকল করিতে সক্ষম হয়, এবং আত্মাদ্বারা পরমপিতা পরমেশ্বরের তত্ত্ব সকল অবগত হয়, এই সকল কারণে মনুষ্যকে সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশ্বপতি ভগবানের অসীম করুণায় আমরা এই শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করিয়া কত সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি তাহা বলা যায় না। মনুষ্যজীবনে ভগবানের অনন্তলীলা ও মহিমা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার এই অনন্ত করুণার জন্য তাঁহারি চরণে অবনত মস্তকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

সুনীতি কলেজ
কুচবিহার।
৫।২।০৯
} বিধাননন্দিনী মজুমদার,

সংবাদ।

নিজাম হাইদারাবাদে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু "নব্যভারতের ভাব" বিষয়ে একটী বক্তৃতা তথাকার ইনিষ্টিটিউটহলে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে ভারতময় একটা নবজাতীয় জাগরণ হইয়াছে। উপযুক্ত নেতৃত্বে অধীনে চলিলে ভাবি সুফল নতুবা নেতৃত্ব দোষে ভয়ঙ্কর অরাজকতায় ভয়ানক অনিষ্ট হইবে।

গত ৭রা মার্চ ১০নং হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীটে মুসলমান রমণীগণ পর্দ্দার ভিতরে লেডি মিণ্টোকে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে কোচবিহারের মহারাণী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী. নাটোরের মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং ইউরোপীয় মহিলাগণও উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের সম্মিলন অতি শুভলক্ষণ। আমরা মাননীয়া মিসেস্ কে, এ, জাহিদ সুহ্রাদিকে এই জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করি। এতদুপলক্ষে লেডি মিণ্টোকে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হয়; এবং রাজপ্রতিনিধিপত্নীর প্রত্যুত্তর অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি এ দেশীয় নারীবৃন্দের এরূপ সম্মিলন বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান বলিয়া সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন।

পুর্ণিয়া হইতে আচার্য্য মাতার জীবনী-যিনি মহিলাতে লিখিয়া পাঠাইতেছেন

তিনি এরূপ লিখিয়াছেন। "মহিলার একটি ভুল শোধরাইয়া দিবেন।"

"মহিলার ১৭৩ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে ২৩ লাইনে বাহির হইয়াছে—আমি ওদের জন্য রোজ ৫০।৬০ টাকা উপরি আনিতেছি, সেই স্থানে ৫০।৫০ টাকার উপর রোজকার করিতেছি হইবে। তাঁহার মাহিনা দেড় হাজার দুই হাজার ছিল।"

১৭২ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ১৯ লাইনে 'ছড়ি' না হইয়া 'ছুরি' দিয়া হইবে।

প্রেরিত।

জীবের বন্ধু অনন্ত জীব-জীবন।

মহিলাগণ,

তোমরা আমার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ কর। তোমাদের কোন দেহ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে "জীবের শত্রু জীবাণু"। সেই সকল জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাহারা শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক নানারূপ ভীষণ ব্যাধি উৎপাদন করে। একবার সেরূপ ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিলে, দেহ রক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়। এই সকল জীবাণু চিকিৎসকদিগের ব্যাধি বিনাশের সর্ব্বপ্রকার যত্ন বিনষ্ট করিয়া রোগীকে পরলোকে পার করিয়া দেয়। চিকিৎসকগণ ঐ সকল দেহনাশক জীবাণুর ভয়ে অতি শঙ্কিত। সুতরাং তোমাদিগকেও সেই জীবাণুর ভীষণ পরাক্রমের তত্ত্ব দিয়াছেন এবং তাহারা যেন আক্রমণ বা শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য তোমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তোমাদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া একপ্রকার সাধ্যাতীত। চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কর্ণে তাহাদের পদ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সতত অণুবীক্ষণ হাতে করিয়া তাহাদের যাতায়াত লক্ষ্য করা ও অসম্ভব। অতএব ঐহিক জীবনের পরম শত্রু জীবাণুর জ্ঞান পাওয়া কিংবা না পাওয়াতে কিবা লাভ কিবা ক্ষতি আমি তাহা ভাল বুঝিলাম না। যাহা হউক আমি একটা তত্ত্ব তোমাদিগকে দেওয়া অতি আবশ্যক বোধ করিলাম। তোমরা সে তত্ত্ব পাইলে নিশ্চয়ই কিছু লাভ করিবে এরূপ বিশ্বাস করি। বক্তৃতা শক্তি আমার তেমন নাই। এ জন্য "মহিলার" কলেবরে আমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এবং "মহিলার" গ্রাহিকাগণ আমার প্রকাশিত তত্ত্ব অন্তরে অনুধাবন ও পরিগ্রহ করিতে যত্ন করিবেন।

জীবাণু অতি ছোট। তাহার মন ছোট, কর্ম্মও ছোট। তাহার জাতি ছোট, ধর্ম্মও ছোট। আমাদের দেশে অসভ্য বর্ব্বর ও মন্দলোককে "ছোট লোক" বলে। "ছোট লোক" কথাটি একটা গালি। কেহ অপকর্ম্ম করিলে, হেয় অপরাধ করিলে তাহাকে অবজ্ঞার সহিত

"ছোট লোক" বলা হইয়া থাকে। যে জীব ছোট হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম লক্ষ্য ও অভিপ্রায় খুব ছোট হইবে ইহা স্বাভাবিক। সহস্র সাবধান হইলেও জনসমাজে ধনী মানিরা যেমন দস্যু তস্করে অপকর্ম্মজনিত অপচয় গ্রস্ত প্রায়শঃই হইয়া থাকেন, তেমন ছোট জীবের ক্ষুদ্রাশয় জাতশত্রুতার হাত এড়ান তোমাদের ও ক্ষমতার বহির্ভূত। অতএব তোমরা সে ভয় ত্যাগ কর, সে চিন্তা মনে স্থান দিওনা। ক্ষুদ্রেরা ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে থাকুক।

তোমরা একটি মহাতত্ত্ব শ্রবণ কর। জীবের বন্ধু অনন্ত জীব-জীবন। ইনি সকল জীবনে সতত বিচরণ করিতেছেন। ইনি মহান্। পরন্তু ইনি অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিন্তু ইহার আশা মহৎ। তোমাদের সকলে যাহাতে অনন্তজীবন লাভ করিতে পার, মৃত্যুর নিকট বদন যাহাতে কোন কারণে তোমাদের দেখিতে না হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহাকে সকলেই দেখিতে পায়। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের সঙ্গেই সেই অনন্ত জীব-জীবন স্থিতি করেন। জীবাণু যেমন শত্রু সেই অনন্ত জীব-জীবন তেমন বন্ধু। সকলেই তাঁহাকে বন্ধু বলিবার অধিকারী।

জড়, উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী এবং মনুষ্য নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গেই সেই বন্ধু মিশিয়া আছেন। অথচ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কেহ নষ্ট করিতে পারে না। কেহ আপনার সঙ্গে তাঁহাকে মিশাইতে সক্ষম নহে। সকলের রঙ্গে সর্ব্বপ্রকার রসে তিনি সদা খেলা করিতেছেন।

মৃত্যু এ ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র সঞ্চরমান রহিয়াছে। মৃত্যুকে দূর করিবার জন্য তিনি অমৃত নাম ধরিয়া মৃত্যুর সহিত নিয়ত সংগ্রাম করেন। অনন্ত জীবজীবন সততই জয়যুক্ত হইতেছেন। তাঁহার করধৃত বিজয়পতাকা কাহারও কাড়িয়া লইবার শক্তি নাই। মৃত্যুই সংসারে মরিতেছে। অমৃতস্বরূপ অনন্তজীব-জীবন বন্ধুর থাকা জন্য তোমাদের কাহার মৃত্যু নাই। সুতরাং মৃত্যুকে আর ভয় করিও না। তোমরা যে শুনিয়াছ জীবাণু তোমাদের শত্রু। তাহা সত্য হইলেও কোন ভয় নাই। কেন না বন্ধু বড় পরাক্রান্ত। বন্ধু তোমাদের ক্ষুদ্র নহেন, মহান্. মৃত্যুর উপরে অমৃতের চিরদিনই জয়।

তোমাদের নিকট এই তত্ত্ব আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইতেছে কি না তাহা আমার জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা তোমাদিগকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তোমরাও উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ কর জানিয়া আমার ন্যায় মূর্খের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ও তোমাদের সুকোমল চিত্তকে উপহার দিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইল। সেজন্য আমি এই চেষ্টা করিলাম। ফলাফলের চিন্তা আমার নহে। সকলের যিনি বন্ধু তাঁহারই হাতে সে ভার।

তোমাদের ক্ষুদ্র জীবের ভাবনা ছাড়; অনন্ত জীবনের ভাবনা মনোমন্দিরে গ্রহণ কর এই মাত্র বিনীত অনুরোধ।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

মানবের দায়িত্ব। *

ব্রহ্মান্বেষণের জন্য গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প সেই সংসারবিরাগী মহাপুরুষের গৃহত্যাগ কাহিণী আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। সদ্যজাত মাতৃহীন সন্তান সম্মুখে উপবিষ্ট কর্ত্তব্য বিমূঢ় পুরুষ খড়ের চালের বাতা হইতে একটি টিক্‌টিকির ডিম মেজেতে পড়িয়া বিখণ্ডিত হইতে দেখিতে পাইলেন, আরও দেখিলেন অমনিই নবজাত টিক্‌টিকি শিশু আবরণ হইতে বহির্গত হইবামাত্র নিকটস্থ মশক গলাধঃ করিয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। সন্দিহান মানব বিধাতার হাতে অসহায় শিশুর ভবিতব্য রাখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহার কিন্তু ভাবিবার অবসর হইল না যে, যে বিধির নিয়মে সদ্যজাত টিক্‌টিকি শিশু পূর্ণাবয়ব ও সমর্থবান্ সেই বিধাতার আদেশেই সদ্যপ্রসূত মানব শিশু সহায়হীন ও নিষ্ক্রীয় মাংসপিণ্ড। জীবরাজ্যে শৈশবের পরিমাণ—জাতির হিতৈষণা বৃত্তির পরিমাপক। যে শ্রেণীর জীবের শৈশবকাল অর্থাৎ সহায়হীন অবস্থা যত কম, সেই শ্রেণীর জীবের দয়াবৃত্তি সেই পরিমাণে অল্প। অন্য কথায় বলিতে গেলে মানবের সুদীর্ঘ শৈশবকাল মানবের সন্তান বৎসলতার জনক। সন্তান পালন, সন্তান শিক্ষা, সেই হেতু মানবের বিধিনিয়োজিত অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বা স্বভাব। আর এই বিধি কেবল মানবজাতিতেই নিবদ্ধ নহে। এই স্বভাব বা ধর্ম্ম অল্প বিস্তররূপে অন্যান্য প্রাণীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্তনপায়ী জীবগুলিতে ইহার বিশেষ প্রভাব, সেখানেই মাতৃস্নেহের অসীম পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পাখীদের মধ্যেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব পাখীগুলির ছানা পূর্ণাবয়ব ও সক্ষম হইয়া ডিম হইতে বাহির হয়, তাহাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। আর যেখানে ডিম হইতে বাহির হইয়া শিশুর চক্ষু ফোটে না, পাখা উদ্গম হয় না, সেখানে সন্তান বৎস তো শিশুর অসহায়তার অনুপাতে বিদ্যমান। জীব রক্ষার জন্য জীব হৃদয়ে এই বৃত্তির উন্মেষ বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি বিধাতার বিধান। শৈশবের দীর্ঘতার সঙ্গে জীবের সহজ জ্ঞান (Instinct) এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের (acquired knowledge) আর একটা বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে জীবের শৈশবকাল যত দীর্ঘ তাহার ব্যক্তিগত শিক্ষালব্ধ জ্ঞান গ্রহণের শক্তি (educability) সেই পরিমাণে অধিক অন্যদিকে যে জীবের শৈশবকাল যত কম তাহার জন্ম জাত স্বভাব লব্ধ (Instinct) জ্ঞানের পরিমাণ তত অধিক। যে জাতীয় জীবের ব্যক্তিগত জ্ঞানার্জ্জনে বেশী ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদের স্বভাবলব্ধ জন্মজাত (Instinct) জ্ঞানের পরিমাণ তত অল্প। তাই যেন মনে হয় মানুষ ব্যক্তিগত উপার্জ্জিত জ্ঞানের মাত্রা বাড়াইতে যাইয়া স্বভাবলব্ধ জন্মজাত জ্ঞানের

পরিসর কমাইয়াছে। এই কথাটাই একটু অন্য রকম করিয়া বলিতে পারা যায় যে আমরা স্বকীয় জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি পরিসর বাড়াইবার প্রতিরূপ স্বরূপ আমাদের স্বভাব লব্ধ জ্ঞান (Instinct) অনেক হারাইয়াছি। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে ইহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিধানে যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য মানবদেহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বুঝি এই প্রাকৃতিক নিয়মে একটি রূপক মাত্র (attem) কল্পনা এই Instinct হারাইয়া আমরা আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার পরিসর বাড়াইয়া বিধি নিয়ম গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে নিজদিগকে বাধ্য করিয়াছি। এই দায়িত্বের হাত হইতে এড়াইবার আমাদের কোনও পথ নাই। এই বিধিনিয়ম নির্ণয় করা মানবের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রধান ধর্ম্ম। ইহার অনুশীলনে উন্নতি, উপেক্ষায় পতন মৃত্যু। এই বিধি নিয়ম নির্ণয় করার আর এক নাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা। কাজেই এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা বিধিলিপী পাঠ স্ত্রী পুরুষ অভেদে মানবের বিধি নিয়োজিত ধর্ম্ম। তবে অবস্থা ও সময় হিসাবে যেখানে সাক্ষাৎভাবে এই আলোচনার সম্ভাবনা নাই সেস্থলে প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ম অধ্যয়নে যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহাদের যত্নলব্ধ সত্যগুলি পরোক্ষভাবে অবগত হওয়ার চেষ্টা সর্ব্বোতোভাবে প্রয়োজনীয়। মানুষ প্রকৃতির বিধি নিয়মের সম্পূর্ণ অধিন একথা বলায় ইহা প্রমাণ হয় না যে মানবের উৎপত্তি অন্ধ আকস্মিক (Blind chance) ঘটনার ফল। বরং ইহাই প্রমাণ হয় যে মানবের উৎপত্তি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিধিলিপীর ধারাবাহিক প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল।

কিন্তু সভ্য মানবমণ্ডলী প্রকৃতি নিয়মের বিরুদ্ধে বা উপেক্ষায় কার্য্য করিতে করিতে নিজের সম্পদে এবং নিজের গৃহ পালিত জীবাদির সম্বন্ধে এমন একটা অঘটন ঘটাইয়া ফেলিয়াছে যে হয় তাহাতে চতুস্পার্শবর্ত্তী অবস্থা ও ঘটনাবলীর পুঙ্খানু পুঙ্খ অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা ইহা দেখিতে আয়ত্বাধীন করিতে হইবে নতুবা গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়া ও যাহারা অন্যমনে ও অর্দ্ধ অবহেলার সহিত বৃহৎ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে তাহাদের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। জীবরাজ্য যে সুনিয়মে চলিয়া আসিয়াছে মানব নিজের দায়িত্বে প্রকৃতি জননীর সেই সকল সুনিয়মকে ওলট পালট করিয়া দিয়া হয়ত নিজের হাতে দুই একটি ক্ষমতা বা অধিকার দেখিতে পাইতেছে কিন্তু তাহার সেই বিরুদ্ধাচারে চতুর্দ্দিকে নানারূপ অজ্ঞাত ও অত্যন্ত বিপদ ঘেরিয়া আসিতেছে পালাইবার পথ নাই যো নাই দ্বিধা করিবার বা পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভবনা নাই প্রকৃতিজননার নিয়ম অবগত হওয়া, বিধিলিপী অধ্যয়ন করিয়া অগ্রসর হওয়াই এক মাত্র পথ। প্রাকৃতিক এ নিয়মগুলি বুঝিবার জন্য ও বুঝাইবার জন্য আমাদের একটা বিশেষ প্রয়াস হওয়া প্রয়োজন।

---

* ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১০৯ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরীর বক্তৃতা।
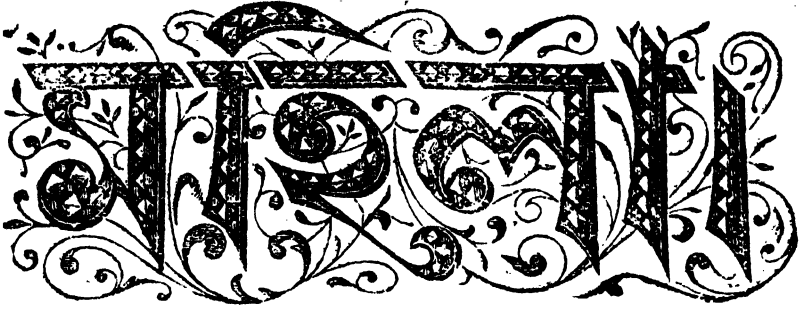
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] চৈত্র, ১৩১৫, এপ্রিল ১৯০৯। [৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীনিতীসার।

নারী, তুমি মা হওয়ার দায়িত্ব কি ভাব?

যে গৃহে ভগবদ্ভক্ত সেবাপরায়ণা নারী বাস করেন, সে গৃহে পরমেশ্বরের অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, স্বর্গের সুবিমল বাতাস সেখানে বহিতে থাকে।

সকলেই জানেন মাতৃ স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেরা মাতৃ-স্বভাব লাভ করিয়া থাকে। মায়ের স্বভাব চরিত্র যেরূপ, সন্তানগণ অজ্ঞাতসারে সেই চরিত্রের অধিকারী হইয়া থাকে। মা, তুমি যদি যথার্থই সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তবে স্বীয় চরিত্র ও প্রকৃতিকে সমুন্নত কর, জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম শান্তিতে ভূষিত হও, দেখিতে পাইবে তোমার প্রেমের পুত্তলী সকল সেই সকল স্বর্গীয় ভূষণে ভূষিত হইবে। তুমি উপদেশ দিয়া, শাসন ও তিরস্কার করিয়া সন্তানকে ভাল করিতে পারিবে না, আপনি যদি ভাল হও, সন্তান অনায়াসে ভাল হইবে।

ভগবানের প্রেম-প্রকৃতিতে নারীজাতির উৎপত্তি। স্ত্রীস্বভাবে সুকোমল প্রেমের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। প্রেমেতে সেবার উৎপত্তি। প্রেম পরের সেবা করিয়া, অপরের অভাব মোচন করিয়া তৃপ্ত। অভাব বিবিধ প্রকারের, কেহ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, কেহ জ্ঞানাভাবে মূর্খ, কেহ রোগ শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত। যেখানে যেরূপ অভাব, প্রেম তাহাই মোচনে তৎপর। নারী, তুমি সেবার কষ্টিপাথরে আপনার জীবনকে পরীক্ষা করিও। নারী যখন প্রেমে বিগলিত হইয়া শিশুসন্তানকে স্তন্য-দান করেন, কত তাঁ'র শোভা হয়, নারী যখন ক্ষুধিতকে অন্নজল পরিবেশন করেন কত তাঁ'র শোভা হয়। নারী যখন রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করেন, গাত্রদাহ নিবারণের জন্য ব্যজন করেন, কত তাঁর শোভা হয়, নারী যখন শোকাকুলের অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়া দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দানে প্রবৃত্ত, কত তার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

বৈ—

জমা খরচ।

আয় ব্যয় স্থিতি লইয়া সংসার। যে সংসারে এই তিনই আছে সেই লক্ষ্মীর সংসার। "গৃহস্থের সংসার লক্ষ্মীর সংসার হউক।" ইহাই আমরা নিত্য কামনা করি। আয় ব্যয় স্থিতি এই তিনই যে সংসারে আছে সে গৃহের কর্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে "গৃহলক্ষ্মী"। যত আয় তত ব্যয় উহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। গৃহীর পক্ষে আয় যত সামান্য হউক না কেন, প্রতি মাসে স্থিতির হিসাবে অন্ততঃ ২।৪টী পয়সা হইলেও জমা করা প্রয়োজন। আয় ব্যয় সমান, শূন্য স্থিতি, এরূপ সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে অর্থাৎ ধার করার ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হয়। প্রতি সংসারেই একটা নৈমিত্তিক ব্যয় আছে; নিত্য ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিঞ্চিৎ স্থিতি বা সঞ্চয় করা প্রতি গৃহীর পক্ষেই মহাধর্ম্ম। যে সংসারে কেবলই আয়, ব্যয় অতি সামান্য, নাই বলিলেই হয়, যে সংসার যক্ষের সংসার, পরস্পর অবিশ্বাস, হিংসা, বিদ্বেষ, বিবাদ, কলহ সে সংসারে লাগিয়াই রহিয়াছে। সে সংসারে শান্তি নাই, সুখ নাই, সে অশান্তির ঘর। অর্থ থাকিতেও সে ঘরে লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান। যে সংসারে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক সে "উজাড় সংসার"। সে সংসারেই ভূত প্রবেশ করে এবং আয় যত হউক না কেন "ভূতে লুটিয়া লয়।" যদি ব্যয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া কিছু কিছু স্থিতি করা না যায়, বহু অর্থ উপার্জ্জিত হইলেও সংসারে স্থিতি-নিবৃত্তি হয় না। সংসারে স্থিতি বা সঞ্চয়ের ব্যবস্থার উপরেই নিবৃত্তি বা শান্তি অতি-মাত্রায় নির্ভর করে। আমরা বৃদ্ধা যুবতী বা কন্যা প্রত্যেক মহিলাকেই "আয় ব্যয় স্থিতি লইয়া সংসার" এই সত্যের মর্ম্ম প্রতি পরিবারের অবস্থা উদাহরণস্বরূপ লইয়া গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে অনু-রোধ করিতেছি। কারণ সংসারের সুখ শান্তি বহু পরিমাণে এই সত্যের পরিজ্ঞা-নের উপর নির্ভর করিতেছে। "আয় ব্যয় স্থিতি" এই নীতিতে সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিলে কোন মহিলাই উৎকৃষ্ট গৃহিণী হইতে পারেন না।

জমা খরচ সংসার ধর্ম্ম পালনে "মনু-সংহিতা।" যে সংসারের জমা খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখা হয়, আমাদের বিশ্বাস, সে সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পারে না। একটা কথা আছে "ছাড়া নৌকা সয়তানে বায়।" এই জন্য নৌকায় কেহ না থাকিলে নৌকা বাধিয়া রাখে। জমা খরচ রাখাও সংসারে লক্ষ্মীর বন্ধন। যে সংসারের জমা খরচ নাই "ছাড়া নৌকা"র ন্যায় তাহাতে অতি সহজে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে। এই জন্য জমা খরচ রাখা আমরা বড় ভালবাসি, এবং সকলকে জমা খরচ রাখিতে প্রযত্ন-সহকারে অনুরোধ করি। জমা খরচ রাখার অনেক গুণ, সে সকল এক দুই করিয়া বলিলেও আরও কতক-গুলি থাকিয়া যাইবে। তথাপি আমরা চেষ্টা করিতেছি এবং পাঠকপাঠিকাদিগকে

আরও কয়েকটী বলিয়া বা লিখিয়া আমাদের কার্য্যের সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিতেছি। নিয়মিতরূপে জমা খরচ রাখার ফল :—

(১) আয় ব্যয় স্থিতির উপরে দৃষ্টি রাখা যায় ; (২) সংসারের সমুদয় বিভাগের সুবন্দোবস্ত করা যায় ; (৩) অন্ন, বস্ত্র, গৃহ-দ্রব্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান, ধর্ম্ম, ভৃত্যাদির বেতন দান, আত্মীয়তা প্রভৃতি সকল দিকেই চরিত্রের বিকাশ হয় ; (৪) এক মাসে অধিক ব্যয় হইলে, অন্য মাসে তাহা কমাইতে পারা যায় ; (৫) ঋণ শোধের দিকে দৃষ্টি পড়ে ; (৬) প্রাপ্য আদায়ের জন্য চেষ্টা হয় ; (৭) কেহ অধিক দাবি করিতে পারে না (৮) অর্থের প্রতি মমতা জন্মে না ; (৯) অর্থের প্রতি ঔদাসিন্যও জন্মে না (১০) ভৃত্যের বেতন, বাড়ীভাড়া প্রভৃতি নিয়মিতরূপে দিতে প্রবৃত্তি হয় ; (১১) নিয়মিততা শিক্ষা হয় ; (১২) দানাদি দ্বারা দয়া প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয় ; (১৩) ধর্ম্মার্থ দানের দ্বারা ধর্ম্মে মতি জন্মে ; (১৪) সেবা করিয়া তৃপ্তি হয় ; (১৫) দেনা পাওনা বিষয়ে অবিশ্বাস দূর করিতে পারা যায় ; (১৬) আয় ব্যয় বিষয়ে স্মৃতি শক্তির উপরে কোন প্রকার চাপ থাকে না ; (১৭) সংসারে সুশৃঙ্খলা জন্মে ; (১৮) সকল বস্তুর প্রতি আদর হয় ; (১৯) সকলই যত্নে রক্ষা করিতে ইচ্ছা জন্মে ; (২০) সর্ব্বোপরি গৃহে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন ও শান্তি থাকে,(২১) সংসারে পরস্পরের মধ্যে অর্থসম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে না।

আমরাতো এতগুলি লিখিলাম, পাঠক পাঠিকারা আরও ২।৪টী বাড়াইতে যত্ন করিবেন আশা করি। ইহার মধ্যে কোন কোনটা মুখ্য কোন কোনটা গৌণ ফল।

ঋণ করা পাপ, ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না থাকা মহাপাপ। যাহাদের ঋণ করা অভ্যাস, কি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নাই, তাহারা কখনও জমা খরচ রাখিবে না। জমা খরচ রাখার কথা হইলেই তাহাদের গায়ে জ্বর আইসে এবং নানা প্রকার আপত্তি উঠাইয়া উহার বিরোধী হয়। নিত্য আপনার ঋণের হিসাব দেখা বা মনে করা মাথার উপরে ধারাল খাঁড়া রাখা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এই জন্য অনেকেই জমা খরচের বিরোধী। আবার যাহারা আয়ের অনুরূপ ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক তাহারাও জমা খরচ রাখিতে লজ্জিত হয়। তাহারা পরের কাঁধে ব্যয়ের অত্যধিক কথা বলিয়া আপনার মান বজায় রাখে কিন্তু জমা খরচ রাখিলে সেরূপ কথা বলিতে আর পারে না। কারণ হিসাব বাহির করিলেই মিথ্যা ধরা পড়ে এবং পরের কাছে ও আপনার কাছে অপদার্থতা প্রতিপন্ন হয়। আবার কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতিক, সে মনে করে আমার আয় ব্যয় সকলই আমার হাতে, হিসাব কিতাব রাখিব কেন?" বস্তুতঃ তাহারা আপনার উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাসন করিতে চায় না। যুবক যুবতীরাই এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ভালবাসে এবং তদ্দ্বারা আপনার স্বভাবকে বিপন্ন করে।

তাহাদের পক্ষে জমা খরচ রাখা হাতীর অঙ্কুশের মত কাজ করে, তাহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করে এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব পরাস্ত হয়। ইহাদের পক্ষে জমা খরচ রাখার ন্যায় মহৌষধি আর নাই। জমা খরচ রাখিতে রাখিতে আত্মপ্রকৃতি সংযত হইয়া আসে।

আমরা ছোট কালে দেখিয়াছি, জমা খরচ কর্ত্তা রাখিতেন। টাকা কড়ি ও জমা খরচ উভয়ই কর্ত্তার জিম্বায় ছিল। গৃহিণী সংসারের অভাবের কথা মাত্র বলিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেন। কেহ কেহ বা জিনিসের ফরমাস ও বরাদ্দ করিয়া আপনার গিন্নীপনার পরিচয় দান করিতে পারিলেই পাকা গিন্নী হইতেন। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। মেয়েরা এখন বেশ লিখা পড়া করিতেছেন, হিসাব কিতাব করিতে পারেন, কাজেই গৃহিণীই এখন আয় ব্যয়ের কর্ত্রী হইয়াছেন, টাকা কড়ি এখন তাঁহার হাতেই থাকে। আমরা বলি উপযুক্ত পাত্রেই উপযুক্ত ভার পড়িয়াছে। কিন্তু কোন কোন পরিবারে আয় ব্যয়ের কর্ত্তৃত্ব লইয়া এখনও বিবাদ দেখিতে পাই। প্রাচীন নিয়ম মতে কর্ত্তাই আয় ব্যয়ের কর্ত্তা থাকিবেন না গৃহিণীই কর্ত্রী হইবেন। আমরা বলি এ ডিপার্টমেণ্ট একেবারে গৃহিণীকেই ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়, সংসারে গৃহিণীই রাজত্ব করিবেন বিধিলিপি। গৃহকর্ত্তা তাঁহার সাহায্যকারীমাত্র মনে করিয়া যথাসাধ্য সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিবেন। ইহার অন্যথা হইলেই সংসারে বাদবিসংবাদ ও অশান্তি আসিবে।

আমরা জমা খরচের নাম করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। কেহ বা অতিব্যাপ্তি দোষ দিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলিতে পারি জমা খরচের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যখন কথাগুলি মনে উঠিয়াছে তখন কোথাও না কোথাও উহাদের পরস্পর বাঁধুনী আছে আমরা হয়তো সে গুলি ভাল করিয়া বনিয়া তুলিতে পারি নাই, তাই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না।

গৃহিণী যখন পরিবারের আয় ব্যয়ের কর্ত্রী, তখন জমা খরচ ও অন্যান্য হিসাব পত্রও তাঁহারই নিয়মিতরূপে রাখা কর্ত্তব্যের ভিতরে পড়ে। তারিখ দিয়া প্রতিদিনের আয় এবং তারিখে তারিখে প্রতিদিনের ব্যয় জমা খরচেই লিখিবেন। তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন এই হিসাব দিতে যেমন গৃহকর্ত্তার নিকটে সেইরূপ পরিবারের প্রত্যেকের নিকটেই তিনি দায়ী। তিনি যদি এই হিসাব যথাযথরূপে রাখিতে ও দেখাইতে না পারেন তবে তিনিই সংসারকে অশান্তির আলয় করিবেন এবং সকলের দুঃখ কষ্টের কারণ হইবেন জমা খরচ পরিবারের শান্তিরক্ষার শাস্ত্র। গৃহিণী বা যিনি জমা খরচ রাখিবেন তিনি এই মাসে কোন্ বাবতে কত খরচ গেল তাহার একটী মোট হিসাব তৈয়ার করিয়া কর্ত্তাকে দেখাইবেন এবং তাঁহার সই লইবেন। এইরূপ জমা খরচ রাখা এবং প্রস্তুত করাতে যে

কত শিক্ষা হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। আশা করি প্রতি গৃহস্থ এই রূপে জমা খরচ ও হিসাব কিতাব রাখিয়া তাহার সাক্ষ্যদান করিবেন। "বেহিসাব" বা "আগলে গাইদোয়া" কথাটাই অলক্ষীর অভিধানের কথা, লক্ষীর অভিধানে সে কথা নাই। আমাদের গৃহিণীরা ও কন্যারা যেমন আয় ব্যয়ের ভার লইয়াছেন, সেরূপ জমা খরচেরও ভার লইয়া এবং সুন্দররূপে সব বিষয়ের বিশেষতঃ আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া প্রতি গৃহকে লক্ষীর গৃহ এবং প্রতি পরিবারকে সুখী পরিবার করিতে সহায় হইবেন, এই আমরা আশা করি।

শ্রী—রা।

এতো চেনা লোক !

(একজন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

গঙ্গার পারে প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা, রাজপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পুরীর গায় লাগাইয়া রেল পথ, দিন রাত সে পথে মালগাড়ী গতায়াত করে। নিশীথ না হইলে রেল গাড়ীর কর্ণভেদী শব্দোৎপাত থামে না। রেলপথের পরেই রাজপথ, এ পথেও দিন রাত গরুর ও ঘোড়ার গাড়ী চলিতেছে, জনতাও কম নয়। এই দুপথ পার হইলেই স্নানের ঘাট। ভোর হইতে সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শত শত লোক সে ঘাটে স্নান করে। তার পরেই গঙ্গার প্রবাহ, গঙ্গায় ছোট বড় অর্ণবযান নিয়ত যাতায়াত করে। দুপর বেলায়ই গঙ্গার পারে কোলাহলটা উথলিয়া উঠে। জিনিস পত্র উঠান নামানের জন্য বহুলোকের বহু গাড়ীর সমাগম হয়। পুরীর অন্য পার্শ্ব দিয়া সুপ্রশস্ত রাজপথ। জনতায়, গাড়ীর শব্দে ও সর্ব্বোপরি তাড়িত-চালিত ট্রামগাড়ীর কোলাহলময় নিনাদে সেদিক্‌টাও মুখরিত। বোধ হয় মহাকোলাহল-সমুদ্রের মধ্যে পুরীটা ঘুমাইতেছে। কখন বা পুরীর প্রকাণ্ড বহিরঙ্গনে ২।৪ জন লোক দেখা যায়, কখন বা জনমানবেরচিহ্নও থাকে না, উপকথার রাক্ষসের পুরী মনে হয়।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই দুসারি লৌহখাটের উপরে শায়িত লোক দেখা যায়। এবং বাড়ীটা যে একটা চিকিৎসালয় সহজেই বোধগম্য হয়। যেরূপ নীচে, সেরূপ উপরেও রোগী রহিয়াছে। গৃহটী উপরে নীচে রোগীতে পরিপূর্ণ। সুপ্রশস্ত এক একটা হলের মাঝখানে এক একখান চেয়ারে এক এক জন রমণী বসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখেই একখান ক্ষুদ্র টেবল রহিয়াছে। এই রমণীরা সেবিকা বা Nurse নার্স নামে আখ্যাত। রোগীর তত্ত্ব খবর ও সেবা শুশ্রূষা করা ইঁহাদের কাজ।

গৃহে প্রবেশ করিলেই খৃষ্টদেবকে মনে পড়ে, রুগ্নদের জন্য তাঁহার দয়া প্রেম হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। অমনি সে গৃহের ভাব বদলিয়া যায়। মূর্ত্তিমতী দয়া ও প্রীতি সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া দেখা দেন। রুগ্নদের জন্য খৃষ্টের ব্যস্ততা ও প্রেম যেন এই গৃহের সর্ব্বত্র বিচরণ

করিতেছে বোধ হয়। আহা! এ হেন স্বর্গের মধ্যেও দৈত্য, এরূপ নির্ম্মল কুসুমেও কীট এবং দেবভাবের মধ্যেও মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতা আছে। তথাপি বলিতেছি রুগ্নাত্মারা ধন্য, তাহারা অমরাপুরীতে বাস করিতেছে।

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার গঙ্গার দিকস্থ একটী প্রকোষ্ঠে একটী বর্ষীয়সী মহিলা একজন বর্ষীয়ান পুরুষের হস্তাবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলেন। দুজন যুবক তাঁহাদের অনুগমন করিল। গৃহ প্রবেশমাত্রই একটা লৌহ খাট আনীত হইল। তদুপরি একটা গদি ও বিছানার চাদর দেওয়া হইল। বর্ষীয়সী একটী বালিসে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। খাটটা স্প্রিংওয়ালা ছিল বলিয়া শয়ন করিয়া বেশ আরাম পাইলেন। একটুকু বিশ্রাম করিয়াই উঠিয়া বসিলেন। মহিলার বয়স ৫৫ বৎসরের উপরে এবং পুরুষের বয়স ৬০র কিঞ্চিৎ অধিক। যুবক দুটীর বয়স প্রায় সমান, অনধিক বিংশতি বৎসর হইবে। রোগীর নিকটেই দুখানা লৌহ-নির্ম্মিত চেয়ার ছিল। তাহার একখানে বর্ষীয়ান ও অপর খানে একটী যুবক বসিল। আর একটী যুবক শয্যা পার্শ্বেই একটুকু বসিয়া পরে পাচারি করিতে লাগিল। চারিজনে মিলিয়া ঘরের বিষয়ে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রকোষ্ঠটী একজন রোগীর জন্য বেশ প্রশস্ত, দীর্ঘে ১০।১২ হাত ও প্রস্থে ৭।৮ হাত হইবে। উচ্চতা বড়ই বেশী, বোধ হয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম ধরিয়া উহার উচ্চতা ঠিক করা হইয়াছে। উহার সংলগ্ন আর একটী ঘরে একটী জলের কল রহিয়াছে। সে ঘরটী মন্দ নয়। যুবক দুটী সঙ্গের বিছানা ও কাপড়চোপড় সে ঘরে যথাসম্ভব সাজাইয়া রাখিল।

শনিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই ইঁহারা হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলেন। একটুকু পরেই রুটিওয়ালা একখান রুটি, কিঞ্চিৎ পরে গোয়ালা একপোয়া দুধ দিয়া গেল। জমাদারকে বলায় সে ঘরটা বেশ করিয়া ঝাড় দিয়া গেল। সাতটার পরেই ডাক্তার বাবু ও একজন সেবিকা সঙ্গে করিয়া রোগীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক চোখ মুছাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন এখনই ডাক্তার সাহেব আসিয়া ইঁহাকে দেখিবেন এবং যাহা যাহা জানিবার ছিল তাহাও জানিয়া গেলেন। নটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেব আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুজন ডাক্তার ও একজন ইংরেজ মহিলা (Nurse) আসিলেন।

রোগিণীর একটী চোখ পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মফঃস্বলে একজন ডাক্তার তাঁহার চোখের ছানী কাটিয়াছিলেন। সেই কাটাতেই দৈবগত্যা চোখটি নষ্ট হইয়া যায়। মফঃস্বলে চোখ কাটানে সে যাত্রায় অনেকেই তাঁহাকে এবং তাঁহার আত্মীয়দিগকে মন্দ বলিয়াছিলেন তাই এবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব সমুদয় শুনিয়া বলিয়া গেলেন "একটী চোখ নষ্ট হইয়াছে, এই চোখের উপরেই একমাত্র নির্ভর, ভাল করিয়া দেখিয়া পরে অস্ত্র করিতে হইবে। কিছু-

কাল এখানে থাকিতে হইবে।” পরে ডাক্তার বাবুকে পরীক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন।

দশটার পরেই রোগীর খাবার দিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই ডাক্তার বাবু রোগীর শিরের উপরে ঝুলন ব্যবস্থা পত্রে আহারের ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছিলেন। দুপরের পরে ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা গৃহে লইয়া গিয়া নানা পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা পত্রে লিখিয়া গেলেন। একটার পরে দুধ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভাত এবং রাত্রি ৮টার সময়ে আবার দুধ দিয়া গেল। রোগীদের আহার পান বিষয়ে প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষ দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা আছে। ঢেঁকী স্বর্গ গেলেও বাড়া ভাণে, দুঃস্থেরা যেখানে যায় দুরবস্থা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। সেদিন চলিয়া গেল, পরদিনও চলিয়া গেল। রবিবার বলিয়া ডাক্তার সাহেব সেদিন আর হাঁসপাতালে আসিলেন না। সোমবার ৮টার পূর্ব্বেই ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রোগীর চোখ বেশ পরীক্ষা করিলেন, ডাক্তার বাবুকে পরীক্ষার ফল কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বাবু রবিবারও পরীক্ষা গৃহে গিয়া রোগীর চোখ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শেষ বলিলেন রোগীকে উপরে লইয়া যাও আজই চোখ কাটা হইবে।

কথা শুনিয়াই রোগীর কম্প উপস্থিত হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে বর্ষীয়ানের হস্ত ধরিয়া রোগিণী আস্তে আস্তে দোতালায় উঠিলেন। একজন সেবিকাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিল। রোগী বার বার বলিতে লাগিলেন তোমরা আমার কাছে থাকিবে। সেবিকা বলিলেন “মা, আমি তোমার কাছে থাকিব, কোন ভয় করিও না কাটিতে উদ্দেশও পাইবে না।” কিন্তু রোগিণীর ভয় কিছুতেই গেল না। পুরুষটী একবার ধমক দিয়া বলিলেন “এই তোমার সাহস! কেবল কথার বেলায় সাহস! কাজে তো এই।” রোগিণী বলিলেন “না চোখ কাটার সময় তুমি কাছে থেকো।” সেবিকা বলিল অন্যকে কাছে থাকিতে দিবে না। তা মা ভয় কি আমি কাছে থাকিব, ডাক্তার বাবুও কাছে থাকিবেন।” উপরে যাইয়া রোগীকে একটা উঁচু খাটে শুইতে হইল এবং তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন “আমি সম্মুখে থাকিব কোন ভয় করিবেন না।” সেবিকা তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গীরা চলিয়া আসিল।

কিছুকাল পরেই দুজন কুলি একটা কেন্‌ভাসের খাটের দুদিক ধরিয়া রোগীকে নীচে লইয়া আসিল। একজন সেবিকাও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন, তিনি অতি যত্নে রোগীকে তাঁহার বিছানায় শয়ান করাইয়া নীচের কেন্‌ভাসটা আস্তে আস্তে তুলিয়া লইলেন। রোগী নিঃশব্দে চিৎ হইয়া শুইয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া একেবারে নিঃশব্দে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে বলিয়া গেলেন। বারটার পরে দুধসাগু খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রোগী নিঃশব্দে শুইয়া রহিলেন। ১২টার পরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন “আমাকে

খেতে দাও বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে” তখন জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই স্বরেই বলিলেন “কাটিবার সময় আমি উদ্দেশও পাই নাই।” রোগী নীচে আনা হইলে পরেই সকলে বলিয়াছিলেন “চোখ বেশ কাটা হইয়াছে, চোখ বেশ আছে।”

সেইদিন বৈকালে ডাক্তার বাবু আসিয়া চোখের বাঁধন খুলিয়া ধোয়াইয়া দিয়া আবার বাঁধিয়া গেলেন। চোখ ভাল আছে বলিলেন। ব্যবস্থা পত্রে একটুকু লিখিয়া গেলেন। পরদিন ৮টার পরে ডাক্তার সাহেব আসিয়া চোখ ধোয়াইয়া দিলেন। “রোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে কি না?” জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন “বাঁ চোখ কাটা হইয়াছে, ডানদিকে একটুকু ফিরতে পারে। কিন্তু অধিক যেন নড়চড় না করে।” ডাক্তার সাহেব বলিলেন “তোমার চোখ বেশ কাটা হইয়াছে এবং চোখ বেশ আছে।” তিনি একখান গ্লাস দিয়া প্রতিদিনই চোখ পরীক্ষা করিয়া যাইতেন। রোগী প্রায় ২৪ ঘণ্টার পরে একবার ডানদিকে ফিরিল। ইহার মধ্যে একেবারেই মাথা নাড়াচড়া করে নাই, কেবল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম রক্ষা করিতে শরীরের শেষার্দ্ধ ২।৩ বার নাড়িতে হইয়াছিল।

এইরূপ চোখ কাটার পরে ৭ দিন চলিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব চোখ একটুকু একটুকু পরীক্ষা করিয়া আবার বন্ধ করিয়া যাইতেন। ৮ দিনের দিন ডাক্তার সাহেব বর্ষীয়ান্‌কে নিকটে ডাকিয়া নিলেন এবং রোগীর চোখের আবরণ মোচন করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন “দেখতো ইহাকে চিন কি না?” রোগিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন “এতো আমার চেনা লোক, একে চিনিব না কেন? চোখ না থাকিলেও তো ইঁহাকে চিনিতে পারি।” উত্তর শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

পাঠকপাঠিকারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন এই বর্ষীয়ান্ রোগিণীর স্বামী। তাই জিজ্ঞাসায় ও উত্তরে সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছিল।

“চোখ না থাকিলেও চিনিতে পারি।” এই পরিচয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা বলি স্ত্রীআত্মা ও স্বামীআত্মা পরস্পরকে শরীর না থাকিলেও চিনিতে পারিবেন। তাঁহাদের পরস্পরের পরিচয় অনন্ত জীবনে।” ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন পৃথিবীতে পতি পত্নীর পরিচয় অনন্ত জীবনের জন্য হউক।

ডাক্তার সাহেব সেদিনই বলিলেন “তোমার চোখ ভাল হইয়াছে তুমি এখন যাইতে পার। কিছুকাল পরে চোখে চস্‌মা দিতে হইবে।”

পরদিন পতিপত্নী উভয়ে ডাক্তার সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন “আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া সকলকে চক্ষুদান করুন। ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন এই প্রার্থনা করি।” ডাক্তার সাহেব রোগিণীকে বলিলেন “তুমি বাড়ীতে যাহাকে হইতে দেখ নাই এমন নাতি, নাতিনীদিগকে দেখিয়া সুখী হও।” স্বামী বলিলেন “আমি ইতিপূর্ব্বেই এক নাতি-

নীকে লিখিয়াছি এবার ঠাকুর মা সোণার চোখে তোমাকে দেখিবেন।" সাহেব এরূপ আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া Good bye বলিয়া বিদায় লইলেন। এরূপ successful operation কমই হয় বলিয়া ডাক্তার সাহেবের খুব আহ্লাদ হইয়াছিল।

মাতৃগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমার নানা স্থানের অতি স্নেহ ও আদরের তরুণবয়স্কা অনেক মা আমার দীর্ঘকালব্যাপী হৃদ্‌রোগের ঘোরতর যন্ত্রণার জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত ও ব্যথিত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া আমার অবস্থা জানিবার জন্য ব্যাকুলভাবে পত্রাদি লিখিয়াছেন। আমি তাঁহাদের পরিচয় দান না করিয়া তাঁহাদের পত্র বা পত্রাংশ সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। এই অনুপযুক্ত বুড় ছেলের প্রতি তাঁহাদের এই প্রকার স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও সহানুভূতি প্রকাশ কেন আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহার ভিতরে পরম জননীর প্রেমের লীলাই দেখিতেছি। এবার আমি তাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় পত্র বা পত্রাংশ অবিকল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। তাঁহারা আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

অপার বর্ম্মা পীনমানাস্থ মা প্রফুল্ল কুমারী দেবীর ১০ই মার্চ্চের পত্র ;—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু :—

আপনি আমাদের অনেক অনেক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আজ মেজ বৌদির পত্রে জানিলাম আপনি ভাগলপুরে বাবার নিকট আছেন, আপনার শরীর ভাল নয়, শ্বাস-কষ্টে বড় কষ্ট পাইতেছেন, শুনিয়া প্রাণটা কেঁদে উঠিল। দূর হইতে অসুখ কি রকম কিছুই বুঝিতে পারি না, কিছুদিন পূর্ব্বে মহিলায় আপনার শরীর একটু ভাল আছে শুনিয়াছিলাম, আবার ৩।৪ দিন হইল ধর্ম্মতত্ত্বে শরীর একটু খারাপ শুনিয়া ঔষধ পথ্যের জন্য কলিকাতার ঠিকানায় আপাততঃ ১০টী টাকা পাঠাইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে সুখী করিবেন।

"বাবার নিকট থাকিতে আপনার সুবিধা হইতেছেতো? সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইতেছে নাতো? মেজ বৌদি আপনাদের দুজনকে সম্পূর্ণরূপে দেখে উঠিতে পারেন? তাই ভয় হয় পাছে আপনার অযত্ন হয়। আপনার যদি সুবিধা হয় তাহলে বাবার নিকট থাকিলে খুব সুখী হইব, আমি মাসে মাসে আপনার জন্য বাবার নিকট পাঁচও পাঠাইব, বাবা কাজ করিতেছেন না বলিয়া আপনি থাকিতে কিছুই সঙ্কুচিত হইবেন না। আপনি কাছে থাকিলে বাবারও একটি সঙ্গী থাকেন। না হ'লে বাবাও বড় একলা বোধ করেন।"

"আপনার শরীর এত সুস্থ ও সবল ছিল, কেন হঠাৎ এরূপ খারাপ হইল

আমি সর্ব্বদাই এরূপ ভাবি ও বড় দুঃখ হয়। আপনি ভাগলপুর গিয়েছেন শুনিয়া আমারও আপনার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনার এত অসুখ আমরা বুঝিতে পা'রি নাই, কলিকাতায় গিয়া আপনার নিকট যেমন ক'রে হউক যাওয়া উচিত ছিল। উনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে রেখে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট যাইব।" আশা করি দয়াময় ভগবানের কৃপায় আপনি দিন দিন ভাল হইবেন, যখন কলিকাতায় যাইব আপনার চরণ দর্শন করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইব।

"এঁর সেই বাতের ভাব এখনও যায় নাই। মাংস, চা, সব ছাড়িয়া দিয়াছেন, কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে। চিঠি পত্রে ৮৲ টাকা ফি লইয়া ডাক্তার ইউনান্ (Dr. Younan) ওষুধ পাঠাইয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটু উপকার হইয়াছে মনে হইতেছে। আজকের মত আপনাকে অনেক অনেক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া চিঠি শেষ করিলাম। ইতি

আপনার অতি স্নেহের সেবিকা

মা প্রফুল্ল।

পূর্ণিয়া হইতে ১লা মার্চ্চ তারিখে মা সরলা কান্ত গরি লিখিয়াছেন।

শ্রীচরণেষু—

আপনার স্নেহপূর্ণ পোষ্টকার্ড খানি পাইয়াছি। তাহাতে আপনার এত অসুখের কথা শুনিয়া মন বড় খারাপ হইল। আমি এতদিন চিঠি দিতে পারি নাই আমার ছোট ছেলেটীর খুব জ্বর হইয়াছিল, ১০৬ এর উপর আর সেই সঙ্গে ফিট্ ছিল।

আর আমার নিজের শরীরও খুব খারাপ কএক দিন থেকে মাথাব্যথায় বড় কষ্ট পাইতেছি।

আপনাকে চিঠি দিতে পারি নাই বটে কিন্তু সব সময় আপনার কথা মনে হয়। পিতার ন্যায় আপনি আমাদের স্নেহ করেন কিন্তু আমরা আপনার কিছুই করিতে পারিতেছি না, আপনার অসুখের কথা শুনিলে আপনার জন্য নানা রকম ভাবনা হয়। ভগবানের নিকট আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা আপনি শীঘ্র আরোগ্য হউন।

আপনার স্বর্গীয় শক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি এত অসুখেও আপনি কত কাজ করিতেছেন। কএক দিন হইল মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত খানি পড়িলাম, কি যে ভাল লাগিল। আপনার পায়ের ধূলা মনে মনে কত বার মাথায় দিলাম। আরও আপনার সব বইগুলি পড়িবার খুব ইচ্ছা আছে সেই-গুলি আনাইয়া পড়িব আপনার সমস্ত শক্তি দ্বারা ভগবানের কার্য্য করিয়া আমাদের যাহা উপকার করিলেন, তাহা আমাদের ইহ পরকালের সম্বল হইল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় নকুড় বাবুকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবেন। আমি যখন ভালপুরে গিয়াছিলাম, তখন তিনি আমার অসুখের সময় কত যত্ন করিয়া

দেখিয়াছিলেন। আপনি যখন তাঁর ওখানে আছেন, তখন আপনার যত্নের কোনও ক্রটি হইতেছে না এবং আশা করি আপনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন।

বাঁকিপুর হইতে ১১ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীমতী কুমারী সুজাতা দেবী লিখিয়াছেন,

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ভাগলপুরে আসার পর আর কোনও খবর পাইনি। কেমন আছেন এখন জানি না ত? একবার এখানে আসবার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম, শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তবু কিছু দিন কাছে পাব ভেবে, তার পর শুন্‌লাম আমাদের এ বাড়ীতে, সহরের ভেতরে ধূল ও ধোঁয়ার ভেতরে আপনার আসা হচ্ছে না। আর আমিও ভাবি স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য আস্‌তে হলে সহরের বাহিরে, খোলা জায়গাতেই আপনার থাকাই এখন ভাল। আমার এ স্বার্থপর ইচ্ছার কোন মূল্য কি আর এখানে থাক্‌তে পারে? ভাগলপুরে নকুড় বাবুর বাড়ীতে কি আছেন? চিকিৎসাও কি তাঁরই হচ্ছে? এখানে এসে কি রকম মনে হয়? শরীরের উন্নতি কিছু বোঝেন কি? বল, শক্তি পাচ্ছেন কি? আশা করি সেবা যত্নের কোন ক্রটি আর এখানে হবে না। এখানে কতদিন আর থাক্‌বেন মনে করেন? এর পরে এখান থেকে কোথায় যাবেন? এখানে নগেন বাবুর খুবই খারাপ অবস্থা। দিদিমার কি হয়েছে জানি না, তিনিও নিজে চিঠি লিখ্‌তে ও পারেননি। চারিধারের এ সব ঘটনার মধ্যে পড়ে মনে হয় কি করি, এখন কি করবার জন্য বিধাতা বলেন?

এখানে খুব গরম, বেশ বসন্ত ও হচ্ছে। ওখানে গরম কেমন? সকল বিষয় জানাবার কি উপায় আছে? কি করে জান্‌তে পারব? অনেক দিন কিছু শুনিনি, জানিও না, তাই জান্‌বার জন্য এত ব্যস্ত।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। জ্যেঠামহাশয় দেখ্‌তে আসেন কি? নিবারণ বাবু?

আপনার একান্ত আদরের মা—

সুজাতা।

কোন্নগরস্থ বধূমাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণী সেনের পত্র।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

অদ্য আপনার রোগ বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া আমরা সকলে যারপর নাই চিন্তিত আছি। আপনার শরীরের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, বুঝি আর এরোগ হইতে অব্যাহতি নাই। জানিনা ভগবানের কি ইচ্ছা। মনে এই দুঃখ যে এই সময় একবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিলাম না। জানিনা জীবনে ইহা হইবে কিনা। কলিকাতা থাকিতে আপনাকে দেখিতে যাইব বলিয়া কতবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এমন দুরদৃষ্ট যে নানা রকম অসুবিধায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

আপনার প্রদত্ত "চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারীর জীবন" পড়িয়া মনে বড়ই শান্তি পাইয়াছি।

অধিক কি লিখিব। আপনি দূরে থাকিয়া আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।—ইতি।

আপনার স্নেহের—বড়বৌমা।

কোন্নগরস্থ নাম্নী শ্রীমতী মালতীর পত্র।

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদামহাশয় আপনি ভাগলপুর যাইয়া পুনরায় অসুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া আমরা সকলে অতিশয় চিন্তিত আছি। আমাদের সাধ্য নাই যে আপনার কোনও সেবা শুশ্রূষা করি। আমার শরীর এখনও সম্পূর্ণরূপে সারে নাই। আপনি কলিকাতা থাকিতে, আমরা কতবার মনে করিয়াছি আপনাকে একবার দেখিয়া আসি, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ থাকাতে যাইতে পারি নাই। আমি বোধ হয় বৈশাখ মাসেই ঢাকা যাইব, ইহার পূর্ব্বে যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব এরূপ আশা দেখি না। আপনি যে বাড়ীতে থাকেন, আমরা ভাগলপুর থাকিতে সেই বাড়ীতে একবার গিয়াছিলাম। বাড়ীটি কিন্তু বেশ, খুব নির্জ্জন। আপনার পক্ষে বেশ আরাম-জনক স্থান। কিন্তু আজকাল ক্রমেই গরম পড়িয়া আসিতেছে বিশেষতঃ পশ্চিমের গরম বড়ই অসহ্যজনক, আপনার এ দুর্ব্বল শরীরে কতদূর সহ্য করিতে পারিবেন বলিতে পারি না। অধিক কি লিখিব। সর্ব্বদা আপনার শরীরের অবস্থা জানাইয়া সুখী করিবেন। আমরা এক প্রকার। ইতি

আপনার স্নেহের—মালতীবালা।

কলিকাতা হইতে মোসলমান কন্যা মা আর্ এস্ হোসেন লিখিয়াছেন।

পরম পূজনীয়েষু,

ক্রমে আপনার দুই পত্র পাইয়াছি। এতদিন আপনার পত্র না পাওয়ায় আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে আপনার পীড়া বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। এখন দেখিতেছি আমার সে আশঙ্কা অমূলক ছিল না। আমাদের সৌভাগ্যবলে পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা। আপনার ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করা আমাদের কতদূর সৌভাগ্য তাহা আমরাই জানি।

ঈশ্বর করুন ডাক্তার বার্ণার্ডোর চিকিৎসা আপনার পক্ষে উপকারী হউক, আমার কিন্তু তাঁহার প্রতি তত ভক্তি নাই। আর এখন ত ভাগলপুরে গরমের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগও দেখা দিবে। গত বৎসর ভয়ঙ্কর প্লেগের কথা আমার এখনও মনে আছে—চারিদিকে প্লেগ, মাঝখানে আমরা ছিলাম। আপনি যতশীঘ্র সম্ভব ভাগলপুর ছাড়ুন। নিবেদন ইতি।

আপনার অতি স্নেহের—মা।

ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবী ৩নং পেনরোড হইতে গত বৃহস্পতিবার লিখিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত দুইখানি পুস্তক যথা-সময়ে পাইয়াছি আমার প্রণাম ও ধন্যবাদ লইবেন। সুন্দর লেখা হইয়াছে। ছেলেদের অসুখের জন্য কয়দিন ব্যস্ত ছিলাম। আপনার শরীর কেমন? ভাল থাকিলে

একদিন আসিয়া খোককে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন।

এতদূর আসিতে কষ্ট হইবে, কমল-কুটীর আশা করি একদিন দেখা হইতে পারিবে।

এখন শরীর কেমন আছে একটু জানাইলে সুখী হব। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী—সুচারু দেবী।

কুচবিহারের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুনীতি দেবী উডল্যাণ্ড প্রাসাদ হইতে প্রচারকবর্গের অভিভাবক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে আমি গিরিশবাবুর চিকিৎসাদির জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারি কি? তিনি জানাইয়াছেন বিলাত হইতে তাঁহার ভাগিনেয় কে, জি, গুপ্ত ক্রমাগত অর্থ পাঠাইতেছেন, তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা যত্নের কোন সুব্যবস্থার ত্রুটি না হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন, এই অবস্থায় মহারাণীর সাহায্য দানের প্রয়োজন দেখা যায় না।

কটকনগর হইতে বিগত ১৮ই মার্চ্চ শ্রীমতী রেবাদেবী লিখিয়াছেন ;—

শ্রীচরণেষু,

আপনি এখন কেমন আছেন, অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। এবার ধর্ম্মতত্ত্বে আপনার ভাগলপুরে থাকার সংবাদ পাইলাম। আপনি আর কতদিন ভাগলপুরে থাকিবেন।”

ইনি দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যা। তিনটি শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া অকস্মাৎ বিধবা হন। কোন বাধা বিঘ্ন ইহার অদম্য উৎসাহ উদ্যমকে পরাস্ত করিতে পারে না। ইনি বাঙ্গলা ভাল জানেন, ইহার সারগর্ভ গদ্য পদ্য প্রবন্ধের জন্য মহিলা ঋণী। ইনি উড়িষ্যাভাষায় পত্রিকা সম্পাদন করিয়া ও উৎকল দীপিকা পত্রিকায় নিয়ত সুন্দর সুন্দর গদ্য পদ্য প্রবন্ধ যোগাইয়া গদ্য পুস্তক ও রন্ধন প্রণালী ইত্যাদি এবং বঙ্গসাহিত্য পুস্তক ও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম পুস্তক উড়িষ্যাভাষায় অনুবাদ করিয়া উৎকল সাহিত্যে নবজীবন দান করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবং বৃহৎ বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী নিবাস স্থাপনপূর্ব্বক নিজের বাড়ী ও গাড়ী এবং সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। একটি বড় লোকের কন্যা বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার প্রতিযোগী বৃহৎ স্কুল স্থাপন করিয়াছেন রেবাদেবী তাহাতেও ভগ্নোদ্যম নহেন। একাকী অন্য লোকের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া একা সংগ্রাম করিতেছেন। বাস্তবিক মা রেবা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা।

তিনি লিখিয়াছেন, “স্কুল ভাল চলিতেছে। আপনারা বৃদ্ধবয়সে যেরূপ উৎসাহ ও কর্ত্তব্যশীলতার ছবি দেখাইয়াছেন, আমাদের জীবনে তাহা যেন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া আজীবন পালন করিতে পারি। এই আশীর্ব্বাদ চাই।”

স্নেহের মা রেবা।

গাজীপুর হইতে শ্রীমতী সাবিত্রীবালা

দেবী গত ৩রা এপ্রিল নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়াছেন ;—

পরম ভক্তিভাজনেষু

"পূজনীয় জ্যেঠ মহাশয় আপনার শরীর অসুস্থ শুনিয়া পর্য্যন্ত অতিশয় ভাবিত আছি। জানি না এখন আপনি কেমন আছেন। আপনার এখানে আসিবার কথা হইয়াছিল শুনিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল কিন্তু আপনার শরীর বেশী অসুস্থ জানিলাম, বোধ হয় সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। আপনি এখন ভাগলপুরে জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে আছেন শুনিলাম। আজকাল আপনি কেমন আছেন জানিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি কিন্তু কে আমাকে আপনার সংবাদ দিবে। আপনার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে। ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে, তথাপি আত্মীয় স্বজনের অসুখের সংবাদ শুনিলে মন বড়ই বিচলিত হয়। মণি দাদার বৌ বোধ হয় ওখানে আছেন তাঁহাকে বলিবেন যে তিনি যেন দুছত্রেও আমাকে আপনি কেমন আছেন লেখেন।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও পূজনীয় জ্যেঠামহাশয়কে জানাইবেন। ঈশ্বর প্রসাদে এখানে আমরা সকলে ভাল আছি।

আপনার আদরের মা—সাবিত্রীবালা।

সীতাদেবী এবং গোপাদেবী।

ভারতীয় রমণীকুলের গৌরব পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ভারত মহিলার পাতিব্রত্য এবং একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ভারতের সর্ব্বপ্রধান রত্ন। এ দেশীয় কুলললনাগণ চরিত্রাঙ্গে উল্লিখিত দুটিরত্ন সর্ব্বপ্রযত্নে সমাদরে পরিধান করেন ; সেই কারণে তাঁহাদের এরূপ জগচ্চিত্তহারিণী শোভা। কিন্তু তাঁহারা আপনারাও এ বিষয়ে সচেতন নহেন যে, ভারতমহিলার চরিত্রাভ্যন্তরস্থ বিজয়িনী-শক্তি কেবল তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত নহে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তিনী পূজনীয়া মহিলাদিগের আশীর্ব্বাদ লব্ধ বলিলে ঠিক হয়। যাঁহাদের আশীর্ব্বাদে ঐ সকল রত্ন করতলগত হইয়াছে তাঁহাদের বিষয়ে জানা থাকা এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিযুক্ত থাকা এ দেশস্থ নারীসমাজের পক্ষে সর্ব্বথা আবশ্যক। এ জন্য উপরে যে দুই বরণীয়া দেবীর নাম প্রকাশিত তাঁহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে।

উঁহাদের এক জনের নাম, ধাম, চরিত্র অনেকেরই জানা আছে। অন্য জন সকলের নিকট ততটা পরিচিতা নহেন। সীতা মিথিলারাজ রাজর্ষি জনকের দুহিতা এবং সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের বণিতা। গোপা বা যশোধারা কপিলবস্তুর মহারাজা শুদ্ধোদন তনয় সিদ্ধার্থের পত্নী। কৃত্তিবাস এবং তুলসীদাসের প্রসাদে ভারতবাসিনী মহিলাগণ সীতাকে সহজে জানিতে পারেন। কিন্তু গোপার তত্ত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অথচ ভারতললনার জীবনের উপরে সীতার ন্যায় গোপাদেবীরও প্রভাব এবং আশীর্ব্বাদ

বিশেষরূপে বিদ্যমান। বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে গোপাও যে বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জমানা হইয়াছেন ইহা আর বিচিত্র কি? গোপাদেবী স্মৃতিপটের অন্তরালবর্ত্তিনী হইয়াও তৎকর্তৃক বহু ক্লেশলব্ধ ধর্ম্মরত্ন এ দেশের নারীজাতির কণ্ঠহারের মধ্যমণি করিবার জন্য আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। নারীগণ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা প্রদান না করিলেও তিনি প্রদত্তনিধি প্রতিগ্রহণ করিবেন না।

সীতাদেবী নারীজীবন ভূষণ অন্যান্য কমণীয় গুণের সঙ্গে পতিসঙ্গ এবং পতিসেবাপরায়ণতা গুণের প্রতিমূর্ত্তি। রামের দৃশ্যতঃ অতি নিষ্ঠুর আচরণেও তাঁহার প্রতি আস্থা বা কল্যাণাকাঙ্ক্ষার ব্যত্যয় সীতার মনে ঘটায় নাই। চোর রক্ষিত অশোকবনে রামের প্রেমসুখেই দুঃসহ দুঃখ পরীক্ষা ও প্রলোভন বহন করিয়া সীতা জীবিতা ছিলেন। বাল্মীকির তপোবনে বর্জ্জন সংবাদরূপ বজ্রাহত হইয়াও সীতা পতিপ্রেমরূপ কাঞ্চনের উজ্জ্বলতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতার অমন দেব-স্বভাবেও একটি অভাব লক্ষিত হয়। অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না। সে অভাবটি প্রস্ফুটিতরূপে দেখাইবার জন্য রামচরিতের একটি দিক্ একটুকু বর্ণনা করা প্রয়োজন।

রামচন্দ্র যেমন রাজধর্ম্ম, রাজনীতি এবং ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমন সনাতন যোগধর্ম্মও শিক্ষা করিয়াছিলেন। যোগে সিদ্ধিলাভ করা প্রযুক্ত রামচন্দ্র নিস্পৃহ নির্ম্মম এবং সমদর্শী হইয়াছিলেন। রাম রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক তিনি পিতৃপদধূলি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইয়া মহারাজ দশরথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজানন হইতে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কৈকেয়ী প্রমুখাৎ বন গমনাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। তথাপি রাম পিতা বিমাতা কৈকেয়ী বা মন্দমতি মন্থরার প্রতি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিলেন না। তদ্রূপ বিপৎপাতে তাঁহার সমচিত্ততা ও সমদর্শনের অভাব ঘটিল না। যেমন হৃষ্টচিত্তে পিতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি হৃষ্টচিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইহা তাঁহার যোগের ফল। হায়! রামচন্দ্র, যথার্থই তুমি বশিষ্ঠদেবের উপযুক্ত শিষ্য। তুমি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে দ্বন্দ্বরহিত অবস্থা পরিষ্কার প্রদর্শন করিয়াছ। কিন্তু পতিগতপ্রাণা সীতাতে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ভাবের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সতী সীতা রামসঙ্গপ্রিয়া; কিন্তু রামচন্দ্রের যোগধর্ম্মের প্রতি তাঁহাকে মতিহীনা বলিলেও হয়, পতিহীনা বলিলেও হয়। সেই নিমিত্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধীর গম্ভীর রাম চরিতের পার্শ্বে বাতাহতা তরঙ্গিণীর ন্যায় অধীরা সীতাচরিত চিরদিনই এক প্রকার রহিয়া গিয়াছে। রামচন্দ্রের ধর্ম্মের প্রতি যদি সীতার মতিগতি থাকিত, তাঁহার মধুর পবিত্র চরিত্রে বৈরাগ্যসম্ভূত ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ হইত।

গোপার দুর্লভ চরিত্র অন্য প্রকার। রামও সীতাকে ত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থও গোপাকে ত্যাগ করেন। রামচন্দ্র

প্রজারঞ্জনার্থ অন্তর্ব্বত্নী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিত করেন। সিদ্ধার্থ জগতের প্রজাপুঞ্জের দুঃখ নিরাকরণার্থ গোপাকে ভোগবিলাসপূর্ণ রাজপ্রাসাদে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং বনে প্রস্থান করেন। যথাকথঞ্চিৎ ভিক্ষালব্ধ আহারীয় দ্বারা জঠরজ্বালা দূরীকরণে তিনি রত হন।

গোপা সদ্যপ্রসূত শিশুর জননী। তাঁহার স্বামী একপ্রকার নিরুদ্দেশ। কি নিদারুণ বিরহদহনে সেই সময়ে গোপাদগ্ধ তাহা ভাবিয়া দেখ। ছন্দক সিদ্ধার্থের বেশ ভূষা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রমুখাৎ নিদারুণ সংবাদ অন্য সকলের ন্যায় গোপাও শ্রবণ করিলেন যে, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীবেশ ধরিয়াছেন, কঠোর তপস্বরণে রত হইয়াছেন,গোপা অবস্থানুরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। ধীরভাবে দয়িতের আত্মার ও ব্রতের অনুসরণে রত হইলেন। সিদ্ধার্থের আত্মার সঙ্গী এবং সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইলেন। আপনার কেশদাম আপনি কর্ত্তন করিলেন। মূল্যবান পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে লজ্জানিবারণ করিলেন। সুকোমল শয্যাসহ খট্টা ছাড়িয়া ভূমিতলে শিশুসন্তানসহ দিন যামিনী যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। একান্তমনে প্রাণে প্রাণে গোপার আত্মা সিদ্ধার্থের আত্মার অনুসরণ করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ কি আহার করেন, কি ভাবে কোথায় কালহরণ করেন, কাহার সঙ্গে কি প্রসঙ্গে প্রীত হয়েন, গোপা রাজান্তঃপুরের সুখসমৃদ্ধিরাশিমধ্যে থাকিয়াও তাহারই অনুধ্যানে মগ্ন। তিনি উপকরণবিহীন তণ্ডুল মাত্র ভোজন সার করিলেন। সর্ব্বপ্রকার ধাতুপাত্রের পরিবর্ত্তে সামান্য মৃৎপাত্র মাত্র ব্যবহার করিতেন। বলিতে কি গোপাদেবী পতির ধর্ম্মের অনুসরণার্থ সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনা বিনাশ ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

সীতা পতিব্রতা; গোপা পতির সহধর্ম্মিণী। সীতা পতিসঙ্গ সুখার্থিনী কিন্তু পতিবিরহানলে চিরদগ্ধা। গোপা পতির কুশলার্থিনী, দৈহিক বিরহে সহিষ্ণুপ্রকৃতি, অতএব পতিসঙ্গ বিরহিত অবস্থাতেও সন্তোষরসাভিষিক্তা সুতরাং সুধীরা। রামগত প্রাণ হইয়াও সীতা রামচন্দ্রের যোগধর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। পরন্তু গোপা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যেমন নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে জীবন শেষ করিলেন তৎসহধর্ম্মিণী গোপাও কালক্রমে এবিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রথমতঃ প্রচার কার্য্যের দৃষ্টান্ত জগৎকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের বাসনা ত্যাগাপেক্ষা যশোধারার বাসনাত্যাগ সমধিক প্রশংসনীয়। কেননা বুদ্ধদেব সেই নিয়তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপা কেবল পতির ধর্ম্মগ্রহণ উপলক্ষে অবলা হইয়াও বাসনাত্যাগের অপরাজিত শক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং ধর্ম্মসাধনে এবং পতির অবলম্বিত ধর্ম্মকে অনুরাগপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ বিষয়ে গোপা ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে অনন্যসাধারণ উদাহরণ।

সতীত্ব, শুদ্ধাচার এবং পাতিব্রত্যধর্ম্মে সীতা এবং গোপা উভয়েই সমকক্ষ। ধর্ম্মানুসরণে, ধর্ম্মসাধনে, ধ্যানে, বৈরাগ্যে, ধৈর্য্যে গোপাদেবী অতুলনীয়া। ভারত-ললনাকুলে তাঁহারা দেবী, অভিভাবিকা-স্বরূপ। অর্থাৎ ইংরেজগণ যাহাকে Guardian angel বলে সেই নামে অভিহিত হইতে পারেন।

তাঁহারা অধুনা স্বর্গলোকে থাকিয়া ভারতবর্ষীয়া নারীজাতির প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদেই এদেশীয় নারীসমাজে এরূপ শ্রী এবং গাম্ভীর্য্য, পবিত্রতা এবং ধর্ম্মানুরাগ।

তাঁহাদের পবিত্র মধুর চরিত-কথা ভারতীয়া আবাল বৃদ্ধা নারী মাত্রেরই অবশ্য স্মরণীয় বিষয়। সীতার প্রভাবে অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণ পতিব্রতা ধর্ম্মলাভে যত্নবতী। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মসাধনে কিম্বা প্রিয়তম পতির ধর্ম্মলাভার্থ যত্নযুক্ত, তাঁহারা যে গোপাদেবীর অনুসরণ করেন তাহা কি অবগত আছেন?

শ্রীঈ—

আহ্নিক।

সংসার প্রেম-বিদ্যালয়। এখানে যাহারা আগমন করে প্রেমই তাহাদের শিক্ষণীয় প্রধান বিষয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ও এখানে শিক্ষণীয় আছে। সেগুলির জ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানও প্রেমশিক্ষারই সহায়। ভক্ত বলেন "প্রীতিঃ পরম সাধনম্"। পরম বলিলেও হয়, চরম বলিলেও হয়; ফলতঃ প্রেমই মুখ্য বিষয়। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি প্রেমশিক্ষার আরম্ভ। দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কেহ এশিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। প্রেমের প্রথম শিক্ষা, গ্রহণে বা ঋণে। পরের শিক্ষা হয়, দানে বা সেবায়।

শিশু অজ্ঞান। কিন্তু মাতা পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ জ্ঞানবান। তাঁহারা শিশুর যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখ হয়, কোন প্রকারে কোন অভাবে তাহার ক্লেশ পাইতে না হয় তজ্জন্য সতত সতর্ক। স্নেহের সহিত প্রেমের সহিত—শিশুর সেবা শুশ্রূষায় তাঁহারা নিরত। একটি ক্ষুদ্র বীজ রোপণ করিয়াই গৃহস্থ যেমন তাহার উপরে বারিসিঞ্চন করিতে নিযুক্ত থাকে, শিশুর জন্মাবধি তেমন অভিভাবক অভিভাবিকারা তাহার জীবনের উপরে স্নেহধারা সিঞ্চন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। সুতরাং শিশু অজ্ঞানতার মধ্যে থাকিলেও প্রেমগ্রহণের দ্বারা প্রেমই শিখিতে থাকে। জ্ঞানলাভ হইলেই বালক বা যুবক দেখিতে পায় যে, প্রেম তাহাকে আগুলিয়া রহিয়াছে, প্রেম তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছে, প্রেম তাহার রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিপোষণে রত রহিয়াছে। দিবানিশি তাহার উপরে প্রেম বা স্নেহবারি বর্ষিত হইতেছে।

অনেকে (পাম্পিং) দমকলে পুকুর বা কূপাদি হইতে জলোত্তোলন ব্যাপার দেখিয়াছেন। শূন্যকল ঘুরাইলে কলে জল উঠে না। এজন্য যে নলের মুখ দিয়া জল উঠে, সেই নলের মুখে পূর্ব্বে কিছু

জল ঢালিয়া দিয়া কল ঘুরাইলে প্রদত্ত জলের আকর্ষণে জল উঠিতে আরম্ভ হয়। আমাদের হৃদয়ের উপরে পিতা মাতা প্রভৃতি স্নেহের জল ঢালিয়া দিতে থাকেন। সেই জলের আকর্ষণে হৃদয় কূপ হইতে প্রেম ও দয়ার জল আকৃষ্ট করা হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আমরা যে দয়া প্রাপ্ত হই, জ্ঞানোদয় হইলে হৃদয়ে প্রবিষ্ট সেই দয়াই, স্নেহরূপে প্রেমরূপে দয়ারূপে হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়া থাকে; এবং প্রেমাস্পদ প্রিয়জনের উপরে কিম্বা মনুষ্যজাতির উপরে তাহা পতিত হইতে থাকে। আমাদের জ্ঞানজন্মিবার পর প্রেমই জীবনের মঙ্গলব্রতরূপে উদ্যাপন করিয়া আমরা জীবনধারণ করি।

পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকের স্নেহ প্রীতির উৎপত্তি কোথায়? যেখানে সৃষ্টির সকলই উৎপন্ন, উহাও সেখানে উৎপন্ন। ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার প্রেমের নিদান। এ জন্য অন্য প্রকার জ্ঞান বুদ্ধির সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধেও জ্ঞানবৃদ্ধি যখন হইতে থাকে, মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতিও তখন প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতারস সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সকল দেশে সকল কালে মনুষ্যগণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে পিতা মাতার প্রতি যেমন ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তেমন ঈশ্বরের প্রতিও ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া থাকে।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যেই আহ্নিকের প্রচলন আছে। দেবোদ্দেশে সন্ধ্যা বন্দনাদির নামই আহ্নিক। যে কোন দেবতাকে যে কোন সম্প্রদায় আপনাদের সৃষ্টি স্থিতি ও বৃদ্ধির কারণ স্বীকার করে, সেই সম্প্রদায়, দিনের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই দেবতার প্রতি প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা এবং আত্মনিবেদন বা স্তব স্তুতি নিষ্ঠার সহিত প্রদান করিয়া থাকে। মনুষ্যজীবনের এই একটি অতি গুরুতর কার্য্য। সংসারে পিতা মাতা পতি সতী ও পুত্র কন্যা ভাই ভগিনীর প্রতি প্রীতি যেমন গুরুতর কর্ত্তব্য, আপনার স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দানও তেমন অত্যন্ত গুরুতর কর্ত্তব্য। মনুষ্যের জীবনই প্রেম ভক্তি সাধন জন্য। পরিবার পরিজনের প্রতি প্রেম সাধন না করিলে মনুষ্যসমাজে কেহ জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সাধন না করিলেও আপনার মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি পূর্ণ হইতে দিতে পারে না।

মহাজনগণ দেশে দেশে যুগে যুগে জন্মধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রেম কৃতজ্ঞতা সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাজনদের পথানুবর্ত্তী অসংখ্য নরনারী প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে আহ্নিক অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারে থাকিয়া বৈকুণ্ঠলাভের পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

আহ্নিক নিষ্ঠা অতি গুরুতর বিষয়। সকল দেশে সকল জাতিতে রমণী এবং গৃহিণীই আহ্নিক নিষ্ঠার জীবন্ত মূর্ত্তি। প্রীতি যে মনুষ্যের আকৃতি ও মুখশ্রীকে

সৌন্দর্য্য দান করে তাহা বলা বাহুল্য। ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা গৃহিণীদিগের মুখের সেই শ্রীতে লাবণ্যমাখা করিয়া তোলে। আমার এবং আমার সমবয়স্ক বন্ধুদের অনেকের জননীর মুখে নিত্য পূজা অনুষ্ঠানের পরে এমন নয়নরঞ্জন শোভা দেখিয়াছি যে অদ্যাবধি তাহা স্মরণ করিয়া পরম সুখ-লাভ করি। তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন; পুত্তলেরই পূজা অর্চ্চনা, স্তুতি বন্দনা প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে করিতেন। কিন্তু তথাপি ভক্তির এমনই মধুময়ী প্রভাব যে তাহা আশ্চর্য্যরূপে তাঁহাদের মুখশ্রীতে প্রকাশ পাইত।

নব্যসম্প্রদায় কি কুসংস্কারের সঙ্গে আহ্নিক নিষ্ঠাকে কুসংস্কার বলিবেন? আহ্নিক নিষ্ঠা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ না করিলে, যত্নসহকারে সাধন না করিলে নব্যসম্প্রদায়ে ইহার প্রভাব থাকিবে না।

পরিবারে বাস করিয়া পরস্পরের সেবাদ্বারা আমরা নিত্য প্রেমসাধন করিতেছি। ঈশ্বরকে স্বীকারপূর্ব্বক প্রতি-জন যদি প্রতিদিন স্তব স্তুতি ও আত্ম-নিবেদন সহযোগে ভক্তির সাধন প্রত্যহ না করেন কখন জীবনে শান্তি ও শুদ্ধতা অনুভব করিতে পারিবেন না।

নিয়মিত সময়ে প্রতি দিন ভক্তির সাধনকেই আহ্নিক বলা যায়। আহ্নিকে নিষ্ঠা নব্য সভ্যতা সমাগমের প্রলয়ঙ্কর কালে গৃহিণীগণের অবশ্য অবলম্বনীয় বিষয়। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রিয় পরিবারে এবং মনুষ্য সমাজমধ্যে বাস করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই সুযোগে প্রতি দিন নিষ্ঠায় সহিত সজ্ঞানে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি এবং মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রেম ও কৃতজ্ঞতাসাধনে যেন কেহ নিষ্ঠাহীন না হই।

রমণী গৃহের লক্ষ্মী এবং গৃহ রক্ষা-কারিণী। অথবা রমণীর প্রেমই মনুষ্য-জাতির গৃহপদে বাচ্য হইয়া থাকে। রমণীগণ যদি ভক্তিপ্রেম স্ব স্ব জীবনে সযত্নে রক্ষা করেন, তাঁহাদের আশ্রিত-জনেরা আশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহা অবশ্য লাভ করিবে। যে রমণীর জীবনে ভক্তি নাই সে রমণীর গৃহ বারিবিহীন জলাশয়-সদৃশ। গৃহরক্ষার ভার যাঁহাদের, ভক্তি রক্ষার ভারও তাঁহাদেরই। তাঁহারা ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে যাহাদিগকে আহার্য্য দান করিবেন, তাহারা শরীর পোষণের সহিত জীবনের পুষ্টি ভক্তি অমৃত ও প্রাপ্ত হইবে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না পাঠিকাগণ ক্ষণকাল চিন্তা করুন।

শ্রীঈ—

প্রাপ্ত।

(শ্রাদ্ধোপলক্ষে পঠিত)

স্বর্গীয়া বড়বধূ ঠাকুরাণী।

মার অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? ইনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইনি আমাদের পূজনীয়া ছিলেন। যদিও

তাঁহার মনুষ্যস্বভাবসুলভ দোষ দুর্ব্বলতা ছিল কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এত নিষ্ঠা ছিল যাহা সচরাচর দেখা যায় না। অত্যন্ত উপাসনা নিষ্ঠা ছিল। যখন আমরা পরিবার শুদ্ধ সকলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হই, তখন ইনি প্রধান সহায় ছিলেন। কুসংস্কার অতি কমই ছিল। প্রতি দিন উপাসনায় অতি সুমিষ্ট প্রার্থনা করিতেন। সে প্রার্থনা এত গভীর এবং হৃদয়স্পর্শী যে, মনে হইত ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। তাঁর পার্থিব কোন দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলিতেন না, কেবল বলিতেন, "মা তুমি আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও। তোমাতে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখ। তোমা বই আর মাথা রাখিবার স্থান নাই। তোমার আজ্ঞা সর্ব্বদা যেন পালন করিতে পারি। তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাই না।" এই ভাবের প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তাতে নূতনত্ব ছিল। বহু কথা ছিল না। এই সকল প্রার্থনা শুনিয়া উপাসনার ভাব সকলেরই যেন আরো সরস হইয়া উঠিত। সচরাচর যে ভাবে থাকিতেন, উপাসনায় সময় তাঁহার ভাব এক স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত। ইদানীং তাঁহার এই ভাব অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। সংসারের সুখ তাঁহার হয় নাই। চিরদিন দুঃখে দুঃখে কাটাইয়াছেন, তবু ভগবানের প্রতি কোন অবিশ্বাস বা সন্দেহ মনে পোষণ করেন নাই। আমাদের ধর্ম্মের সহায়তা কত করিয়াছেন। এই সকল ভাবিলে মনে হয়, তিনি যেন ইহলোক ছাড়িবেন বলিয়া গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁর চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ছিল। সতীত্ব ও লজ্জাশীলতায় তিনি অতি বিভূষিতা ছিলেন। বৈধব্য অবস্থায়ও প্রায় ২৪।২৫ বৎসর সংসারে অতি নিষ্ঠার সহিত কাটাইয়া গিয়াছেন। জীবনের উচ্চ ব্রত পালন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া প্রায় ৪০ বৎসর কাটাইয়াছেন! ভগবানের প্রতি ভক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁর গুণের আদর পৃথিবীতে হয় নাই, কিন্তু আশা করি, মা তাঁর কন্যাকে আপনার শান্তিক্রোড়ে স্থানদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। শুনিয়াছি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, এবং হরি হরি করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শেষ সময়ে আমাদিগকে দেখিবার জন্য খুব ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে আর দেখা হইল না। এখন মার চরণতলে আধ্যাত্মিক ভাবে দর্শন হইবে এইত চিরদিনের আশা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দ্বারকানাথ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাতে তাঁরও জীবন ধন্য হইয়াছে। প্রার্থনা করি এই মাতৃভক্তির যথার্থ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ইনি কৃতার্থ হউন। ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া সন্তানগণ মার উপযুক্ত সন্তান হইয়া জীবনকে কৃতার্থ করুন। ছোট ছেলেটি সংপ্রতি বিলাতে আছেন। না জানি এই ঘটনা শুনিয়া দূর দেশে একাকী তাঁর প্রাণ কতই আকুল হইবে। মা কৃপা করিয়া তাঁরও আত্মার সান্ত্বনা দান করুন, এই প্রার্থনা করি। তাঁর এখন

দুইটি পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান। সকলেই বিধানমণ্ডলীভুক্ত। তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি কারো নিকট আত্মসম্মান হারাইতেন না। কারো নিকটে ভিক্ষার্থী হইতে চাহিতেন না। অন্যের সহায়তা করা এবং সেবা করা তাঁর স্বাভাবিক গুণ ছিল। নিজের দুঃখ প্রায় কারো কাছে বলিতেন না। প্রার্থনা করি মা জগজ্জননী তাঁর কন্যাকে আপন শান্তি-ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া সকল দুঃখ, সকল কষ্ট নিবারণ করুন। আমাদেরও জীবন দিন দিন সেই অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হউক, এই প্রার্থনা করি। পরলোকের জন্য মা আমাদিগকে প্রস্তুত করুন। মা! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র তোমার পৃথিবীর কার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে প্রবেশ করিয়া ধন্য হইতে পারি। আর কি বলিব, মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীচন্দ্রমোহন কর্ম্মকার।

মহিলাদিগের রচনা।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা
এবং
তাহা পরিত্যাগের ও স্বভাবোন্নতির উপায়।

(রেঙ্গুণ মহিলা সমিতির অধিবেশনে পঠিত)

রমণীগণ দয়া, দাক্ষিণ্য, পতিভক্তি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য যেরূপ চিরপরিচিতা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, কলহ-প্রিয়তা প্রভৃতি কয়েকটী কুস্বভাবের জন্যও সেরূপ সুপ্রসিদ্ধা।

গুণোন্নতির আলোচনা হওয়া ভাল, কিন্তু কুস্বভাব সংশোধনের উপায় আলোচনা তদপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। সেই জন্যই আমি আমাদের সুস্বভাব গুলির আলোচনা না করিয়া কুস্বভাব গুলিরই আজ আলোচনা করিব। এবং যে দোষটী অল্পবিস্তর সকলেরই মধ্যে বর্ত্তমান তাহারই আলোচনা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনায় তাহারই সম্বন্ধে অদ্যকার অধিবেশনে দুই চারটী কথা বলিব মনে করিয়াছি।

সে দোষটী যে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হয়। এই কুস্বভাবটী আমাদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, আজ কাল এই রোগাক্রান্ত নন এমন রমণী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

দুইটী স্ত্রীলোক আমরা একত্র হইলেই পরের চরিত্রের, তাহাদের স্বামীর, পুত্র কন্যার, আত্মীয় স্বজনের অধিকন্তু তাহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের নিন্দা করিতে ছাড়ি না। এমনটী না হইলে আমাদের মজলিস্ জমে না ছেলের দুধ খাওয়াইবার সময় হইয়া যায় উঠি উঠি করিয়া উঠা হয় না, বৈকালিক খাবার প্রস্তুতের সময় কোনদিক দিয়া কথায় কথায় চলিয়া গিয়াছে ছেলেরা সময় মত খাবার পাইল না কাঁদিলে বড়রা রাগ করিলেন বাড়ীতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল।

সর্ব্বদা পরনিন্দা ও পরসমালোচনা

করিতে করিতে আমাদের এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে স্ত্রী স্বামীর, ভগ্নী ভ্রাতার, মাতা কন্যার ও কন্যা মাতার নিন্দা করিতেও বিমুখা হন না। সামান্য মৌখিক সুখের জন্য কর্ত্তব্যে বিস্মৃতি সংসারে অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মনান্তর এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আনয়ন করে।

রমণীরা যাঁহারা শাশুড়ীর গঞ্জনা, স্বামীর অনাদর, সংসারের দৈন্যতা হাসি মুখে বহন করেন, তাঁহাদেরই পক্ষে কি এই সামান্য মৌখিক সুখ যাহা সংসারের ও সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। পূর্ব্বে একথার আলোচনা নিজে কখন করি নাই। কিন্তু মাস দুয়েক পূর্ব্বে সমিতিতে "পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা না করিতে চেষ্টা করিব" এসম্বন্ধে ব্রত লইবার যখন একটা কথা উঠে তখন হইতে আমার মনে হইয়াছে কি করিলে সে ব্রত রক্ষার পক্ষে সাহায্য হইতে পারে।

আমার বোধ হয় পরের স্বভাব চরিত্রের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজেরও স্বভাব চরিত্রের সমালোচনা করি তখন নিজের দোষ সংশোধনের ইচ্ছা হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার ইচ্ছা অল্প হইতে অল্পতর হইয়া ক্রমেই চলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু সকলেই যে একই উপায়ে স্ব স্ব স্বভাব সংশোধন করিতে পারিবেন তাহা বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব বুঝিয়া তাহা সংশোধনের উপায় স্থির করিতে পারেন।

এসব কথা রমণীগণ যে প্রকারেই হোক্ যাঁহাদের স্বভাব চরিত্রের উন্নতি করিতে পারিলে নিজেদের মঙ্গল সংসারের মঙ্গল এবং সমাজের পক্ষেও মঙ্গলকর

পুষ্পমালা।

নববর্ষ।

(কেশবাশ্রম উদ্যানের সম্মুখে লিখিত)

আজি শুভ নব বরষের দিনে
এসেছি সকলে আনন্দিত মনে,
পুরাতন বর্ষ গিয়াছে চলিয়া
পুরাতন সব গিয়াছে মিশিয়া,
নূতন উদ্যমে নূতন আশায়
নূতন প্রাণেতে এসেছি হেথায়,
নূতন সঙ্গীতে নূতন পরাণে
ডাকিছে কোকিল ডাকিছে কাননে,
এই রম্য স্থানে সাধু ভক্তগণ
এই রম্য স্থানে সমাধি মগন,
এই রম্য স্থানে "ব্রহ্মানন্দ" স্মৃতি
এই রম্য স্থানে সেই যোগী মূর্ত্তি
প্রেম ভক্তি কত করে উদ্দীপন
আজি এই স্থানে নূতন জীবন।
আজি সবে মোরা নবীন বরষে
গাই তাঁর গুণ মনের হরষে,
ছোট শিশু মোরা নবীন বরষে
নমি তাঁর পদে মনের হরষে,
রচিত যাঁহার এই ক্ষুদ্র প্রাণ
নববর্ষে করি তাঁর গুণগান।

সুনীতি কলেজ
কুচবিহার
৫।২।০৯। } বিধান নন্দিনী মজুমদার

সংবাদ।

ভাগলপুরে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ক্রমে দুই দিন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জীবনের আশা বড় ছিল না। ঈশ্বরকৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি দুর্ব্বল ও একান্ত ভগ্নশরীরে কলিকাতায় পঁহুছিয়া তাঁহার নাতজামাই শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেনের ১৪৯।১নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট ভবনে কয়েক দিন হইল বাস করিতেছেন। সকলকে স্বহস্তে পত্র লেখা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ক্রমে স্বাস্থ্যোন্নতির আশা করা যাইতেছে। বড় বড় ডাক্তারগণ সামুদ্রিক শীতল বায়ু সেবনে এই রোগের উপশম হইবে এইরূপ বলিয়াছেন। তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা এক্ষণও হইয়া উঠে নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এপদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। ভারতসচিব লর্ড মলি গতবর্ষে স্বীয় কাউন্সিলে মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত ও বেলগ্রামী সাহেবকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবার সিংহ সাহেবকে ভারতগবর্ণমেণ্টের সদস্য মনোনীত করিয়া ভারতবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। বাঙ্গলা দেশের গৌরবের বিষয় যে ইহাঁদের দুজনই বাঙ্গালী এবং তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোক।

এবার কলিকাতায় বসন্তরোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কোন কোনও সপ্তাহে চারিশতেরও বেশী লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। বহুকাল এরূপ বসন্তের মড়ক দেখা যায় নাই।

কলিকাতা টাউনহলে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক মহাসভা হইয়াছিল। দ্বারবঙ্গের মহারাজা তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, জিহুদি, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করা এদেশের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। এ উপলক্ষে বিশ্বপতি বিশ্বরাজ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হইলে বড়ই ভাল হইত।

ময়ূরভঞ্জে একটী অনাথাশ্রম স্থাপিত হইতেছে। মহারাজা তজ্জন্য বার্ষিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। পিতৃমাতৃহীনদের আশ্রয়দাতাকে ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মানবহৃদয়ের তাড়িৎ।—মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গের চালনার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাড়িতবীক্ষণ ও তাড়িতমান যন্ত্রের দ্বারা ইহা ঠিক ধরা যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুলিকার ও মুলার তাড়িতের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য, তাড়িতমান যন্ত্রের দ্বারা একটা ভেকের হৃৎপিণ্ডের চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ একই উদ্দেশ্যে, মানবহৃৎপিণ্ডের তত্ত্বানুশীলন করিবার জন্য লিপমান তাঁহার কৈশিক তাড়িৎমান যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে দেহতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত

গুরাগার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-অনুযায়ী তাড়িতপ্রবাহ উৎপাদিত হয়। মনে কর, যদি কেহ এই তাড়িতমান যন্ত্রের উপর দুই হাত স্থাপন করেন, তাহা হইলে, সেই যন্ত্রের পারাবদ্ধ চোঙ্গের মধ্যে স্থাপিত একটি কৈশিক নলের ভিতর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও সঙ্কোচন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সহিত এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের সম্পূর্ণ মিল আছে হৃদয়ের এই স্পন্দন ক্রিয়া ফোটোচিত্রে উঠাইয়া লওয়া হয়। সেই চিত্রে গতিপ্রদর্শক একটা বক্ররেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্রটি এখন আরও সঠিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

(প্রবাসী)

মিথ্যা কথা ধরিবার যন্ত্র।—মনস্তত্ত্ববিৎ দুই জন পণ্ডিত,—জুরিচএর জং নিউ-এয়ারক্‌এর পিটারসেন, একটা বৈদ্যুতিক মনোমান যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; কেহ সত্য কথা বলিতেছে, কি মিথ্যা কথা বলিতেছে, সেই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্র-সরঞ্জামের মধ্যে একটি ধাতুজনিত তাড়িতমান যন্ত্র ও আর একটি বিশেষ কার্য্যসাধক যন্ত্র আছে ; এই বিশেষ প্রকারের যন্ত্রটিতে চিন্তা ও অনুভূতি সমূহের পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। একটা দীপের সহিত ঐ তাড়িতমান যন্ত্রের যোগ আছে ; বৈদ্যুতিক প্রবাহের বেগ অনুসারে ঐ দীপের শিখা ওঠে কিংবা নামে ; পরিমাণক্রম-চিহ্নিত একটা দর্পণে ঐ শিখা প্রতিবিম্বিত এবং উহার উচ্চতা পরিমাপিত হইয়া থাকে। পরীক্ষার পাত্র তাড়িতমান যন্ত্রের দস্তা-স্তূপের উপর এক হাত এবং তামার উপর আর এক হাত রাখিয়া দেন। উহা হইতে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, পরীক্ষা-পাত্রের মনোবিকারের তীব্রতা অনুসারে সেই তাড়িতবেগের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি তাঁহার মনে কোন মিথ্যা কথা থাকে অর্থাৎ কোন একটা কথা মনে করিয়া ইচ্ছা করিয়া যদি তাহা বদলান হয়, চিন্তা ও ইচ্ছা এই উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তদনুসারে তাড়িতপ্রবাহের বেগের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই জং ও পিটারসেনএর উদ্ভাবিত যন্ত্র। কিন্তু প্যারিসের তাড়িত পরীক্ষাগারের পরিচালক পোলযেনেট ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহা প্রদর্শিত হয় নাই, কতদূর পর্য্যন্ত, পরীক্ষা পাত্রের মানসিক অবস্থা, তাড়িতমান যন্ত্রের উপর স্বকীয় প্রভাব প্রকটিত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হস্তের আর্দ্রতা ন্যূনাধিক পরিমাণে, মাংসপেশীর টান্ ন্যূনাধিক পরিমাণে তাড়িতমান যন্ত্রকে বিচলিত করিতে পারে ও তাড়িতপ্রবাহে পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। সারবনের মনস্তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক ডুমাস আরও বলেন যে, এই পরীক্ষায় যে বৈজ্ঞানিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা এতই সূক্ষ্ম ও সুকুমার ধরণের যে এই পরীক্ষা হইতে কোন সঠিক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। ঐ

আহত-অন্বেষণকারী কুকুর।—যুদ্ধে আহত হইলে অনেক সময় ডুলি-বেহারা জানিতে পারে না, কোথায় কে আহত হইয়া পড়িয়া আছে ; এবং তাহাদিগকে তখনই উঠাইয়া লইতে না পারিলে, প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন আশা থাকে না। এই কারণে, ইঙ্গ বুয়ার যুদ্ধে, রুস-জাপানী যুদ্ধে, কুকুরের ঘ্রাণশক্তির সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তাই কুকুরকে এই কাজে নিয়োগ করিবার জন্য আজকাল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ফ্রান্সের যুদ্ধ, কৃষি ও উপনিবেশ বিভাগের সচিবের আশ্রয়াধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা গঠিত হইয়াছে প্যারিসে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ঐ
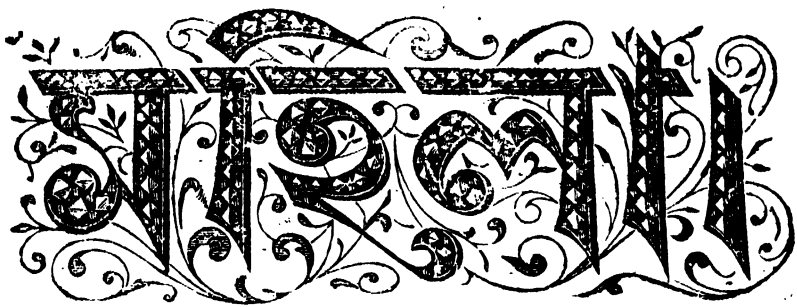
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩১৬, মে ১৯০৯। [১০ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

মানবজাতির জননী স্ত্রীলোক। আমরা সকলেই জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, জননী-বক্ষে প্রতিপালিত হইয়াছি, জননীর স্তন্যপানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। জননীর রক্ত, জননীর স্নেহ এখনও আমাদের দেহ আত্মার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। এমন যে মানবজাতির উৎপত্তি স্থিতির হেতু স্বরূপা জননী তাঁহাকে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ কাহারো অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। মাতৃভক্তি মানবজাতির ভূষণ।

মা, তুমি আপনাকেও হেয় নীচ ভাবিও না। তুমি ব্রহ্মকন্যা। তোমার উচ্চ অধিকারের কথা স্মরণ রাখিও। নরকুলভূষণ নরনারী সকলেই তোমার গর্ভজাত, ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ, মেরী, মণিকা, সুজাতা সকলেই জননী ক্রোড়ে পালিত। তুমি স্বকৃতি, প্রেমপ্রকৃতি, দেবী হইলে তোমার গর্ভে দেবতার জন্ম হইবে। পৃথিবীকে উন্নত লোকে পরিণত করিবার ভার তোমার উপর। তুমি ভগবদ্ভক্ত প্রেমিকা হইলে, মনুষ্যকুল ভগবদ্ভক্ত প্রেমিক হইবে, তোমার আত্মা নির্ম্মল হইলে মানবজাতি শুদ্ধ হইবে, তোমার আত্মা দিব্যালোকে আলোকিত হইলে, মনুষ্যজাতির মনের অন্ধকার চলিয়া যাইবে। তোমার কত বড় দায়িত্ব, তাহা স্মরণ কর এবং স্বীয় জীবনকে সমুন্নত কর।

বর্ত্তমানকালের অনেক পরিবারে দেবার্চ্চনা বন্দনার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন কতকগুলি কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। এ সকল পরিবারে বাহ্য সভ্যতার চাকচিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের মন বড় শুষ্ক। মনের সরসতা আনন্দলাভ আনন্দময় দেবতার অর্চ্চনা ভিন্ন হয় না। সুখী পরিবার গড়িতে হইলে সর্ব্বাগ্রে

পরিবারে দেবার্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়েও নারীর দায়িত্ব অধিক। নারী-প্রকৃতি ধর্ম্ম-প্রবণ। নারী আপনার হৃদয়ে বিশ্বনাথকে স্থাপন করিবেন, পারিবারিক বেদীকাতে বিশ্বপতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামী সন্তানসহ প্রতিদিন তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন; গৃহ শুদ্ধ ও মধুময় হইবে।

স্ত্রীলোক সত্যবাদিনী ও স্বল্পভাষিনী হইবেন। কথা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকারী। নারী আপনার কথা ব্যবহারে যদি সত্যের অনুসরণ করেন, তাঁহার সত্যপরায়ণতা সন্তানগণে বর্ত্তিবে। বংশপরম্পরা সেই সত্যপরায়ণতার স্রোত প্রবাহিত হইবে।

শ্রীবৈ—

৺ সম্পাদক।

মা চারু,

আমি যে কি প্রকার সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছি বোধ করি তোমার তাহা অবিদিত নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় আমি মহিলা কিছুতেই সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি মহিলার জন্য দুই একটী প্রবন্ধ দিবে। অন্য বন্ধুগণ যে সকল প্রবন্ধ দিবেন তুমি তাহার প্রুফ দেখিয়া দিবে। ফাল্গুন মাসের মহিলাতে আমি দুই ছত্রও লিখিতে পারি নাই। বিহারী বাবুকে মহিলার কাজ চালাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তোমার প্রতি ভার দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আপাততঃ যে যে নারীহিতৈষী বন্ধু দয়া করিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন, তুমি তাহা দেখিয়া যেটার পরে যে প্রবন্ধ যাইবে তাহা Compose করিতে দিবে, এবং প্রুফ দেখিয়া দিবে। বিহারী বাবু বিশেষ করিয়া তোমার কথা আমাকে বলিয়াছেন। মহিলাসম্পাদনের ভার আমি প্রেরিত দরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণ আমি তাহা সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। অসার আমোদ গল্প উপন্যাস দ্বারা মহিলার অসারতা বৃদ্ধি করা ও বৃথা আমোদের দিকে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করা মহিলাসম্পাদনের উদ্দেশ্য নয়। সতীসাধ্বী আর্য্যনারীদিগের সুনীতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার দিকে তাঁহাদের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহাদের জীবন সমুন্নত ও সুখী হয় যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমার লক্ষ্য সেই দিকে, যিনি মহিলা সম্পাদন করিবেন, আমার ইচ্ছা যে সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

আমি জানি না। মহিলাসম্পাদন করিতে আমি পুনরায় সক্ষম হইব কি না। আপাততঃ তুমি স্বীয় পিতৃদেবের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইলে বিশেষ সুখী ও বাধিত হইব। আমি বর্ত্তমান অবস্থায় মহিলা চালাইব বিধাতার এরূপ ইঙ্গিত বুঝিতেছি না। শরীর সুস্থ ও সবল হইলে, এবং দরবারের ইচ্ছা হইলে

পুনর্ব্বার কার্য্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে না।

এই পত্র পাপ্তিমাত্র আমাকে তোমার ইচ্ছা পত্র লিখিয়া জানাইবে। একখানা টিকেট সেই জন্য পত্রের সঙ্গে দেওয়া গেল মহিলাদের রচনা তুমি অনেক পাবে। শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিবাবু মেনেজার, টাকা পয়সা ও হিসাব পত্রাদির সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে মেছুওয়াবাজার রোড ৮৪.২ নং ভিক্টোরিয়া নারীবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুমারী চারুবালা নিয়োগী লিখিয়াছেন,—

শ্রীচরণেষু ;—

"আপনার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার অসুখের কথা শুনিয়াছিলাম, আপনি এখন কেমন আছেন? আপনি লেখা ও প্রুফ দেখিয়া দিতে বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়া দিব। আপনার শরীর এখন যে রকম, আপনি এ সকল বিষয় অত ভাবিবেন না। আপনার যাওয়ার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল। গোলমালে হ'য়ে উঠে নাই। আপনি এখন কি খান? বেড়াতে পারেন কি? মহিলার জন্য আপনি ভাবিবেন না।"

আপনার স্নেহের
ভাঁজু।

স্বর্গীয় ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার বৌমা।

(ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত)

যতই আমরা এ পৃথিবীতে প্রাচীন হইতেছি ততই আমরা এক এক করিয়া বহুদিনের বিশ্বাসী ভক্ত বন্ধুদিগকে এখানে হারাইতেছি। ভাগলপুরের ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এক জন অত্যন্ত প্রাণের ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন, আমরা তাঁহার দ্বারা কতরূপে বিশেষভাবে উপকৃত। তাঁহার বিশ্বাস, বৈরাগ্য, নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন ব্রাহ্ম সাধারণকে—বিশেষভাবে আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। তিনি বহুকালযাবৎ বিপত্নীক হইয়া কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরলোকে তাঁহার খুব উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল। পারিবারিক সমুদায় অনুষ্ঠান তিনি নব সংহিতার ঠিক ব্যবস্থামত সম্পাদন করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনিই একজন যথার্থ নববিধানবিশ্বাসী ভক্ত। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার এই দুর্ব্বল শরীরে ডাক্তার নকুড় বাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহাই পত্রিকাস্থ করিলাম। আমরা কয়েকদিন যথাবিধি শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া গত মঙ্গলবার পারিবারিক উপাসনালয়ে তাঁহার পবিত্র আত্মার সহিত চিরসম্মিলনের জন্য বিশেষভাবে উপাসনা করিয়াছি। পরলোকগত আত্মা সদলে মিলিয়া দিন দিন আনন্দ সম্ভোগ করুন। তিনি পৃথিবীতে যে ৬ ছয়টী পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলে ভগ-

বালের আশীর্ব্বাদে পিতার ধর্ম্মলাভ করিয়া সুখী হউন এই প্রার্থনা।

ভাগলপুর হইতে শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর সরকার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"গত ২০শে এপ্রেল মঙ্গলবার রাত্রি ৮॥০ টার সময় হঠাৎ হার্টফেইল হওয়ায় ডাক্তার নকুড় বাবু পরলোকে গমন করিয়াছেন। পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রেরা কেহই আসিয়া পঁহুছেন নাই।" ডাক্তার নকুড় বাবুর বয়ঃক্রম শুনিয়াছি ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই বয়সে জরা বার্দ্ধক্যে অভিভূত হইয়া ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ অপেক্ষা দুর্ব্বল ও একান্ত শিশু প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন নববিধানবিশ্বাসী ভক্ত লোক ছিলেন। ভাগলপুরের ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য নববিধানানুযায়ী হইতেছে না দেখিয়া সেই মন্দিরের সঙ্গে সামাজিক উপাসনার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রতি রবিবার প্রাতে জলাবাঙ্গলাতে বিধানবিশ্বাসী সাধক শ্রদ্ধাস্পদ হরিসুন্দর বসু মহাশয় সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন। ডাক্তার বাবু মৃতের পুত্রবধূসহ যাইয়া সেই উপাসনায় যোগদান করিতেন। প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে তাঁহার আগ্রহমতে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া হরিসুন্দর বাবু উপাসনার কার্য্য করিতেন। তাঁহার গমনাগমনের জন্য গাড়ী নিযুক্ত থাকিত। ডাক্তার বাবুর আবাসের অন্তর্গত নিত্য উপাসনার জন্য একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট, সেই গৃহে পারিবারিক বেদীর উপর শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক, সঙ্গীত ও প্রার্থনা পুস্তকাদি স্থাপিত। সেখানে তিনি স্নেহের মধ্যম পুত্রবধূর সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন ; উপাসনার প্রথম অংশ ধীরে ধীরে নিজে সম্পাদন করিতেন, শেষাংশ শ্লোক পাঠ ইত্যাদি পুত্রবধূ দ্বারা সম্পাদিত হইত। আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠের পর শান্তিবাচন হইত। ইদানীং তাঁহার বড় অরুচি ছিল, তিনি দুগ্ধ ও বেদানার উপর জীবনধারণ করিতেছিলেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রায় স্পর্শ করিতেন না, দুগ্ধ দুই সের আড়াই সের পান করিতেন। মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর তাঁহার আগ্রহানুসারে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত আচার্য্যদেবের জীবনচরিত পুত্রবধূ পড়িতেন, তিনি শ্রবণ করিতেন ; রাত্রিতে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ শ্রবণ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিতেন ইহা তাঁহার জীবনের নিত্য ক্রিয়া ছিল। তিনি খ্রীষ্টের ও চৈতন্যের জন্মোৎসবাদিতে এবং শারদীয় উৎসবের তিন দিবস হরসুন্দর বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উৎসব সম্ভোগ করিতেন ; সমস্ত উৎসবেই পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, কেবল মহাপুরুষ মোহম্মদের জন্মোৎসবে রোগদৌর্ব্বল্যবশতঃ যাইয়া যোগদান করিতে পারেন নাই।

ডাক্তার বাবুর জামাতা অপার বর্ম্মার অন্তর্গত পীনমানায় থাকেন, তিনি তথাকার একজন প্রধান এডভোকেট তাঁহার আর্থিক বেশ স্বচ্ছল অবস্থা, তাঁহার পত্নী প্রফুল্লকুমারীর বহুকাল হইতে একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ ছিল যে, কিছুদিন আমাকে ও তাঁহার পিতৃদেবকে পীনমানাতে নিজের গৃহে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি তথায় যাইতে সম্মত

হই। আমি বর্ম্মায় যাইতেছি শুনিয়া আমার সঙ্গে ডাক্তার বাবু সহযাত্রী হইয়া যাইতে সম্মত হন। ৮ই জানুয়ারী মালদহ-নামক জাহাজে বর্ম্মার অভিমুখে আমরা যাত্রা করি। সেই দিন সৌভাগ্যে সেই জাহাজে বসন্তকুমার ও প্রফুল্লকুমারীর সঙ্গে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণাভিমুখে যাত্রা করা যায়। ৮ই জানুয়ারী আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের দিন, সেই দিনের উপযোগী আমাদের যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা জাহাজেই সম্পাদন করি। ডাক্তার বাবুর একটীও দন্ত ছিল না, কন্যা নেওয়া নেও ভাত চটকাইয়া গ্রাস প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত পিতাকে খাওয়াইতেন। আমরা ৪ দিন সাগরবক্ষে জাহাজে সম্মিলিত উপাসনাদি করিয়াছিলাম। রেঙ্গুণে পঁহুছিয়াই সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে পীনমানায় যাত্রা করা যায়। ১১ই মাঘের উৎসব পীনমানাতে সম্পাদন করার প্রস্তাব ধার্য্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার বাবু অসুখ বোধ করাতে টাঙ্গুনগরে অন্যতর পুত্র এডভোকেট সুরেন্দ্রের নিকটে চলিয়া যান। তিনি ১১ই মাঘের পূর্ব্বদিন পুত্র সুরেন্দ্র ও পুত্রবধূ সুবোধবালা এবং কনিষ্ঠ পুত্র এডভোকেট বিনয়েন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বেশ উৎসব হয়। সেই দিন বিনয়েন্দ্র নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হন। আমি প্রায় এক মাসান্তে পীনমানা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় সপ্তাহকাল ডাক্তার বাবুর সঙ্গে টাঙ্গুতে ছিলাম। আমি বিকালবেলা টাঙ্গু ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি উক্ত শ্রদ্ধের বৃদ্ধ বন্ধু ষ্টেশন হইতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য প্লাটফরমে ট্রেণ পঁহুছিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি সেখানে পুত্রবধূ শ্রীমতী সুবোধবালার যেন আঁচলধরা শিশু হইয়াছিলেন, সর্ব্বদাও বৌমা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেন। খাইবার সময় বৌমা নিকটে বসিয়া খাওয়াইতেন। বৌমা ব্যতীত পৃথিবীতে তাঁহার যেন অন্য কোন আশ্রয় ও আত্মীয় ছিল না, বৌমা তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি বল সমুদয় ছিল। সেখানে তাঁহার ছোট নাতনীর নামকরণ হয়।

কলিকাতা এবং বাড়ীতে আমার শ্বাসকৃচ্ছ্রের পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তথায় থাকাতে জীবন-রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ভাবিয়া নানাস্থানে বন্ধু বান্ধবদিগের বাড়ীতে কিছুদিন আশ্রয়-গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কোথাও সুবিধা না হওয়াতে একেবারে ভাগলপুরে নকুড় বাবুর বাড়ীতে চলিয়া যাই। বাড়ীটী নগরের এক প্রান্তে ভাগীরথীর অনতিদূরে, অতি নির্জ্জন, প্রাকৃতিক দৃশ্যও রমণীয়, চারি দিক খোলা, সেখানে প্রমুক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারিব ভাবিয়া ডাক্তার বাবুর অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া নিজ-গৃহের ন্যায় মনে করিয়া উপস্থিত হই। তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করেন। সেখানে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই দুই দিন আমার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমার জীবনের আশা বড় ছিল না। প্রথম দিন ডাক্তার বাবু অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস নাড়ী ভাল আছে বলিয়া খুব সাহস প্রকাশ

করিয়াছিলেন। যাহা হউক ঈশ্বরকৃপায় দুই দিনই রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। সেই সময় ডাক্তার বাবুরও ভয়ঙ্কর মাথার অসুখ ও উদারময় হয়। এক এক দিন দিবা-রাত্রিতে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার বৌমা নলিনীবালা এক ঘণ্টার জন্যও ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারেন নাই। বৌমার এরূপ অক্লান্তভাবে শ্বশুরের সেবা করা আমি কখনও দেখি নাই, শুনি নাই। চাকরগুলি প্রায় সকলেই নিতান্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য কোন কাজ করিতে হইবে ভাবিয়া দশবার ডাকিলেও উত্তর দিত না। বৌমার খাটুনী দেখিয়া এক এক সময় ডাক্তার বাবুর প্রতি আমার রাগ হইত। আত্মীয় স্বজন নগরের ভিতর প্রায় এক মাইল দূরে ছিলেন। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের সাহায্য সময়মত পাওয়া যাইত না। দুই পুত্র বিলাতে শিক্ষিত ডাক্তার, বিলাত হইতে প্রত্যাগত. তিনি অন্তিমকালে তাঁহাদের কাহা ও সেবা ও সাহায্য পাইলেন না। সর্ব্বদা ভুল বলিতেন ও আর্ত্তনাদ করিতেন। সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই একা বৌমা উপস্থিত। ধন্য বৌমার সেবাপ্রিয়তা, ধন্য তাঁহার শ্বশুরের প্রতি ভক্তি ও ধন্য সহিষ্ণুতা।

টঙ্গুতে তিনি ওলাউঠা রোগ শেষকালে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল অবস্থায় ভাগলপুরে ফিরিয়া আইসেন। পূর্ব্বে তিনি রাজমহলে ও ভাগলপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, অতঃপর গবর্ণমেণ্টের কাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় চালান। তাঁহার বিস্তৃত পসার ছিল। গঙ্গার ধারের নির্জ্জন বাড়ীতে থাকিয়াও চিকিৎসা দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মবন্ধুদের পরিবার হইতে তিনি অর্থের প্রত্যাশী ছিলেন না। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোকের ১২ বৎসর বয়সের বধূর প্রসবকালে শিশুর হাত প্রথমে বাহির হয়, সেই অবস্থায় ডাক্তার বাবু ভিতরে অস্ত্র চালনা করিয়া শিশুকে কাটিয়া বাহির করিয়া প্রসূতিকে রক্ষা করেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ছিল। বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি বোরাসিক এসিড ৫ গ্রেণ এক আউন্স জল ডাক্তারী সাঙ্কেতিক অক্ষরে এক ঘণ্টা গলদঘর্ম্ম কলেবরেও লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের ৩টি বিশেষ সঙ্কল্প ছিল। একটী সুপাত্রীর সঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়েন্দ্রকে বিবাহ দান। ২য় হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী এবং এলোপ্যাথীর সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনা করিয়া পুস্তক প্রচার; এই পুস্তক বহু পরিশ্রমে লিখিয়াছিলেন, প্রুফ দেখার লোকের অভাবে এ পর্যন্ত ছাপা হইতে পারে নাই ৩য় চুঁচড়া নগরের নিজ সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক সেই অর্থে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া চুঁচড়ায় নববিধান স্থায়িরূপে প্রচার করা। তাহার ট্রষ্টডিড লেখা পড়া হইয়া কাগজপত্র উকিলের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সেই সম্পত্তি চারি হাজার টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

প্রতি সপ্তাহে একজন নববিধান প্রচারক চুঁচুড়ায় নববিধানমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য গমনাগমন করিবার পাথেয় বাবতে সেই টাকা ব্যয় হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারণ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শৈথিল্য ও গোলযোগে সেই কার্য্যও তিনি সুসম্পন্ন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার জন্য তিনি একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। এক্ষণ তাঁহার পুত্রগণ পিতৃসঙ্কল্প অচিরে পূর্ণ করেন এই প্রার্থনা। বিধান-বিশ্বাসী ডাক্তার নকুড় বাবু যুক্তি তর্ক ও বক্তৃতাদির আড়ম্বর জানিতেন না। তিনি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় বিনীত ও সরল ছিলেন। শিশুত্বেই তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য ছিল। তিনি বেদীতে বসিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন না। ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় অতি সারল্যে তাঁহার জীবন শত উপদেশের কার্য্য করিয়াছে। বিধানবিশ্বাসী সাধকদিগের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গাদি করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল তজ্জন্য তিনি কয়েক বার কিছু কাল ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারকে নিজের বাড়ীতে আদরপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন, এবারও তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কয়েক দিন ভীষণ গরমের জন্য কিয়ৎক্ষণ বাহিরে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রোঙ্কাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, সর্ব্বদা ভুল বলিতে থাকেন। তখন স্নেহের বৌমা পৃথিবীতে তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল, স্বর্গে আনন্দময়ী মাতাকে সার করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র শিশুর জীবন কিরূপ হয়, নকুড় বাবুর সুন্দর জীবন দেখ। বিদ্যা ও ক্ষমতার গৌরব তাঁহার কিছুই ছিল না। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, শিশুরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। শিশু না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ডাক্তার নকুড় বাবুর শিশু-প্রকৃতি সেই কথারই প্রমাণ করিতেছে। আমি ভাগলপুরের দুঃসহ উত্তাপ মোশা ও ছারপোকার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইলেই কলিকাতাভিমুখে গমনে উদ্যোগী হই, ১০ই শনিবার যাত্রা করি। সেদিন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বাবু অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। তাঁহার নিকটে বিদায়ের প্রার্থনা জানাইলে বলিলেন, আপনি বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া থাকিলে গমন করুন আশীর্ব্বাদ করিবেন। ডাক্তার মতিবাবুকে আমার নমস্কার জানাইবেন।” তাহার তিন দিন পরেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা। *

প্রথম অধ্যায়।

পাদ্রীনন্দিনী।

লণ্ডননগরের লোকবহুল অংশ বিশেষে টেম্পল বারের একটু উত্তর দিকে অনেক

---

* মিসেস্ হেনরি উড প্রণীত উক্ত নামধেয় পুস্তক হইতে ইহা অনুবাদিত। কল্পিত উপাখ্যান হইলেও ইহাতে মহিলাদের শিক্ষনীয় অনেক বিষয় আছে। ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞা পাঠিকাদের জন্য, ইহা “মহিলা”য় সন্নিবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বৎসর পূর্ব্বে, অন্যান্য ধর্ম্মমন্দির সমূহের মধ্যে একটী অনুচ্চ ও অতি প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দির অবস্থিত ছিল। লণ্ডন নগর ঈদৃশ মন্দির সমূহে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। ডিসেম্বর মাসের কোনও এক তামসী সন্ধ্যায় উল্লিখিত অনুচ্চ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারদেশ ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল, এবং তদভ্যন্তরে একটি আলো মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল।

মন্দিরের ভিতরভাগে কি হইতেছিল এবং কেনইবা তখন তথায় আলোক ছিল, ইহা সকলেই জানিত। রেক্টর বা ধর্ম্মযাজক সে দিন সাপ্তাহিক রুটী বিতরণ করিতেছিলেন। জনৈক বদান্য ভদ্রলোক কিছু অর্থদান করিয়াছিলেন; সেই অর্থ হইতে প্রতি সপ্তাহে কুড়ি জন দরিদ্র বিধবাকে কুড়ি খানা রুটী বিতরণ করা হইত। এই দান ও রুটী বিতরণের কতকগুলি অদ্ভুত সর্ত্ত ছিল। তন্মধ্যে একটি সর্ত্ত এই ছিল যে, দাতব্য রুটীগুলি অন্যূন দুই দিবস পূর্ব্বের তৈয়ারী হওয়া চাই এবং বিতরণের অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওগুলি মন্দিরে আনিয়া রাখিতে হইবে। অপর একটি সর্ত্তানুসারে দান গ্রহীত্রীকে স্বয়ং আসিয়া রুটী নিতে হইবে, তাহাতে অক্ষম হইলে; যতই অনিবার্য্য কারণ থাকুক না কেন, অনুপস্থিত ব্যক্তি তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য অংশলাভে বঞ্চিত হইবে, তাহার কোনও বন্ধু আসিয়া তাহার ভাগ লইয়া যাইতে পারিবে না, অথবা উহা তাহার গৃহে তাহাকে প্রেরণ করা হইবে না। এরূপ অবস্থায় বিতরণকারী ধর্ম্মযাজক তাঁহার ইচ্ছামত উপস্থিত অপর কোনও "অপরিচিতা" বিধবাকে উক্ত রুটী দিতে পারিবেন। দানের বহিতে যে নির্দ্দিষ্ট কুড়ি জনের নাম লিখিত ছিল, তদ্ব্যতীত অপর যে কোনও বিধবাকে এ স্থলে "অপরিচিতা" বলা হইল। বৎসরের মধ্যে চারি বার রুটীর সঙ্গে এক একটী শিলিং মুদ্রা প্রতি বিধবাকে দেওয়া হইত।

এক খানা রুটী বড় বিশেষ কিছুই নয়। আমরা সতত সচ্ছলভাবে সুরম্য হর্ম্ম্যাবাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, আমাদের নিকট, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু এই লণ্ডন নগরেই এমন বিস্তর শ্রান্ত, ক্লান্ত, অনশনক্লিষ্ট লোক আছে, যাহাদিগকে একখানা সামান্য রুটী আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবন দান করিতে পারে। দীনহীন অসহায় লোক অতি প্রাচীন কালেও ছিল, এখনও আছে এবং চির দিনই থাকিবে। সুতরাং ইহা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, আজ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে এক পাল বিধবা সমবেত হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই বৃদ্ধা ও ঘোর দরিদ্র-দশাপন্না। রুটী বিতরণ স্থানের চারিদিক্ ঘিরিয়া এই বিধবাকুল দাঁড়াইয়াছে এবং প্রত্যেকেই আশা করিতেছে, নিরূপিত কুড়ি জন বিধবামধ্যে হয়ত কেহ অনুপস্থিত থাকিতে পারে, তাহলেই কেরাণী আসিয়া সম্ভবতঃ তাহারই নাম ধরিয়া ডাকিবেন এবং মন্দিরাভ্যন্তরে তাহাকে লইয়া গিয়া অনুপস্থিত বিধবার পরিবর্ত্তে তাহাকেই রুটী সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

বৎসরের যে যে দিনে রুটির সঙ্গে শিলিং-মুদ্রা দিবার কথা, তত্তৎদিনে এই জনতার সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রতি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে এই বিতরণকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন যথা-নির্দ্দিষ্ট অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে রেক্টর মহোদয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকে একটু বেশী জনতা ভেদ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল কারণ আজ শিলিং বিতরণের দিন। তিনি উপস্থিত বিধবাদের সকলকেই চিনিতেন, তাহাদের নাম ধাম সমস্তই তাঁহার বিদিত ছিল, কারণ রেভারেণ্ড ফ্রান্সিস্ টেট্ একজন বিশেষ পরিশ্রমী পাদ্রী ছিলেন, আর তখনকার দিনে, আজ কালের ন্যায় শ্রমপরায়ণ পাদ্রীর সংখ্যা নিতান্তই বিরল ছিল।

ইনি স্কট্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডেই প্রধানতঃ প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। যথা নির্দ্দিষ্ট বয়সে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং লণ্ডনের কোনও এক পল্লীর কিউরেটের পদে বৃত হন। এই স্থলে তাঁহাকে অত্যন্ত খাটিতে হইত এবং তৎকালে তাঁহার আয়ও অতি সামান্য ছিল। ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে তাঁহার খাটুনি বেশী ছিল এমন নহে, তাঁহার পল্লীতে শুধুই দরিদ্র লোকের বসতি ছিল। ধর্ম্মযাজক সহানুভূতিপূর্ণ ও বিবেকসম্পন্ন হইলে, কর্ত্তব্য কত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হয়, যাঁহারা তাঁহার ঊর্দ্ধ দরিদ্রপল্লী ও অধিবাসিগণের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন, একমাত্র তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। ক্রমাগত বিংশতিবর্ষব্যাপিয়া তাঁহাকে কিউরেটের পদেই থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সুদীর্ঘকাল তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত শ্রম করিয়া গিয়াছেন, উৎফুল্ল ও আশান্বিত হৃদয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রতীক্ষা করিয়াছেন। বিশ বৎসর! লিখিতে ইহা অতি সহজ, কিন্তু এতকাল এরূপ ভাবে জীবনধারণ করা বড়ই কঠোর কার্য্য। ফ্রান্সিস্ টেট্ তাঁহার অবিচলিত আশা ও উৎসাহের মধ্যেও সময় সময় ঐ কঠোরতা উপলব্ধি না করিয়াছেন, এমন নয়। অবশেষে অভিলষিত উন্নতি সমাগত হইল। তাঁহার ধর্ম্মমন্দিরের অধীকারভুক্ত সমস্ত পল্লীর আয় অতঃপর তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। অন্যান্য পল্লীর আয়ের তুলনায়, এই আয় অতি সামান্য, অধিবাসিগণের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, এ অতি দরিদ্র পল্লী। তথাপি কিউরেটরূপে তাঁহার যে আয় ছিল, বর্ত্তমান উন্নতিতে তাঁহার আয় ঐশ্বর্য্যরূপে প্রতিভাত হইল। পল্লীবাসিগণ দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু তিনি এতদপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী পল্লীর কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন না। অতঃপর রেভারেণ্ড ফ্রান্সিস টেট্ পরিণয়াবদ্ধ হইলেন। ইহার পর আরও বিশ বৎসর চলিয়া গেল।

কথিত সায়ংকালে তিনি মন্দিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার মস্তকের একটু উপরিভাগে, মন্দিরের দ্বারদেশের সান্নিধ্যে, একটী শেল্ফের উপর বিতরণীয় রুটীগুলি সজ্জিত ছিল। তাঁহার ও

তাঁহার অপর পার্শ্বস্থ গবাক্ষনিচয়ের মধ্যবর্ত্তী একখানা ছোট টেবিলের উপর একটী চঞ্চল মোমবাতি জ্বলতেছিল, বাতির শলিতা অনেকটা দূর পুড়িয়া গিয়াও শিখা মধ্যে লম্বভাবে দণ্ডায়মান ছিল। ফ্রান্সিস্ টেটের বয়স এক্ষণ ৬৫ বৎসর, তাঁহার মস্তক কেশ-শূন্য, নাতিদীর্ঘ দেহ, পরিচ্ছন্ন ত্বক্, প্রতিভাসম্পন্ন মুখমণ্ডল ও মনোহর অক্ষিযুগলে চিন্তাশীলতা সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান। একটী মিষ্টকথা অথবা সস্নেহ প্রশ্নের সহিত তিনি এক একটী শিলিং প্রত্যেক বিধবাকে দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার খঞ্জ বৃদ্ধ কেরাণী তৎসঙ্গে সঙ্গে রুটী বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যখন এই বিতরণ কার্য্য চলিতেছিল, তখন ফ্রান্সিস্ টেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই কি উপস্থিত আছ?"

বহুকণ্ঠে সমস্বরে উত্তর হইল, "না মহাশয়, বেটীকিং আসে নাই।"

"কেন, তাহার কি হইয়াছে?"

"তাকে বাতে ধ'রেছে, সে কিছুতেই এখানে আস্‌তে পাল্লে না, সম্ভবতঃ সে শয্যাগত আছে।"

"তা হ'লে, আমি একবার গিয়ে তাকে দেখে আস্‌ব। হাঁ, মার্থা, আবার তুমি এখানে এসেছ?" সকলের পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা নিক্রান্তা একটী বিকলাঙ্গ রমণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি শেষোক্ত প্রশ্ন করিলেন, এবং বলিলেন, "তোমায় দেখে সন্তুষ্ট হ'লেম।"

রমণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আজ এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে একদিনও আমি আস্‌তে পারিনি। কিন্তু আমি অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ ক'রেছি।"

এই সময়ে বিতরণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। রেক্টর তখন তাঁহার কেরাণীকে বলিলেন; "এলাইজা টার্ণারকে আহ্বান করুন।"

কেরাণী বিতরণাবশিষ্ট ৪।৫ খানা রুটী টেবিলের উপর রাখিয়া দ্বারের দিকে গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে রমণীগণ সকলেই ওগুলি হইতে কিছু কিছু ভক্ষণ করে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

কেরাণীর আহ্বান শুনিয়া এলাইজা টার্ণারের বুক আনন্দোচ্ছ্বাসে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, আর তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ রমণীকুলের মুখ হইতে গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক কাতরধ্বনি সমুত্থিত হইল। কেরাণী তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না তাঁহাকে প্রায়ই এদৃশ্য দেখিতে হইত তিনি আস্তে আস্তে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এলাইজা টার্ণার তাঁহার অনুসরণ করিল কিন্তু অপর একটী রমণী চুপে চুপে এলাইজা টার্ণারের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

কেরাণী এই অন্যায় অভিগমন লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "ভাল বুথ, এখানে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি কি জাননা যে এটা নিয়মবিরুদ্ধ?"

বিধবা বুথ, শান্ত ও অনশনক্লিষ্টা অপর এক রমণীর গাত্র চাপিয়া কাতর ভাবে বলিল, "রেক্টরের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিতেই হইবে।" এই বলিয়া সে অপর

সকলকে সজোরে এদিক্ ওদিক্ সরাইয়া ভজনালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিল ও তাহার দুঃখ কাহিনী কাতরভাবে নিবেদন করিতে লাগিল,—

"বিধবা টার্ণারের অপেক্ষা আমার অবস্থা খারাপ; তার মেয়ে তাকে অনেক প্রকার সাহায্য করে থাকে, আর আমার হতভাগিনী মেয়েটা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও জ্বরাক্রান্ত হ'যে ঘরে প'ড়ে আছে! হাঁ, মহাশয়, এবারের অবশিষ্ট দাতব্য রুটীখানা কি আমায় দিতে পারেন না? সকাল হইতে এপর্য্যন্ত আমার মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি, এক প্রতিবেশী দয়া-পরবশ হ'য়ে খানিকটা চা ও সামান্য একটু রুটী আস্বাদন করিতে দিয়াছিলেন এই যা।"

এই প্রকার প্রার্থনা ও মিনতির প্রশ্রয় না দেওয়াই এস্থলে সঙ্গত হইয়াছিল। রেক্টর নিয়ম করিয়াছিলেন যে যাহারা দানের জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহারা উহা পাইবে না। অন্যথা এই বিতরণ ব্যাপার সাপ্তাহিক কলহ ও ভীষণ গোলযোগের কারণ হইয়া পড়িত। তিনি এলাইজা টার্ণারের হাতে রুটী ও একটী শিলিং মুদ্রা প্রদান করিলেন। বিধবাকুল তখন একে একে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল; এলাইজা টার্ণারও বাহির হইল। বিধবা বুথ ভজনালয়ের দেয়াল ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া শোক প্রকাশ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া রেক্টর তাহাকে করুণস্বরে বলিলেন;—

"মিসেস্ বুথ, তোমার এখানে প্রবেশ করা উচিত হয় নাই। তুমি জান যে আমি এরূপ আচরণের প্রশ্রয় দিই না।"

"কিন্তু মহাশয়, আমি যে অনাহারে মারা যাচ্ছি। আমি মনে ক'রেছিলাম, আপনি হয়ত টার্ণার ও আমার মধ্যে উহা ভাগ ক'রে দিবেন; তাহাকে ছয় পেনী ও আমাকে ছয় পেনী আর রুটীখানাও আধা-আধি ক'রে দিবেন।"

"এই দান বিভাগ ক'রে দেবার আমার অধিকার নাই; তা কর্ত্তে গেলে, দানের সর্ত্তভঙ্গ কর্ত্তে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সপ্তাহে তোমার এরূপ দুরবস্থা কি ক'রে হল? তুমি কি কোন কাজ পাওনি?"

"না মহাশয়, আমি কাজে যেতে পারিনি। ঘরে রোগীর পরিচর্য্যাই করবো, কি কাজে যাবো? তা ছাড়া এই দেখুন, এই বুড়ো আঙ্গুলটা ফুলে কি হয়েছে, এ জন্যও কাজে যেতে পারিনি। গত পরশু দিন আমার হাতে ৯টী পেনী ছিল, কিন্তু কাল রাত্রির মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে।"

"আচ্ছা এখন যাও, আমি একটু পরেই তোমাকে গিয়ে দেখ্‌বো।"

ক্রমশঃ।

নারীদিগের পরসেবা কার্য্য স্বর্গের সোপান।

ধনীর কন্যা এবং গৃহিণীগণ প্রায় সর্ব্বদা দাস দাসী দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। দাস দাসীগণ কর্ত্রীবর্গের আদেশ শ্রবণে উৎকর্ণ।

আজ্ঞামাত্র তাহারা আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইতেছে। গৃহকার্য্য করা দূরে থাকুক, আপন আপন কেশপ্রসাধন, গাত্রে তৈলমর্দ্দন, স্নানাদি কার্য্যও ধনী গৃহিণীরা স্বয়ং সম্পাদন করেন না। অনেক ধনীর গৃহিণী সন্তান প্রসবের ক্লেশ বহন না করিয়াও ধনবিনিময়ে পুত্রলাভ করিতেছেন। তাঁহারা পতি পুত্রের পরিচর্য্যাও কখন করেন না। ধনীদিগের বিলাসভোগসুখমত্ত জীবন অনেকের বিবেচনায় সাংসারিক সুখের আদর্শ। অনেক রমণী ঐ প্রকার আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট। তবে বিধাতাপুরুষ বহু লোককেই সংসারে বিপুল ধনের অধিকারী হইতে দেন নাই। নতুবা অলসতার সিংহাসনে অনেকেই উপবিষ্ট হইত। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা কিঞ্চিৎ স্থূল বেতনভোগী গবর্ণমেণ্টভৃত্য, তাঁহাদের গৃহিণীগণও আচার ব্যবহার গৃহধর্ম্মে ধনবান্ লোকের অনুকরণে উদাসীন নহেন।

অনেকেরই মনের ধারণা এই যে আলস্য এবং অহঙ্কারের মত মানসিক সুখ যেন অন্য কিছুতেই প্রদান করে না পাড়া প্রতিবেশীর নিকট পতি পুত্রের কিংবা আপনার গুণগৌরব ব্যাখ্যা, মানসম্ভ্রম দেখান যে কত সুখকর তাহা যাঁহারা ইহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোঝেন। কাল যাহারা দাসীর ন্যায় সারাদিন গৃহকার্য্যে রত থাকিত এবং অর্থের অভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিল, আজ দৈববলে ধনে মানে একটুকু উন্নত হইয়াই আলস্য এবং অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে তাহারা উদ্যত হইতেছে। এই কারণে পুরুষ এবং নারীনির্ব্বিশেষে প্রায় সকলের মনকেই ধনসম্পদ অতি নীচ করিয়া ফেলে।

বিনয় মনুষ্যের বাস্তবিক উচ্চাবস্থা। সেবা প্রতি মনুষ্যের জন্যই স্বর্গের সোপান। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা সেবা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগ হইতে যাঁহারা সেবা করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্যজাতির ভক্তিকুসুম প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা দীনাত্মা, বিনীত এবং মনুষ্যজাতির সেবানিরত। অল্পবুদ্ধি অসার সংসার সুখাসক্ত রমণী তাহা পরিগ্রহ করিতে পারে না। গৃহিণী সেবিকা। পতি পুত্র এবং গৃহবাসিমাত্রেরই সেবা গৃহিণীর নিত্য প্রতিপালনীয় ব্রত। সেবাধর্ম্মে কিরূপ পুণ্য ও পবিত্র আরাম প্রাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অলস, অহঙ্কারী বিলাস সুখাসক্ত নারী তাহা কি প্রকারে অনুভব করিবে?

আমাদের দেশে দেবর্ষি নারদের নাম সকলেই জানেন। তিনি এক দাসীর পুত্র। এক সময়ে কয়েকটি ঋষির সামান্য সেবা কিছুকাল করার ফলে দাসীতনয় নারদের জীবনে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি সেবাব্রত পালনের ফলে নবজীবন লাভ করেন বলিলে অসত্য বলা হয় না। সেবার ফলে দাসীতনয়ই দেবর্ষি নারদ হইয়াছিলেন। আমাদের প্রতি গৃহে অতি ক্লেশে যাঁহারা গৃহস্থদের সেবাব্রতে ব্রতী, ঈশ্বর তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গে কি

প্রকার পুরস্কার প্রস্তুত করিয়াছেন কে তাহা কল্পনা করিতে পারে?

যীশুখ্রীষ্ট বেথানা নগরে মার্থা এবং মেরীনাম্নী দুই ভগিণীর গৃহে একদা অতিথি হইয়াছিলেন। উক্ত উভয় ভগিনা যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম ও সেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সামান্যা রমণী হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চত্তে ঋষিপ্রবর যীশুখ্রীষ্টের সেবা করাতে যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভক্তি আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। নারদের ন্যায় ঐ দুইটি কন্যাও স্বর্গীয় জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধু সেবার ফলে স্বর্গলাভ ব্যাপার বর্ণিত আছে। সাধুর ন্যায় শিশু, রুগ্ন, অতিথি এবং গৃহবাসী লোকেরও সেবা করা আবশ্যক যে সকল নারী ফলকামনা বিরহিত হইয়া আপনার রক্ত দিয়া অন্যের সেবাব্রতে ব্রতী, তাঁহারা পুণ্যফল, প্রেমফল এবং শান্তিফল অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহারা গৃহস্থদিগের সেবাকার্য্যে রত, তাঁহারা ঈশ্বরের সহায়তাতেই সেই সেবাব্রত পালন করিয়া থাকেন। কেন না, আমি হই কি তুমি হও, আমরা সংসারে ঈশ্বরের দ্বারা আনীত হইয়াছি। যাঁহাদের সেবা প্রয়োজন, ঈশ্বরই তাঁহাদের প্রকৃত সেবক। সেবক সেবিকাগণ ঈশ্বর হইতে শক্তি সামর্থ্য না পাইলে কিরূপে সেবাব্রত পালন করিবেন? প্রতি মানবের সর্ব্বপ্রকার সেবা ঈশ্বরেরই নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, প্রতি গৃহে গৃহিণীগণ সেবিকার ব্রত পালন দ্বারা ঈশ্বরেরই সাহায্য করিতেছেন। দীন মনে শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে যে নারী যে গৃহে সেবার কার্য্য করেন, সেই গৃহের গৃহদেবতা ঈশ্বর তাঁহার মস্তকে পুণ্যের শিরস্ত্রাণ এবং বক্ষে আনন্দের কবচ প্রদান করেন। সেবিকাদিগের জীবনে বাস্তবিকই নবজীবনের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

যাহারা অলস, অহঙ্কারী, তাহারা অতিলঘুচিত্ত এবং মৃত্যুভয়াকুল। আলস্য এবং অহঙ্কার মানবসন্তানকে সত্য হইতে দূরে লইয়া যায়। দীনতা এবং সেবাব্রতে মানবসন্তান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেবা যে স্বর্গের সোপান এ কথা নরনারী মাত্রই সহজেই বুঝিতে পারেন। শৈশবাবধি আমরা জননী এবং ভগিনীদিগের সেবা পাইয়া বাঁচিয়া আছি। আমরা কি কেহ মাতা ভগিনা প্রভৃতি সেবিকাগণের কোন পুরস্কার প্রদান করিতে সক্ষম? আমরা কি কেহ মনে এরূপ চিন্তাও কখন করিয়া থাকি? বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন। অনেক লোকের মনেই এ প্রকার চিন্তার কণামাত্রও উপস্থিত হয় না। তবে যিনি এ প্রকার সেবাকার্য্যের বিধাতা এবং নিয়ন্তা তিনিও কি আমাদের ন্যায় উদাসীন। কখনই নহে। তিনি সেবিকা কন্যাদিগকে স্বর্গে নিশ্চয়ই প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

সুনীতি কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ।

বিগত ২৮শে এপ্রেল বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে সুনীতি কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ খুব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাজন মহারাজ কুচবিহারাধিপতি বালিকাদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। স্থানীয় Lansdown Hallএ এতদুপলক্ষে অতি সুন্দর জমাট হইয়াছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয়া কুচবিহার মহারাণী মহোদয়া মহারাজ কুমারীগণ ও কতকগুলি ভদ্র মহিলা এবং কুচবিহার ষ্টেটের উচ্চতম দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, কুচবিহার কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল্ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, মহারাজ বাহাদুরের প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, নূতন রেভিনিউ অফিসর শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতি চক্রবর্ত্তী এবং কলিকাতা হইতে সমাগত ডাঃ পি, কে, রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কুমারী চারুবালা ঘোষ বিগত উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় বালকদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র কুচবিহারের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করাতে মহারাজ-প্রদত্ত একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয়া মহারাণী মহাশয়ার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বাবু স্কুলের বাৎসরিক বিবরণী ইংরাজিতে পাঠ করেন। রিপোর্টে বিদ্যালয়ের সমগ্র উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ সুমতি মজুমদার ও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপসংহারে শ্রদ্ধেয় মহারাজ বাহাদুর ইংরাজিতে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি বালিকাদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। বালিকাগণ যাহাতে ভবিষ্যতে সুভগিনী, সুস্ত্রী ও সুমাতা হইতে পারেন তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং যাহাতে তাহারা জাতীয় সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভুলিয়া পরস্পরের মধ্যে পবিত্র ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বক্তৃতায় এরূপ উপদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে যে সকল সঙ্গীত ও উপহারের পদ্য প্রবন্ধ বালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত, পঠিত ও আবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও বাৎসরিক বিবরণ প্রকাশার্থ এতৎসহ প্রেরিত হইতেছে। আশা করি সে গুলি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

সুনীতিকলেজ,
কুচবিহার,
৩০।৪।০৯।

বিনীতা—
বিধাননন্দিনী মজুমদার।

(১৯০৯ সালের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে)

অতীতের গর্ভে আর এক বৎসর চলিয়া গেল। বলিতে গেলে এবার সুনীতি কলেজের ইতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা হইয়াছে। নূতন ভাবে, নূতন প্রণালীতে সংগঠিত ও নূতন জীবন লইয়া এবার সুনীতি কলেজ সাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয়া নারীশিক্ষানু-

রাগিণী মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরী সি, আই, মহাশয়াই এ বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভার স্বহস্তে গ্রহণ এবং একটি সংগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর পর্য্যবেক্ষণ ভার সমর্পণ করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী মহাশয়া ও নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়কর্তৃক উপরোক্ত সভা সংগঠিত হইয়াছে—

মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরী সি, আই, প্রেসিডেণ্ট। শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতি চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বি, এল্,—সভ্য। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম্, এ,—সভ্য। শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্ এ,—সভ্য। শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেন,—সভ্য। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল সেন,—সভ্য।

নূতন প্রণালী।

বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত নূতন প্রণালী অনুসারে নারী জাতির শিক্ষার উপযোগী বিষয় সমূহই শিক্ষা দেওয়া সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউনিভার্সিটি ও প্রাদেশিক শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিয়া নারী ও পুরুষ শিক্ষার সমতা রক্ষা করা এ নূতন প্রণালীর অনুমোদিত নহে। নারীজীবন ও নারী চরিত্রের উপযোগী শিক্ষা বিধানের উচ্চ লক্ষ্য লইয়া সুনীতি কলেজ এবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে। যাহাতে অল্প বয়স্কা বালিকাগণ সম্ভবানুরূপ সাহিত্য, গণিত ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া তাহাদের ভাবী পারিবারিক জীবন ও ভাবী আদর্শ পরিবার সংগঠনের উপযুক্ত হইতে পারে বর্ত্তমান প্রণালী সেই সুন্দর ও সমীচীন পথ অবলম্বন করিয়াছে। বিগত বর্ষের পারিতোষিক দানোপলক্ষে মাননীয় মহারাজা বাহাদুরও স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

পরীক্ষার ফল।

বিগত উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় সুনীতি কলেজ খুব আশাপ্রদ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার জন্য যে পাঁচটি বালিকা প্রেরিত হইয়াছিল সেই পাঁচটিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া বিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা ও নারীকুল-হিতৈষী মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ও মাননীয়া মহারাণী মহাশয়ার বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। ইহা কোচবিহারের পক্ষে বড় সহজ আনন্দ ও আশার কথা নহে যে উপরোক্ত পাঁচটি উত্তীর্ণা ছাত্রীর মধ্যে তিনটি ছাত্রী বালকদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র কোচবিহার বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সুনীতি কলেজের ইতিহাসে ইহা এক নূতন ব্যাপার। এই কলেজ হইতে বিগত মধ্যইংরাজী পরীক্ষায় যে ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিল প্রতিদ্বন্দ্বতায় সে বালিকাও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম পারদর্শিতানুসারে সন্নিবেশিত হইল।

মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা।

কুমারী বিধাননন্দিনী মজুমদার।

উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা।

কুমারী চারুবালা ঘোষ। কুমারী লাবণ্যলতা দেবী। কুমারী দক্ষবালা দেবী।

কুমারী শান্তিদায়িনী মজুমদার। শ্রীমতী নলিবালা সেন।

আমাদের মহারাণী মহাশয়াও খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া দার্জ্জিলিং হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"মেয়েগুলি পরীক্ষাতে এত ভাল পাস হইয়াছে শুনিয়া কি যে আনন্দ হ'ল কি বলিব। সুনীতি কলেজের উন্নতি দেখিলে বড় আহ্লাদ হয়"।

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার ফল।

নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষাসম্বন্ধেও এবারে সুনীতি কলেজ খুব আশাপ্রদ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। এই পরীক্ষার জন্য এবার দশটি বালিকা প্রেরিতা হইয়াছিল এবং উক্ত দশটির মধ্যে নয়টি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে আর একটি বালিকা পরীক্ষার দ্বিতীয় দিবসে পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদিগের নাম পারদর্শিতানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুমারী সরযূবালা গুপ্ত। কুমারী ইন্দুবালা বিশ্বাস। কুমারী সুনীতিবালা ঘোষ। কুমারী প্রফুল্লময়ী বক্সী। কুমারী শৈলবালা সেন। কুমারী ভক্তিউষা মল্লিক। কুমারী সহিদননেছা। কুমারী চারুবালা দেবী। কুমারী সুনীতিবালা সরকার।

ছাত্রী সংখ্যা।

বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ১২৫। দৈনিক গড় উপস্থিত ৮০।৯০। অর্থাৎ বিগত বর্ষ অপেক্ষা ২৫।৩০ অধিক। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে এই সকল ছাত্রীদের মধ্যে ১২ জন ছাত্রী মুসলমান, ১ জন খ্রীষ্টিয়ান, ৩ জন ব্রাহ্ম ও ২০ জন আদিম কোচবিহার অধিবাসী। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কোচবিহার যে দক্ষিণ বঙ্গ, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতেও অগ্রসর হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইস্লাম বিশ্বাসী পরিবার হইতে সরকারী স্কুলে প্রকাশ্যভাবে বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের রীতি এখনও উপরোক্ত স্থানসমূহে প্রচলিত হয় নাই। কোচবিহারবাসী ইস্লাম পরিবার এসম্বন্ধে নৈতিক সাহসের যে পরিচয় দিতেছেন বাস্তবিকই তাহা প্রশংসনীয় ও পশ্চাৎপদ প্রদেশ সমূহের অনুকরণীয়। ইহা বড়ই আশার কথা যে কোচবিহার ভূমি এসম্বন্ধে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। এ সমুদায়ের মূলে যে মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ও মাননীয়া মহারাণী মহাশয়ার উদাম উৎসাহ ও উচ্চ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলস্থ উচ্চশ্রেণী ইংরাজী অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষোপযোগী অনেক স্ত্রীবিদ্যালয় হইতে সুনীতি কলেজে যে আশাতিরিক্ত ছাত্রী সংখ্যা শিক্ষালাভ করিতেছে ইহা এখানকার পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে।

উপসংহারে প্রার্থনা যে এই বিদ্যালয় ভগবানের প্রসাদে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকুক এবং ইহার উন্নতিকল্পে যেমন একদিকে মাননীয় মহারাজা বাহাদুর, মাননীয়া মহারাণী মহাশয়া ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আশা ও উৎসাহ বিধান করিতেছেন তেমনই অপর দিকে

স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্র মহিলাগণ উৎসাহ প্রদান করিতে থাকুন।

সুনীতিকলেজ, কোচবিহার। ৮ই এ, ১৯০৯।	শ্রীমতী সুমতী মজুমদার, প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে)

প্রথম সঙ্গীত।

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য পূজিব
সত্য খুঁজিব সত্যধন
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু মিথ্যা বাক্য নয়
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ আজি
করিব সকলে দান
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয়
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু অশুভ বাক্য নয়
জয় জয় মঙ্গলময়।
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি
মোরা সবে লইলাম
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক্
চলিব ব্রহ্মধাম
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি মৃত্যু নিকটে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।

মোরা আনন্দ মাঝে মন
আজি করিব বিসর্জ্জন
জয় জয় আনন্দময়।

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

হাতে হাতে ধরে আয় সবে তোরা
আশা উৎসাহ লয়ে বুক ভরা
সম্মুখে চাহিয়া চলে যাই মোরা
পিছে পড়ে নাহি রব। (মোরা)

(২)

উৎসাহ উদ্যম যাহাদের আছে
উন্নতির পথে তারাই চলেছে
আমরা কি শুধু পড়ে রব পিছে
আঁধারে ডুবিয়া যাব। (মোরা)

(৩)

চলেছে যাহারা উন্নতির পথে
থাকিতেছে মান তাদের জগতে
চল তবে মোরা মিলি সেই সাথে
পিছে ফিরে নাহি চাব। (মোরা)

(৪)

আলস্য জড়তা করি পরিহার
প্রাণপণে সাধি কাজ আপনার
জগতের মাঝে স্থান দাঁড়াবার
আমরাও করে লব। (তবে)

তৃতীয় সঙ্গীত।

শুনে যা আমার মধুর স্বপন
শুনে যা আমার আশার কথা
নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহন বলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেব স্তুতি উঠিতেছে ধীরে
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
পঞ্চনদ কূলে একই প্রথা।
দেখিনু যতেক ভারতসন্তান
এক প্রাণে বলী জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজ মূর্ত্তিমান
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ভারত রমণী সাজাইছে ডালি
বীর শিশুকুল দেয় করতালি
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাইছে উল্লাসে বিজয় গাথা।

ডাক্‌রে পাখী।

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে)

ডাক্‌রে আবার পাখী ডাক্‌রে আবার,
বসন্তের পাখী তুমি রবে কি নীরব ?
ডাক পাখী ডাক তুমি ডাক বার বার,
ডাক আজ শুনি মোরা তোমার সুরব।

(২)

চাইনাক আর পাখী কিছুই তোমার,
চাই শুধু তাঁর নাম শুনিতে কেবল,
গাও পাখী সেই নাম গাও অনিবার।
গাও শত মুখে তাই গাও অবিরল।

(৩)

অই নামে অই গানে ঋষি ভক্তগণ
ঈশা, মুষা, ব্রহ্মানন্দ সবে মাতোয়ারা,
গাও পাখী গাও তাই গাও অনুক্ষণ
আমরাও তব স্বরে হই আত্মহারা।

(৪)

গাওনা স্বাধীন প্রাণে গাও একবার,
গাওনা স্বাধীন স্বরে "হোক্ তাঁর জয়"
গাওনা তাঁহার নাম গাও বার বার,
গাও তাঁর যশ পাখী গাও বিশ্বময়।

(৫)

গাও শুভদিনে আজ প্রমুক্ত আকাশে
গাওনা তরুর শাখে সান্ধ্য সমীরণে,
গাওনা স্বাধীন পাখী স্বাধীন উচ্ছ্বাসে,
মহিমা তাঁহার গাও মধুর কূজনে।

(৬)

গাও পাখী গাও আজ গাও বিশ্বজুড়ি,
গাও আমাদের কত শুভদিন আজ,

"সাগর দীঘির" বক্ষে মুক্ত পক্ষে উড়ি
গাও ধন্য "মহারাণী" ধন্য "মহারাজ"।

নারীকুলহিতৈষী বঙ্গকুলতিলক—
শ্রীমন্ মহারাজ কোচবিহারাধিপতি
সি, বি, মহোদয় সমীপেষু।

ভক্তি উপহার।

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার
বিতরণোপলক্ষে)

আবার বরষ পরে রাজ দরশন,
আবার মোদের আজ বড় অধিকার,
আবার তোমারে আজ নমিছে রাজন্
পিতৃ সম হও তুমি মোদের সবার।
সে দিন পাশ্চাত্যভূমে হিমানী প্রদেশে
ছিলে তুমি সিন্ধুপারে সুদূরে রাজন্
আজ তুমি আসিয়াছ কত ভালবেসে
দুঃখিনী কন্যার দলে পিতার মতন।
ভুল নাই তুমি এই দুঃখী কন্যাগণে
ছিলে যবে তুমি দূর সাগর বেলায়,
ভুল নাই তাই তুমি আসিয়া এখানে
এসেছ মোদের তরে এসেছ হেথায়।
জানিনাক আজ মোরা কি দিব তোমায়
জানিনাক আমাদের কি আছে সম্বল,
জানিনাক কি লইয়া এসেছি হেথায়
আছে আমাদের শুধু ভক্তি অশ্রুজল।
তাই দিই আজ মোরা চরণে তোমার
তাই দিই সবে মিলে প্রফুল্ল অন্তরে,
তাই দিই আমাদের—যা আছে দিবার
তাই দিই তব পদে সবে ভক্তিভরে।

কত ভালবাসা তব দুঃখী কন্যা তরে,
দিবে তুমি আমাদের স্নেহ পুরস্কার
তোমার স্নেহের তরে কৃতজ্ঞ অন্তরে
তব পদে সবে মিলে করি নমস্কার।
আমাদের শিক্ষা তরে উদাম উৎসাহে
কত অর্থ ব্যয় তুমি করিছ রাজন,
সুখ্যাতি তোমার সবে দেশে দেশে কহে
কি বলিবে তব গুণ দুঃখী কন্যাগণ?
পাশ্চাত্য দেশের নীতি পাশ্চাত্য শিক্ষার
যা কিছু সুন্দর তুমি আনিতেছ হেথা
পাশ্চাত্য ভূমির কত সমাধি সংস্কার
আনিতেছ সভ্য রীতি সুরুচি সুপ্রথা।
এসব তোমার তরে আসিছে হেথায়,
এসবের মূলে তাঁর ইচ্ছার পালন,
এ সবের মূলে আজ দেখি যে তাঁহায়
আদেশ পালন হেতু যাঁর আগমন।
আদেশ—বাদীর তুমি আদরের অতি,
আদেশের সাক্ষ্য তাঁর তোমার জীবনে
আদেশে তাঁহার তব আদর্শ প্রকৃতি,
চিরদিন মোরা তাই রাখিব স্মরণে।
আদর্শে তাঁহার এই মাতা মহারাণী
চলেছেন তব সাথে জীবনের পথে,
তোমাদের জানি মোরা জনক জননী
চলেছি আমরা সবে পশ্চাতে পশ্চাতে!
ধন্য আজ মহারাজ তব দরশনে,
ধন্য আজ আমাদের দীনা ভগ্নীদল,
ধন্য মোরা শত মুখে বলি সর্ব্বজনে
আমাদের সাধ আজ হইল সফল।

স্নেহের ছাত্রীগণ।

অশেষগুণসম্পন্না নারীকুলহিতৈষিণী—
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরী,
সি, আই, মহোদয়া সমীপেষু।

ভক্তি উপহার।

(সুনীতি কলেজের ১৯০৯ সালের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে।)

বরষের পরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
এসেছি আবার আমরা সকলে,
এসেছি উচ্ছ্বাসে এসেছি উল্লাসে
এসেছি আমরা দুঃখী কন্যাদলে।
এসেছি আবার শুনিয়া তাঁহার
নূতন আশার নূতন আহ্বান,
এসেছি ছুটিয়া সকলে মিলিয়া
করিতে তাঁহার মহিমার গান।
কৃপায় তাঁহার হৃদয় সবার
নূতন ভাবেতে জাগিল আবার,
নূতন পরাণে নূতন মিলনে
গাইব নূতন মহিমা তাঁহার।
তাঁর ডাক্ শুনে দুঃখী কন্যাগণে
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলেছি হেথায়,
তাঁর ডাক শুনে আজি শুভ দিনে
এসেছি আমরা গভীর আশায়।

... ...

তাঁহারি আদেশে তুমি এই দেশে
লয়েছ কতই গুরু ভার করে।
সিন্ধুপার হ'তে ভারত ভূমিতে
এনেছ অনেক ভাব আমাদের তরে,
এনেছ সুনীতি সভ্যতা সুরীতি,
এনেছ আনিবে কত স্নেহের অন্তরে।
তাঁহারি ইচ্ছায় তাঁহারি কৃপায়
আজি আমাদের শুভ সম্মিলন,
আজি সবে মিলি উচ্চরব তুলি
করিব তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন।
আজি প্রাণ ভরে প্রফুল্ল অন্তরে
বলি সব আজ সৌভাগ্যের কথা,
বলি আজ সবে বলি উচ্চ রবে
আমাদের আজ আশার বারতা।
বলি বিশ্ব জনে উচ্ছ্বসিত মনে
আমাদের আজ বড় শুভ দিন,
আমাদের তরে স্নেহের অন্তরে
রাজারাণী আজ সবে সম সীন।
বিধানের লীলা বিধানের খেলা
বিধানের এই মহিমা প্রকাশ,
বিশ্বাসী মানবে দেখ আজ সবে
বিধানের এই উন্নতি উচ্ছ্বাস।
এ দৃশ্য এদেশে পূর্ব্ব ইতিহাসে
এচিত্র কখন হয়নি অঙ্কিত,
এচিত্র কখন এরূপ মিলন
পূর্ব ইতিহাসে হয়নি কীর্ত্তিত।
এদেশের তরে স্বর্গ হ'তে পরে
আসিল করুণা তাঁহার অশেষ,
এদেশের তরে ভক্তের ভিতরে
আসিল তাঁহার আলোক আদেশ।
আজ সে আদেশ করুণা বিশেষ
সাক্ষ্য দিই মোরা দীনা কন্যাগণে,
সাক্ষ্য দিই সবে বলি উচ্চরবে
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ভক্তের জীবনে।
আজ ব্রহ্মানন্দে অপার আনন্দে
প্রত্যাদিষ্ট ভক্তে করি নমস্কার,
আজ মহারাণী মোদের জননী
নমি তব পদে নমি শতবার।
তোমার হস্তের তোমার স্নেহের
তোমার প্রদত্ত লই পুরস্কার,

বৎসরের পরে সবার উপরে
বিধাতারে সবে করি নমস্কার।
স্নেহের ছাত্রীগণ।

বৌমার পত্র।

মহিলা সম্পাদকের নিকটে স্বর্গগত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বিষয়ে তাঁহার বৌমা নলিনীবালা দেবীর পত্র।

পরম ভক্তি ভাজনেষু,—

"আপনার পোষ্টকার্ডখানা পাইয়াছি। এতদিন মন এত খারাপ ছিল যে, কাহাকেও চিঠি লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণে আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এত দিনে আমি যেন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। আমি শৈশবে পিতৃহীনা হইয়াছিলাম, ১৩ বৎসর যাবৎ যাঁহাকে পিতার তুল্য বলিয়া জানিতাম আজ তিনি কোথায়? যিনি জীবিত থাকিতে সর্ব্বদাই আমাকে অন্বেষণ করিতেন, আজ তাঁহার শব্দ বন্ধ হইয়াছে। বৌমা বলিয়া ডাকিবার আর কেহই নাই। যখন এ সব কথা ভাবি, মন অস্থির হয়। তিনি পিতার কোলে সুখে আছেন, যত কষ্ট আমাদের। হঠাৎ এরূপ হওয়াতে আরো মনে লাগিয়াছে। একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল; আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাঁহার জীবন দেখিয়া যেন আমরা জীবন গঠন করিতে পারি। তাঁহার প্রকৃতি সরল শিশুর মতন মধুর ছিল, আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্ত তিনি কতই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আমরা যেন ধর্ম্মকেই প্রথম মনে করি, সংসার ও সুখ বিলাস লইয়া যেন পরমপিতা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া না থাকি। যখন তিনি ছিলেন তখন তাঁহার স্বভাবে কত মধুরতা দেখিয়াছি, পরনিন্দা বোধ হয় কখনও তাঁহার মুখে শুনি নাই, পরের সুখে তিনি পরমানন্দিত হইতেন। তাঁহার সরল বিশ্বাস, ধর্ম্মের জীবন, প্রকৃতির মধুরতা হইতে আমরা কত শিখিতে পারি। তাঁহার জীবন যেরূপ ছিল, তাহাতে তিনি স্বর্গে পরমানন্দে মার কোলে সুখে রহিয়াছেন। আমাদেরও এক দিন যাইতে হইবে, এখন থেকেই যেন প্রস্তুত হইতে পারি। আপনার শরীর কেমন আছে? এখানে নীলমণি, দেবেন, উনি ও প্রফুল্ল আসিয়াছেন। ইরা যে এখানে পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ব্রাহ্মেরা সকলে আসিয়াছিলেন। তা ছাড়া হিন্দুরাও আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ্ হরিসুন্দর বাবু কাজ করিয়াছিলেন।

আপনার স্নেহের—নলিনী।

জাগরণ।

[চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।]

রজনী তমস্বিনী নৈশান্ধকার নিখিল জগতে একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক প্রাণীবৃন্দকে শাসন করিতেছে। জীবজন্তুগণ অত্যাচারী নৃপতির শাসনাধীন প্রজার ন্যায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সহসা উষারাণী পূর্ব্বাকাশ

দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক অনন্ত আকাশে আপন স্বর্ণাঞ্চলখানি ছড়াইয়া দিয়া জগতে উপস্থিত হইলেন। জীবগণকে সুখশীতল করস্পর্শে জাগাইয়া নৈশান্ধকারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশ্বাস বাক্য বলিলেন। সে বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র সকলে চমকিত হইয়া উঠিল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল বাস্তবিকই অন্ধকারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। তৎক্ষণাৎ প্রকৃতি উষার বন্দনা গীত আরম্ভ করিল। জীবগণ মহোল্লাসে উষারাণীর পদতলে প্রণিপাতপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্য শিরোভূষণ করিয়া তাঁহারই আদেশে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ উষার আগমনে মানবগণ সঞ্জীবিত হইয়া নূতন কর্ত্তব্যে প্রণোদিত হইল।

ইতিহাস চক্ষে জগতগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান যুগও মানব সাধারণের পক্ষে উষাকাল—কর্ম্মযুগের প্রারম্ভিক কাল। বহুকাল অতীত হইল জগতে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, নিউটন, গ্যালিলিওর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের পাদস্পর্শ পুণ্যে ধরাধাম পবিত্র হইয়াছে এবং এ যুগবাসিগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করিবার স্বর্ণদ্বারের সন্ধান পাইয়াছে তথাপি আমরা সেই প্রাচীন যুগকে জগতের নিশাকালই বলিব। সে যুগে সময়ে সময়ে মেরুপ্রদেশের সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি (Aurora Borealis) উদ্ভাসিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু দিবাভাগের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য তখনও মানব জগতে উদিত হয় নাই।

প্রাচীন ইতিহাসে অনেক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মহাত্মার নামোল্লেখ থাকিলেও সাধারণ মানব তখন জ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মি দর্শন হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। মানব সাধারণের জ্ঞান নেত্র উন্মীলন চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জগতে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান কালকে সেই 'নবযুগ' আখ্যা প্রদান করিতে পারি।

নৈশ বিশ্রামের পর নবোসূর্য্যোদয়ে জাগরণ মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রভাতে তরুণ অরুণের কিরণপাতে বৃক্ষে, লতায়, বনের কুসুমে, পক্ষীর কূজনে, মানবপ্রাণে এক সমতান বাদ্যের লহরী তুলিয়া দেয়। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় গাহিতে থাকে 'মানব উত্থান কর, জাগ্রত হও'। তখন বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিক হইতেই মানব হৃদয় সজীবতার অমৃত রস আকর্ষণ করিয়া লইতে থাকে। নিদ্রিত মানব প্রকৃতির সেই ধ্বনিত গীত শ্রবণ করিয়া জাগ্রত না হইয়া থাকিতে পারে না।

প্রভাতকালের ন্যায় জ্ঞান সূর্য্যের উদয়েও মানব জাগ্রত না হইয়া পারে না। জাগরণের সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবণতা। জাগ্রত ব্যক্তির কর্ম্মসাধন ব্যতীত অবস্থান অসম্ভব। তুমি নিদ্রিত নও, অথচ শারীরিক কিংবা মানসিক কোনও কার্য্য করিতেছ না, ইহা মানব কল্পনারও অতীত। জাগরণ তাহার পক্ষেই সম্ভব, যাহার জীবন আছে। ইহা নিশ্চিত যে নির্জীব পদার্থের পক্ষে জাগরণ অসম্ভব। মৃত মানবকে কি কখনও প্রকৃতি তাহার

কোমল করস্পর্শে কিংবা শ্রুতি সুখকর সঙ্গীত লহরীতে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছে? সত্য বটে নির্জীব পদার্থকেও যন্ত্রাদির সাহায্যে বাহ্যিক শক্তি (mechanical Force) প্রয়োগ দ্বারা কর্ম্মরত করিতে পারা যায়, তাহারাও সময় সময় প্রকৃত জীবিত পদার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং কর্ম্মের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা জীবিত ও মৃত পদার্থ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইতে পারি। কিন্তু উহার পরীক্ষাস্থল ঐ শক্তি প্রয়োগ প্রণালী। কারণ বাহ্যশক্তির অপনয়নে মৃত পদার্থ কর্ম্মসাধন করিতে পারে না। কর্ম্মরত মৃত পদার্থকে বাহ্যশক্তির ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে হয়, তাহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। জীবিত পদার্থে ঈদৃশ শক্তি প্রয়োগের কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে মৃত পদার্থের কর্ম্ম দ্বারা জগত উপকৃত হয় বটে কিন্তু ব্যক্তিগতরূপে তাহার নিজের কোনও পরিবর্ত্তন কিংবা অবস্থার উন্নতি সাধন হয় না। কিন্তু জীবিত পদার্থ স্বীয় কর্ম্মদ্বারা জগৎ এবং স্বীয় জীবন উভয়েরই উন্নতি করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

মহিলা সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হইয়া একান্ত দুর্ব্বল হইয়া আপাততঃ মহিলার কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্র পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ অবগত হইবেন যে, গত চৈত্র মাস হইতে মহিলা সম্পাদনের ভার অন্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। মহিলার হিতৈষী লেখক, লেখিকা মহাশয়দিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে মহিলা খাস মেয়েদের পত্রিকা; মহিলাতে সচরাচর স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় বিশেষ শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হয়, সাধারণ সংবাদ পত্রের ন্যায় অন্য বাহুল্য বিষয় লিখিত হয় না। মহিলার প্রবন্ধের শিরোনাম এরূপ হওয়া সমুচিত, তাহা পড়িলেই যেন লোকে প্রবন্ধের শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারে। মহিলার জন্য লেখা এনং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্ ম্যানেজার ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে এবং মূল্যাদিও ম্যানেজারের নিকটে প্রেরিত হইবে।

প্রায় এক বৎসর কাল বোমার মোকদ্দমা চলিয়াছিল। সম্প্রতি সেসন জজ মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বারীন্দ্র ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। হেমচন্দ্র দাস, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি দশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, অশোকচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি ছয় জনের দশ ও সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর ও বৃন্দাজীবনের এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। সুখের বিষয় যে অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ষোলজন নৈর্দ্দোষ খালাস পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত পালোয়ান প্রফেসর রামমূর্ত্তি নাইডু এবার কলিকাতার গড়ের মাঠে নানাবিধ অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার অসাধারণ শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়া দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। প্রবল বেগশালী চলন্ত মটর গাড়ীর গতিরোধ, স্থূল, দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল অবাধে ছিন্নকরণ, বক্ষের উপর বৃহৎ হস্তীধারণ প্রভৃতি কতকগুলি ক্রীড়া তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। এই অমিত বিক্রম বীরপুরুষ খাঁটি নিরামিষ ভোজী। যাঁহারা বলেন দৈহিক বল সঞ্চয়ের জন্য

মাংসাহার একান্ত প্রয়োজন, রামামূর্ত্তি নাইডু, তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণ করিতেছেন। শুনা যায়, এতৎ-সম্বন্ধে ইনি শীঘ্রই একখানা পুস্তক প্রকাশ করিবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

একাদশ বৎসর।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ মালিক, সোনপুর ২৲

দ্বাদশ বৎসর।

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন সেন, কটক ২৲
„ চন্দ্রভূষণ মালিক, সোনপুর ২৲
„ খগেশ্বর দাস, বালিজান ২৲
শ্রীমতী মহারাণী, ময়ূরভঞ্জ ॥০
„ ইন্দিরাকুমারী রায় পাইকোড়া ২৲
„ সতী দেবী, দুমকা ২৲

ত্রয়োদশ বৎসর।

মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়, থ্যাটন ১।০
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও, বোদ ১।০
„ জি পি, শুকুল, নাটোর ২৲
„ আবদুল মজিদ, রাজসাহী ২৲
„ দুর্গাপ্রসন্ন সেন, কটক ২৲
„ চন্দ্রভূষণ মালিক, সোনপুর ১৲
মুন্সী এনাতউল্লা প্রধান, হলদিবাড়ী ২৲
মিসেস্ এস, মুখার্জ্জি, মাণ্ডালয় ২৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত, হবিগঞ্জ ২৲
„ তারকনাথ রায়, কলিকাতা ২৲
শ্রীমতী ইন্দিরাকুমারী রায়, পাইকোড়া ২৲
„ মহারাণী, ময়ূরভঞ্জ ১।০
„ কিরণশশী দাসী, কলিকাতা ২৲
„ সরলা কাস্তগীর, পূর্ণিয়া ২৲
„ শরৎকুমারী দেবী, টাঙ্গাইল ২৲
„ সতী দেবী, দুমকা ২৲

চতুর্দ্দশ বৎসর।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু, বাখিল ২৲
„ জগন্নাথ রাও, বোদ ॥০
„ আবদুল মজিদ, রাজসাহী ২৲
মুন্সী এনাতউল্লা প্রধান, হলদীবাড়ী ২৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত, হবিগঞ্জ ১৲
„ মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড় ২৲
„ ভুবনমোহন রায়, লক্ষ্ণৌ ২৲
„ কালীমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ ২৲
শ্রীযুক্তা রাণী রায়, কলিকাতা ২৲
মিসেস্ বন্দ্যোপাধ্যায়, থ্যাটন ২৲
শ্রীমতী মনোরমা দেবী, ঢাকা ১৲
„ ইন্দিরাকুমারী রায়, পাইকোড়া ২৲
„ স্নেহলতা দত্ত, কলিকাতা ২৲

পঞ্চদশ বৎসর।

মিসেস্ বন্দ্যোপাধ্যায়, থ্যাটন ॥০
শ্রীযুক্ত মহারাজা মুনিন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কাশীমবাজার ২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাকমাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়! যাঁহারা মূল্য দানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পি, পোষ্টে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬, জুন ১৯০৯। [১১শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে পরিবারে মাতা সত্যবাদিনী, সদাচারা, দয়ালু, সে পরিবারের বালক বালিকারাও সচরাচর সত্যবাদী, দয়ালু ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া থাকে। বালক বালিকারা মাতার দোষ গুণের অনুসরণ করিয়া থাকে। মাতা যদি ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও সত্যভ্রষ্টা হন, তাঁহার কথা ও কার্য্যে সমতা না থাকে, সন্তানগণ অজ্ঞাতসারে ঐ দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব প্রথম নীতি "সত্য কথা কহিবে।"

গৃহে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা নারীর এক বিশেষ কর্ম্ম। যথাস্থানে তৈজষপত্র, গৃহসামগ্রী রক্ষা করিবে। যথাসময়ে গৃহস্থ জনগণের আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিবে। গৃহকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কোনও কোনও পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায় বালক বালিকারা খাদ্যবস্তু দেখিলেই খাইতে চায়, আব্দার করে। ইহাও বিশৃঙ্খলার ফল জানিবে। যথাসময়ে বালক বালিকাদিকে নিয়মিতরূপ খাইতে দিবে, অন্য সময়ে দিবে না। শৈশবকাল হইতে এই অভ্যাস করিলে আর বালকেরা বৃথা আব্দার করিয়া তোমায় বিরক্ত করিবে না। তাহাদের পাকস্থলীও সুস্থ থাকিবে, দেহ সবল হইবে।

গৃহিণী সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা, নীতিপরায়ণা হইলে পরিবারস্থ সকলেরই দেহ মন আত্মা সুস্থ ও সমুন্নত হইবার বিশেষ সহায় হয়। গৃহিণী স্বাস্থ্যবিধিসকল জানিয়া গৃহে উহা প্রতিষ্ঠা করিলে গৃহে ব্যারাম পীড়া অল্পই প্রবেশ করিতে পারে। দুঃখের বিষয় আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি পুস্তক পড়িয়াই তুষ্ট, জীবনে আর উহা বড় আচরণ করিতে দেখা যায় না।

শ্রীবৈ—

স্ত্রী ও পুরুষের আত্মার স্বাধীনতা।

ভগবান্ যে সমস্ত গুণদ্বারা মানুষকে তাঁর সৃষ্ট অন্য সমস্ত জীব হইতে উন্নত করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে প্রধান একটী গুণ স্বাধীনতা। এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ তাঁহার আত্মজ, তাঁহার সন্তান; তাঁহার স্বভাব ও গুণ মানুষের প্রাপ্য। অন্যান্য প্রাণী সকল কতকগুলি স্থিরবদ্ধ অবস্থায় উন্নতি বা পরিণতি লাভ করে, তাহারা সেই সকল অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে না; অপরদিকে তাহার ব্যতিক্রম বিপরীতাচরণও করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা পাপ করিতে পারে না, পুণ্যবান্ও হইতে পারে না। কারণ স্বাধীনতা নাই।

আমাদের এক এক সময় মনে হয় মানুষ এত পাপ দুষ্কার্য্য করে,—যে জন্য আমরা তাহাকে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলি, ও হিংসুক পাপী মানুষের সঙ্গ অপেক্ষা বনে গিয়া হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বাস করা ভাল মনে করি—এত দুষ্কার্য্য করে ভগবান্ তাহাকে কেন বাধা দেন না, অবাধে কেন সে পাপ কার্য্য করিতে পারে, যেন এ পৃথিবীর কোন বিধাতা নাই; মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। ইহার উত্তর স্বাধীনতা। ভগবান্ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তিনি কখনও তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করেন না। তাই তিনি কিছুতেই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেন না। জগতের সমস্ত কার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় স্থির নিয়মে চলিতেছে। তিনি আমাদের অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচার, দুর্ম্মতি, দুষ্কার্য্য দেখিয়া অধীর হন নাই, আশা ছাড়েন নাই, কঠিন বিচার বা কঠোর দণ্ড দেন নাই। তিনি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, ক্ষমা কর্‌ছেন, দান কর্‌ছেন, কাহারও স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। পরম পিতা ভগবান্, তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিছুতেই কোন কারণেই তাহা হরণ করিতেছেন না, কিন্তু মানুষ অতি অল্পেতেই, সামান্য অবাধ্যতাতেই ভ্রাতার স্বাধীনতা হরণ করিতেছে, ভগবান্ যে স্বাধীনতা দিলেন, মনুষ্যসন্তান তাহা তাঁহার ভ্রাতাকে দিতে চান না, তিনি ভ্রাতাকে বলেন, তুমি আমার ইচ্ছামত চল, আমি যেরূপ উপদেশ দি কর, তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পার না, তুমি আমার অধীন হইয়া চল। আমাদের কতদূর অহঙ্কার! ভগবান্ যে স্বাধীনতা তাঁর সন্তানের নিকট হইতে লইলেন না, আমরা তাহা কাড়িয়া লই। মানুষ মানুষের গুরু, পথপ্রদর্শক হইতে চায়! মানুষের স্বাধীনতা হরণ করিবার আমার কি ক্ষমতা। যে মানুষ অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে, সে ভগবানের নিকট ভয়ানক অপরাধী। ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ, পুরুষ স্ত্রী, এ দেশীয় অন্য দেশীয়, এমন কি ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলের নিকট ভগবানের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, আলোক প্রকাশিত হয়, মানুষ যথাসম্ভব অন্যের সাহায্য লইয়া সেই ইচ্ছামত কার্য্য

করিবে। কোন মানুষ আমার গুরু, পথ-প্রদর্শক নয়, গুরু স্বয়ং ভগবান্, তাঁর ইচ্ছা পালন করাই আমার কার্য্য, তাহা পালন করিবার জন্য অন্তর বাহির হইতে, নানা পুস্তক হইতে আমার চতুর্দ্দিকস্থ ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত লোক হইতে, সমস্ত ঘটনা হইতে, আলোক পাইব। আমার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যখন কোন একটি আলোক বা ইঙ্গিত পাইলাম, তাহা যে একেবারে অন্ধভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়া যাইব, সে অধিকার আমার নাই, সেই আলোককে আমার অবস্থার উপযোগী করিয়া, তাহাকে আত্মস্থ করিয়া আমার মধ্য হইতে নূতন অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইবে।

ভগবান্‌তো কখনও বলেন না, আমার ইচ্ছা তোমাকে পালন করিতেই হইবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে আমার ইচ্ছামত কাজ করিতে হইবে, তাহা না হইলে তোমার এই শাস্তি হইবে। পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, যখনই কোন দুঃখ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত, তাহাকে তাহারা ভগবানের প্রেরিত শাস্তি মনে করিত। ভগবানের আদেশ পালন করে নাই বা ভগবানের অপ্রিয় কোন কার্য্য করিয়াছে, সেই জন্য ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিয়াছেন, বাইবেলের পুরাতন খণ্ডে এইরূপ লেখা আছে; জোবের কাহিনী পাঠ করিলে তাহা জানা যায়। হায় ভগবান্ যদি ক্রুদ্ধ হইতেন, তবে কি আমাদের [illegible] থাকিত? তিনি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, কবে আমরা জানিয়া বুঝিয়া স্বইচ্ছায় আনন্দিত মনে তাঁর ইচ্ছা পালন করিব। এ স্থলে প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ফিলিপাইন্ দ্বীপ-পুঞ্জে কারাগারে প্রেরিত অপরাধীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। শুনিয়াছি, যখন কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তখন প্রথমতঃ চিকিৎসক আসিয়া তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন। যদি কোন রোগ থাকে তাহা হইলে অতি যত্নে তাহার চিকিৎসা করা হয়। যখন সুস্থ হয়, তখন তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করান হয়, সৎসঙ্গে থাকিতে দেওয়া হয়, সদ্‌গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়, তাহার কোনও বিশেষ কাজ করিতে হয় না। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে কোন একটি শিল্প বা কার্য্য অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে যখন সে কারাগার হইতে বাহির হয়, তখন সে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসে। সৎ-সঙ্গে, সৎশিক্ষায় সে সুন্দর চরিত্র লাভ ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়া আপনার ভরণপোষণ আপনি করিতে পারে। ফিলিপাইন্ দ্বীপের লোকেরা কারাগার হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি পাইলে আনন্দের সহিত কাজে নিযুক্ত করে; আমাদের দেশে যদি কোন কর্ম্মপ্রার্থী লোকের বিষয়ে জানা যায়, সে কারাগারে গিয়াছিল, তবে তাহাকে রাখিতে ভয় হয়। কিন্তু সে দেশে সেরূপ লোক পাইলে আগ্রহের সহিত রাখা হয়। ভগবান্ আমাদের সঙ্গে

পৃথিবীতে এইরূপ ব্যবহার করেন। ভালবেসে ভাল করবেন।

স্বাধীনতার একটী চিহ্ন কি কখনও কাহারও অনুকরণ করিব না। সেদিন একটী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, Imitatiou is suicide অনুকরণ করিলে আত্মহত্যা করা হয়। তোমার মধ্যে যে স্বাধীন বিশেষ ভাব বা মনুষ্যত্ব আছে তাহাকে প্রস্ফুটিত করাই কার্য্য, সেই স্বাধীন নূতন ভাবকে দমন করা, রোধ করাই আত্মহত্যা করা। পৃথিবীতে সকলেই বলে, লোকে যেরূপ করে করিয়া যাও, অনুকরণ কর। যদি কোন লোক কোন নূতন স্বাধীন মত বা ভাব প্রচার করে, সে সকলের বিরাগ-ভাজন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নানা উৎপীড়ন বাধা বিঘ্নের মধ্যে নিজের স্বাধীনভাবকে জাগ্রত, বর্দ্ধিত করিতে পারে সেই যথার্থ ভগবানের সন্তান হইবার যোগ্য। অনুকরণপ্রিয়তা মানুষের স্বভাবে আছে, তাহা দ্বারাই মানুষ সকল জ্ঞানলাভ করে। একজন মানুষ সম্পূর্ণ-রূপে কখনও কাহারও অনুকরণ করিতে পারে না; নিজের ভিতরের আলোক ও বাহিরের দৃষ্টান্ত, উভয়ের সংমিশ্রণে নূতন মানুষের সৃষ্টি। সাধারণ ভাব ও বিশেষ ভাব, এই দুইয়ের মিলনে একটী মনুষ্য হয়। অনুকরণপ্রিয়তা মানুষের ভয়ানক অনিষ্ট ক'র্‌ছে, নিজের মনুষ্যত্ব, বিশেষত্ব হারাচ্ছে। একদিক হইতে সকল মানুষই আমার গুরু, অপর দিক হইতে কেহই আমার গুরু নয়, সকলের নিকট হইতেই শিখিবার আছে, সম্পূর্ণ-রূপে কাহারও অনুকরণ করা যায় না। এই স্বাধীনতা আমাদের জীবনের নানা বিভাগে প্রয়োগ করিতে হইবে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিজের স্বাধীনতাকে একটুও খর্ব্ব করা হবে না, যাহা সত্যরূপে বুঝিয়াছি তাহা অন্যের অনুরোধে ছোট করা হবে না, এবং লোকের স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করা হবে না, অনিচ্ছায় কোন বিষয়ে বাধ্য করা হবে না। শুনিয়াছি, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন, আমার সম্মুখে যদি কেহ কোন মানুষকে হত্যা করে; আমি তাহাকে নিবারণ করিতে পারি না, বাধা দিতে পারি না।

আমরা অনেক সময়ে অন্যের প্রদর্শিত পথে চলি, এখানে আবার স্বাধীনতা দরকার। অন্যের বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস হবে না, যেমন কোন স্থানের কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর বর্ণনা অন্য লোকের মুখে শ্রবণ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত না স্বচক্ষে দেখিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিতেছে না। আমরা কিন্তু অনেক বিষয়ে "পরের মুখে ঝাল খাই"; সকলে বলে সুন্দর, আমিও অনুভব না করিয়াই সুন্দর বলিলাম। এই জগতের নৈসর্গিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিষয় আমার নিজের উপলব্ধি করিতে হইবে। এক একটী সত্য বা বিষয় গ্রহণ করিয়া সেই সত্য নিজের অন্তরে অনুভব করা চাই। স্বাধীনভাবে, অন্যের কথায় তৃপ্ত না হ'য়ে, প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,

তত্ত্বান্বেষণ করিতে হইবে। ভগবান্ চান যে তাঁর প্রত্যেক সন্তান জগতের সব বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সকল জ্ঞানকে, পুস্তকের, শাস্ত্রের সাধু মহাজন হইতে প্রাপ্ত সকল জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া লইতে হইবে। যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রত্যেকের নিজের অর্জ্জন করতে হবে, এক জনের বিশ্বাস হইলে অন্যের বিশ্বাস হয় না, তেমনি প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান, আমার নিজেকে অর্জ্জন করতে হবে।

শিশুশিক্ষা বিষয়েও স্বাধীনতা দরকার। আজকাল শিশুশিক্ষা বিষয়ে নানা আলোচনা হইতেছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, শিশুশিক্ষার প্রারম্ভে স্বাধীনতা দরকার। শৈশব হ'তেই শিশুকে সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অনুভব করিতে দেওয়া হইবে। তাহার জ্ঞান ও বিবেককে প্রথম হইতেই স্বাধীন করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা ইহাই শুনিয়া আসিয়াছি, পিতামাতা সন্তানকে চালিত করিবেন, সে হিতাহিত জ্ঞানহীন শিশু মাত্র। পিতামাতা পথ দেখাইবেন, সে তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক চলিবে। পিতামাতা শিশুকে এরূপভাবে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে তাহার অন্তরে ভালমন্দ জ্ঞান পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইতে পারে ; পিতামাতার অনুপস্থিতিতে নিজের স্বাধীন জ্ঞানদ্বারা আপনাকে সুপথে রক্ষা করিতে পারে। অনেক বিষয়ে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত চলিতে দিতে হবে, অনেক সময় সে অন্যায় ক'রে ফেলবে, নষ্ট করবে, ক্ষতি করবে, কিন্তু এইরূপে তাহার নিজের জ্ঞান অভিজ্ঞতা জন্মিবে। কেবল পিতামাতার আদেশে উপদেশে চলিলে, সে কখন মানুষ হইতে পারে না।

স্বাধীনতারূপ মহামূল্যধন ভগবান্ আমাদের দিয়াছেন, তাহা আমাদের জীবনের নানা বিভাগে প্রয়োগ করিতে হইবে। দুই এক বিভাগে দৃষ্টি পড়িয়াছে, আরও কত দিক এখনও রুদ্ধ রহিয়াছে, ক্রমে আরও কত দিকে কত ভাবে কত রূপে স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে হইবে, জানি না। এ বিষয়ে স্বাধীনতার হস্তে আপনাদের ছাড়িয়া দি, স্বাধীনতা আমাদের চালিত করুন। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ। অন্যের আদেশ উপদেশে চলিলে আমার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না।

একটী মোসলমান মহিলার মৃতদেহের প্রতি সম্মান।

আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেলে সে দেহের আর কোনও মূল্যই থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে, আমরা যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ ছাড়িয়া নূতন দেহ ধারণ করে। সুতরাং জীর্ণ-বস্ত্রের ন্যায় বিগত-প্রাণ দেহ একান্তই মূল্যহীন। বস্তুতঃ শবদেহ হইতে কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বরং রাখিয়া দিলে তাহা গলিত হইয়া পুতিগন্ধে ব্যাধি

প্রভৃতি আনয়ন করিয়া বিষম অনিষ্টের সৃষ্টি করে। মায়ামুক্ত জ্ঞানী মহাত্মা ব্যক্তিগণ পরম স্নেহভাজন আত্মীয় বিয়োগেও শোকে অণুমাত্র বিচলিত হন না। তাঁহাদের চিত্ত নির্ব্বিকার, তাঁহারা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়াই নিরস্ত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি মায়ামুগ্ধা শোকবিহ্বল কোনও জননীকে মৃত শিশু বক্ষে ধারণ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালু বেশে হৃদয়বিদারক শোক গাঁথায় ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়াছেন, ধূল্যবলুণ্ঠিতা জননী সেই শিশুকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন ও স্নেহ-সম্ভাষণে আপ্যায়ণ করিতে যাইয়া তাহার উত্তর না পাইয়া ভীষণ ব্যাকুলতার সহিত স্বীয় মস্তকের কেশোৎপাটন পূর্ব্বক ভীষণ চীৎকার করিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীব স্বাভাবিক স্নেহের প্রাবল্যে প্রিয়জনের মৃত দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না। দেহ ও আত্মার পার্থক্য যুক্তিতে হৃদয়ঙ্গম হইলেও অভ্যাসবশতঃই হউক, বা মায়াবশতঃই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, কার্য্যতঃ সে ভেদবোধ অনেক সময়ই মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীবিতাবস্থায় যে জনক জননী বা অন্য গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি, যাঁহাদের চরণবন্দনা না করিয়া কোন কার্য্য করি নাই, আজ হঠাৎ তাঁহাদের কাহারও পরলোকগমন মাত্রই তাঁহার সেই মৃত পরিত্যক্ত দেহ তখন মূল্যহীন বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিব ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতিতেই মৃত মানবদেহ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সভ্যসমাজে সাধারণতঃ তিন প্রকার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিসংকার, খ্রীষ্টান ও মোসলমান কর্ত্তৃক কবর প্রদান ও পার্শিগণ কর্ত্তৃক Tower of Silence নামক প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত ভূমিতে মৃতদেহ নিক্ষেপ ও তথায় শকুনি গৃধিণী প্রভৃতি দৃঢ়চঞ্চু পক্ষী কর্ত্তৃক মৃতদেহের ভক্ষণ। শেষোক্ত ব্যবস্থা যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাব্যঞ্জক তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দুগণ মৃতদেহের প্রতি কোনও সম্মান করেন না, এ কথা বলিলে অসত্য ও অন্যায় বলা হয় এরূপ মনে করি না। আমি হিন্দু মহিলা; হিন্দুর আচার, হিন্দুর রীতিনীতি দেখিয়া শুনিয়াই ইহা বলিতেছি। হিন্দুগণ সামান্য বস্ত্রখণ্ডে মৃতদেহ আচ্ছাদন করিয়া বাঁশের মঞ্চের উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাহা কাঁধে বহিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া যান; তথায় চুল্লী প্রস্তুত করিয়া কাঠ ও অগ্নিসহযোগে সেই দেহ পোড়াইয়া ফেলেন। শুনিয়াছি, "শ্মশানবন্ধু"গণ অনেক স্থলে সত্বর কার্য্য সম্পাদন জন্য ভীষণ লগুড়াঘাতে মৃতদেহের হস্ত পদ বা মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জীবিতাবস্থায়, এমন কি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে দেহের আরামের জন্য বিবিধ বেশভূষা, সুকোমল শয্যা, আস্তরণ প্রভৃতি

আড়ম্বরের অপ্রতুল ছিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে তৎসমস্ত বিস্মৃত হইয়া ঐ দেহের প্রতি উক্তরূপ আচরণ কি বীভৎস ও নিতান্ত নৃশংস নহে? শবদেহ মঞ্চোপরি কাঁধে বহিয়া শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত নেওয়াকে যদি তৎপ্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন গণ্য হয়, তা হ'লে আমার কিছু বলিবার নাই। দেহ সম্বন্ধে উক্তরূপ ব্যবস্থা হইলেও তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য হিন্দুসমাজে পিণ্ডদানাদি বিবিধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

খ্রীষ্টান ও মোসলমান সমাজে মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অতি সুন্দর রীতি পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি আমরা একটি মোসলমান মহিলার পরলোক গমনের পর তাঁহার মৃতদেহের সম্বন্ধে যে যে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই মোসলমান মহিলা আমাদের প্রতিবেশিনী ছিলেন, অনেক সময় বাটীর ছাদের উপর উঠিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি। আট দিনের জ্বরে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। তখন প্রাতঃকাল ৫টা, কান্নার রোলে আমরা জাগিয়া উঠি। বেলা দুপুর ১২টা পর্য্যন্ত অগণিত আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিয়া গেলেন। তৎপর মক্কা তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এমন দ্বাদশ জন স্ত্রীলোককর্ত্তৃক অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাঁহার শবদেহ কক্ষমধ্য হইতে দ্বিতলের বারান্দায় আনয়ন করা হইল। এই সময় কোনও পুরুষ, এমন কি তাঁহার স্বামী বা পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না।

ইহার পর উৎকৃষ্ট সাবান ও জল দিয়া প্রথমতঃ সমস্ত দেহ পরিষ্কাররূপে ধৌত করা হইল; পুনরায় গোলাপজল ও সাবান সহযোগে মস্তকের চুলের গোড়া হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত অতি সতর্কভাবে পরিষ্কার করা হইল, এমন কোমল ভাবে ও সাবধানতার সহিত দেহ মর্দ্দন করা হইয়াছিল যে, পাছে অঙ্গুলির নখাঘাতে মৃতদেহের কোনও স্থানে ক্ষত হয়, এই ভয়ে হাতে নূতন বস্ত্র নির্ম্মিত এক প্রকার দস্তানা বা থলে ব্যবহার করা হইয়াছিল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকারন্ধ্র ও দন্তপংক্তি যে কত যত্নে ও সাবধানে পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল, মৃতারমণী যেন একটী শিশু বালিকা, নিমন্ত্রণোপলক্ষে কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্বয়ং বেশভূষা করিতে অসমর্থ, তাই যেন তাহার আত্মীয়া মহিলারা আসিয়া তাঁহার সাজ সজ্জা করিয়া দিতেছেন। শবদেহের ভীতিপ্রদ বিকট চেহারা এখানে দেখিলাম না, ইহাকে গাঢ় নিদ্রাভিভূতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। অতঃপর ঐ শবদেহে নূতন থান কাপড়ের প্রস্তুত একটী পায়জামা পরান হইল, ও একটী শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত দেহ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কফিন নীচে আঙ্গিনায় ছিল। ৮।১০ জন মহিলা শবদেহটী ধরাধরি করিয়া খুব সাবধানে নীচে নামাইয়া অতি

সযত্নে ও সম্ভ্রমে কফিনে রক্ষা করিলেন; কফিনের উপরভাগ ভাল বহুমূল্য শাল দিয়া আচ্ছাদন করা হইলে পর পুরুষগণ উহা বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তৎপর কি হইল আমি দেখিতে পাই নাই।

এই মোসলমান মহিলার মৃতদেহের প্রতি যেরূপ যত্ন ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা হইল, তাহা দেখিয়া স্বতঃই আমাদের হিন্দুসমাজে প্রচলিত পদ্ধতির সহিত তুলনা জাগিয়া উঠিল। হিন্দুগণ সধবা মৃতাকে শাঁখা সিন্দুর পরাইয়া বা সামান্য নূতন বস্ত্রখণ্ড পরাইয়াই তৎপ্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইল মনে করেন। কিন্তু উল্লিখিতরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের কোনও ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। খুব ধনী পরিবারে কখন কখন চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহের সৎকার করা হয় সত্য, কিন্তু শুধু উহাই কি তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন পক্ষে যথেষ্ট? শ্মশান ঘাটের নৃশংসতা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যে দেহের জন্য এত যত্ন করা হইতেছে তাহা পরিণামে শকুনি গৃধিনীর ভক্ষ্য হইবে, কিংবা স্বজাতির লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, এ দৃশ্য মানব জাতির পক্ষে কখনও শ্লাঘাকর নহে। জানি, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে, জানি, দেহকারাগার হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া গেলে শূন্যপ্রাণ দেহ অসাড় ও একান্ত মূল্যহীন। কিন্তু এই দেহধারীইতো এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার সামগ্রী ছিলেন; ইঁহার সুখ, শান্তি, আরামের জন্য কি না করিয়াছি, হায়! মুহূর্ত্তমধ্যেই কি সে সমস্ত বিস্মৃতিসলিলে চিরনিমজ্জিত করিয়া সে দেহের অবমাননা করিব? খ্রীষ্টান সমাজে desecration of the dead বা মৃতদেহের অবমাননা অত্যন্ত পাপজনক বলিয়া পরিগণিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ পাপানুষ্ঠান না হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু তাহা একবাক্যে নিন্দিত হইয়াছে। দেহ মৃতই হউক বা প্রাণযুক্তই হউক, উহা ভগবানের দান, তাহার অবমাননা কখনই মানবীয় ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিষ।

যে কোন দ্রব্য শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অবিলম্বে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তাহাকে বিষ বলা যায়। বিষ সাধারণতঃ তিন প্রকারে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, যথা—ভক্ষণ দ্বারা, ক্ষতমুখে প্রযুক্ত হইলে ও নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে। কখন কখন বিষাক্ত দ্রব্য চর্ম্মোপরি ঘর্ষণ করিলেও শরীরে বিষের লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ভক্ষণ দ্বারা শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে, সর্পাঘাতে কিংবা ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনে যে ক্ষতমুখে বিষ প্রবেশ

করে তাহা সকলে অবগত আছেন, কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলে অবগত নহেন যে, কোনরূপ ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তদুপরি ঔষধ প্রয়োগ করিলে সময়ে সময়ে তাহা শোণিতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic acid) আইডোফরম্ (Iodoform) বা পারদসংযুক্ত ঔষধ, যাহা নানাপ্রকার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইতে এরূপ ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বেলেডোনা (Belladona) ধুতুরা বা পারদ-সংযুক্ত মালিশের তৈলেও কখন কখন এরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষাক্ত বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে আমরা ভক্ষিত বিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই পর্য্যন্ত যে সমুদায় দ্রব্য বিষ বলিয়া জানা গিয়াছে, এবং যাহা ভক্ষণে মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত হয় বা মৃত্যু ঘটে, তাহা সাধারণতঃ লক্ষণানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

১। উত্তেজক বা প্রদাহোৎপাদক।
২। মাদক বা অবসাদক।
৩। পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় গুণসম্পন্ন।

প্রথম শ্রেণীস্থ বিষ সেবন করিলে, মুখে গলনালী ও পাকাশয় দগ্ধপ্রায় হয় বা "ঝেজিয়া" যায় এবং অভ্যন্তরে জ্বালা অনুভব এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বিষ সেবনে, নেশা, উন্মত্ততা বা সংজ্ঞাহীনতা উৎপন্ন হয়। তৃতীয় শ্রেণীস্থ বিষ সেবনে, পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে প্রথমে দারুণ জ্বালা অনুভূত হয়, পরে ভেদ ও বমন এবং অবশেষে অচৈতন্য উপস্থিত হয়। নিম্নে এই তিন প্রকার বিষের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথম শ্রেণী—সকল প্রকার দ্রাবক দ্রব্য যথা গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) যবক্ষার দ্রাবক (Nitric acid) কার্বলিকএসিড (Carbolic acid) ইত্যাদি। সকল প্রকার তীব্র ক্ষার দ্রব্য যথা তীব্র পটাশ (Caustic potash), তীব্র সোডা (Caustic soda), চুণ Lime, এমোনিয়া (ammonia) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী—অহিফেন, ধুতুরা, সিদ্ধি বা ভাং, মদ্য, তামাকু ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণী—সেঁকো বিষ (arsenic) কাঠ বিষ (aconite) শ্বেত ও রক্ত করবির মূল, কলিকা ফুলের মূল, তারপিন, ফসফরাস, কেরোসিন, ম্যাজেন্টা, (magenta) সিন্দুর, কোকেইন।

উপরি লিখিত তিন শ্রেণীস্থ বিষ সেবনের ফলস্বরূপ কি কি লক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায়ই বা কি তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। একথা বলা বাহুল্য যে এখানে যে সমুদয় প্রতীকারের উপায় বর্ণিত হইতেছে তাহা আংশিক মাত্র, অর্থাৎ চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার ভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত যে যে উপায় অবলম্বন প্রয়োজন কেবল তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

কোন ব্যক্তি বিষপান করিয়াছে একথা অবগত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

১। গন্ধক দ্রাবক ও যবক্ষার দ্রাবক।

লক্ষণ,—মুখ হইতে উদর পর্য্যন্ত তীব্র জ্বালা, বারংবার বমন (পরিত্যক্ত পদার্থ কাল এবং লালাপূর্ণ)। মুখের অভ্যন্তর এবং জিহ্বা, সলফিউরিক এসিড (sulphuric acid) পানে কাল বর্ণ এবং নাইট্রিক এসিড (nitric acid) পানে হরিদ্রাবর্ণ হয়। কথা বলিতে, ঢোক গিলিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয় এবং ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও বেগবতী হয় এবং সময়ে সময়ে অসমান ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। বাহ্য ও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

প্রতীকার—প্রথমে জলের সহিত খড়ি, সোডা, (soda) চুণ কিংবা সাবান গুলিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়া দিবে,—এই সমুদয়ের কোন দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে, গৃহের প্রাচীর হইতে চুণ তুলিয়া তাহা গুলিয়া দিলেও হইতে পারে। পরে নারিকেল বা তিল তৈল, জলের সহিত মিশ্রিত অণ্ডের লালা, বার্লির (barley) জল কিংবা জলের সহিত ময়দা গুলিয়া খাইতে দিবে। যদি জ্বালা বা বেদনা অসহ্য হয়, চার চামচাতে (tea-spoon) এক চামচা অহিফেণের আরক (tincture of opium) পিচকারীর দ্বারা মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদ্যপি নাড়ীর গতি দুর্ব্বল হয় তবে এক আউন্স ব্রাণ্ডি সমান পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপরি উক্ত রূপে পিচকারী দিবে।

কার্ব্বলিক এসিড।

লক্ষণ।—সলফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড পানে যে সমুদয় লক্ষণ উৎপন্ন হয়, ইহাতেও সাধারণতঃ তাহাই হইয়া থাকে কেবল কার্বলিক এসিড পানে মুখ ও জিহ্বা কাল বা পীত বর্ণ না হইয়া শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে। চক্ষুর তারা দুটী সঙ্কুচিত হয়। পীড়িত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়ে এবং তদবস্থায় নিশ্বাসে নাক ডাকার ন্যায় শব্দ হয়। প্রস্রাব কোন কোন স্থলে বন্ধ হইয়া যায়, সচরাচর উহা ঈষৎ সবুজ বর্ণ বা কটা বর্ণ হয়, এবং কষ্টে নিঃসৃত হয়। মুখে কার্বলিক এসিডের গন্ধ পাওয়া যায়।

প্রতীকার।—প্রথমে ২।৩ আউন্স ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি (whiskey) তদর্দ্ধ পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে, তৎপরে বড় চামচার (table-spoon) এক চামচা সলট (sulphate of magnesia বা (epsom salt) এক গ্লাস জলে গুলিয়া পান করাইবে, তৎপরে ডিমের লালা দুগ্ধ এবং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। পীড়িত ব্যক্তির শরীর যাহাতে শীতল হইয়া না যায় তাহার উপায় অবলম্বন করিবে। উষ্ণ বস্ত্রে তাহাকে আবৃত রাখিবে এবং গরম জলের বোতল পদতলে ও পার্শ্বে রাখিবে।

তীব্র ক্ষার দ্রব্য।

এই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে চুণই সচরাচর আমাদের গৃহে থাকে। সময়ে সময়ে শিশুরা তাহা খাইয়া কঠিনরূপে পীড়িত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—অধিক চুণ খাইয়া ফেলিলে মুখ এবং জিহ্বা হেজিয়া যায় এবং মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বালা অনুভব হয়, বারংবার বমন হয় এবং তৎসঙ্গে কাল রক্ত মিশ্রিত পদার্থ নির্গত হয়।

প্রতীকার।—প্রথমে কোনরূপ অম্ল দ্রব্য যথা—তেঁতুল, লেবুর রস, সির্কা (vinegar) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তৎপরে দ্রাবক দ্রব্য সেবনে বিষের লক্ষণ উৎপন্ন হইলে যাহা করিতে হয় ইহাতেও তাহাই করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ, নারিকেল বা তিল তৈল অথবা অণ্ডের লালা দুগ্ধ বা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তিল, তিসি, ইসফ্‌গুল, তোকমা উষ্ণ জলে ভিজাইয়া সে জল শীতল করিয়া খাইতে দিলেও উপকার হয়। ইসফ্‌গুল এবং তোকমা বীজ শুদ্ধ খাওয়াই ভাল।

দ্রাবক ও ক্ষার দ্রব্য গ্রহণে বিষলক্ষণাক্রান্ত হইলে, কোন রূপ বমন করিবার ঔষধ দিবে না। শরীরের কোন স্থান কোন রূপ দ্রাবক দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে যেরূপ সময়ে সময়ে গাত্রে সলফিউরিক বা নাইট্রিক এসিড নিক্ষেপ হইতে শুনা যায় উহা তৎক্ষণাৎ সোডা, (soda) খড়ি বা চুণ মিশ্রিত জল দ্বারা ধৌত করিবে এবং পরে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের ন্যায় দগ্ধস্থানে চুণের জল ও নারিকেল তৈলের প্রলেপ দিয়া তুলার দ্বারা আবৃত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। যদি ক্ষার দ্রব্যের দ্বারা কোন স্থান দগ্ধ হয় বা হেজিয়া যায়, তবে তাহা কোনরূপ অম্ল দ্রব্য মিশ্রিত জলের দ্বারা ধৌত করিবে এবং দগ্ধস্থান পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে বাঁধিয়া দিবে।

ক্রমশঃ।

হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২য়।

বুথ তাহার কাতরনয়ন উত্তোলন করিয়া বলিল, "মহাশয় যদি দয়া ক'রে এক্ষণই আমাকে এক টুক্‌রো রুটী দিয়ে যান—এক পেনী মূল্যের রুটী পেলেই আমি কৃতার্থ হই।"

ফ্রান্সিস্ টেট্ তখন দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "মিসেস্ বুথ, তুমি জান যে এখানে কিছু দেওয়া আমার সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ, আরও জান যে তোমাদের কেহ এরূপভাবে কিছু পাইবার চেষ্টা করিলে, আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাকি। শান্তভাবে ঘরে যাও বাছা, আমি ব'লেছি যে একটু পরেই তোমাকে গিয়ে দেখ্‌বো।"

বুথ তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে বহিঃস্থ রমণীমণ্ডলী যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত ঘিরিয়া

দাঁড়াইয়াছিল, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে উক্ত নিয়মের কিরূপ আবশ্যকতা ছিল। বিধবাকুলের একজনও ঐ স্থান পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "সে কিছু পেয়েছে কি?" প্রত্যুত্তরে যদি শুনিতে পাইত যে কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ইহারা পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া ভিক্ষার জন্য রেক্টরকে একে একে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

বিধবা বুথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না গো না, কিছু পাই নি, আমি আগেই জান্তম যে তিনি কিছু দেবেন না, তবে ব'লেছেন যে তিনি একবার আমাকে দেখে যাবেন।"

অতঃপর সকলে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল। কেহ এদিক, কেহ ওদিক, যার যার মত নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। রেক্টর বাতি নির্ব্বাপিত করিলেন ও কেরাণী সমভিব্যাহারে বাহির হইয়া পড়িলেন। রুটী বিতরণার্থ এক সপ্তাহের জন্য মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইল। মিঃ টেট্ স্বয়ং চাবিগুলি ঘরে নিবার জন্য লইলেন, তাঁহার গৃহেই চাবি থাকিত। ইতঃপূর্ব্বে ওগুলি কেরাণী তাঁহার বাটিতে পৌঁছাইয়া দিতেন, কিন্তু তিনি খঞ্জ ও বৃদ্ধ হইয়াছেন অবধি মিঃ টেট্ তাঁহাকে আর এ কষ্ট করিতে দিতেন না।

রাত্রি বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু রাস্তাগুলি স্থানে স্থানে জল কাদায় পরিপূর্ণ থাকায়, এবং যে পথে রেক্টর তাঁহার গৃহে যাইতেছিলেন তাহাতে উপযুক্তরূপ আলোকের বন্দোবস্ত না থাকায়, অনেক স্থলেই তাঁহার পা জলকর্দ্দমময় গহ্বরে নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার বাসগৃহ একটী সুন্দর ও সুপরিচিত স্কোয়ার বা চতুষ্কোণ মুক্ত ময়দানের সন্নিহিত ছিল। বাহির হইতে বাড়ীটিকে অতি সুন্দর দেখাইত। এই আবাসগৃহ দেখিয়া মনে হইতে পারে, এই পল্লী হইতে রেক্টরের অন্ততঃ পাঁচশত পাউণ্ড বার্ষিক আয় হইত, কিন্তু বস্তুতঃ সেরূপ কিছুই নয়। পল্লীবাসিগণ তাঁহাকে এমন উৎকৃষ্ট বাটী প্রদান করিয়া যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পোয়া ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ টেট্ ধর্ম্ম-মন্দির হইতে গৃহে সমাগত হইলেন।

মিঃ টেটের গৃহে তাঁহার নিজ পরিবার ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অপর এক পল্লীর ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড মিঃ এক্টন্ বন্ধুরূপে স্থিতি করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গেই তথায় আহারাদি করিতেন। এই বন্দোবস্তে মিঃ টেটের একটু সাহায্য হইত; তাহা না হইলে তিনি কখনই দুজন চাকর রাখিতে পারিতেন না; কারণ তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষাতেই তাঁহার আয়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। কিন্তু মিঃ এক্টন সম্প্রতি কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে বদ্‌লি হওয়াতে, তাঁহাকে এ স্থান ও এ আবাস পরিত্যাগ করিতে হইল। মিঃ টেট্ তাই অপর কোনও ভদ্রলোককে গৃহে স্থান দিবার জন্য ইচ্ছুক ও চেষ্টিত হইলেন।

বর্ণিত সায়াহ্নে মিঃ টেট্ জল কাদা ভাঙ্গিয়া গৃহে আসিতেছিলেন; তাঁহার

বসিবার ঘরখানা যেন আনন্দময় বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা নীচের তলার ঘর হইলেও বেশ উঁচু ও প্রশস্ত এবং তাহার সম্মুখেই বড় রাস্তা। উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় ঘরটী সমুদ্ভাসিত। একখানা টেবিলের উপর চা পাত্রের পশ্চাদ্ভাগে, দুটী বাতি ছিল কিন্তু তাহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় নাই, কারণ ঘরের উজ্জ্বল অগ্নিশিখার আলোকই তৎসময়ে তথাকার কার্য্য সম্পাদন পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বস্তুতঃ সে ঘরে কোন কাজই হইতেছিল না—যা হইতেছিল, তাহাকে খেলা বলিলেই ঠিক হয়। একটী যুবতী ধীরপাদক্ষেপে ঐ কক্ষের চারিদিক পরিক্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার গতি ও প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন ধীরতাব্যঞ্জক। তিনি ঐ ভাবে তালে তালে পা ফেলিয়া আপন মনে মিহিসুরে একটী রাগিণী টানিতেছিলেন। যৌবনসুলভ নির্দ্দোষ চিত্তপ্রসাদ লইয়া তিনি এইরূপে উক্ত কক্ষে পাদচারণা করিতেছিলেন। নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সেই মনোজ্ঞদর্শন বালিকাকে দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, কারণ গর্ব্ব করিবার মত সৌন্দর্য্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন কিছু ছিল, যাহা স্বতঃই অপরের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। ঐ সুন্দর বিনম্র মুখমণ্ডলে সরলতা মাখান, অক্ষিযুগলে রেভারেণ্ড মিঃ টেটের চক্ষুর ন্যায় অকৃত্রিম সততা বিজড়িত, কুন্তলকলাপ উজ্জ্বল সুবর্ণরাগরঞ্জিত। ইনি ঐ ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক মনে হয় না, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার বয়স আরও এক বৎসর বেশী ছিল। তিনি তখন বেগুনে রংয়ের সিল্কের ছোট আস্তিনবিশিষ্ট একটী জামা পরিধান করিয়া ছিলেন। তৎকালে যুবতী মহিলাগণ তাঁহাদের চারু কণ্ঠদেশ ও ভুজপাশ আবৃত রাখিতেন না। তাঁহার পরিহিত উক্ত পোষাক দিনের বেলায় পুরাতন বলিয়া দেখা গেলেও সন্ধ্যা বাতির আলোকে তখন অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

সদর দরজার চাবি নাড়ার শব্দ শুনিয়া তিনি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন কে আসিয়াছেন, কারণ ঐ চাবি গৃহস্বামী ব্যতীত অপর কাহারও নিকট থাকিত না। বালিকা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে যাইয়া বাতি ধরাইতে গেলেন।

মিঃ টেট্ ঐ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ওভারকোট বা টুপি না খুলিয়াই তিনি বলিলেন, "জেন্, চা তৈয়েরি করে'ছ।"

"না বাবা, এই সবে মাত্র পাঁচটা বেজেছে।"

"তা হ'লে, এক্ষণই আমাকে আমার বের হ'য়ে যেতে হচ্ছে। দু এক জন স্ত্রীলোককে দেখে আস্‌তে হবে।" তৎপর বক্‌লাস আঁটা জুতো ও কালরঙের গেইটারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার পা ইতিমধ্যেই ভিজে গিয়েছে; এই অবস্থায় ঘুরে এলে আর দ্বিতীয়বার ভিজতে হবে না। ইত্যবসরে তুমি

আমার শ্রীপায় জোড়া গরম ক'য়ে রে'খ, কিন্তু"—এই বলিয়াই হঠাৎ একটা কথা স্মরণ করিয়া থামিয়া গেলেন। তৎপর বলিলেন, "কিন্তু, তোমার মা ততক্ষণ অপেক্ষা কর্ত্তে পারবেন কি ?"

"মাত্র আধঘণ্টা হ'ল মা এক পেয়ালা চা পান ক'রেছেন। তিনি বলছিলেন, এতে তাঁর উপকার হ'তে পারে। চা পানের পর যদি একটু ঘুম হয়, তা হ'লে হয়ত তিনি শয়নের পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণের জন্য একবার নীচে নেমে আসতে পারবেন। তুমি যখন ইচ্ছে কর, তখনই চা তৈয়েরি ক'রে দিতে পার্‌বো, বাবা। বাটীতে এখন আর একমাত্র ফ্রান্সিস্ আছে। আমরা দুজন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌তে পারবো।"

"তা হ'লে আমি এক্ষণই যাই। রাত দশটা হবে না জেন্, বড় জোর ছয়টা। বেটী কিং পীড়িতা, তার ঘর এখান থেকে খুব দূরে নয় ; আর বিধবা বৃথকেও একবার দেখে আসতে হবে।"

মিঃ টেট্ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় জেন্ বলিলেন, "বাবা, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। ফ্রান্সিস্ বলছিল, সে একজন ভদ্রলোককে জানে, তিনি মিঃ এক্টনের স্থলে আমাদের এখানে থাক্‌তে ইচ্ছুক হ'তে পারেন।"

"বটে, কে তিনি ?"

"তাদের স্কুলের একজন শিক্ষক। ঐ যে ফ্রান্সিসই নেমে আস্‌ছে, সে হাত ধোবার জন্য উপরে গিয়েছিল।"

"হাঁ বাবা, ইনি আমাদের নূতন গণিতাধ্যাপক।" অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ফ্রান্সিস্ নেমে আসিয়া এই বলিল। ফ্রান্সিস্ তখন ধর্ম্মযাজকের উপযোগী বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করিতেছিল। "ইনি ডাঃ পার্শির সহিত যে কথোপকথন করিতেছিলেন, আমি তা শুন্‌তে পেয়েছিলাম। ডাঃ পার্শিকে তিনি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলেন, তিনি এমন কোনও বাড়ীর কথা বল্‌তে পারেন কি না যেখানে তাঁহার স্বচ্ছন্দে থাকা ও আহারাদির বন্দোবস্ত হ'তে পারে এবং তাঁদের সঙ্গে এক পরিবারের মত থাকা যেতে পারে। আমি তা শুনে ব'লেছিলাম, যে হয়ত আপনি তাঁকে আমাদের পরিবারে গ্রহণ কর্ত্তে পারেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।"

মিঃ টেট্ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "ফ্রান্সিস, তুমি কি তাঁহাকে পরিবারভুক্ত করার যোগ্য ব্যক্তি মনে কর ? তিনি ভদ্রলোক বটেন তো ?"

ফ্রান্সিস্ বলিল, "তিনি সর্ব্বপ্রকারে ভদ্রলোক এ আমি দৃঢ়তার সহিত বল্‌তে পারি। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জান্‌তে পেরেছি, তাতে সকলেই তাঁকে পছন্দ ক'রেছি।"

"তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছেন কি ?"

"না, তবে শীঘ্রই কর্‌বেন।"

"ভাল, আপাততঃ এ সম্বন্ধে আমি হাঁ, না, কিছুই বল্‌তে পাচ্ছি না।" এই বলিয়া মিঃ টেট্ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

জেন্ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখভাগে চিন্তাকুল-

চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিগুলি অজ্ঞাতসারে সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত তাঁহার মস্তকের সুন্দর কুন্তলকলাপের সিঁথীপথের উপর সঞ্চালিত হইতে লাগিল। আত্মাভিমানে তিনি আর কখনও এমন কাজ করেন নাই, ইহা বলিলে অসত্য বলা হয়। বস্তুতঃ নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্যের বিষয় সম্পূর্ণ অনবগত, এমন রমণীর সংখ্যা জগতে একান্তই বিরল। কিন্তু জেন্ এইক্ষণ নিজের বা তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিষয়, কোনটিই ভাবিতেছিলেন না। তিনি গৃহসম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহার জননীর সঙ্গে পিতার দরিদ্র পল্লীবাসিগণের মধ্যে গৃহের বাহিরের কাজেও যোগ দিতেন। প্রস্তাবিত ভদ্রলোক তাঁহাদের সঙ্গে স্থিতি করিতে আসিলে, তজ্জন্য তাঁহার কি কি অতিরিক্ত কাজ করিতে হইবে, জেনের চিন্তাস্রোত এক্ষণ সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছিল। হঠাৎ তাঁহার ভাই ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার কি নাম ফ্রান্সিস্?"

"কার?"

"ঐ ভদ্রলোকের—তোমাদের স্কুলের নূতন শিক্ষকের।"

"হ্যালিবার্টন, তাঁর ক্রিষ্টিয়ান নাম আমি জানি না।"

"আমি ভাব্ছি, মিঃ এক্টনের ন্যায়, ইনিও তাঁর মোজাগুলি অত শিগ্‌গির শিগ্‌গির ছিড়বেন কি না। বাপ্‌রে, বারটা মাস তাঁর কত মোজাই না সার্‌তে হয়েছে! ফ্রান্সিস্, ইনি কি বুড়ো থুবড়ো লোক?"

"বুড়ো আবার নয়! নীলরংয়ের চশমা চোখে পরা বেশ মোটাসোটা বুড়ো লোকটী দেখে যেন তোমার মূর্চ্ছা না হয়। আমি বল্‌ছিনা যে তিনি এমনি বুড়ো যে বাবারও বাবার বয়সী হবেন,—কিন্তু"

জেন্ নিতান্ত নৈরাশ্যের সহিত বলিলেন, "তাহ'লে অন্যূন আশি বছরের বুড়ো বটে তো? তাঁকে তুমি কি ক'রে আসতে বল্লে? মিঃ এক্টনের চেয়ে অধিক বয়স্ক কাউকে আমরা ঘরে স্থান দেব না।"

ফ্রান্সিস্ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "এক্টন? তিনি তো ছেলে মানুষ!" "তাঁকে তুমি হ্যালিবার্টনের পাশে দাঁড় করাচ্ছ! এক্টনের বয়স যে পঞ্চাশও পার হয় নি!"

"আমার বোধ হয়, তাঁর ৪৮ বৎসর বয়স ছিল।" ওহো, কি অন্যায়ই ক'রেছি, আজ অপরাহ্নে মার্গেরেট ও রবার্টের সঙ্গে বেড়াতে গেলেই হতো।" উপস্থিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া, জেন্ শেষোক্ত কথাগুলি বলিয়া উঠিলেন।

ফ্রান্সিস্ বলিল, "তাদের এটুকু সৌজন্য ছিল না যে আমাকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে। তা যাক্, মার্গেরেটকে একদিন এর প্রতিশোধ দিব।"

জেন্ হাসিয়া বলিল, "ফ্রান্সিস্, তুমি এখন বড় হ'তে চলেছ, তোমার কি যুবতী মেয়েদের উৎসবে যোগদান সাজে? মিসেস্ চীলাম মার কাছে এরূপ কি বল্‌ছিলেন——"

অকস্মাৎ সদর দরজার উপর একটী

আঘাত—সম্ভবতঃ কোনও আগন্তুকের আঘাত—জেনের কথায় বাধা প্রদান করিল। ফ্রান্সিস্ একটু ব্যস্ততার সহিত বলিল, "জেন্, এ হয়ত মিঃ হ্যালিবার্টন। তিনি বলেন নাই যে ঠিক কখন এখানে আসবেন।"

এক মিনিট পরেই একজন ভৃত্য একটী ভদ্রলোকসহ সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। জেন্ প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পাইলেন যে আগন্তুক কোন লোলদেহ বৃদ্ধ নহেন। তাই দেখে তাঁর মনটা যেন একটু পাতলা হইল। আগন্তুকের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, ক্ষীণ দীর্ঘায়তন দেহ, সুঠাম গঠন, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, পরিষ্কার রং, অতি সুন্দর চেহারা।

"এই দেখ, কত শীঘ্র আমি তোমার কথানুসারে এখানে আস্‌বার সুযোগ গ্রহণ ক'রেছি।" আগন্তুক ফ্রান্সিসের হস্তধারণপূর্ব্বক স্নেহ মধুরস্বরে এই কথাগুলি বলিলেন ও জেনের দিকে তাকাইয়া সম্ভ্রমসহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ফ্রান্সিস্ বলিল, "মহাশয়, ইনি আমার ভগিনী।" তৎপর জেন্‌কে কহিল, "জেন্, ইনি মিঃ হ্যালিবার্টন।"

মুহূর্ত্তের জন্য জেন্ তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত শিষ্ট ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন। বাস্তবিক তিনি তখন এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ও গোলে পড়িয়াছিলেন যে তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, ফ্রান্সিস্ তাঁহার সহিত তখনই চাতুরী করিতেছিল, কি কিয়ৎপূর্ব্বে করিয়াছে। মোটের উপর ইনিই প্রকৃত হ্যালিবার্টন কি না এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি সন্দেহাকুলচিত্তে একবার ফ্রান্সিস্ ও অন্যবার আগন্তুকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি মিঃ হ্যালিবার্টন?"

"হাঁ, আমারই নাম হ্যালিবার্টন।" আনতমস্তকে অতি বিনীতভাবে তিনি এই উত্তর করিলেন। "মিঃ টেটের সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে কি?"

জেন্ বলিলেন, "আপনি উপবেশন করুন। বাবা বাহিরে গিয়েছেন, সম্ভবতঃ তাঁর ফির্‌তে খুব বিলম্ব হবে না।"

ফ্রান্সিস্ অতি কষ্টে একগাল হাসি কোনরূপে চাপিয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "জেন্, তিনি কোথায় গিয়েছেন জান?"

"বেটী কিং ও বিধবা বুথের গৃহে। তবে অন্যত্রও যেতে পারেন—হয়ত গিয়েছেন।"

"সে যা হউক, আমি এক্ষণি এক দৌড়ে সেখানে যাচ্ছি। তুমি ইত্যবসরে মিঃ হ্যালিবার্টনকে সব বল্‌তে পার। আমরা এখানে কি প্রকারে থাকি, আর তিনিই বা এখানে এলে কিরূপ থাক্‌তে পার্‌বেন, এই সমস্ত তাঁকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়ে বল। তাহ'লে মহাশয় আপনিও একটা মীমাংসা কর্ত্তে পারবেন।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষিতা মহিলার প্রতি।

ভারতবর্ষ সভ্যতার বাসভূমি, জ্ঞান-রবির প্রথম প্রকাশক্ষেত্র, এবং মনুষ্যের স্বাধীনতারও এককালে বিলাসভবন ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদিও অধুনা ভারতবাসীকে অসভ্য নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত না হউক, তথাপি আজপর্য্যন্ত ভারতভূমির অসভ্যতাও অনেকদেশের তথাকথিত সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দি আচ্ছন্ন ছিল। সেই অজ্ঞানতারূপ তামসী নিশার সুযোগ পাইয়া দস্যুতস্করগণ ভারতসন্তানের স্বাধীনতারত্ন হরণ করিয়াছে। যেমন এখানে নারীগণ তেমনি নরসমূহ নানাপ্রকারে অধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। এমন শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে যে, এখনকার রমণীকুল সর্ব্বপ্রকারের অধীনতাই স্বভাব মনে করেন, অধীনতাই ভালবাসেন, কোনরূপ স্বাধীন ভাব, স্বাধীন মত, স্বাধীন বৃত্তির নামে অধিকাংশ ভারতরমণী অত্যন্ত শঙ্কিত। পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখীর যেমন মুক্তাকাশ ভাল লাগে না, ভারতীয়া নারীর —এমন কি বহুসংখ্যক পুরুষেরও—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তেমন প্রিয় বোধ হয় না। শিক্ষিতা মহিলাদিগের পক্ষে স্বজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করা অতি আবশ্যক।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণের যুগে, বৌদ্ধ যুগে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগসকলেও নারী জাতির অবস্থা কোন্ কোন্ প্রভাবে ও কোন্ কোন্ ভাবে এদেশে কত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীনতম স্বাধীনতার যুগে নারীর চিত্ত এবং চরিত্র কিরূপ ছিল, স্বীয় পরিবারে এবং জনসমাজে নারীগণ কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎকালে সকল বিষয়ে তাঁহাদের অধিকার কি প্রকার ছিল, এ সকল চিন্তা করা বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা নারীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্ব যতদূর সম্ভব আবিষ্কারে যদি কোন কোন মহিলা নিযুক্ত হন, তবে নারীদিগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সকলে জ্ঞাত হইতে পারেন।

অধুনা পুনরায় জ্ঞানের অরুণোদয় হইয়াছে। আলোক পাইয়া ভারতীয় নারীগণও পুলকিত হইতেছেন। পাখিগণ আলোক দেখিলেই অন্ধকার ও কোটর ত্যাগ করিয়া আকাশে উড়িবার উদ্যোগী হয়। ভারতে পুনরায় জ্ঞানালোক প্রকাশ পাওয়াতে নরনারী সকলেই যে অন্ধকার কোটরে বাস করিতেছিলেন, তাহা ছাড়িতে প্রয়াসী হইয়াছেন। স্বাধীনতা সকলেরই স্পৃহণীয় হইয়াছে। এ সময়ে স্বাধীনতার নামে অনেকে স্বেচ্ছাচারী হইতেছেন এবং কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে অনেক অকর্ত্তব্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। অতএব এ সময় অতি গুরুতর, প্রতি মনুষ্যের পক্ষে যৌবনকাল সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনের উপযুক্ত কাল। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যৌবনকালেই জীবনের অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এজন্য যৌবনকালকে বিষম কাল বলা হয়। বহুকালের অধীনতানিষ্পেষিত অবস্থার

পরে বর্ত্তমান সময়ের স্বাধীনতা অবশ্যই সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণজনক ; কিন্তু বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে এবং স্বেচ্ছাচারে এক্ষণ যৌবনের ন্যায় স্বাধীনতাও সমূহ অনিষ্টপাতের হেতুভূত হইতে পারে।

নারীকুলে যাঁহারা এ সময়ে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্বাধীনভাবে নারীকুলে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও সদ্বৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে এ দেশের ভাবী মহিলাগণ স্বাধীনতার পথাবলম্বনে সমর্থা ও সাহসিনী হইবেন। স্বাধীনতায় অনিষ্ট ঘটে, নারীজীবন সুপথ হারায়, এ প্রকার ধারণা নবীন ভারতীয় জনসমাজে প্রবেশপথ পাইলে ঘোরতর অমঙ্গল হইবে। সে অমঙ্গল ও কুসংস্কারের প্রতিবিধান করা দুঃসাধ্য হইবে।

যেমন নারীর তেমনি পুরুষের সংসারধর্ম্ম সাধারণ ধর্ম্ম। সাংসারিক কর্ত্তব্য—যথা, সন্তানাদির লালনপালন এবং অন্যবিধ পারিবারিক ব্যাপার সম্পাদনে নরনারীর সমান অধিকার। ঈশ্বর উক্ত কর্ত্তব্য ভিন্ন জনসমাজের বিশেষ কার্য্য সাধনার্থ বিশেষ বিশেষ রমণী এবং বিশেষ বিশেষ পুরুষকে নিয়োগপত্র প্রদান করিয়া থাকেন। সুশিক্ষার সহিত স্বাধীনতার মিলনে এবং ধর্ম্মের শাসনে নারীগণ যদি উল্লিখিতরূপ ইতিকর্ত্তব্য অবধারণে সক্ষম না হন, তবে নারীদিগের জীবনে সভ্যতার উচ্চতর অবস্থার যোগ্যতা লাভ হইল, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

সভ্যতা সমগ্র মানবসমাজকে এক অখণ্ড মনুষ্যত্ব প্রদান করে। ব্যক্তিগত চিন্তা, ব্যক্তিগত চেষ্টা সভ্যতার নিকট নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা এবং অপরাধ মধ্যে গণ্য। প্রতি ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ পরিবার রক্ষায় সচেষ্ট। পরিবাররূপ আশ্রমগৃহে প্রতি নরনারী অধিবাস করিবে, কিন্তু সমাজের সেবা এবং কল্যাণ প্রতি নরনারীর জীবনের নিয়তিচক্র। সুতরাং বিস্তীর্ণ জনসমাজের চিরন্তন কল্যাণব্রত. প্রতি মহিলারও জীবনব্রত। এদেশের মহিলাবৃন্দ কি স্ব স্ব জীবনকে স্বাধীন ভাবে উক্তবিধ মঙ্গল যজ্ঞে আহুতি দান করা অত্যাবশ্যক বোধ করেন না ?

শিক্ষিতা নবীনার মনে যদি উক্তবিধ উদার চিন্তার উদ্রেকও না হয়, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল না। এ দেশের প্রাচীনাদিগের চরিত্রে একবিধ পবিত্রতা ও উদারতা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর পবিত্রতা এবং বিশালতর উদারতার প্রতি নবীনার যদি লক্ষ্য না হয়, তবে নব্যতর উচ্চ শিক্ষার অনুরূপ নবীনতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে ভারতভূমিতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মহিলা যদি বিশ্বাসের উন্নততর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রেমপরিবারের আদর্শ দর্শন না করেন, তবে তাঁহারা অপরের নিকট মনুষ্যজীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য অধিক কি প্রদর্শন করিতে পারেন ? এক দিকে জ্ঞানশিক্ষা, অন্য দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রকৃত দীক্ষা, এই দুইটি যে কোন মহিলাজীবনে সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহারই উপর গুরুতর দায়িত্ব বর্ত্তিয়াছে।

তাঁহাদের নিকটে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি। আমাদের প্রত্যাশা কি অপাত্রে অযথারূপে স্থাপন করিতেছি? তাহা কখনই নহে।

দেবহূতি, মদালসা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি বহুসংখ্যক পূজ্যা মহিলার চরণরেণু যে ভারতের ভূমিতলে অদ্যাপি মিশিয়া রহিয়াছে, ঐ সকল ললনাসুহৃদ দেবীগণের জীবনসঙ্গীত যে ভারতকুঞ্জে অদ্যাপি বিঘোষিত হইতেছে, সেই ভারতে কি তাঁহাদের জীবনানুসরণকারিণী নবীনা যোষিৎগণ পুনরাভিনয় করিবেন না? আমরা আশা করি, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে নবীনতর সভ্যতাযুগে যেমন নারীগণ স্বাধীনতার নির্ম্মল সমীরণ ভোগে রত হইয়াছেন, তেমনি নবীন শিক্ষা এবং নবীন দীক্ষার ফলে নবীনতর জীবনলীলাও নারীকুলরত্নগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে, এ আশা আমাদের দুরাশা নহে। আমরা বর্ত্তমান নারীবংশের নিকট এ বিষয়ে নিরাশও হইব না। (ঐ)

জেবোন্নেসা।

প্রতি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যেমন একটি সেবিকার একান্ত আবশ্যক, সেইরূপ সমস্ত মানব জাতিরও বহু সেবিকার আবশ্যক। সদ্যোজাত সন্তানের জননী তাহার সর্ব্বপ্রধান সেবিকা। সন্তানই জননীর জীবন এবং সর্ব্বস্ব। আপনার জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, আপনার ভোগ-সুখবাসনা পরিহারপূর্ব্বক, জননী শিশুর জীবন সংরক্ষণে এবং পরিপোষণে ব্রতী। সমস্ত মানব জাতির বহুবিধ কল্যাণসাধন, পরিরক্ষণ এবং পরিপোষণার্থ বহুসংখ্যক সেবিকার আবশ্যক। প্রতি মহিলা আপনাকে মানবকুলরক্ষিণী সেবিকা বলিয়া যদি স্বীকার করিতে পারেন তবে তাঁহার আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে বলা যায়।

শিক্ষা এবং ধর্ম্মদীক্ষা দ্বারা উক্তবিধ জ্ঞান লাভ হওয়া উচিত। সভ্যতা যদি নারীজাতিকে উৎকৃষ্ট বসনভূষণের প্রতি কেবল আসক্ত করে, জ্ঞান যদি কেবল অভিমানভার বৃদ্ধি করে তাহা মূর্খতার অন্ধকার অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর।

হিন্দু সমাজের রমণীগণ বহুকাল হইতে জ্ঞানালোচনায় বঞ্চিত কিন্তু তাঁহারা পরের দুঃখ মোচনে বিমুখী নহেন। রমণী যে মানবকুলের জননী তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। শিক্ষিতা না হইয়াও নারীগণ বহুপ্রকারে জন সমাজের সেবাব্রতে নিযুক্ত। শিক্ষিতাগণ যদি প্রাচীনা মহিলাগণের আচার ব্যবহার মনোযোগসহকারে দর্শন করেন, আমাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা প্রবন্ধের শীর্ষভাগে যে মহিলার নাম গ্রহণ করিয়াছি, ইনি প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আরঙ্গজেবের দুহিতা। রমণীকুলে ইনি প্রসিদ্ধ কবি। বোধ হয় আমাদের পাঠিকাগণের অনেকে জেবোন্নেসার জীবনবৃত্তান্ত কিছু কিছু জানেন। সাহিত্যে এবং কবিতারচনায় ইঁহার স্বাভাবিক দক্ষতা এবং অনুরাগ ছিল।

পিতার নিয়োগক্রমে সমসাময়িক পারস্য এবং ভারতবর্ষবাসী বহুসংখ্যক কবি ইঁহার সাহিত্যানুরাগ এবং তদ্বিষয়ক শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি আজীবন কুমারী থাকিয়া সাহিত্যচর্চ্চা এবং কবিতা-রচনাদ্বারা সমস্ত মানবসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নির্ম্মল চরিত্র এবং মধুর কবিতারস তৎকালবর্ত্তী জন সমাজকে যথেষ্ট পরিপোষণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকটি রমণী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা রমণীকুল এবং পুরুষগণও বিশেষ ভাবে সেবিত হইয়াছেন একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করা যায়। নানা বিষয়ে উচ্চ-ভাব,উন্নতরুচি ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা কবিগণ মানবজাতির চিত্তক্ষেত্রে জাগ্রত করেন। তদ্দ্বারা জনসমাজ উন্নতিমঞ্চে অধিরোহ-ণের আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়।

কেবল কবিতা এবং সাহিত্য দ্বারাই যে মানবজাতির সেবা হয় এমন নহে। সেবারূপ বিশাল প্রাসাদের বহুতর দ্বার বর্ত্তমান। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সুখ, জীবন মরণে কত প্রকারে যে মনু-ষ্যজাতি শিশুর ন্যায় জননীমুখাপেক্ষী হইয়া আছে, তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা রমণী বা জননীকুলের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অপরের দুঃখ এবং অভাব দেখিলে আপনার সুখ ও সৌভাগ্য তুচ্ছ বোধ হয়। যাঁহারা পরদুঃখহরণার্থ বা অপরের সুখসুবিধাসাধনার্থ আপনাকে তুচ্ছ করেন অথবা নত করেন, তাঁহারাই কল্যতঃ" সমুন্নত। অন্যের সেবাই মহিলা-দিগের অতুল গৌরবের একমাত্র হেতু। যাঁহারা আপনার জীবনের ঐশ্বর্য্য সুখ সংরক্ষণে যত্ন করেন, তাঁহাদের তাহা বস্তুতঃ থাকে না। মানবজাতির সুখৈ-শ্বর্য্য এবং কল্যাণার্থ যাঁহারা যত্নবতী হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ও কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়াছে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। মুসলমানজাতি বহুকাল হইতে ভারতে অধিবাসী হইয়াছেন। যাঁহারা মানব জাতির বিরাট জীবনের সেবা করিয়াছেন, কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় জাতির সেই সকল মহিলার ধর্ম্ম এবং জীবনই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কীর্ত্তি এবং জীবনী থাকুক বা না থাকুক, যদি ঈশ্বর তাঁহার কন্যাদিগকে অপরের সেবার্থই প্রেম, পুণ্য এবং শক্তি দ্বারা সাজাইয়া জগতে আনিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে তাহাই সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হইবে। তাঁহারা ব্যক্তিগত বা সমবেত ভাবে ঈশ্বরপ্রদত্ত মহাব্রতসাধনে উদাসীন থাকিলে সুখী ও সার্থকজন্মা হইতে পারিবেন না। অতএব আমরা জেবোন্নেসার মাত্র নামোল্লেখ পূর্ব্বক এ প্রকার বহু শ্রদ্ধেয়া মহিলার জীবনের প্রতি আমাদের শিক্ষার্থিনী ললনাকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (ঈ)

কেথারাইন্ উইলকিন্সন্।

কেথারাইন্ উইলকিন্সন্ সচরাচর কিঁধি নামে অভিহিত হইতেন। আমরাও সেই নামেই তাঁর উল্লেখ করিব। ১৭৮৬

খৃঃ অঃ আয়র্লণ্ড দেশে কিথির জন্ম হয়। কিথির মা বৈধব্যদশায় একজন মহিলার কারখানায় কর্ম্ম করিতেন; বালিকাটী তাঁর সঙ্গে কারখানায় যাইত। কারখানার অধিকারিণী খোঁড়া ছিলেন, তিনি চেয়ারে চড়িয়া প্রতিবেশী দরিদ্র লোকদের বাড়ী যাইতেন ও তাদের তত্ত্ব লইতেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতেন। কিথিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাইত। উক্ত মহিলা অনেক সময় কিথিকে গরিব লোকের ঘরের ভিতর যাইয়া অভাবের বিষয় সন্ধান লইতে পাঠাইতেন; এবং অবস্থা দেখিয়া তার মনে কি ভাব হয় তাহাও জানিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তাকে বলিতেন, "কিথি, সম্ভবতঃ তুমি গরীবই থাকিবে, কিন্তু তুমিও গরীব লোকের কোনও উপকার করিতে পার। কোনও রোগীকে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে পার, কোনওরূপ ফুট ফরমাইস্ করিতে পার। প্রতিজ্ঞা কর তুমি পরের জন্য কিছু কিছু করিবে, এবং আশা করি পরলোকে আমরা সম্মিলিত হইব।" এই কথা কিথির মনে গভীর রূপে বিদ্ধ হইয়াছিল, এবং তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন সেই ভাবে যাপন করিয়াছেন। কিথি কিছু দিন কাপড়ের কলে কর্ম্ম করেন, তৎপর একজন ভদ্রলোকের গৃহে চাকুরী গ্রহণ করেন। গৃহিণীর নিকট তিনি নানা বিষয়ে বহুজ্ঞতা লাভ করেন।

তিনি একজন জাহাজের নাবিককে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে নাবিকের সঙ্গে কথা হয় যে তাঁর বৃদ্ধা ও রুগ্না জননী তাঁর সঙ্গে থাকিবেন। নাবিকও তাহাতে সম্মত হন। তাঁহাদের জীবন এক প্রকার সুখেই কাটিতে ছিল। দুইটি সন্তান হইলে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। মা অন্ধ ও উন্মাদ হইলেন। তিনি দুঃখের সাগরে ভাসিলেন। তিনি নানা রূপ কাজকর্ম্ম করিয়া দুঃখে কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। বড় পুত্রটী চিররুগ্ন হইয়া পড়িল। কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত কত কষ্টে তাহাকে পালন করিলেন; তৎপর তাহারও মৃত্যু হইল। যে সকল লোকের সঙ্গে কর্ম্ম করিতেন, মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে কর্ম্ম করিয়াছিল, কালে সে ব্যক্তি অন্ধ ও উপায়হীন হয়, কিথি তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া সাত বৎসর কাল তাহার সেবা করেন। পরে যখন অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাকে এক দরিদ্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি প্রতি সপ্তাহে কিঞ্চিৎ চা ও চিনি তার জন্য প্রেরণ করিতেন। উক্ত স্ত্রীলোকের একটি পঙ্গু পুত্রও সেই দরিদ্রালয়ের আশ্রয় লইলেন। তাহার মাতা যে কিঞ্চিৎ চা পাইতেন, পুত্রকেও তাহার কিছু অংশ দিতেন। কালসহকারে মাতার মৃত্যু হইল। তখন সেই পঙ্গু ছেলেটি কিথিকে বলিলেন যে, "মার সঙ্গে আমিও একটু চা পাইতাম, কিন্তু আমার আর তাহা পাইবার উপায় রহিল না।" তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া কিথি বলিলেন, "আমি যত দিন বাঁচিব, তোমাকে চা চিনি পাঠাইব।" তিনি নিয়মমত উহা শেষ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।

একদা একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক কয়েকটি সন্তান লইয়া কিথিদের বাড়ীর নিকট বাসা না পাইয়া বড়ই নিরুপায় হইয়া পড়িল। তখন কিথি তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র গৃহে স্থান দান করিলেন। এক-পক্ষ কাল মধ্যে স্ত্রীলোকটী মারা গেল। মরিবার সময় তার সন্তানগুলিকে কিথির হাতে সঁপিয়া গেল। তিনি আপন সন্তান-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন।

অপর একটী ভিক্ষুক রুগ্না স্ত্রীলোক স্বীয় সন্তানদিগকে ছাড়িয়া আতুরাশ্রমে বাস করিতে অসম্মত। কিথি সময় সময় তাহার তত্ত্ব লইতেন। ক্রমে সে স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতে লাগিল, এবং তাঁহারই প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে গরীবদের কার্য্যালয়ে দিল ও দুবছরের ছোট ছেলেটীকে কিথি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটিকে প্রতি সপ্তাহে আপনার ব্যবহারের কাপড় দিয়া তাহার মলিন বস্ত্র নিজে পরিয়া আসিতেন ও পরিষ্কার করিতেন। এত উপকার করিয়াও তার মন পাইতেন না, বরং বার বার তিরস্কৃতা হইতেন।

কিথির জ্যেষ্ঠপুত্রের মরণান্তে তিনি লিভারপুলে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রও মারা গেল। তখন আর সংসারে তাঁর আপনার বলিবার কেহ রহিল না। একজন বিপত্নীক ভদ্রলোকের তিনটী সন্তানের প্রতিপালনের ভার লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন! অল্পদিন মধ্যে ভদ্রলোকটি মারা গেল. কিথির উপর সন্তান তিনটির ভরণপোষণের ভার পড়িল, তিনি বহু কষ্টে অনেক বৎসর তাদের প্রতিপালন করিলেন।

ইংলণ্ডে প্রথম ওলাউঠা পীড়া আরম্ভ হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধি পালনে সকলকে বাধ্য করা হয়। কিন্তু গরীব লোকে স্থানাভাবে, অর্থাভাবে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে পারিত না। এ সময়ে কিথির বাড়ীতে সামান্য একটু আঙ্গিনা, বস্ত্রপ্রক্ষালনের ঘর ও থাকিবার ঘর ছিল। তিনি তাঁর অঙ্গনে কতকগুলি রজ্জু টাঙ্গাইয়া দিলেন ও প্রতিবেশিনী গরীব স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয় বাড়ীর বস্ত্রপ্রক্ষালনের ঘরে কাপড় ধুইতে দিতেন। সেখানে অনেকে কাপড় ধুঁইয়া শুকাইয়া লইত। ইহা দ্বারা সে পল্লীর বহু পরিবারের বিশেষ উপকার হইল। তদ্দর্শনে নগরপালগণ সাধারণ বস্ত্রধৌতাগার সকল স্থাপন করেন। প্রথমতঃ কিথি ও তাঁহার স্বামী উক্ত কার্য্যের অধ্যক্ষতা করেন। কিথির এই সামান্য হিতকর কার্য্য হইতে সাধারণ স্নানাগার ও বস্ত্রপ্রক্ষালনের স্থানের সূত্রপাত হয়। এই অনুকরণে পরে লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় নগরেও উহার প্রতিষ্ঠা হয়।

কলেরা আরম্ভ হইলে সচরাচর গরীব লোকদের উপরই আক্রমণ অধিক হয়। কিথি এ সময়ে নানাপ্রকারে ঔষধ দ্বারা, পথ্য দ্বারা, নিজের উপস্থিতি দ্বারা লোকের সেবা করিতেন। কলেরাতে বহু বালক-বালিকা পিতৃমাতৃহীন হইল। কিথি প্রায় কুড়িটিকে আপন গৃহে প্রতিপালন করিলেন।

একদিন পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য কাগজের সঙ্গে কতকগুলি পুরাতন জীর্ণ বাইবেল বিক্রির জন্য রহিয়াছে। তিনি অল্প মূল্যে

বাইবেলগুলি কিনিয়া আনিলেন। নিজ হস্তে বইগুলি মেরামত করিয়া সমুদ্রগামী নাবিকদিগকে উহা উপহার দিতে লাগিলেন। শুনা গিয়াছে তাঁহার প্রদত্ত বাইবেল দ্বারা অনেকের বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

সামান্য অবস্থার লোক হইয়া তিনি নানা প্রকারে বহু লোকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রাণে যদি প্রেম থাকে, মনে যদি ইচ্ছা থাকে, লোকে সামান্য অবস্থায় থাকিয়াও কত রূপে পরসেবা করিতে পারে, কিথির জীবন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। (বৈ)

মহিলার রচনা।

জাগরণ।

[চট্টগ্রাম ভগ্নিসমাজে পঠিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বহু শতাব্দির নিদ্রার পর মানবের হৃদয়াকাশে ঊষার সুবিমল আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, মানবপ্রাণে জাগরণের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। এ যুগে মানব সাধারণ কর্ম্মসাধনে ব্যস্ত। ক্রমে তাহাদিগের কর্ম্মের ব্যাপকতা সমুদয় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে মনুষ্য আপনার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রত্যেকেই স্বীয় শক্তি অনুসারে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্য করিতে প্রয়াসী। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের একবার সন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবিত কি না! জগতে জ্ঞানসূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কর্ম্মজগতে জাগরিত হইয়াছি সত্য, জীবনের আভাস পাইয়াছি সত্য, কিন্তু প্রকৃতজীবন লাভ করিয়াছি কি না দেখা আবশ্যক।

প্রকৃত জীবন কি? মানবজীবন কালের সমষ্টি নহে, অথবা কর্ম্মেরও সমষ্টি নহে। সৃষ্টির অন্যান্য জীবের ন্যায় মানবজীবন কর্ম্ম এবং কালমাত্র দ্বারা সংগঠিত হয় নাই। পক্ষান্তরে মানবজীবন 'একটি স্বর্ণ মুহূর্ত্ত মাত্র।' সহসা একটি মুহূর্ত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইল, আমি তাহার পশ্চাতে আরোহণ করিয়া অনন্তের সন্ধানে অনন্তকালের জন্য ছুটিয়া চলিলাম ইহাই প্রকৃত জীবন। আমি বিশ্বের কোলাহলে আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়া মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া সুখস্বপ্নে কালাতিবাহিত করিতেছিলাম, সহসা আমার হৃদয়রাজ্যে ঊষার আলো প্রবেশ করিল, চাহিয়া দেখিলাম আমি জীবনলাভ করিয়াছি। আমার হৃদয়রাজ্যে প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়াছে, প্রবৃত্তিসমূহ সুপ্ত বিহগের ন্যায় জাগরিত হইয়া সুমধুর স্বরলহরীদ্বারা আমার হৃদয়কানন মুখরিত করিয়াছে, ভক্তি গঙ্গাজল প্রবাহিত হইয়া আমার অন্তরকে সুনির্ম্মল করিয়াছে, কত সুখদর্শনপুষ্প বিকশিত হইয়া আমার জীবনকে সুশোভন করিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানে বিশ্বাসই মানবের প্রকৃত জীবন ও জন্মের চিরসার্থকতা। যিনি জীবনের মূলাধার এবং সকল শক্তির উৎস, তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভরব্যতীত মনুষ্য কি প্রকারে প্রকৃতজীবন লাভের আশা করিতে পারে? জীবন এবং জাগরণ একত্র গমন করে। জীবিত ব্যক্তি কিছুতেই জাগরিত না হইয়া পারে না। সুতরাং মানব যখন ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া প্রকৃত জীবন লাভ করে, তখন সে জগতের হিতকর কার্য্যে আত্মদান না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইবার নিমিত্ত কোনরূপ বাহ্যশক্তিপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না।

সংসারে কর্ম্মীদিগের মধ্যে অনেকেই

এরূপ প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের কার্য্য দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মৃত পদার্থের কর্ম্মসাধনের ন্যায় তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কোনও উন্নতিলাভ হইতে দেখা যায় না। তাঁহাদিগের কর্ম্মসাধনের মূলে বাহ্য শক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে। কেহ স্বজাতি-প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বদেশসেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন দেন, কেহ বিশ্বহিতৈষী নাম লাভের নিমিত্ত পরসেবাব্রত গ্রহণ করেন. কেহ সংসারে উচ্চপদবী লাভের নিমিত্ত নানারূপ লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ বা পরলোকে উচ্চস্থান লাভের আশায় নানারূপ পুণ্যকর এবং ধর্ম্মজনক অনুষ্ঠানে রত হয়েন। কোন প্রকারে তাঁহাদিগের কর্ম্মপ্ররোচক ইচ্ছার মূলে আঘাত লাগিয়া সে শক্তি অপনীত হইলেই তাঁহাদের সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারা কর্ম্মজগত হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অন্ধ জগৎ ইহাদিগকে জীবিত বিবেচনায় বন্দনা করে এবং মস্তকে যশের মুকুট তুলিয়া দেয়।

কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন এরূপ নহে। তিনি ধ্রুবতারা জ্ঞানে ভগবানে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। পর্ব্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তিনি তৃণের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যান। কিছুতেই তাঁহার সাধনা প্রতিহত হয় না। জগতের কোন পদার্থই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। তবে আসুন, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে আরও অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে একবার চিন্তা করিয়া দেখি যে আমরা প্রকৃতজীবন লাভ করিয়াছি কি না। হৃদয়ের সমুদয় দ্বার বন্ধ করিয়া একবার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গমন করি। তথায় নির্জ্জনে নিভৃতে বসিয়া ভাবিয়া দেখি আমাদিগের জীবনে সে স্বর্ণমুহূর্ত্ত আসিয়াছে কি না। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে কর্ম্মের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে জাগরণের সুসংবাদ ধ্বনিত হইতেছে। আমাদিগের কর্ণে সেই ধ্বনি প্রবেশ করিয়াছে, আমরা জাগরিত হইতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জীবন-লাভ করিতে হইবে। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারিলেই আমাদের জাগরণ সফল হইবে। আমরাও জাগিব এবং আমাদিগের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণকেও জাগরণের অমৃতধারা পান করাইয়া সন্তৃপ্ত করিতে পারিব।

শ্রীসুশীলা বালা সেন।

সংবাদ।

গুরুতর শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত মহিলার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশ-চন্দ্র সেনের এক্ষণ কিরূপ অবস্থা জানিবার জন্য নানা স্থান হইতে পাঠিকা মহিলারা এবং আত্মীয়বন্ধুগণ ব্যাকুল হইয়া পত্রাদি লিখিতেছেন। তিনি সকলকে পত্র লিখিয়া উত্তর দানে অক্ষম। আমরা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এক্ষণ তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তাঁহার পরম-হিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহার নানা ভুল ভ্রান্তি হয়, তজ্জন্য তিনি চিকিৎসকদিগের উপদেশমতে লেখা পড়ার কাজ হইতে যতদূর সম্ভব নিবৃত্ত আছেন। কিয়ৎকাল পুরীর সমুদ্রতীরে বাস করিয়া সামুদ্রিক শীতল বায়ুসেবনে শরীর বিশেষরূপে সুস্থ এবং মস্তিক প্রকৃতিস্থ হইবে আশায় অচিরে দুই এক জন সমবিশ্বাসী বন্ধু সহ সেখানে যাইবেন, মনস্থ করিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৪শ ভাগ]   আষাঢ়, ১৩১৬, জুলাই ১৯০৯।   [১২শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

পরম জননী, তোমার দুঃখিনী দুর্ব্বলা কন্যার তুমিই পরম সহায়, পরমআশ্রয়। আমাদের দুঃখ দুর্গতি তুমি ভিন্ন কে আর মোচন করে? আমরা অজ্ঞানতামোহ-পাপে আচ্ছন্ন, কে আমাদেরে এ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করে। তুমি অসহায়ের সহায় গতিহীনের গতি। অনাথের নাথ, আমরা তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি। তুমি আমাদিগকে যে সকল সম্পদের অধিকারী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, আমরা আপনদোষে সে অধিকার হারাইয়াছি। নারীহৃদয়কে তুমি প্রেমে আর্দ্র করিয়াছ, কিন্তু আমরা নিজের দোষে সে শুদ্ধ প্রেম হারাইয়া ঘোর সাংসারাসক্তিতে ডুবিয়াছি, ভয়ানক স্বার্থপরতা আমাদের হৃদয়কে অতিশয় নীচ করিয়া ফেলিয়াছে। অসার বিষয় লইয়া দিবানিশি ব্যস্ত থাকি। সৎচিন্তা সাধুভাব আমাদের মনে স্থান পায় না। কেবল সংসার চিন্তা, সংসার ভাবনা আমাদের মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই সর্ব্বদা দৃষ্টি; উচ্চভাব উচ্চদৃষ্টি আমাদের নাই। হে অগতির গতি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই দুর্গতি দূর কর। তোমার কন্যা হইয়া আমরা আর কতকাল এরূপ নীচ জীবন যাপন করিব। তুমি আমাদের প্রাণে তোমার প্রতি অনুরাগ উদ্দীপন কর, শুষ্কপ্রাণে প্রেমের সঞ্চার কর। যাহাতে সাংসারিকতা পরিহার করিয়া তোমার সন্তানদের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, আমাদের অন্তরে সেই শুভ বুদ্ধি সঞ্চার কর। আমরা ভক্তিভরে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ   শান্তিঃ   শান্তিঃ।

শ্রমশীলতা।

কি নারী, কি পুরুষ, সকলেরই শ্রমশীল হওয়া প্রয়োজন। আলস্যে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের লোকের ধারণা, যাহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, যাহারা বিনা আয়াসে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহারাই সুখী। সুখী লোকের আদর্শ, যাহাদের কোনও কর্ম্ম করিতে হয় না, যাহারা চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা ভূরি ভোজন করিতে পারে কোথাও গমন করিতে এক পাও হাঁটিতে হয় না, গাড়ী ঘোঁড়া পাল্কী চড়িয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, স্নান গাত্রমার্জ্জন ইত্যাদিও স্বহস্তে করিতে হয় না, দাস দাসীরা তাহাও করিয়া দেয়। যে দেশে সুখী লোকের আদর্শ এইরূপ অসাড় জীবনযাপন, সে দেশের লোক যে শ্রমবিমুখ হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রমেই যথার্থ সুখ, আলস্যে সুখ নাই। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় শ্রম-বিমুখ ব্যক্তির শারীরিক স্বচ্ছন্দতাও নাই। পরিশ্রম না করিলে ক্ষুধা ও নিদ্রা হয় না। ক্ষুধা না থাকিলে আহারে তৃপ্তি থাকে না। শ্রমে দেহে ক্লান্তি উপস্থিত না হইলে সুনিদ্রা হয় না। শ্রমেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমে বিমুখ হইলে দেহে জড়তা উপস্থিত হয়। ক্ষুধামান্দ্য অনিদ্রা প্রভৃতিতে দেহ ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠে। তখন কি আহার, কি পান, কি শয়ন কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। অলস লোকের জীবন ভয়ানক দুঃখময়।

অলস লোক কেবল দৈহিক শ্রমেই বিমুখ তাহা নহে; মানসিক শ্রমকেও তাহারা ভয় করিয়া থাকে। কোনও গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। তাহাদের মনও জড়তাগ্রস্থ হয়। অভাবগ্রস্থ হইলে আলস্যবশতঃ অভাব মোচনে উদ্যোগ হয় না। উদ্যোগ না থাকিলে কোনও বিষয়েই সফলতা লাভ হয় না।

মানুষের দেহ রক্ষার জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন, মানসিক উন্নতির জন্যও পরিশ্রম প্রয়োজন। শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সকল বিষয়েই শ্রমের প্রয়োজন। যাঁহারা যে বিষয়ের জন্য ক্রমাগত খাটিয়া থাকেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সফলতা লাভ করেন।

যাঁহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য খাটিতে হয় না, তাঁহারা আত্মোন্নতি সাধনের জন্য, পরের সেবার জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন।

আমাদের দেশের নারীগণ বিলক্ষণ শ্রমশীলা ছিলেন। প্রাচীনাগণ কখনও শ্রম-বিমুখ হইতেন না। তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিতেন, ঘরবাড়ী বাসনাদি পরিষ্কার করিতেন, ধানভানা, কুটনাকাটা মশলাপেশা সমস্ত কার্য্যই স্বহস্তে করিতেন। কোনও কোনও পল্লীগ্রামে দেখা গিয়াছে ২০০।৩০০ লোকের ভোজ ব্যাপারের রান্না এক একটী মহিলা নিজ হস্তে সম্পন্ন করিয়াছেন। আর আধুনিক নব্যা নারীর অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। তিনি পরিশ্রমের জীবনকে ভয়ানক দুঃখের জীবন বলিয়া মনে করে।

করেন। চাকর বামুন দাস দাসীদ্বারা তিনি সকল কার্য্য সমাধা করিতে প্রয়াসী। এই শ্রম-বিমুখতা হেতু নবীনাদের দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, দেহভার বহন করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। কাহারো অজীর্ণ রোগ লাগিয়াই আছে, কাহারো মাথার ব্যারাম, কাহারো গায়ে ব্যথা, কাহারো অনিদ্রা, কাহারো ক্ষীণ দৃষ্টি। দেহের তো এই অবস্থা! মনে উচ্চ চিন্তা নাই, হৃদয়ে পরপ্রেমের অভাব, আত্মাতে ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বর ভক্তির অভাব। কেবল আপনার ও স্বামী সন্তানের দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি।

আলস্য-পরায়ণ লোকের মনে নানা কুচিন্তা কুভাব আসিয়া হৃদয় আত্মাকে কলুষিত করে। শ্রমশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের মনে পাপচিন্তা কুবাসনা উপস্থিত হইবার সুযোগই হয় না। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাঁহারা ভক্তিভরে ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোভিনিবেশ সহকারে নিযুক্ত হন, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! তাঁহাদের বিশ্রামেও সুখ আছে। শ্রমান্তেও সুখ আছে। অলসলোক বিশ্রামের সুখ জানে না, শ্রমের সুখও তাহারা ভোগ করিতে পারে না।

ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণলাভের জন্য যথাবিহিত প্রণালীতে শ্রমও সাধন করিতে হয়।

শ্রীবৈ—।

স্ত্রী-শিক্ষা।

যে দেশে বাগ্দেবীর ন্যায় ব্রহ্মবাণী শ্রবণকারিণীর অভ্যুদয়, যে দেশে মদালসা-সদৃশ জননী ও রাজরাণীর জন্ম, যে দেশে খনা লীলাবতীর তুল্য প্রখরবুদ্ধি গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিণীর আবির্ভাব, সে দেশেই আবার দুর্দ্দশারাহু রমণীচিত্তের জ্ঞানরবিকে করালগ্রাসে কবলিত করিয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে রমণীকে অনধিকারিণী করা হইয়াছিল। হায়! রমণীর অন্তঃকরণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন করিবার জন্য ভারতের কৃতি পুরুষগণ কি উপায় না অবলম্বন করিয়াছিলেন? ভাবিতে দুঃখ হয় যে, ভারত রমণীহৃদয়ে জ্ঞানকে দুঃখ দুর্দ্দশার একমাত্র হেতু রূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ-সিংহ ভারতের কুসংস্কারারণ্যে আধিপত্য স্থাপনের ফলে ভারতললনা অজ্ঞানতারূপ ভীষণ কুক্কুরদংশনমুক্তির ন্যায় উপায় পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল বিস্তার হইতেছে। কিন্তু ষাট্ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ভাবিলে দুঃখে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয়।

শতাব্দিকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষা শব্দ ছিল কি না সন্দেহ। পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা অনেকে শিক্ষা করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে "শিক্ষা" শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন, শতবর্ষ পূর্ব্বে তাহা হইত না। মহাত্মা রাজা রামমোহন ইউরোপীয়ানদিগের সহিত বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শিক্ষার উপযোগিতা সবিশেষ উপ-

লব্ধি করিয়াছিলেন, কাজে কাজেই স্বদেশীয় অজ্ঞানান্ধদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য শতপ্রকারে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যদিও রামমোহন রমণীকুলের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং রমণীসুহৃদ্, তথাপি তিনি রমণীকুলের দুঃখ দূরীকরণার্থ বিশেষ ভাবে কিছু অনুষ্ঠানের অবকাশ পান নাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বর চন্দ্র বঙ্গমহিলার মূর্খতাদুঃখাপহরণার্থ সর্ব্বপ্রথমে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে মহামতি বিদ্যাসাগর সহায়তা না করিলে বঙ্গদেশের সমগ্র অন্তঃপুরবাসিনীগণ অদ্যাবধি যে অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত না থাকিতেন তাহা কে বলিতে পারে?

অবলাদিগের দুঃখাভিঘাতে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়সাগরে প্রবল তরঙ্গ উঠিত। এই কারণে কুলীনদিগের বহু বিবাহ, বালবিধবাদিগের ঘোরতর বৈধব্য যাতনা এবং বঙ্গবালার মূর্খতা দুঃখ দূর না হইলে যে বঙ্গদেশের—বিশেষতঃ হিন্দুগণের কল্যাণ নাই, এ চিন্তা বিদ্যাসগরে তরুণ মনে যৌবন কালেই উদয় হইয়াছিল।

প্রায় ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে "সর্ব্বশুভকরী" নামক একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়িণী প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগকে "ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকগণকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না? এই প্রশ্ন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র নীলকমল ভাদুরী উক্ত প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট ঐ রচনার জন্য নীলকমল বাবুকে সুবর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই পুরস্কার বিতরণ সভাতে সভাপতি প্রাতঃস্মরণীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মহোদয় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে অতি উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বেথুন সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণে তৎকালীয় অনেক কৃতবিদ্য লোক দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র এ সময়ে বঙ্গদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জিলায় বিদ্যালয়স্থাপন এবং কুলনারীদিগের জ্ঞানদানের উপায়াবধারণার্থ বিদ্যোৎসাহী বেথুন সাহেবের গৃহে প্রায়শঃ গমন করিতেন। অবলাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতা নগরে অবলাহিতৈষী বেথুন সাহেবের উৎসাহে সুকিয়াষ্ট্রীটে প্রথমতঃ একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার হিন্দুদলপতিগণ বিবিধ প্রকারে ইহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টায় রত হইলেন। বিদ্যাসাগর ইঁহাদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া শত সহস্রবৎসরের বদ্ধমূল সংস্কারলতার মূলোচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া অনেক দলপতির কন্যাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রী করিয়া লইলেন। কিয়ৎকাল পরে বেথুন সাহেবের প্রদত্ত প্রচুর অর্থে বর্ত্তমান বেথুন বিদ্যালয়ের ভূমি ক্রীত ও

বিদ্যালয়বাটী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ মহাত্মা বেথুন পরলোকগত হইলেন। কিন্তু বেথুনের কার্য্যভার তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ডডেল্‌হাউসি মহোদয় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গের প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে বঙ্গদেশের বালক বালিকাদিগের মধ্যে জ্ঞান প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বেথুন মহোদয়ের অভাবে বেথুন বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত হইল না। বিদ্যাসাগরের যত্নে মফঃস্বলে ও বালিকাবিদ্যালয়স্থাপন কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিল। এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনা যুবাদের ন্যায় বহু যুবতীও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হইতেছেন। ইহা আমাদের দেশের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটি বিষয় গভীর গবেষণার যোগ্য। প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা কি স্ত্রীশিক্ষা নামের উপযুক্ত? এ দেশে বালকদিগের উপযোগী শিক্ষা প্রথমতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বেথুন মহোদয় কিংবা মহামতি বিদ্যাসাগর বালিকাদিগের অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যেমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কোন্ প্রকারের জ্ঞান শিক্ষা দিলে বালিকাদিগের উপযোগী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চিন্তা তেমন করিয়াছেন, এমন চিহ্ন আমরা কিছুই দেখিতে পাই না।

পুরুষকে শিক্ষাপ্রদানে পুরুষের চিত্ত শক্তিশালী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নারীদিগকেও শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক নারী— গৃহিণী এবং জননী করাই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হওয়া কি আবশ্যক নহে? বালিকা এবং বালক, নারী এবং নর যেমন এক নহে, তাহাদের শিক্ষাদানের উপকরণ এবং প্রণালীও তেমন সম্পূর্ণরূপে এক হওয়া স্বাভাবিক নহে। প্রথম উদ্যোক্তাগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনার্থ যেমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন, শিক্ষার উপকরণ ও প্রণালী বালিকাগণের সম্বন্ধে কিরূপ হওয়া উচিত, তেমন এদিকে দৃষ্টিমাত্র করিয়াছিলেন কি না তাহা বুঝা যায় না।

শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, দেশহিতৈষী চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন দেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কিছু করেন, তাহা এক দেশদর্শী ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। বালক বালিকার ভিন্নতা—গৃহস্থ গৃহিণীর ভিন্নতা, তাঁহারা কেহ কি স্মরণ করেন? বালকের বোঝা বালিকার পৃষ্ঠে, যুবকের ভার যুবতীর স্কন্ধে কাজে কাজেই নিক্ষিপ্ত হয়। কতিপয় মাস পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে জাতীয় শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও গতানুগতিকের ন্যায় বালিকাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

মাননীয় তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন লর্ড কর্জ্জন, এ দেশে শিক্ষাপ্রণালীর সমস্ত দোষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক শিক্ষাবিভাগে আমূল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন। ভারতীয় রমণীকুলের দুর্ভাগ্যবশতঃ লর্ড কর্জ্জনের মত সূক্ষ্মদর্শী পুরুষের চক্ষেও

ভারতরমণীর স্বাতন্ত্র্য অবহেলিত হইয়াছে। বালকের যে গতি বালিকারও সেই গতি নিরূপিত হইতেছে, ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে? অদ্যাপি কি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভারতললনার, বঙ্গমহিলার বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবেন না?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে কার্য্যকারিণী হইতে পারে বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা হইতেছে। এখনও নরনারীর অধিকারভেদ অবশ্যকর্ত্তব্য। কার্য্যতঃ কিংবা কার্য্যক্ষেত্রে যদিও লক্ষ্য এক, তথাপি পুরুষ এবং নারীর অধিকার বা কার্য্য বিভিন্ন। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্নতা অবশ্য থাকিবে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি তাহা বিচার করিবেন না?

অধিকন্তু অধুনা মহিলাদিগের বিদ্যালয় সমূহ মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণ দ্বারা পরিচালন চেষ্টা হইতেছে। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য পুরুষকে সংসারে পুরুষরূপে দণ্ডায়মান করা, যে শিক্ষার পরীক্ষা পুরুষের দ্বারা পুরুষোচিতরূপে গৃহীত হইবে, নারীগণ, বালিকা বা যুবতীদিগকে সেই শিক্ষা সম্যক্‌রূপে প্রদান করিবেন, এবং পুরুষগণসন্নিকটে সেই শিক্ষার পরীক্ষায় যোগ্যতা নির্ব্বাচিত হইবে, ইহাও কি বাস্তবিক আশা করা সমীচীন হইবে? আমাদের বিবেচনায় কাঁঠাল গাছের বীজ বপনপূর্ব্বক বারিসিঞ্চণ ও সার প্রদানদ্বারা আম্রফলের প্রত্যাশা করার ন্যায় ঐরূপ প্রত্যাশাও নিতান্ত বিফল হইবার সম্ভাবনা।

বালিকা এবং যুবতীগণ শিক্ষাপ্রভাবে যোগ্যা নারী হইবেন, জনসমাজে নারীজনোচিত কর্ত্তব্যপালনক্ষমতা লাভ করিবেন। শিক্ষিত সমাজহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইহাই কি লক্ষ্য করেন না? যদি বালিকাদিগকে শিক্ষিতা নারীরূপে দণ্ডায়মান করা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হয়, তবে নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ক আদর্শ ও উপায়াদি সর্ব্বথা পরিবর্ত্তন করিবার এবং এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যাবধারণ করিবার সমূহ সময় উপস্থিত।

বেথুন বা বিদ্যাসাগর ইহা যদি করিতেন এতদিনে প্রভূত মঙ্গল হইত; কিন্তু না করাতে তাঁহারা নিন্দনীয় নহেন। কেন না, এ দেশ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে যে ভাবাপন্ন হইয়াছিল, বঙ্গীয় জনসমাজ, স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ বিরোধী ছিল তাহাতে যে কোনরূপে স্ত্রীশিক্ষার পথ মুক্ত করাই প্রথম যুগে তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা আকর্ষণ করিয়াছিল।

বঙ্গদেশের সমাজসংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মনে নারীজাতির শিক্ষার স্বতন্ত্র প্রণালীসম্বন্ধে চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা নগরে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে নারীদিগের উচ্চশিক্ষার স্বতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মহাত্মা কেশবচন্দ্রের আদর্শ সমীচীন কি না ইহা চিন্তাও করেন নাই। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সমাজসংস্কারের

অপর বিষয় সকলেরও যেমন প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর প্রতিও সেই প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে নব্যীয় শিক্ষিত সমাজের যে সকল লোক কেশবচন্দ্রের মতানুবর্ত্তী, তাঁহারাও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার মতবিরোধী ছিলেন। যদি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সকলেই কেশবচন্দ্রের মতের পক্ষপাতী হইতেন, বেথুন কলেজ এ ভাবে সংস্থাপিত হইতে পারিত না। ইংলণ্ডে যুবকদিগের সহিত যুবতীগণ সমুদায় ইউনিভারসিটিতে উপাধি-পরীক্ষায় প্রতিযোগিনী হইতে পারেন না। যদি কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে সেরূপ নিয়ম থাকিত তবে আমাদের দেশে অল্পকাল মধ্যে যেমন বি, এ, এম্, এ, উপাধিধারিণী অনেক মহিলা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, ইহার অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাদের উপাধি প্রাপ্তির অন্য প্রকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইত।

মহামনা লর্ড কর্জ্জনের এ দেশীয়া নারীগণের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা আকৃষ্ট না হওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে।

যে সকল পুরুষ এ দেশে কুসংস্কার-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া মতোল্লাস লাভ করিয়াছেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীদিগকে স্বাধীনতা দিয়া তাঁহারা কৃতকৃতার্থ। আহ্লাদের উচ্ছ্বাসে নারী-দিগের সম্বন্ধে গভীর ও শান্তভাবে তাঁহারা আদৌ চিন্তা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। নারীকে যে নারীই রাখিতে হইবে এ কথা তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই। রমণীদিগের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় বর্ত্তমান। যা করাও তাই করেন; যা শিখাও তাই শিখেন। সম্প্রতি দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষিত লোকদিগের এখন আর "হুজুগের" সময় নাই। অনেক নারী সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, আমরা বিশ্বাস বা আশা করি যে, তাঁহাদের স্বজাতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ও ক্ষমতা কিছুটা জন্মিয়াছে, বেথুন বিদ্যালয়ে এখন মহিলাগণ আপনারাই অধ্যক্ষতা এবং অধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। জিলায় জিলায় যে সকল এনট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার শিক্ষাকার্য্য মহিলাগণের প্রতি ন্যস্ত হইতেছে।

এ সময়ে কি নারীকুলহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং শিক্ষিতা মহিলাবর্গ বিশেষ ভাবে নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ক ইতিকর্ত্তব্য গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক বোধ করেন না? যুবা এবং যুবতীগণের শিক্ষার বিষয় সকলের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা অবশ্য প্রবর্ত্তনীয় বলিয়া কি বোধ হয় না? শিক্ষাকার্য্য যেমন মহিলাদিগের হস্তে ন্যস্ত হওয়া শিক্ষিত নরনারী উভয়ের দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে; পরীক্ষা কার্য্যে বালিকা এবং যুবতীগণের কেন বিভিন্নতা না হইবে? কেন মহিলাগণ পরীক্ষাকার্য্যে বালিকা এবং যুবতীগণের ভারপ্রাপ্ত না হইবেন? সংসারে নারী, নরের প্রতি

যোগিণী কুত্রাপি নহেন। তবে শিক্ষাগৃহে কেন বালিকা এবং যুবতীগণ বালক এবং যুবকগণের প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে? প্রতিযোগিতায় প্রতিহিংসা প্রবণতা জন্মে। প্রতিযোগিতা দ্বারা জিগীষাবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। নারীনরের মধ্যে কখন কোন প্রকারে তাহা হওয়া উচিত নয়।

নারী নরের, নর নারীর চিরশ্রদ্ধাস্পদ। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, উভয়ের শিক্ষাকার্য্যে বাল্যাবধি সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিহিত। নারী নারীর এবং নর নরের প্রতিযোগী হইলে কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু নারী নরের প্রতিযোগিতায় যেমন পরিবারে, তেমনি জনসমাজে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটে। বাল্যাবধি বিধিমতে এ প্রকার অমঙ্গলের বীজ জীবনক্ষেত্রে বপন করা কি কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য? যাহা অকর্ত্তব্য সামান্য বিবেচনার অভাবে তাহাই অধুনাতন বঙ্গীয় সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শিক্ষাবিভাগীয় রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এত কাল পরে দেশীয় বালিকা এবং যুবতীগণের শিক্ষার ভার শিক্ষিতা মহিলাগণের উপরে অর্পণ করাই কর্ত্তব্যস্থির করিয়াছেন। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বালিকাগণের শিক্ষাভার পুংশিক্ষকের হস্তে গ্রাম ও নগর নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র ন্যস্ত ছিল। শিক্ষিতা মহিলার অভাবে অনেক সময়ে অনেক স্থানে অনিচ্ছাসত্বেও পুরুষ শিক্ষকই বালিকাবিদ্যালয়ে রাখিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বালিকাবিদ্যালয় মহিলা শিক্ষয়িত্রী দ্বারা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতে শিক্ষয়িত্রী গঠনের উপায় ও অবধারিত হইতেছে। ইহা যথাযোগ্য বটে। যেমন মহিলা শিক্ষয়িত্রী তেমনি মহিলা পরিদর্শিকাগণও নিযুক্ত হইতেছেন। ফলতঃ যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী সকলেই কুলবালা, সে সকল বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য্য শিক্ষিতা রমণীবৃন্দকর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত না হওয়া নিতান্তই দূষণীয়।

গবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনায় ত্বরায় এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের হস্তে পতিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহা মঙ্গল এবং আনন্দজনক সন্দেহ নাই।

শিক্ষার বিষয় এবং আদর্শ বিষয়ে, পরীক্ষা এবং পরীক্ষকবিষয়েও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পুরুষ যে সকল বিষয় শিক্ষা করিবে রমণীর সে সমুদায় বিষয় সম্যক্ গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই। কতকগুলি বিষয় নরনারী উভয়ের পক্ষে তুল্যরূপে শিক্ষণীয়। কতকগুলি বিষয় এমন আছে যাহা এক পক্ষে অতি প্রয়োজন, অপর পক্ষে অপ্রয়োজন বা অত্যল্প প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষের সেগুলি বিচার করা উচিত। যে বিষয় যে দিকে অতীব প্রয়োজনীয়, সে দিকে সে বিষয়টি অবশ্য শিক্ষণীয়রূপে নির্দ্ধারণ করা এবং যেটি অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় সে বিষয়টি শিক্ষাবিষয়ক তালিকা হইতে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

বালিকা এবং যুবতীদিগের নিম্ন বা উচ্চক্রম পরীক্ষাগুলিও যোগ্যতমা মহিলা-

কুলের হস্তে অর্পণ করা আবশ্যক। পরিদর্শনের ন্যায় পরীক্ষাকার্য্য নারীগণ যত দিন সম্পাদন না করিবেন, তত দিন স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের কার্য্য যোগ্যরূপ সম্পন্ন হইবে না। অবশ্য পরীক্ষাকার্য্যে পটু রমণী, আশা করি এ দেশে ক্রমে এক দুই করিয়া বাড়িতে থাকিবে। শিক্ষিতা মহিলাবর্গের বিশেষ যত্নসহকারে স্ত্রীশিক্ষার ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণজন্য উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত কি হয় নাই? রমণীজাতির কল্যাণচিন্তা এবং কি কি বিষয় রমণীর শিক্ষণীয় এ বিষয়ে চিন্তা কি ভারতে এবং বঙ্গদেশে শিক্ষিতা মহিলাগণ মনে স্থানদান করিতেছেন না?

ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণকণ্ঠ "মহিলা" পত্রিকার উল্লিখিত প্রস্তাব কি মহিলাকুলহিতৈষীদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে?

দয়াময় ঈশ্বর এদেশের মহিলাদিগকে পুণ্যবলে এবং ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও গুণে বিভূষিত করুন। তাঁহারা উপযুক্ত গৃহিণী, মাতা ও ভগিনীরূপে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করুন ইহাই অভিলাষ।

নারীজাতির অধিকার।

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত।)

শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রমথলাল সেন মহাশয় অনেক দিন হইতে আপনাদের নিকট কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হই নাই; এবার আর তাঁর কিছুতেই দয়া হইল না, বলা দিতে হইয়াছে। আমি যে এত দিন বলি নাই, তাহার কারণ কলিকাতায় কোন একটা বিষয় ভাবিবার অবকাশ পাওয়া যায় না। আমরা যেমন, কোনও বস্তু খানিকটা দূরতা বা শূন্যতার মধ্য দিয়া না দেখিলে তাহা ভাল করে দেখিতে পাই না, তেমনি কোন একটী বিষয় যতক্ষণ না একটী অবকাশের মধ্য দিয়া দেখি, ততক্ষণ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয় না, ঝাপসা থাকিয়া যায়। আর একটী কারণ এই, আপনারা তাহাকে হয়ত বিনয়ের কথা বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহা বিনয় নয়—আমি বলিতে পারি না, লিখিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিতেই আমি অভ্যস্ত, বলিতে বলিতে ভাবা, ভাবিতে ভাবিতে বলা তাহা আমার অভ্যাস নাই। কোন বিষয় না ভাবিয়া বলা আমি অপরাধ মনে করি, সেই জন্য আমাকে খানিকটা ভাবিয়া আসিতে হইয়াছে। আমার নিকট হইতে যেন কেহ কোন উপদেশ বা বক্তৃতা শুনিবার আশা না করেন, আমি একটী বিষয় লইয়া কেবল আলোচনা করিব।

আজকাল একটী বিষয় লইয়া সর্ব্বত্রই খুব আলোচনা হইতেছে—নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাইতে পারেন কি না।

সম্প্রতি আমার একটী শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন যে মেয়েরা ঘরের ভিতরে সামান্য বিষয় নিয়ে কেন থাকবেন, তাঁরা অনেক বড় বড় কাজ করিতে পারেন। আমি এখনই একথার কোন সমালোচনা করছি না। কিন্তু আজ কালকার দিনে এ কথা বলা কিছু আশ্চর্য্য নয়। পূর্ব্বে আমা-

দের দেশে কোন একটী সত্যকে, সংস্কারকে অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করা হ'ত, তখন অন্যান্য দেশের সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষণ হয় নাই,যাহা সত্য, যাহা প্রবর্ত্তিত সংস্কার, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, তাহা বিনা বিচারে সকলে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন অন্য দেশের নিকট হইতে আঘাত আসিতেছে, এখন আর বিনা বিচারে কেহ কোন সত্য লইতে প্রস্তুত নয়, সকল সত্যই যাচাই ক'রে নেওয়া হচ্ছে। আমার তাই মনে হয়, আমরা যে সত্যকে একেবারে সত্য ব'লে ধরে রেখে দিয়েছি, সে সত্য আমাদের কোনও কাজে আসে না, সে অচল অটল ভাবে রয়েছে। যে সত্যকে আমরা একবার নাড়াচাড়া করে দেখি, তার মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা সত্য কি না, তাহাই আমাদের কাজে আসে, সে সত্য তখন দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মহত্ত্ব গৌরব আরো বাড়ে, আমরা সচেতন হ'য়ে সত্যকে গ্রহণ করি, পালন করি। এখন সকল লোকেই সকল বিষয় যাচাই ক'রে নেয়। সেই রমণী যে ঐ ভাবটী প্রকাশ করেছিলেন, আমি সেজন্য তাঁকে নিন্দা কর্‌ছি না, কিন্তু এখন দেখিতে হইবে সে কথা সত্য কিনা।

আমরা এই পৃথিবীতে দুটী ভাব দেখিতে পাই,একটী সামাজিক আর একটী ব্যক্তিগত। প্রথমতঃ দেখিতে গেলে, মানুষ সমাজের দাস, সমাজই যেন তার সব, তার খাওয়া পরা, উঠা বসা, চলা ফেরা, বিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়ে সমাজের আজ্ঞাধীন হইয়া তাহাকে চলিতে হইবে। যেন তার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব নাই, সে যেন সমাজের ছায়া। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সমাজকে এরকম ক'রে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন কেন? এই জন্য যে তাহাতে সমাজের কোন লোক কোন বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা করিতে পারিবে না, যাহা ইচ্ছা আহার পান করিবে, তাহা পারিবে না। এ সকল সত্ত্বেও তাহার একটী পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষত্ব আছে।

ভগবানের সৃষ্টির মধ্যেও দেখি, দুটী ভাব রয়েছে। দেখি যে মুহূর্ত্তের মধ্যে কত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে, কত লোক দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িতেছে, যেন ভগবান মানুষের জীবন মৃত্যু কিছুই গ্রাহ্য করেন না। এ কিন্তু তা নয়, এখানে তিনি সমগ্র দেশের, জাতির, পৃথিবীর মঙ্গলসাধন কর্‌ছেন, যাহাতে কত শত লোক মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এখানে ব্যক্তির স্থান নাই জাতির। অপর দিকে কি দেখিতে পাই, যেন এই বিশ্বসংসার এক একটী মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অনাদি কাল, অনন্ত ভবিষ্যৎ সকলের কেন্দ্র যেন, সেই একটী মানুষ, গতকালে যত কিছু হয়েছে, সমস্ত ভবিষ্যতের সকল ব্যবস্থা সেই একজন মানুষের জন্য, তার প্রতি মুহূর্ত্তের অভাব পূর্ণ করিতে সকলে ব্যস্ত। সকলের সঙ্গে গোপনে একটী সম্বন্ধ রাখেন, অন্তরে গোপনে, কাণে কাণে কথা বলেন; ভগবান্ বলেন, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে একটী কথা আছে; সেখানে আর কেহ নাই,

তুমি আর আমি। সকল জীবের সঙ্গে এই তাঁর দুটী সম্বন্ধ, তিনি একাধারে পিতা ও মাতা।

তিনি তাঁর এই প্রকৃতি দ্বিধা ক'রে নর নারীতে দিয়াছেন। নরের মধ্যে পিতৃ-ভাব, আর নারীর মধ্যে মাতৃভাব; মা সন্তানের প্রতিমুহূর্ত্তের অভাব মোচন করেন, সে এখনি কি খাবে তাঁর এই চিন্তা। সন্তানের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূর্ণ করিতে হয়। মাতা তাঁর ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখেন। মা তাকে কেন ভালবাসেন? সে একজন মানুষ ব'লে, একটী প্রাণী ব'লে একটী ব্যক্তি ব'লে,—তার ব্যক্তিত্বকে মাতা গ্রাহ্য করেন। একটী ব্যক্তি ব'লে মা তাকে ভাল বাসেন। মাতার কাছে প্রত্যেক সন্তান একটী বিশেষ ব্যক্তি—এই জন্য আমরা মাতৃহীন সন্তানকে হতভাগ্য বলি, সে তখন বড় সস্তা হ'য়ে যায়, সে তখন রাস্তার লোক হয়। আর পিতার কাজ কি তাকে শাসন করেন, শিক্ষা দেন, সমাজের মধ্যে একজন করিতে চান, তাকে ডেপুটী কি জজ করিবেন তাই ভাবেন। মা তাকে গৃহে বদ্ধ ক'রে রাখতে চান, পিতা তাকে সমাজের একজন হ'তে বলেন, এর সামঞ্জস্য কোথায়?

নারীর এই যে কাজ স্বামী পুত্রকে আহার করাইবেন, সেবা যত্ন করিবেন, ইহা কি সামান্য কাজ? ইহাকে সামান্য কাজ মনে করা মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এই যে সেবা করা, অভাব মোচন করা, ইহাকে কি তাঁহারা সামান্য হেয় কাজ মনে করেন, ভগবান তাঁর এই মাতৃভাব নারীর মধ্যে দিয়েছেন, ইহা যে কত সুন্দর, কত মহৎ, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না? এরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু এখন এই পদের গৌরব মহত্ত্ব অনুভব ক'রে সচেতনে, আরও সুন্দর রূপে এই কাজ করবেন। স্পার্টান্‌দের (Spartan) কথা শুনিয়াছি, সেখানে কোন পরিবারে পুত্র সন্তান হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাধারণ পালন-শালা বা শিশুশালাতে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে,পিতা মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হ'য়ে কঠিন শাসনে ঐ শিশু মানুষ হইত। কিন্তু তাহারা মানুষ হয় নাই, কেবল যোদ্ধা হ'য়েছিল, বীরও বলিতে পারি না। সে দেশের চেষ্টা ছিল, সকলকে খুব যোদ্ধাশক্ত করিবে, তা সফল হ'য়েছিল, কিন্তু গৃহের আশ্রয় না পাও-য়াতে, তারা কখনও মানুষ হ'তে পারে নাই।

আমি তাই বলি,নারীর স্বভাবের মূলে এই যে সেবা যত্ন ভালবাসা রহিয়াছে, তা কখনও বিকৃত হইবে না, কোন মানু-ষের সাধ্য নাই তাহা নষ্ট করে, ভগবান্ প্রদত্ত অন্তর্নিহিত বস্তু তাহা থাকিবেই।

কিন্তু আর একটা কথা আছে, মেয়েরা ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ হ'য়ে কেবল নিজের স্বামী পুত্রের সেবা ক'রে একটু সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হ'য়ে পড়েন; সকলদেশে সকল জাতির মধ্যেই ইহা দেখা যায়। 'এটা

কিন্তু দূর করিতেই হইবে। সমস্ত পৃথিবীর সুখ দুঃখের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে হইবে যাতে সকলের প্রতি সহানুভূতি, ভাল বাসা বিস্তৃত হয়।

ভালবাসা সকল মানুষের প্রতি বিস্তৃত হইবে, সমস্ত প্রাণীর প্রতি ধাবিত হইবে। কেন হইবে? সে একটী মানুষ ব'লে, প্রাণী ব'লে, আহা সে আছে, আহা সে থাক! প্রতিভা কাকে বলে, যে সকলের মধ্যে তার বিশেষত্ব দেখিতে পায়; সকল মানুষ বিশেষত্ব দেখিতে পায় না। যার যেখানে বিশেষত্ব তাহা দেখাই প্রতিভা। কোন মানুষকে যখন আমরা ছোট ব'লে, সামান্য ব'লে অগ্রাহ্য করি, তখনই আমাদের পথ বন্ধ, বিশেষত্ব দেখিতে পাই না ভালবাসা আসে না। সে ধনী হোক দরিদ্র হোক বিদ্বান হোক, মূর্খ হোক, যাই কেন হউক না, তার একটী বিশেষত্ব আছে। সন্তান মূর্খ হউক, রুগ্ন হউক, যাহাই হউক না কেন, মার কাছে সে একটী বিশেষ লোক।

ইউরোপে ইহা কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে; সেখানে মহা কর্ম্মক্ষেত্রসকল আছে, কত স্বার্থত্যাগ আছে, কত উদ্যম উৎসাহ আছে। আমাদের কি আছে? কেবল গৃহ আছে, সেই গৃহ হইতেই সকল উত্তেজনা, উদ্যম, উৎসাহ লাভ করিতে হইবে। এখানে সকলেই স্বার্থে অন্ধ, স্বার্থত্যাগ করিলে কি অসীম বল, শক্তি আসে, তা আমরা জানি না। এখানে পিতা সন্তানকে খুব বেশী না হয়, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার আশা রাখেন।

যে গৃহে মা সন্তানের সেবা করেন, কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, সে গৃহ গৃহই নয়। মাতা এরূপ ভাবে তাকে লালন পালন করবেন, যে সে সমস্ত দেশের জন্য, দেশের সেবার জন্য মানুষ করছেন। আমাদের দেশে পিতা মাতার মধ্যে সঙ্গত হয় না, সঙ্গত না হ'লে, সঙ্গীত হয় না, রাগিণী আছে কিন্তু একতা নাই, সঙ্গত নাই। পিতা মাতার মধ্যে মস্ত ব্যবধান, প্রকাণ্ড প্রাচীর। এ পাড়ায় একটা বাজনা বাজ্‌ছে ওপাড়ায় একটা বাজনা বাজ্‌ছে তাতে কখনও সঙ্গীত হয় না। পিতামাতার মধ্যে সঙ্গত চাই—নারীরা গৃহে থেকে কাজ করবেন, কিন্তু পুরুষের কাজের সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকবে; নর নারীর কার্য্যক্ষেত্রের মাঝখানে একটী দরজা থাকবে, যেখান দিয়ে যাওয়া আসা যাবে। যেখানে পুরুষদের কাজের সঙ্গে নারীরা না থাকেন, সেখানেই বিকৃতি। নারীকে খানিকটা পুরুষের মত হইতে হইবে। পুরুষকেও খানিকটা নারীর কাছ থেকে নিতে হবে। কেবল স্বদেশী কাপড় কিনলে, ব্যবসা বাণিজ্য করলে হবে না, নরনারীর মধ্যে এইরূপ যোগ, সঙ্গত না হ'লে দেশের উন্নতি হবে না, আমি ঠিক বল্‌ছি হবে না।

সীতা ঠাকুরাণী।

আমরা যে সীতা ঠাকুরাণীর বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি, তিনি ত্রেতাযুগাবতার শ্রীরামচন্দ্র-

মহিষী সীতাদেবী নহেন, ইনি কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের সর্ব্ব-প্রধান পারিষদ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের ভার্য্যা সীতা ঠাকুরাণী।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে বলেন ;—

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা,জগৎ বন্দিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

অদ্বৈত আচার্য্য গৃহিণী সীতা দেবী কিরূপে "জগৎ বন্দিতা আর্য্যা" হইলেন, তাহা মহিলার পাঠিকা গণের যত্নপূর্ব্বক আলোচনার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মহানুভব অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমৎ চৈতন্য লীলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ ছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার ব্যাকুল ক্রন্দনে শুদ্ধ ভক্তির ধর্ম্মজগতে বিতরণ করিবার জন্য শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হন, বৈষ্ণব সমাজে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবী কি মহাপুণ্যবলে জগৎ-বন্দিতা হইয়াছিলেন, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে।

অদ্বৈতাচার্য্য পরিণতবয়সে প্রায় বৃদ্ধকালে দারপরিগ্রহ করেন। সীতাদেবী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হন। কথিত আছে, সীতাদেবী অদ্বৈতগোস্বামীর বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাঁহার দেবচরিত্র ও অপূর্ব্ব ভক্তিনিষ্ঠাদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া একান্ত অনুরাগভরে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। এই স্থানেই আমরা সীতা-দেবীর মহিমার প্রথম পরিচয় পাই। তিনি পতিজীবনে অপূর্ব্ব সেবভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সেবায় ও প্রিয় কার্য্য সাধনে স্বীয় সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিবাহিতা হইয়া সীতাদেবীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল তাঁহার পতি দেবতার একান্ত প্রিয় ও পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনায় পুষ্প তুলসী ও নৈবেদ্যাদি সযত্নে এবং ভক্তিভাবে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, এবং তৎপর শ্রীকৃষ্ণের ভোগরূপে নিবেদন করার জন্য পরম যত্নে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনাদি ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে ভগবৎ সেবা-করা।

শৈশবে মাতৃহীনা হওয়ায় সীতাদেবী স্বীয় পিতৃদেবকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য বাল্যকালেই অতি যত্নের সহিত বিবিধ প্রকার রন্ধন শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। এই রন্ধনশিক্ষাই তাঁহার ভাবী উন্নত ধর্ম্মজীবনলাভের একটী সোপান-স্বরূপ হইয়াছিল। বিবাহিত জীবনে সীতাদেবী শ্রীকৃষ্ণ সেবার্থ নানা উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন, তাহা দেখিয়া ও তাহার সেবানুরাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে আচার্য্য গোস্বামী পরম প্রীত হন এবং কৃপা করিয়া সীতা ঠাকুরাণীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে প্রস্তুত করিয়া লন। ইহার পরে সাধুভক্তগণের সেবা, অদ্বৈতাচার্য্য পরম পণ্ডিত ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা, এ জন্য দেশের নানা স্থানবাসী ধর্ম্মপিপাসু সাধু ভক্ত তাঁহার গৃহে আগমন করিতেন, পরম উদার আচার্য্য তাঁহাদিগকে যেমন শাস্ত্রব্যাখ্যা

শুনাইয়া ও ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া পরিতৃপ্ত ও সুখী করিতেন, তেমনি বিবিধ আয়োজনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, সীতা ঠাকুরাণীই তাঁহার এই মহৎ সেবা-কার্য্যের পরম সহায়স্বরূপা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধা অনুরাগ ও বিশেষ যত্ন পরিশ্রম স্বীকারে এই সাধুসেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার সেবাকার্য্য দেখিয়া পতিদেব অনুপম আনন্দলাভ করিতেন। সীতাদেবীর জীবনে এই সকল মহৎ সেবার কার্য্য ভিন্ন উৎকট যোগ তপস্যা ব্রত নিয়ম দেখা যায় না, তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য সেবা, শ্রীকৃষ্ণের সেবা, পতিদেবতার সেবা, এবং সাধু ভক্তগণের সেবা, এই সেবাধর্ম্মসাধন করিয়াই অদ্বৈত আচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মবীরের প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া পরম পবিত্র শুদ্ধ ভক্তির ধর্ম্মের অমৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিলেন। এই সাধনেই "জগৎ বন্দিতা আর্য্যা" হইয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবন-সহ সীতাদেবীর আধ্যাত্মিকজীবন মিলিত হইয়া যুগলাত্মা হইয়াছিলেন; তজ্জন্যই পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণবাশ্রিত ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্য না বলিয়া তাঁহাকে "সীতানাথ" নামে অভিহিত করিতেন।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অহিফেন।

এই দ্রব্যটী সচরাচর আমাদের দেশে আত্মহত্যা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সময়ে সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া ইহার দ্বারা নরহত্যাও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—অধিক মাত্রা অহিফেন সেবনের ১৫।২০ মিনিট পরেই নেশা অনুভব হয়, এবং নিদ্রা আসে, ক্রমে এই নিদ্রা ঘোর অচৈতন্যে পরিণত হয় এবং নাড়ী ক্ষীণ, শরীর শীতল এবং নিশ্বাস কঠিন হইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় শরীরের চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক হয়, শেষ অবস্থায় শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। নেশার বৃদ্ধির সহিত নিশ্বাস দীর্ঘ হয় এবং প্রতি নিশ্বাসের সহিত গভীর নিদ্রাভিভূতের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ হইতে থাকে। প্রথম প্রথম এই গভীর নিদ্রা বা অচৈতন্যের অবস্থায় পীড়িতকে ডাকিয়া বা নাড়াচাড়া করিয়া জাগ্রত করান যাইতে পারে কিন্তু জাগ্রত হইবার অব্যবহিত কাল পরেই পুনর্ব্বার সে অপূর্ব্ব গভীর নিদ্রা বা অচৈতন্যে অভিভূত হয়। সময়ে সময়ে বহু চেষ্টার ফলে দুই চারি ঘণ্টা কাল জাগ্রত থাকিয়াও পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে। চক্ষের তারা দুটী অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এমন কি ক্ষুদ্র দুইটী কাল বিন্দুর আকার ধারণ করে, কিন্তু মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উহার অবস্থা বিপরীত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ উহা প্রসারিত হয়। ক্রমশঃ অচৈতন্য গভীর হইতে থাকে, তখন শত চেষ্টাতেও পীড়িতকে জাগ্রত করা যায় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হয়, অনেক

সময়ের পর এক একটী করিয়া নিশ্বাস পড়িতে থাকে, নাড়ী সময়ে সময়ে অনুভূত হয় না, মুখ অতিশয় বিবর্ণ হয়। এইরূপে পীড়িত ব্যক্তি ক্রমশঃ চূর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রতীকার :—যদ্যপি অচৈতন্যের অবস্থা উপস্থিত না হইয়া থাকে তবে লবণ বা রাই মিশ্রিত গরমজল পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহার পরিমাণ বড় চামচার table spoon এক চামচা, লবণ বা রাই mustard এবং সাধারণতঃ জলপান করিবার জন্য যে গ্ল্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার এক গ্ল্যাস ঈষদুষ্ণ জল। বমনের পর প্রচুর পরিমাণে গরম চা বা কফি পান করাইবে। যদ্যপি অবস্থা এরূপ হয় যে কিছু পান করিবার শক্তি নাই, তবে অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। তিনি যন্ত্রদ্বারা উদর হইতে বিষ নির্গত করাইবার চেষ্টা করিবেন। নিদ্রাকর্ষণ হইবার লক্ষণ দেখিলেই তাহাকে ডাকিয়া জাগ্রত করিবে, নাড়া চাড়া করিবে, শীতল জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তদ্দারা শরীরে সজোরে আঘাত করিবে, জলের ছিটা দিবে, মস্তকে, বক্ষে, মুখে শীতল জলের ধারা দিবে। যদ্যপি এই সকল উপায়েতেও জাগ্রত রাখা অসম্ভব হয়, তবে তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া দাঁড় করাইবে, এবং দুই পার্শ্বে ধরিয়া হাঁটাইতে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে স্মেলিংসল্ট smelling salt আঘ্রাণ করাইবে এবং পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ জল ও শীতল জল শরীরে নিক্ষেপ করিবে। এবং চা বা কফি পান করাইতে থাকিবে। যদি শরীর নিতান্ত শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে একটু ব্রাণ্ডি (Brandy) ও জল পান করাইবে।

ধুতুরা।

কৃষ্ণ এবং শ্বেত দুই প্রকার ধুতুরা আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে এই উভয়েরই মূল, বীজ, ফল ও পত্র বিষময় পদার্থে পরিপূর্ণ।

লক্ষণ।— ধুতুরা সেবনের অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত শরীরের চর্ম্মে জ্বালা এবং শুষ্কতা অনুভূত হয়,—মুখ ও জিহ্বা এবং গলনালী অতিশয় শুষ্ক বোধ হয়, এবং পিপাসা অনুভব হয়। ক্রমশঃ মস্তক ঘূর্ণ এবং অন্যান্য নেশার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। ধুতুরার নেশায় একটু বিশেষত্ব আছে, ইহা অত্যন্ত অস্থিরতা উৎপাদন করে। পীড়িত ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকে না, সে কখন বা চিৎকার করে, কখনবা উচ্চৈঃস্বরে কোন কল্পিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতে থাকে, কখনবা বিজির বিজির করিয়া অস্পষ্টভাবে প্রলাপ বকিতে থাকে, কখনবা নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিতে পায় এবং সেই হেতু সময়ে সময়ে ভীত ও ব্যাকুল-চিত্তে চীৎকার করিতে থাকে, কখন বা শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং তৎক্ষণাৎ চমকিত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কোন কল্পিত ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, কখনবা আপন শয্যার বা পরিধেয় বস্ত্র খুঁটিতে থাকে এবং হাত ছুঁড়িতে থাকে,

যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা বাছিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, কখন বা দুই হাতে এমনি করিতে থাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সুচিক্কণ সূত্রখণ্ড লইয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ছিন্ন করিতেছে। তাহার চক্ষুর তারাদুটী অসাধারণরূপে প্রকাশিত হয়, সময়ে সময়ে চক্ষের সম্মুখে কোন দ্রব্য ধরিলে তাহা দুই বা ততোধিক বলিয়া অনুভব করে। শরীরের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, এবং সময়ে সময়ে সমস্ত শরীরে এমনি জ্বালা এবং চুলকানী হয় যে কোনরূপ আচ্ছাদন রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপভাবে কিছুকাল থাকিয়া পরে গভীর অবসাদ উপস্থিত হয় এবং পীড়িত ব্যক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে, এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

প্রতীকার।—প্রথম অবস্থাতে রাই বা লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান করাইবে। পরে মস্তকে মুখে ও চক্ষে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল সিঞ্চন করিবে বা ধারা দিবে। অস্থিরতা যদ্যপি অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তবে ত্রিশ ফোঁটা অহিফেণের আরক, এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবে।

মদ্য।

অপরিমিত মদ্যপানে সময়ে সময়ে মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। সৌভাগ্যবশতঃ কিছু অধিক পরিমাণ মদ্য পান করিলেই সাধারণতঃ বমন হয় এবং বমনের পর নেশা ছাড়িয়া গিয়া শরীর সুস্থ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা হয় না, নেশা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ উহা গভীর অচৈতন্যে পরিণত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হয়।

লক্ষণ।—মদ্যপানের প্রথম অবস্থাতে উত্তেজনা ও উল্লাস উপস্থিত হয়, মদ্যপায়ী উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, বিকট হাস্য করে এবং গান করে। তাহার মুখ ও চক্ষুদুটী এ অবস্থাতে লালবর্ণ হয় এবং শরীর শুষ্ক ও উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। পানের মাত্রাধিক্য সহকারে এই উত্তেজনার ভাব তিরোহিত হইয়া অবসাদের ভাব উপস্থিত হয়, মুখ বিবর্ণ ও শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইতে থাকে, দাঁড়াইবার ও চলিবার শক্তি থাকে না, কথা জড়াইয়া যায়, মুখে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়। শেষে অর্দ্ধচেতন বা চৈতন্যহীন হইয়া মদ্যপায়ী ধরাতলে পড়িয়া থাকে।

প্রতীকার।—প্রথম অবস্থাতে মস্তক ও মুখে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল সিঞ্চন করিবে, মাথায় জলের ধারা দিবে, অনেক সময়ে ইহাতেই নেশা ছুটিয়া গিয়া শরীর সুস্থ হইবে, যদ্যপি তাহা না হয় তবে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবার উপায় অবলম্বন করিবে। দুই তিন গ্লাস লবণমিশ্রিত উষ্ণজল পান করাইয়া দিবে। যদ্যপি তাহাতেও উপকার না হয় এবং অবসাদ ও অচৈতন্যের ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া মস্তকে শীতল জলের পটী এবং শরীরে উষ্ণ বস্ত্র আবৃত করিয়া পার্শ্বে

ও পদতলে গরম জলের বোতল রাখিবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে, মধ্যে মধ্যে স্মেলিং সল্ট (Smelling-salt) আঘ্রাণ করাইবে।

সিদ্ধি বা ভাং।

অধিক পরিমাণে সিদ্ধি পান করিলে যে সমুদায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহার কতকটা মদ্য ও কতকটা ধুতুরার লক্ষণের ন্যায়। মদ্যের ন্যায় ইহাতে প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে অবসাদ উপস্থিত হয় এবং ধুতুরার ন্যায় চক্ষের তারা ছুটী প্রসারিত হয় এবং সিদ্ধিপায়ী নানা প্রকার প্রলাপ বকে এবং বিভীষিকা দেখিতে পায়। সমস্ত শরীরে একপ্রকার অসাড়তা বা স্পন্দহীনতার ভাব উপস্থিত হয়, হস্ত স্পর্শ করিলে ভালরূপে অনুভব হয় না। কখন কখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুঁচ ফুটাইবার ন্যায় অনুভব হয়। মস্তকে অতিশয় ঘূর্ণন এবং ভার বোধ হয়, যেন মস্তকের আয়তন ভয়ানকরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং মস্তক স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় পীড়িতব্যক্তি তাহার মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ কোথায় অবস্থিত আছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিছু আহার করিতে দিলে তাহা কখন নাসিকায়, কখন কর্ণে কখন চক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিতে চেষ্টা করে। আর একটী বিশেষ বিভীষিকা, সিদ্ধিপায়ীরা ঘোর নেশার সময়ে দেখিতে পায়, শয়ান অবস্থায় খাট পালঙ্কসহ বা মৃত্তিকায় শায়িত থাকিলে শয্যাসহ যেন অকস্মাৎ সবেগে অতি উচ্চে আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং তথা হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূমিতে পতিত হইতেছে, এইরূপ বারংবার হইতে থাকে, এবং পীড়িত ব্যক্তি আতঙ্কে চীৎকার করিতে থাকে, সময়ে সময়ে তাহার চীৎকারশক্তি থাকে না, সে নীরবে দারুণ যাতনা সহিতে থাকে। এই সকল যন্ত্রণার পর ক্রমে ঘোর অচৈতন্য উপস্থিত হয়, এবং নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল হইয়া শেষ মৃত্যু হয়।

প্রতীকার।—বমন করান, মুখে, মস্তকে, বক্ষে শীতলজলের ধারা দেওয়া এবং অহিফেনের সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়াছে তদনুরূপে, চিকিৎসকের আগমন পর্য্যন্ত, সজাগ রাখিবার চেষ্টা করা।

তামাকু।

তামাকুর পত্র চর্ব্বণ করিয়া বা তামাকের গুল খাইয়া অনেক শিশুকে পীড়িত হইতে দেখা যায়। অল্পবয়স্ক বালকেরা সিগারেট বা চুরুটের ধুম পান করিয়াও কঠিনরূপে পীড়িত হইতে দেখা যায়। লেখক একবার একটী ছয় বৎসর বয়স্ক বালককে এই কারণবশতঃ অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন।

লক্ষণ।—শিরোঘূর্ণন, বমন, মূর্চ্ছা, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ, বক্ষে বেদনানুভব, নিশ্বাস কষ্ট। এই সমুদায়ের পর ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ এবং শরীর শীতল হয়, অবশেষে অচৈতন্য উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইতেও দেখা যায়।

প্রতীকার।—মুখে, বক্ষে শীতলজল প্রক্ষেপ ও বাতাস করা, শয়ান অবস্থায় রাখা এবং গরম চা পান করাইয়া দেওয়া।

নিস্তেজভাব উপস্থিত হইলে গরম জলের সহিত একটু ব্রাণ্ডি পান করাইয়া দিবে এবং চিকিৎসকের আগমন পর্য্যন্ত উষ্ণ আচ্ছাদন ও গরম জলের বোতল দ্বারা শরীর উষ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিবে।

সেঁকোবিষ।

সেঁকোবিষ বাজারে সচরাচর সিমুলক্ষার (white arsenic) এবং হরিতাল (yellow arsenic) এই দুই আকারে বিক্রী হইয়া থাকে, এই উভয় দ্রব্যই নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যে, বিশেষতঃ, রং প্রস্তুত করিবার জন্য ও চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইন্দুর মারিবার জন্যও সিমূলক্ষার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Rat poison নামক যে দ্রব্য বাজারে বিক্রী হয়, উহার প্রধান উপকরণই সিমূলক্ষার। আত্মহত্যা বা নরহত্যা করিবার জন্য সিমূলক্ষার প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সিমূলক্ষার সেবন করিলে যে সমুদায় লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা অনেকটা ওলাউঠা রোগের লক্ষণের ন্যায়। সাদৃশ্য এত অধিক যে অনেক স্থলে কোন ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়াছে কি, সেঁকোবিষ ভক্ষণ করিয়া সে পীড়িত হইয়াছে, কেবলমাত্র লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সন্দেহ হইলে বমন দ্বারা পরিত্যক্ত পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ওলাউঠার লক্ষণের সহিত সেঁকোবিষের লক্ষণের এরূপ সাদৃশ্য থাকা হেতু উহার দ্বারা এ দেশের অনেক নরহত্যা সাধিত হইয়া থাকে। উহা সহজেই আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সময়ে সময়ে সবুজবর্ণ কাগজ চর্ব্বণ করিয়া কিম্বা সবুজবর্ণ রংএ রঞ্জিত খেলনা চুষিয়া শিশুদিগকে পীড়িত হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ এই যে কোন কোন সবুজ রং সেঁকোবিষ সংযোগে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

হ্যালিবার্টন্ পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩য়।

সদ্যবৃষ্টিধারাসিক্ত রাস্তা ধরিয়া বেটী কিংবা অপর কাহারও বাড়ীতে দৌড়ে যাওয়া শুধু আগ্রহাতিশয্যবশতঃ আজ ফ্রান্সিসের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। নতুবা বাহিরে যাওয়ার তাহার অন্য কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

জেন্ বলিলেন, "বড়ই দুঃখিত আছি যে মা এখনও উঠেননি। তিনি মাঝে মাছে মাথা বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে থাকেন, বেদনা উপস্থিত হ'লে, আর তিনি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারেন না। আপনি যে যে বিষয় জান্‌তে ইচ্ছুক, বলুন, আমি যা জানি বলছি।"

"আপনার ভ্রাতা ফ্রান্সিস্ বল্‌ছিল যে আপনাদের পরিবারে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গ্রহণ কর্‌তে মিঃ টেট্ হয়ত সম্মত হ'তেও পারেন।" মিঃ হ্যালি-

বার্টন্ একটু ইতস্ততঃ করিয়া এই বলিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী মহিলাকে এমনি সর্ব্বপ্রকারে সম্ভ্রান্তা ও গৃহটী এমনি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উক্তরূপ প্রস্তাব শিষ্টাচারবহির্ভূত ও আপত্তিকর হইল বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা জন্মিতেছিল।

জেন্ বলিলেন, "আমরা এক জনকে স্থান দিব, এরূপ ইচ্ছা ক'রেছি। আমাদের বাড়ীটে বেশ বড়। ভদ্রলোকের সঙ্গলাভ, বিশেষতঃ তাহাতে সংসার খরচেরও কিছু সাহায্য হ'তে পারে ভেবে বাবা এ ইচ্ছা ক'রেছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে স্থিতি কর্‌ছিলেন, ঠিক কত কাল তিনি এখানে ছিলেন, তা আমি বল্‌তে পাচ্ছি না, তবে তিনি যখন এসেছিলেন, তখন আমি খুব শিশু বালিকা ছিলাম। ঐ ভদ্রলোকের নাম রেভারেণ্ড মিঃ এক্টন। গত অক্টোবর মাসে তিনি আমাদিগকে ছেড়ে গিয়েছেন।"

আগন্তুক কহিলেন, "আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, এস্থান আমার বেশ ভাল লাগ্‌বে। মিঃ টেট্ যদি আমাকে এখানে থাক্‌বার অনুমতি দেন, তাহ'লে আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌বো।"

জেন্ ফ্রান্সিসের ইঙ্গিত স্মরণ করিলেন, মিঃ হ্যালিবার্টন্ এখানে কিভাবে থাকিতে পারিবেন তদ্বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করান সঙ্গত বোধ করিলেন। ঐ ইঙ্গিত না পাইলেও জেন্ উহা বলিতেন, কারণ তাঁহার যেরূপ সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা; তাহাতে উহা না বলিয়া পারিতেন না। তিনি বলিলেন :—

"আমরা খুব সাধারণভাবে থাকি। একদিন মাংস, তৎপরদিন ঠাণ্ডা পুডিং।"

মিঃ হ্যালিবার্টন্ হাসিয়া বলিলেন, "পুডিংটা পেলে আমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর্‌বো। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাত্যাতাড়িত তৃণের ন্যায় আমি নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও স্বচ্ছন্দে থাক্‌বার সুবিধা হ'য়ে উঠে নাই। উপস্থিত বড়ই অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থান কর্‌ছি।"

জেন্ অকৃত্রিম সরলতার সহিত কহিলেন, "আমার বিশ্বাস, বাবা আহ্লাদের সহিত আপনাকে এখানে আস্‌তে বল্‌বেন।" বলিয়া যেন তিনি একটু উপশম বোধ করিলেন। আগন্তুকের চেহারা দেখিয়া তিনি মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, হয়ত ইনি সহজে তুষ্ট হওয়ার মত লোক নহেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন্ বলিলেন, "আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা ভগিনী কেহই নাই, বল্‌তে গেলে সংসারে আমি আত্মীয়শূন্য, কারণ যে একজন আছেন, তিনিও আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।" তৎপর মিস্ জেনের প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি অনেক সময় ভাবি, যাদের প্রিয় আত্মীয় স্বজনও সুখ-শান্তিময় গৃহ আছে, তাহারা কত সুখী।"

জেন্ তাঁহার হাতের কাজটী রাখিয়া দিয়া ত্রস্তভাবে কহিলেন, "আমার

স্নেহভাজন আত্মীয়েরা না থাক্‌লে আমি যে কি কর্‌তেম জানি না।"

"আপনাদের কি খুব বড় পরিবার?"

"আমরা সবশুদ্ধ ছয় জন। বাবা, মা, আর আমরা চারিটী সন্তান। আমি সকলের বড়, মার্গেরেট সর্ব্ব কনিষ্ঠ, ফ্রান্সিস্‌ ও রবার্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী। আজ মার্গেরেটের স্কুলছুটির উৎসব, তাই সে রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে উৎসবে গিয়েছে।" এই ছুটির উৎসবের বিষয় আগন্তুক তাঁহারই মত আগ্রহ সহকারে শুনিবেন, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ না করিয়া জেন্‌ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমিও উৎসবে যেতাম, কিন্তু মা আজ বড়ই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন।"

"উৎসবে যেতে না পারায় আপনার মনে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ হ'য়েছে কি?

জেন্‌ মস্তক অবনমন করিয়া উহা স্বীকার করিলেন, যেন এরূপ স্বীকারে লজ্জিত হইবার কারণ রহিয়াছে। পরে বলিলেন, "মাকে ফেলে যাওয়া নিষ্ঠুরের কার্য্য হইত, আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই অন্য প্রকার আমোদ উপভোগ করবার সুবিধা উপস্থিত হবে, মা এখন ঘুমে আছেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন্‌ মনে মনে বলিলেন, "আহা, কি চমৎকার মেয়ে! এ আমার ভগিনী হলে কি সুখের বিষয়ই হ'ত।"

জেন্‌ বলিতে লাগিলেন, "মার্গেরেট শিক্ষয়িত্রী হবে এবং তদুপযোগিনী শিক্ষা পাচ্ছে। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, এই দুটো শক্তির একত্র সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায়না। তার নিজের রুচিও সম্পূর্ণ এই দিকে, আর বাবারও তেমন অর্থসঙ্গতি নাই, কাজেই তাহাকে শিক্ষয়িত্রী করাই সঙ্গত হইয়াছে।"

"আর আপনি?" মিঃ হ্যালিবার্টনের এই প্রশ্ন অনেকের নিকট ধৃষ্টতাব্যঞ্জক মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি জেনের কথা এত আগ্রহসহকারে শুনিতেছিলেন যে শুধু সেই আগ্রহাতিশয্যেই ঐরূপ বলিয়া ফেলিলেন; জেন্‌ও তাঁহার স্বাভাবিক সরলতার সহিত প্রত্যুত্তরে বলিলেন,

"আমি শিক্ষয়িত্রী হ'ব না। আমি মার কাছে গৃহে থাক্‌বো ও তাঁহার সাহায্য করবো। গৃহে অনেক করবার আছে। মার্গেরেট কোন প্রকার গৃহকার্য্য বা শেলাই শেখেনি। আমিও নৃত্য ব্যতীত অপর কোনও গুণ শিখিনি, অবশ্যি ফ্রেঞ্চ-ভাষাশিক্ষাকে যদি আপনি "গুণ" বলিয়া গ্রহণ না করেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন্‌ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি বেশ ভাল শিক্ষা পেয়েছেন।"

"হাঁ, সকল প্রকার সারবান বিষয়ে আমি শিক্ষালাভ ক'রেছি। বাবা এ সম্বন্ধে খুব যত্ন নিয়েছেন। তিনি এখনও আমাকে সাহিত্যপাঠ, উপদেশ দিয়ে থাকেন। আমি ল্যাটিনও অনেকটা জানি, যদিও আপনার নিকট উহা স্বীকার করতে আমি ইচ্ছুক নহি।" শেষ কথা কয়টি জেন্‌ সংকোচসহকারে কহিলেন, যেন উহা বলিয়া ভাল করেন নাই।

"কেন, আমার কাছে উহা স্বীকার করতে আপত্তি কি ?"

"কারণ, আমার বিশ্বাস ল্যাটিন জানা যুবতী মহিলারা হাস্যাস্পদা হ'য়ে থাকেন। আমি উহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা করি নাই। বাবা ও মিঃ এক্টন যখন ফ্রান্সিস্ ও রবার্টকে ল্যাটিন শিক্ষা দিতেন, আমি তখন ঐ কক্ষে থাকতেম এবং ঐরূপে শুনে শুনে আমি উহা শিখে নিয়েছি। মিঃ এক্টন, প্রায় সর্ব্বদাই ফ্রান্সিসকে পড়াতেন, কারণ বাবার চেয়ে তাঁহার অবকাশকাল বেশী ছিল। ফ্রান্সিস্ ধর্ম্মযাজক হবে"—

এমন সময় একটী ভৃত্য ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মিস্ জেন্, মাঠাকুরুণ উঠেছেন ও আপনাকে দেখ্‌তে চাচ্ছেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টনের নিকট ক্রটী জানাইয়া জেন্ ঐ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রায় তন্মুহূর্ত্তেই মিঃ টেটও গৃহে সমাগত হইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া তিনি একটু থতমত খাইলেন, কারণ তাঁহারও ধারণা ছিল, মিঃ হ্যালিবার্টন্, চশমাধারী অতিবৃদ্ধ না হইলেও, নিশ্চয়ই কোনও স্থির, গম্ভীর, খাঁটি গণিতাধ্যাপক হইবেন। ইহার ন্যায় সুশ্রী যুবাপুরুষকে পরিবারভুক্ত করা কি সঙ্গত হইবে ?

জেন্ যেমন অকপটচিত্তে মিঃ হ্যালিবার্টনের নিকট সমস্ত বলিয়াছিলেন, মিঃ হ্যালিবার্টনও জেনের পিতার নিকট তদ্রূপ সরলতার সহিত আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম এড্‌গার হ্যালিবার্টন, তিনি রেভারেণ্ড উইলিয়ম হ্যালিবার্টননামক গ্রাম্যধর্ম্মযাজকের একমাত্র পুত্র। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় রাখিয়া উইলিয়ম হ্যালিবার্টন পরলোকগমন করেন। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার জননী স্বর্গগতা হইয়াছিলেন। এড্‌গার অতঃপর তাঁহার মাতুল মিঃ কুপারের গৃহে বর্মিংহামে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। মিঃ কুপারের খুব বিস্তৃত কারবার ছিল এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এড্‌গার তাঁহার কারবারে যোগদান করেন। এড্‌গার সম্মত হইলেন না। তাঁহার পিতা জীবদ্দশায় এড্‌গারের রুচিগঠন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিল, এড্‌গার ধর্ম্মযাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন ; এড্‌গারের নিজেরও ঐ মত ছিল। মিঃ কুপার জানিতেন কারবারের চেয়ে ভাল কাজ জগতে আর নাই। ভগবানের সেবারূপ অতি পবিত্র ধর্ম্মযাজকের কার্য্যকে তিনি "ব্যবসায়" বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি নিজ জীবনে কারবারদ্বারা আস্তে আস্তে যথেষ্ট সম্মান ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাগিনেয়ও ঐ প্রকারে ঐরূপ উন্নতিলাভ করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একদিন তিনি ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, সংসারে বণিকসম্রাটরূপে কর্ত্তৃত্ব করা ভাল, কি কিউরেটরূপে দিন রাত্র খেটে খেটে অনশনে জীবনযাপন করা ভাল ? আমি এখনও বণিকসম্রাট্ হ'তে পারিনি বটে, কিন্তু তুমিতো হ'তে পার ?"

আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এড্‌গার বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার ইচ্ছার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন না। বিরোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগল, কথায় নয়—অবাধ্যতায়। এড্‌গার কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে মিঃ কুপার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন, এড্‌গার যদি একান্তই ধর্ম্মযাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তা'হলে তিনি তাঁহার অক্সফোর্ডের ব্যয় কখনই বহন করিবেন না। এড্‌গার হ্যালিবার্টন তখন লণ্ডনে গমন করিলেন ও তথায় কোনও স্কুলে সামান্য একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তথায় তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সে অবধি এ পর্য্যন্ত তিনি প্রাইভেট শিক্ষকরূপে কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুবিধা তাঁহার এ যাবৎ হইয়া উঠে নাই।

পাঁচ মিনিটের কথা বার্ত্তায়ই মিঃ টেট্ আগন্তুকের প্রতি বিশেষ প্রীত ও আকৃষ্ট হইলেন, এবং চা পানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

মিঃ টেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মাতুল কি আপনার উপর আর কখনও নরম হন নাই?"

"কখনও না। আমি তাঁহাকে অনেক পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি তৎসমস্ত ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

"আপনি বল্‌ছিলেন না যে, আপনার মাতুলের পরিবার বা সন্তান সন্ততি নাই? তা হ'লে আপনি ন্যায়তঃ তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ পাইবার অধিকারী। তাঁহার কি অন্য আত্মীয় আর কেহ আছে?"

"আমারই সমসম্পর্কিত একজন আছে, সে আমার মাস্‌তুতো ভগিনী জুলিয়া। মাতুল সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইব এরূপ সম্ভাবনা নাই। আর আমিও তাহা পাইব আশায় বসিয়া নাই।"

মিঃ টেট্ মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক তাহা অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা, উত্তরাধিকারসূত্রে কবে কি পাওয়া যাবে, তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকার চেয়ে অসুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। ইহাতে জীবনের, শক্তি, সামর্থ্যের অপচয় হয়। আমি ২০ বৎসর কাল নিতান্ত দরিদ্র কিউরেট ছিলাম, অবশ্যি দরিদ্র বল্‌তে বুঝায়, আমি এখনও তার বাহিরে নাই, যাক্ সে কথা। আমার একজন ধনৈশ্বর্য্যশালীনী আত্মীয়া ছিলেন, তাঁহার আমি ব্যতীত অপর কোনও আত্মীয় ছিল না। পূর্ব্ব ২০ বৎসরের মধ্যে আমি অনেক সময়ই ঐ অর্থ সম্পত্তির প্রতি মনে মনে সাগ্রহলোলুপ দৃষ্টিপাত করিতাম, কিন্তু তিনি যখন পরলোকগমন করিলেন, এবং যখন জানিলাম, আমার জন্য কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এরূপ আশা করিয়া থাকা কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল। আমি আমার সন্তানগণকে নিয়তই বলি, তাহারা যেন স্বকীয় সাধু চেষ্টায় উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখে এবং

কখনও অপরের অর্থের প্রতি নির্ভর না করে। আপনাকেও আমি সে কথা বলিতে চাই।"

মিঃ হ্যালিবার্টন্ বয়োবৃদ্ধ প্রবীন ধর্ম্মযাজকের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণলোচনে নিরীক্ষণপূর্ব্বক আগ্রহভরে বলিলেন, "ঐ অর্থের বিষয় আমি কখনও চিন্তা করি না, উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, যেন কখনই ছিল না, এরূপই আমি মনে করি। আমি ওকথার উল্লেখই করিতাম না, কিন্তু আমি আপনার পরিবারভুক্ত হইতে আসিয়াছি এই অবস্থায় আমার সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই আপনাকে অবগত করান আমি সঙ্গত বোধ করিয়াছি।"

"আমার মনে হয়, আমরা একত্রে বেশ থাক্‌তে পার্‌তো।" মিঃ টেট্ সরলভাবে উহা স্বীকার করিলেন ; ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মনে যে সমীচীন চিন্তা জাগিয়াছিল, তখন তিনি উহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মিঃ হ্যালিবার্টন আগ্রহভরে কহিলেন, "হাঁ মহাশয়, আমারও বিশ্বাস, আমরা বেশ সুখে ও সম্প্রীতিতে থাক্‌তে পারবো।"

বন্দোবস্ত পাকাপাকি হইল।

(ক্রমশঃ।)

মহিলার রচনা।

আত্মোন্নতির উপায়।

(চট্টগ্রাম ভগ্নী সমাজে পঠিত।)

আমরা যে ভাবে জীবন কাটাইতেছি তাহাতে জীবন ক্রমেই মৃতের ন্যায় হইয়া পরিতেছে, পরব্রহ্মের দিকে কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। তাঁর পথে অগ্রসর হইতে আমাদের জীবনে কয়েকটী বিষয় সাধনা করিতে হইবে। প্রথমেই আমাদের আত্মচিন্তার দরকার। আত্মচিন্তা ব্যতীত জীবন কিছুতেই উন্নত হইতে পারিবে না। প্রতি দিন আত্মচিন্তা করিয়া যদি আমরা আমাদের দোষ ত্রুটি বুঝিতে পারি, উহা পরিত্যাগ করিতে প্রাণ পণে চেষ্টা করি এবং তজ্জন্য ভগবানের চরণে সরলভাবে প্রার্থনা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগের সহায় হইবেন। নিশ্চয়ই তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদিগের প্রতি বর্ষিত হইবে এবং তাঁহারই কৃপা আমাদিগকে তাঁহার দিকে অগ্রসর করিবে।

সাধু চরিত্রও উন্নতজীবন লাভ করিবার একটী সহায়। যদি আমরা প্রতিদিন সাধুচরিত্র পাঠ ও আলোচনা করি এবং তৎসঙ্গে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব আমরা যথেষ্ট উপকার পাইতেছি, জীবন ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যদি আমরা এই কয়েকটী বিষয়ে জীবনকে নিয়মিত করিতে পারি এবং কিছুতেই যদি সংকল্প হইতে বিচলিত না হই, তাহা হইলে, জীবন নিশ্চয়ই তাঁর জন্য ব্যাকুল হইবে, তাঁর দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদিগকে

শুধু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের সাধনা সফল করিতে হইবে। কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টা যেন না হইয়া পড়ি তার জন্য তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া আমরা কাতর প্রাণে তাঁরই চরণে শক্তিভিক্ষা করিব। জীবন যদি সাধনাচ্যুত না হয়, সেই পরব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া যদি জীবনকে সাধনার পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব, শুষ্ক কঠিন হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁর সেই স্নিগ্ধ নির্ম্মল জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে; জীবন নবালোকে আলোকিত হইয়াছে তখন দেখিতে পাইব জীবনে কত আনন্দ! কত সুখ! সঙ্গে সঙ্গে দেখিব তিনি কত আদর করিয়া আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। আমরা ইহলোকে থাকিয়াই তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে কত আরামে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারি!

দয়াময় পিতা! তুমি আমাদের সহায় হও। আমরা যেন জীবন তোমারই পথে পরিচালিত করিত সমর্থ হই। তোমারই ভাবে আমাদের হৃদয় যেন ডুবিয়া থাকে। তোমাতে ডুবিয়া তোমারই বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। করুণাময়! তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীরেণুকণা দাস।

সংবাদ।

পুরী হইতে আগত বন্ধুর মুখে শ্রবণ করিলাম শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় তথায় যাইয়া বেশ মনের আনন্দে আছেন, সাধন ভজন প্রভৃতিতে অনেক সময় ক্ষেপন করিতেছেন। শরীর সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উন্নতি কিছু বুঝিতে পাওয়া যায় না, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা আহারে রুচি এবং নিদ্রা পরিপাক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বৎসর শেষ হইয়া গেল, যাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের মহিলার মূল্য অদ্যাবধি দেন নাই তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন সত্বর ঐ মূল্য প্রেরণ করেন, এইটি বিশেষ অনুরোধ।

"মহিলা" যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, তাহার উদ্যোগ করা যাইতেছে। এ বিষয়ে আমরা "মহিলার" হিতৈষিণী পাঠিকাবর্গের আনুকূল্য প্রার্থনা করি; তাঁহাদের অনেকে ইতঃপূর্ব্বে রচনা ও কবিতাদি পাঠাইয়া মহিলার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেন, এবং আমরাও তাহা প্রকাশিত করিয়া নবীনা লেখিকা-গণের উৎসাহবর্দ্ধনে প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি মহিলার রচনা অতি অল্পই পাওয়া যাইতেছে। "মহিলা" তাঁহাদেরই পত্রিকা, ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

জব্বলপুরের উপদেশিকা পণ্ডিতা গায়ত্রী দেবী প্রায় পক্ষকাল কলিকাতায় আসিয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, ভারতবাসী মহিলাগণ যাহাতে সুশিক্ষিতা হন সে জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা। ঈশ্বর তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন।